॥ ৪ ॥

'আপনি ত দিব্যি মশাই একটি বাঘছাল বাগাবেন বলে মনে হচ্ছে। আর আমি?'

একটু যেন মনমরা হয়েই কথাটা বললেন লালমোহনবাবু। আমাদের খাওয়াদাওয়া হয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক হল। তারপর নিচে বৈঠকখানায় বসে মহীতোষবাবুর কাছে নানা রকম লোমহর্ষক শিকারের গল্প শুনে এই কিছুক্ষণ হল নিজেদের ঘরে এসেছি। লালমোহনবাবুর কথায় ফেলুদা বলল, 'কেন? যে-ই সমাধান করবে সংকেতটার সে-ই বাঘছাল পাবে। অন্তত পাওয়া উচিত। কাজেই আপনিও তাল ঠুকে লেগে পড়তে পারেন। আপনি ত সাহিত্যিক মানুষ, ভাষার উপর বেশ দখল আছে।'

'আরে মশাই, ভাষার উপর দখল মানে কি আর সংকেতের উপর দখল? মহীতোষবাবুও ত সাহিত্যিক। উনি হাল ছেড়ে দিলেন কেন? না মশাই, ওসব মুড়ো বুড়ো গাছ মাছ, তাল ফাঁক ভুঁই ফাঁক—ওসব আমার দ্বারা হবে না। আপনার ভাগ্যেই ঝুলছে বাঘছাল। এই এইটে দেবে নাকি?'

লালমোহনবাবু মেঝেয় রাখা বাঘছালটির দিকে আঙুল দেখালেন। ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক বড় বাঘের কথা বললেন শুনলেন না? ওসব চিতাটিতায় আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।'

ফেলুদা এর মধ্যেই ছড়াটা খাতায় লিখে নিয়েছে, আর খাটে বসে সেটার দিকে একদৃষ্টে দেখছে।'

'কিছু এগোলেন?' লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন।

ফেলুদা খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'গুপ্তধনের সংকেত সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।'

'কী করে বুঝলেন? ওই মুড়ো-বুড়োর ব্যাপারটা কী?'

'সেটা এখনো জানি না, তবে একটা গাছের কথা যে বলা হচ্ছে তাতে ত কোনো সন্দেহ নেই। মুড়ো হয় বুড়ো গাছ। তারপর বলছে হাত গোন ভাত পাঁচ। এখানে হাতটা ইম্পর্ট্যান্ট। সাধারণত এসব সংকেত প্রথমে একটা বিশেষ জায়গার কথা বলে, তারপর সেখান

থেকে কোনদিকে কতদূরে গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে সেটা বলে। রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধন পড়েননি? তেঁতুল বটের কোলে দক্ষিণে যাও চলে, ঈশান কোণে ঈশানি বলে দিলাম নিশানি? তেমনি এখানেও হাত কথাটা পাচ্ছি, দিক কথাটা পাচ্ছি। এই জন্যেই বলছি—'

ফেলুদার কথাটা শেষ হল না, কারণ ঘরে আরেকজন লোক ঢুকে পড়েছে।

দেবতোষ সিংহরায়।

সকালের সেই বেগুনী ড্রেসিং গাউনটা এখনো পরা, আর চোখে সেই অদ্ভুত চাহনি, যেন মনে হয় সকলকেই সন্দেহ করছেন। দেবতোষবাবু সোজা লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি ভোটরাজার লোক?'

লালমোহনবাবু ফ্যাকাশে হয়ে ঢোক গিলে বললেন, 'ভ্-ভোট মানে কি আপনি ভ্-ভোটিং—মানে, ই-ইলেকশনের—?'

'না, উনি বোধহয় ভুটান রাজের কথা বলছেন।'

ফেলুদা কথাটা বলায় দেবতোষবাবুর দৃষ্টি ফেলুদার দিকে ঘুরে গেল, আর তার ফলে লালমোহনবাবু একটা বিশ্রী অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলেন।

'শুনেছিলাম ভোটেরা নাকি আবার আসছে?' দেবতোষবাবু প্রশ্নটা ফেলুদাকেই করলেন। ফেলুদা খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিল, 'সেরকম ত শুনিনি। তবে আজকাল ইচ্ছে করলে ভুটান যাওয়া যায়।'

'ও, তাই বুঝি।'

মনে হল দেবতোষবাবু এই প্রথম খবরটা শুনলেন।

'তা বেশ। উপেন্দ্রকে ভোটরাজ অনেক হেল্প করেছিল। ওরা ছিল বলেই নবাবের সেনা কিছু করতে পারেনি। ওরা যুদ্ধটা জানে। সবাই জানে কি?' দেবতোষবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'হাতিয়ার কি আর সবাইয়ের হাতে বাগ মানে? সবাই কি আর আদিত্যনারায়ণ হয়?'

কথাটা বলে দেবতোষবাবু দরজার দিকে ঘুরে দু'পা এগিয়ে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে মেঝের খাটটার দিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত কথা বললেন।

'যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটি ছুঁত না। তাও শেষটায় ছুঁল।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর ফেলুদা বিড়বিড় করে বলল, 'খড়ম পরেছে। তাতে

রবারের সাইলেন্সার লাগানো।'

এর পর রাত্তিরে পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটল। সেগুলো ঠিক মতো লেখার চেষ্টা করছি। বাইরে বারান্দায় সিঁড়ির দরজার পাশে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক থাকার দরুন ঘটনার সময়গুলো আন্দাজ করতে অসুবিধা হয়নি।

প্রথমেই বলে রাখি যে গদি বালিশ তোষকের দিক থেকে শোবার ব্যবস্থা ভালো হলেও, একটা ব্যাপারে গণ্ডগোল হয়ে যাওয়াতে প্রথম রাত্তিরে ঘুমটা একদম মাটি হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ আমাদের তিনজনের মশারিতেই ছিল ফুটো। মশারি ফেলার দশ মিনিটের মধ্যে ভেতরে মশা ঢুকে কামড় আর বিনবিনুনির জ্বালায় আমাদের ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিল। ফেলুদার সঙ্গে ওডোমস থাকে, শেষটায় তাই মেখে কিছুটা আরাম পাওয়া গেল। বাইরের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে এগারোটা বেজেছে। দিনের বেলা মেঘলা থাকলেও এখন জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল। সবেমাত্র চোখের পাতাটা বুজে এসেছে এমন সময় একটা চেনা গলায় ধমকের সুরে কথা এল।

'আমি শেষবারের মতো বলছি—এর ফল ভালো হবে না।'

গলাটা মহীতোষবাবুর। উত্তরে কে যে কী বলল তা বোঝা গেল না। তারপরে সব চুপচাপ। আমার বাঁ দিকে লালমোহনবাবুর মশারির ভিতর থেকে নাক ডাকার শব্দ শুরু হয়েছে। আমি ডান পাশে ফেলুদার খাটের দিকে ফিরে চাপা গলায় বললাম, 'শুনলে?'

গম্ভীর ফিসফিসে গলায় উত্তর এল, 'শুনেছি। ঘুমো।'

আমি চুপ করে গেলাম।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমটা যখন ভাঙল তখনো ঘরে চাঁদের আলো রয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মেঘের গর্জনও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা লম্বা গুড়গুড়ানি থামলে পর আরেকটা শব্দ কানে এল। ঘুট ঘুট...ঘুট ঘুট...ঘুট ঘুট...। তালে তালে একটানা শব্দ নয়। মাঝে মাঝে হচ্ছে, মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে মেঘের গর্জনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। শব্দটা হচ্ছে বেশ কাছ থেকেই। আমাদের ঘরের ভিতরেই। ফেলুদার খাটের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কান পাততেই ওর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ পেলাম। ও ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু লালমোহনবাবুর নাক ডাকা বন্ধ কেন? ওঁর খাটের দিকে চেয়ে ডবল মশারির ভিতর দিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু

একটা ক্ষীণ শব্দ যেন আসছে খাটের দিক থেকে। এটা আমার চেনা শব্দ। বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে সিমলার বরফের মধ্যে একটা পিস্তলের গুলি লালমোহনবাবুর পায়ের কাছে এসে পড়ায় তার দাঁতে দাঁত লেগে ঠিক এই শব্দটাই হয়েছিল।

সেই সঙ্গে আবার সেই শব্দটা কানে এল। খুট খুট...খুট খুট... খুট খুট...

আমি ঘাড় কাত করে মেঝের দিকে চাইলাম। ফলে মশারিটা একটু নড়ে ওঠাতে বোধহয় লালমোহনবাবু বুঝলেন আমার ঘুম ভেঙে গেছে। একটা বিকট চাপা ঘড়ঘড় স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'ত-তপেশ—বা-বাঘ!'

বাঘ শুনেই আমার চোখ মেঝের বাঘছালটার দিকে চলে গেল, আর যেতেই যা দেখলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

জোৎস্নার আলো বাঘের মাথাটার উপর পড়েছে, আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাথাটা মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক নড়ে উঠছে, আর তার ফলেই খুট খুট শব্দ হচ্ছে।

আর থাকতে না পেরে যা থাকে কপালে করে ফেলুদার নাম ধরে একটা চাপা চিৎকার দিয়ে উঠলাম। ফেলুদার ঘুম যতই গাঢ় হোক না কেন, ও সব সময় এক ডাকে উঠে পড়ে, আর ওঠামাত্র ওর মধ্যে আর ঘুমের লেশমাত্র থাকে না।

'কী ব্যাপার? চাঁচাচ্ছিস কেন?'

আমারও প্রায় লালমোহনবাবুর দশা। কোনো রকমে ঢোক গিলে বলে ফেললাম, 'মেঝে...বাঘ।'

ফেলুদা মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাঘটার নড়ন্ত মাথাটার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ দেখে নিল। তারপর দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে গিয়ে বাঘের থুতনিটা ধরে উপরে তুলতেই তার নিচ থেকে একটা গুবরে পোকা বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদা অম্লানবদনে সেটাকে দু' আঙুলের চাপে তুলে নিয়ে বলল, 'গুবরের আসুরিক শক্তির কথাটা কি তোদের জানা নেই? একটা কাঁসার জামবাটি চাপা দিয়ে রাখলে সেটাকে সুদ্ধু টেনে নিয়ে সারা বাড়ি চক্কর দিতে পারে।'

ভয়ের কারণটা এত সামান্য জানলে অবিশ্যি ঘামটাম আপনা থেকেই শুকিয়ে যায়। আমার আর লালমোহনবাবুরও তাই হল। এদিকে ফেলুদা গুবরেটাকে নিয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে দেখি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এই গভীর রাত্তিরে ফেলুদা কী দেখছে সেটা ভাবছি, এমন সময় ও ডাক দিল, 'তোপসে, দেখে যা।'

আমি আর লালমোহনবাবু ফেলুদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আগেই বলেছি পশ্চিম দিকটা বাড়ির পিছন দিক, আর এদিক দিয়েই কালবুনির জঙ্গল দেখা যায়। এই ক'মিনিটের মধ্যেই কালো মেঘে চাঁদ ঢেকে ফেলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বটে, কিন্তু তা ছাড়াও আরেকটা আলো দেখে অবাক লাগল। আলোটা মনে হল জঙ্গলের ভিতর ঘোরাফেরা করছে। টর্চের আলো।

'হাইলি সাসপিশাস', ফিসফিস করে বললেন লালমোহনবাবু।

আলোটা এবার নিবে গেল।

এবার একটা চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে একটা কানফাটা বাজের আওয়াজ, আর তার পরমুহূর্তেই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম দিক থেকেই ছাট, তাই দুটো জানালারই শার্সি বন্ধ করে দিতে হল। ফেলুদা বলল, 'একটা বেজে গেছে, শুয়ে পড়। কাল সকালে আবার জল্পেশ্বরের মন্দির দেখতে যাবার কথা আছে।'

আমরা তিনজনেই আবার মশারির ভিতর ঢুকলাম।

জানালায় রঙীন কাচ থাকার ফলে বিদ্যুৎ চমকালেই ঘরে রামধনুর রঙ খেলছিল। সেই রঙ দেখতে দেখতেই আবার কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা টেরই পাইনি।

॥ ৫ ॥

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল প্রায় সাতটায়। ফেলুদা অবিশ্যি তার আগেই উঠে যোগব্যায়াম, দাড়ি কামানো-টামানো সব সেরে ফেলেছে। কথা আছে, তড়িৎবাবু আটটায় এসে আমাদের নিয়ে জল্পেশ্বরের মন্দির দেখিয়ে আনবেন। মহীতোষবাবুর তিনজন চাকরের মধ্যে যার নাম কানাই, সে আমাদের চা দিয়ে গেল সাড়ে সাতটার কিছু পরে। ফেলুদা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কোলের উপর রাখা খোলা খাতাটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রায় আপন মনেই বলে উঠল, 'ধন্যি আদিত্যনারায়ণ। তুখোড় বুদ্ধি বলতে হবে।'

লালমোহনবাবু চকাৎ শব্দ করে চায়ে একটু চুমুক দিয়ে বললেন, 'বাঃ, ফার্স্ট ক্লাস চা!—আরো এগোলেন বুঝি?'

ফেলুদা সেইভাবেই বিড়বিড় করে বলল, 'হাত গোন ভাত পাঁচ। ভাত হল অন্ন আর পাঁচ হল পঞ্চ। দুটোকে উলটিয়ে নিয়ে সন্ধি করে হল পঞ্চান্ন। অর্থাৎ পঞ্চান্ন হাত। বাঃ!...কিন্তু কিসের থেকে পঞ্চান্ন হাত? বুড়ো গাছ কি? তাই হবে...তাই হবে...'

ফেলুদার গলা মিলিয়ে এল। আমার মন বলছে, ও দু'দিনের মধ্যেই সংকেতের সমাধান করে ফেলবে, আর বাঘছালটা পেয়ে যাবে।

বারান্দার ঘড়িতে কিছুক্ষণ আগেই আটটা বেজে গেছে, কিন্তু তড়িৎবাবু এখনো আসছেন না কেন? ফেলুদার কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। সে এক মনে সংকেত নিয়ে ভেবে চলেছে, আর মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে উঠছে।

'ঠিক ঠিক জবাবে...ঠিক ঠিক জবাবে...। কিসের জবাব? প্রশ্নটা কই যে তার জবাব হবে? দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে...ঠিক ঠিক জবাবে...'

এবার ফেলুদার বিড়বিড়ানি বন্ধ হবার আগেই দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে একজন লোক ঢুকে পড়ল। তড়িৎবাবু নন। শশাঙ্কবাবু।

'আপনারা—ইয়ে—চা খাচ্ছেন? ও...'

ভদ্রলোকের চেহারা দেখেই মনে হল কিছু একটা হয়েছে। ফেলুদা খাতা রেখে উঠে পড়ল।

'কী ব্যাপার বলুন ত ?'

শশাঙ্কবাবু গলা খাকরিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'একটা দুঃসংবাদ আছে। তড়িৎ, মানে মহীতোষের সেক্রেটারি, মারা গেছে।'

'সে কী ? কী হয়েছিল ? কাল রাত্রেও ত...'

কথাটা বলল ফেলুদা, কিন্তু আমরা তিনজনেই সমান হতভম্ব। শশাঙ্কবাবু বললেন, 'কাল রাত্রে কালবনির দিকে গিয়েছিল—কেন জানি না—এই একটুক্ষণ আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এক কাঠুরে দেখতে পায়, আর দেখেই এসে খবর দেয়।'

'কী ভাবে মারা গেলেন ?'

'কাঁধের অনেকখানি মাংস নাকি খেয়ে গেছে। বাঘ বলেই ত মনে হচ্ছে।'

ম্যানইটার! আমার হাত-পা আবার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। লাল-মোহনবাবু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিন পা পিছিয়ে গিয়ে টেবিলে ভর করে দাঁড়ালেন। ফেলুদার মুখের ভাব অদ্ভুত রকম গম্ভীর।

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'আপনারা এলেন, আর তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। বুঝতেই পারছেন, আমাদের এখন এই নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকতে হবে। এক্ষুনি, মানে, একবার যেতে হবে আর কি।'

'আমরাও যেতে পারি কি ?'

শশাঙ্কবাবু প্রশ্নটা শুনে ফেলুদার দিকে একবার দেখে তারপর আমাদের দুজনের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'আপনি ত গোয়েন্দা মানুষ, আপনার এসব অভ্যেস আছে, কিন্তু এ'রা...'

'ওরা গাড়িতেই থাকবে।'

ভদ্রলোক রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, 'তাহলে আপনারা তৈরি থাকলে চলে আসুন। দুটো জীপ আছে, একটাতে না হয় আপনারা তিনজন যাবেন।'

'বন্দুক থাকবে কি সঙ্গে ?'

প্রশ্নটা আমিও করতে পারতাম, কিন্তু করলেন লালমোহনবাবু। অন্য সময় এ ধরনের প্রশ্ন শুনলে হয়ত শশাঙ্কবাবু হেসে ফেলতেন, কিন্তু এখন গম্ভীর ভাবেই বললেন, 'থাকবে। দিনের বেলা এমনিতে ভয় নেই, তবু থাকবে।'

জীপে করে জঙ্গলের দিকে যেতে যেতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটার

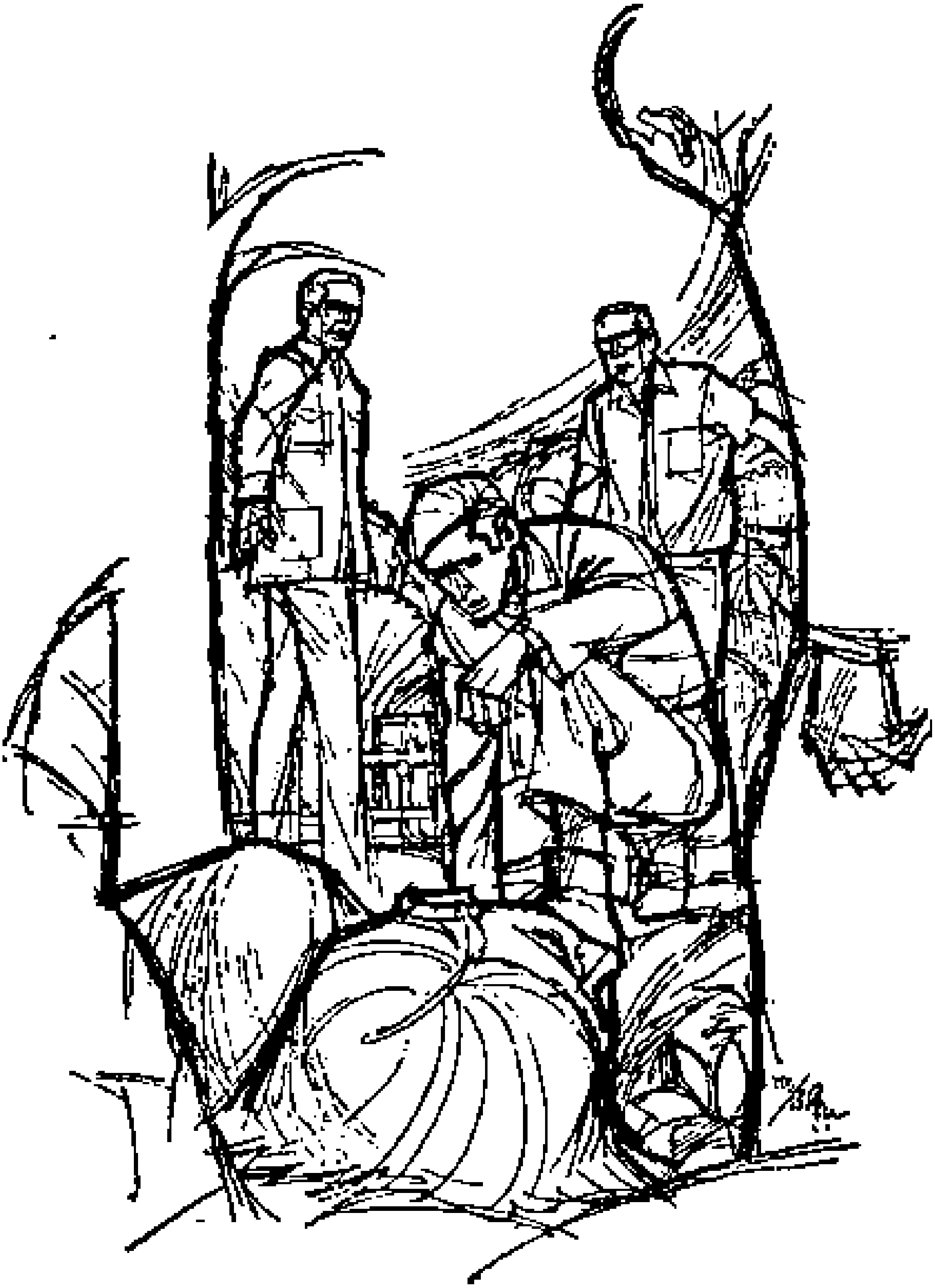

কথা ভাবছিলাম। কালই ভদ্রলোক আমার সঙ্গে এত কথা বললেন, আর রাতারাতি তাকে বাঘে খেল? এত রাত্তিরে কী করছিলেন উনি জঙ্গলের মধ্যে? তাহলে কি কাল রাত্তিরে যে আলোটা দেখেছিলাম সেটা তড়িৎবাবুরই টর্চের আলো?

আমাদের জীপের সামনে আরেকটা জীপ চলেছে। তাতে রয়েছেন মহীতোষবাবু, শশাঙ্কবাবু, এখানকার বনবিভাগের একজন কর্মচারী মিস্টার দত্ত, শিকারী মাধবলাল, আর যে লোকটা তড়িৎবাবুর মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিল সেই কাঠুরে। মহীতোষবাবুকে কাল রাত্রেই হৈ হৈ করে শিকারের গল্প বলতে শুনেছিলাম, আর আজ দেখে মনে হল এক রাত্তিরে তার দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। সেটা শুধু সেক্রেটারির মৃত্যুর জন্য, না ম্যানঈটার আছে এটা প্রমাণ হবার জন্য, তা অবিশ্যি বুঝতে পারলাম না।

জঙ্গলের ভিতরে খুব বেশি দূরে যেতে হল না। বড় রাস্তা থেকে ঘুরে মিনিট পাঁচেক যাবার পর আমাদের সামনের জীপটা থামল। রাস্তার দু'দিকে শাল আর সেগুন গাছ, আর তা ছাড়া আমার চেনার মধ্যে শিমুল, নিম, একটা প্রকাণ্ড কাঁঠালগাছ আর কয়েকটা বাঁশঝাড়। কাল রাত্রে যে বৃষ্টি হয়েছে তার ছাপ রয়েছে চারদিকে। এখানে ওখানে ছোট ছোট গর্ত আর খানাখন্দের মধ্যে জল জমে রয়েছে।

জীপ থামার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা বলল, 'ওই দ্যাখ।'

ও যেদিকে আঙুল দেখাল সেদিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর দূরের একটা বাঁশঝাড়ের ধারে একটা ঝোপের পিছনে হাল্কা সবুজ রঙের যে জিনিসটা চোখে পড়ল সেটা আমার চেনা। ওটা তড়িৎবাবুর শার্ট। কাল রাত্রে ভদ্রলোক ওই শার্টটাই পরেছিলেন।

সামনের জীপ থেকে সবাই নেমেছে। কাঠুরে লোকটা এগিয়ে গেল। তার পিছনে চললেন মহীতোষবাবু ও বাকি তিনজন। ফেলুদাও জীপ থেকে নেমে বলল, 'তোরা গাড়িতে থাক। এ দৃশ্য তোদের ভালো লাগবে না।'

যেখানে তড়িৎবাবুর মৃতদেহ পড়ে আছে সে জায়গাটা আমাদের জীপ থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে। কিন্তু জঙ্গল এত নিস্তব্ধ বলেই বোধহয় সকলের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। যার মুখে যা শুনেছিলাম তা পর পর লিখে যাচ্ছি।

বাঁশঝাড়টার ধারে পৌঁছে প্রথম কথা বললেন মহীতোষবাবু। শুধু দুটো কথা—'মাই গড!'—আর সেই সঙ্গে তাঁর ডান হাতের তেলোটা দিয়ে কপালে একটা আঘাত করলেন।

এবার মিস্টার দত্ত মৃতদেহটার দিকে এগিয়ে গেলেন, আর তার-পরেই তাঁর কথা শোনা গেল।

'এই বৃষ্টিতে বাঘের পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু

বাঘ বলেই ত মনে হচ্ছে। তাই নয় কি?'

মহীতোষবাবু—'নিঃসন্দেহে।'

মিস্টার দত্ত—'কাল বৃষ্টি থেমেছে দুটোর পর। যেভাবে রক্ত ধুয়ে গেছে তাতে মনে হয়, খাওয়ার ব্যাপারটা বৃষ্টির আগেই সেরে ফেলেছে।'

ফেলুদা—'ম্যানঈটার কি যেখানে মানুষ মারে, সেখানেই খাওয়ার কাজটা সারে? অনেক সময় ওরা শিকার মুখে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় না?'

মহীতোষবাবু—'তা তো বটেই। তবে আপনি যদি আশা করেন যে, মাটিতে ঘসটে টেনে আনার দাগ থাকবে, সেটার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। এমনিতেই বৃষ্টিতে দাগ মুছে যাবে। তাছাড়া একটা মানুষের দেহ বাঘ মুখে করে এমনভাবে নিয়ে যেতে পারে যে, সে দেহ মাটি টাচই করবে না। সুতরাং তড়িৎকে কোথায় ধরেছিল বাঘে সেটা বোধ-হয় জানা যাবে না।'

ফেলুদা—'তড়িৎবাবুর চশমাটা কোথায় পড়েছে সেটা জানতে পারলে হয়ত...'

এরপর কিছুক্ষণ কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। শশাঙ্কবাবু বোধহয় বাঘের পায়ের ছাপ খোঁজার জন্য এদিক ওদিক দেখছেন। ফেলুদা এখনো মৃতদেহের কাছেই রয়েছে। মিস্টার দত্ত মাধবলালকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আবার ফেলুদার গলা পাওয়া গেল।

ফেলুদা—'বাঘ কি কেবল একটামাত্র নখের সাহায্যে একটা গভীর আঁচড় দিতে পারে?'

মহীতোষবাবু—'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

ফেলুদা—'আপনারা বোধহয় লক্ষ্য করেননি—তড়িৎবাবুর বুকের কাছে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। শার্ট ভেদ করে একটা ধারালো জিনিস তার শরীরের মধ্যে ঢুকেছে। আপনারা এইখানে এলেই দেখতে পাবেন।'

কথাটা বলা মাত্র সকলে ব্যস্তভাবে তড়িৎবাবুর মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর মহীতোষবাবুর গলা পেলাম।

মহীতোষবাবু—'সর্বনাশ! এ যে খুন! এ ত বাঘের আঁচড় নয়। তড়িৎকে খুন করা হয়েছিল। তারপর তার মৃতদেহ বাঘে টেনে নিয়ে আসে। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!'

ফেলুদা—'খুন বা খুনের চেষ্টা। ছুরির আঘাতেই তড়িৎবাবুর

মৃত্যু হয়েছিল কিনা সেটা এখনো বলা শক্ত। হয়ত তাকে জখম করে আততায়ী পালায়। জখম অবস্থাতে স্বভাবতই বাঘের কাজটা আরো সহজ হয়ে গিয়েছিল। যে অস্ত্র দিয়ে এই কুকীর্তিটা করা হয়েছে, সেটা খোঁজার চেষ্টা করা দরকার।'

মহীতোষবাবু—'শশাঙ্ক, তুমি এক্ষুনি পুলিশে খবর দাও।'

বন্দুক হাতে মাধবলালকে তড়িৎবাবুর মৃতদেহের পাশে পাহারা রেখে আর সবাই জীপে ফিরে এল। ফেলুদাকে এত গম্ভীর অনেকদিন দেখিনি। ফেরার পথে ও একটাও কথা বলল না। আমাদেরও কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। বনের মধ্যে একপাল হরিণকে ছুটতে দেখেও মনটা নেচে উঠল না। লালমোহনবাবু এর আগেও আমাদের সঙ্গে গায়ে কাঁটা দেওয়া অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু ওঁকে এমন ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখিনি কখনো। কোনো জায়গায় বেড়াতে এসে আচমকা রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ফেলুদার জীবনে এর আগেও ঘটেছে, কিন্তু এভাবে নয়। এখানে ত শুধু খুন নয় বা রহস্য নয়, তার উপরে আবার মানুষখেকো!

॥ ৬ ॥

শশাঙ্কবাবু খবর দেওয়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই জলপাইগুড়ি থেকে পুলিশের লোক এসে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এখন বিকেল পাঁচটা। আজ আকাশ পরিষ্কার। আমরা মহীতোষবাবুর নিজের বাগানের অদ্ভুত ভালো চা খেয়ে ঘরে বসে আছি। ফেলুদা ভুরু কুঁচকে পায়চারি করছে, মাঝে মাঝে আঙুল মটকাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে একটা চারমিনার ধরিয়ে দু' চারটে টান দিয়েই টেবিলের উপর রাখা পিতলের ছাইদানিটায় ফেলে দিচ্ছে। লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে বার তিনেক মাটিতে শোয়ানো বাঘের মাথাটা পরীক্ষা করেছেন; বিশেষ করে দাঁতগুলো।

'ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আরেকটু আলাপ করার সুযোগ হত!'

ফেলুদা এ কথাটা আপন মনে আরো কয়েকবার বলেছে। সত্যি, তড়িৎবাবুকে ভালো করে চেনার আগেই তিনি খুন হয়ে গেলেন। খুনের কারণ কী হতে পারে, তড়িৎবাবুর সঙ্গে কারুর শত্রুতা ছিল কি না, এই সব না জানলে পরে ফেলুদার পক্ষে রহস্যের কিনারা করা মুশকিল হবে নিশ্চয়ই।

বারান্দার ঘড়িতে পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট পরেই মহীতোষবাবুর একজন চাকর—যার নাম জানি না—এসে খবর দিল, নিচের বৈঠকখানায় আমাদের ডাক পড়েছে।

আমরা তিনজনে বেশ ব্যস্তভাবেই নিচে গিয়ে হাজির হলাম। মহীতোষবাবু আর শশাঙ্কবাবু ছাড়াও আরেকটি ভদ্রলোক সোফায় বসে আছেন। পোশাক দেখে বুঝলাম ইনি পুলিশের লোক। মহীতোষবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—

'ইনি ইনস্পেক্টর বিশ্বাস। আপনিই প্রথম ক্ষতচিহ্নটা দেখে খুনের কথাটা বলেছেন জেনে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন।'

ফেলুদা নমস্কার করে মিস্টার বিশ্বাসের উলটো দিকে সোফাটায় বসল, আমরা দুজন একটু দূরে আরেকটা সোফায় বসলাম।

মিস্টার বিশ্বাসের গায়ের রং রীতিমতো কালো, মাথায় চকচকে টাক, যদিও বয়স বোধহয় চল্লিশ-টল্লিশের বেশি নয়। সরু একটা

গোঁফও আছে, তার দুটো দিক আবার লম্বায় সমান নয়। ছাঁটবার সময় বোধহয় একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ফেলুদার দিকে দেখে বললেন, 'আপনি শুনলাম শখের ডিটেকটিভ।'

ফেলুদা একটু হেসে বুঝিয়ে দিল, কথাটা ঠিক।

বিশ্বাস বললেন, 'আপনাদের আর আমাদের মধ্যে তফাতটা কোথায় জানেন ত? আপনারা কোথাও গেলে পরে সেখানে খুন হয়, আর আমরা কোথাও খুন হলে পরে সেখানে যাই।' কথাটা বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন ইনস্পেক্টর বিশ্বাস।

ফেলুদা আর কথা না বাড়িয়ে একেবারে কাজের কথায় চলে গেল। বলল, 'খুনের অস্ত্রটা পাওয়া গেছে কি?'

বিশ্বাস হাসি থামিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'না। তবে খোঁজা হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে খানাতল্লাসীর ব্যাপারটা কিরকম কঠিন সে ত বুঝতেই পারছেন। তার উপর আবার ম্যানইটার। পুলিশরাও তো মানুষ—মানে, ম্যান—বুঝলেন ত? হোঃ হোঃ হোঃ।'

বিশ্বাস মশাই এত হাসছেন দেখে ফেলুদাও যেন জোর করেই একটু হেসে আবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'ছুরির আঘাতেই মরেছিলেন কি তড়িৎবাবু?'

বিশ্বাস বললেন, 'সেটা ত আর এখন বোঝবার উপায় নেই। লাসের যা অবস্থা, এমনিতেই বাঘে খেয়ে গেছে অনেকটা। তার উপর এই গরম; পোস্ট মর্টেমে কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। আসল কথা হচ্ছে—কোনো ব্যক্তি তড়িৎবাবুকে কোনো ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে খুন করেছিল, বা খুন করার চেষ্টা করেছিল। তারপর বাঘে কী করেছে না করেছে সেটা আমাদের কনসার্ন না। তার জন্য যা স্টেপ নেবার সেটা নেবেন মিস্টার সিংহরায়।'

মহীতোষবাবু গম্ভীরভাবে মেঝের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এর মধ্যেই আশপাশের গ্রামে প্যানিক আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার লোকও ত জঙ্গলে কাঠ কাটার কাজ করে। আরো দু' মাস কাজ রয়েছে, তারপর বর্ষা নামলে বন্ধ। অবস্থা গুরুতর সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তড়িৎকে এভাবে আক্রমণ করল কে এবং কেন, সেটা না জানা অবধি আমি অন্য কিছু ভাবতেই পারছি না। তাছাড়া আমিই ত আর একমাত্র শিকারী নই এ অঞ্চলে। বনবিভাগ থেকে শিকারীর ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না।'

মিস্টার বিশ্বাস গলা খাকরিয়ে একটু নড়ে বসে বললেন, 'আমার কাছে রহস্য একটাই—এত রাত করে জঙ্গলে গেলেন কেন আপনাদের তড়িৎবাবু। খুনের একটা খুব সহজ কারণ থাকতে পারে। তড়িৎবাবুর পকেটে কোনো মানিব্যাগ বা টাকা-পয়সা পাওয়া যায়নি। তার ঘর খুঁজে সেখানেও পাওয়া যায়নি। এ অঞ্চলে গুণ্ডা বদমাইসের ত অভাব নেই। এ অঞ্চলে কেন বলছি—সারা দেশেই নেই—হোঃ হোঃ হোঃ। তাদেরই কেউ এ কুকীর্তিটা করে থাকতে পারে। স্রেফ রাহাজানি আর কি।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে শান্তভাবে বলল, 'মাঝ রাত্তিরে জঙ্গলের মধ্যে তড়িৎবাবুর মতো একজন নিরীহ লোকের কাছ থেকে টাকা বার করে নিতে কি ছুরি মারার দরকার হয়? মাথায় একটা লাঠির বাড়ি মেরেই কার্যসিদ্ধি হয় না কি?'

বিশ্বাস কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'তা হয়ত হয়। কিন্তু তড়িৎবাবুকে খুন করার অন্য কী কারণ থাকতে পারে বলুন। মোটিভটা কোথায়? তড়িৎবাবু ছিলেন মিস্টার সিংহরায়ের সেক্রেটারি, লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন, পাঁচ বছর হল এখানে এসেছেন, কারুর সঙ্গে মেলামেশা নেই, এ বাড়ির লোকের বাইরে কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও নেই। গুণ্ডা বদমাইস ছাড়া তার উপর এ ধরনের আক্রমণ করবে কে? এবং কেন করবে?'

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল। বিশ্বাস বললেন, 'সাদাসিধে রাহাজানির ব্যাপারটা আপনাদের মতো শখের ডিটেকটিভদের অ্যাপীল করবে না জানি। তা বেশ ত, আপনি রহস্য চান, রহস্যও ত রয়েছে। বার করুন ত দেখি, তড়িৎবাবুর মতো লোক মাঝরাত্তিরে জঙ্গলে যায় কেন।'

শশাঙ্কবাবু চুপচাপ একটা আলাদা সোফায় বসেছিল। ফেলুদা যে কেন মাঝে মাঝে আড়চোখে ওঁর দিকে চাইছিল সেটা বুঝলাম না। মহীতোষবাবুর চেহারায় এখনো সেই ফ্যাকাসে ক্লান্ত ভাবটা রয়েছে। বার বার খালি মাথা নাড়ছেন আর বলছেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না...। কিছুই বুঝতে পারছি না...।'

আরো মিনিটখানেক বসে থেকে আমরা তিনজনে উঠে পড়লাম। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, 'আপনি নিজের খুশি মতো তদন্ত চালিয়ে যেতে পারেন মিস্টার মিত্তির। তাতে আমি কিছু মাইণ্ড করব না। হাজার হোক—ক্ষত চিহ্নটা ত আপনিই প্রথম দেখেছিলেন।'

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে ফেলুদা দোতলায় গেল না। গাড়ি-

বারান্দা দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে ডান দিকে ঘুরে পুরোন আস্তাবল আর হাতিশালের পাশ দিয়ে একেবারে বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে হাজির হলাম আমরা। পিছন ফিরে উপর দিকে চাইতেই দোতলার একসারি জানালার মধ্যে একটা থেকে দেখলাম লালমোহন-বাবুর তোয়ালেটা ঝুলছে। এটা না হলে কোনটা যে আমাদের ঘর সেটা চেনা মুশকিল হত। আমাদের ঘরের ঠিক নিচেই একতলার একটা দরজা রয়েছে। এটাকে খিড়কি দরজা বলা যেতে পারে। এটা দিয়েই নিশ্চয় কাল রাতে বেরিয়ে তড়িৎবাবু জঙ্গলের দিকে গিয়ে-ছিলেন।

সামনে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা খোলার চালওয়ালা ছোট্ট একতলা বাড়ি রয়েছে। তার সামনে আট-দশজন লোক জটলা করছে। তার মধ্যে একজনকে আমরা আগে দেখেছি। এ হল মহীতোষবাবুর দারোয়ান। বাড়িটাও সম্ভবত দারোয়ানেরই। ফেলুদার পিছন পিছন আমরা এগিয়ে গেলাম বাড়িটার দিকে। দূরে কালবুনির জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, তার শাল গাছের মাথাগুলো অন্য গাছের উপর উঁচিয়ে রয়েছে। জঙ্গলের পিছনে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়াটে নীল ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি।

বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছতে দারোয়ান আমাদের সেলাম করল। ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'চন্দন মিসির, হুজুর।'

বুড়ো লোক, মাথার চুলে কদম ছাঁট, পিছনে টিকি, চোখের পাশের চামড়া কুঁচকে গেছে। কথা বলার ঢং দেখেই বোঝা যায় খৈনি খায়।

'কদ্দিন কাজ করছ এখানে?'

'পঁচাশ বরিস হইয়ে গেলো হুজুর।'

চন্দন মিসিরের কথায় বুঝলাম, তড়িৎবাবুর মৃত্যুর চেয়ে মানুষ-খেকো বাঘ নিয়ে এখানকার লোকেরা অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পাগলা হাতি নাকি প্রায়ই বেরোয়, কিন্তু মানুষখেকো বাঘ গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম। চন্দনের মতে এখানে কিছু লোক বেআইনিভাবে চোরা শিকার করে, তাদের কারুর গুলিতে হয়ত বাঘটা জখম হয়েছিল, আর সেই থেকেই ওটা ম্যানইটার হয়ে গেছে। অনেক সময় বেশি বয়সে বাঘের দাঁত খয়ে গেলেও ওরা ম্যানইটার হয়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে সজারু ধরে খেতে গিয়ে তার কাঁটা এমনভাবে চোখে মুখে ঢুকে গেছে যে, তার ফলে কাবু হয়ে বাঘ জানোয়ার ছেড়ে আরো সহজ শিকার মানুষের দিকে গেছে।

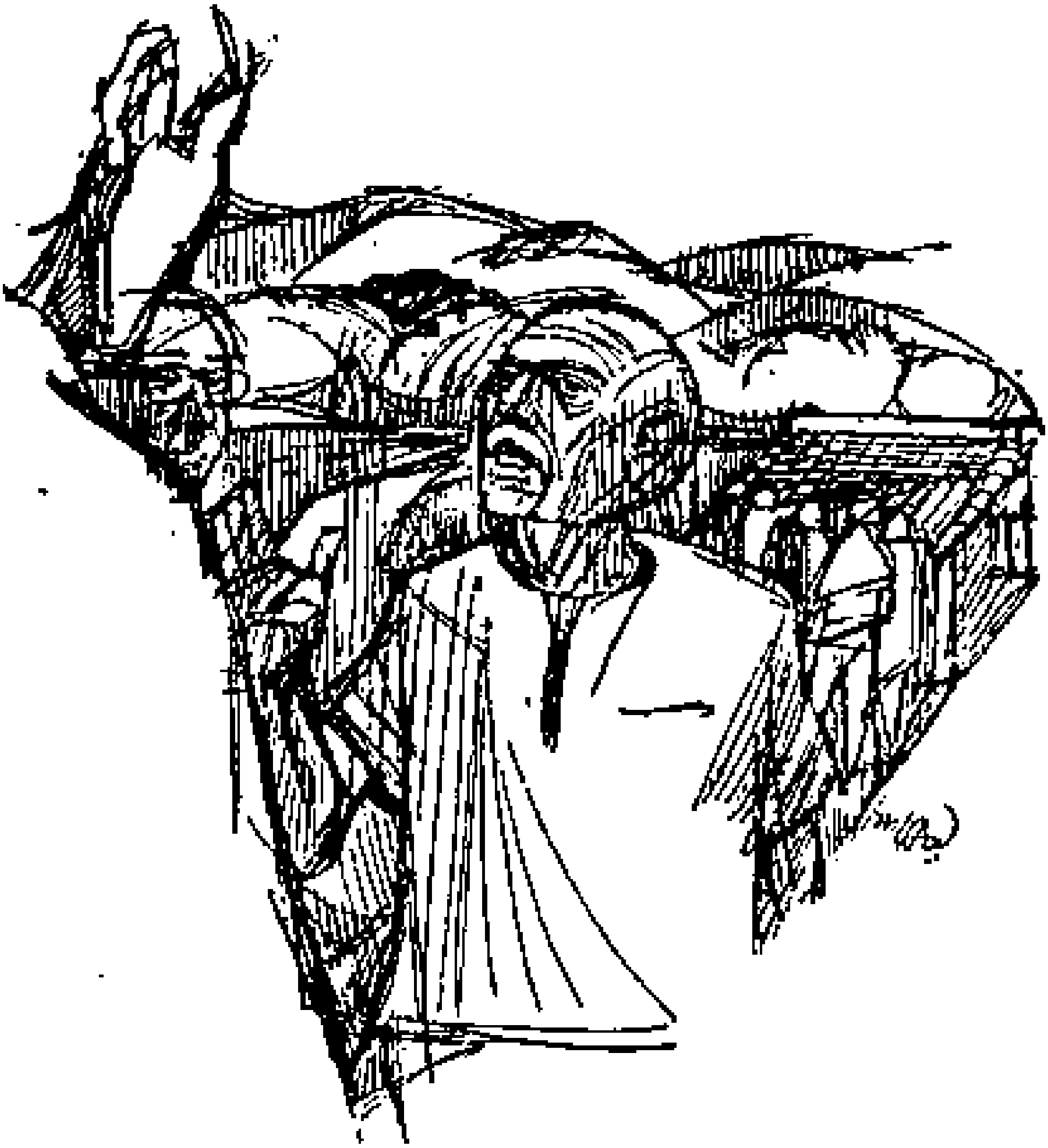

ফেলুদা বলল, 'এখানকার লোকেরা কি চাইছে যে মহীতোষবাবু বাঘটাকে মারুন?'

চন্দন মিসির তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'সে ত চাইবে, লেকিন বাবু ত এ জঙ্গলে শিকার করেননি কখনো। আসামে করিয়েছেন, ওড়িশায় করিয়েছেন—এ জঙ্গলে করেননি।'

খবরটা শুনে আমরা সকলেই অবাক হলাম। ফেলুদা বলল, 'কেন, এখানে করেননি কেন?'

চন্দন বলল, 'এই জঙ্গলে বাবুর দাদাজী (ঠাকুরদাদা) বাঘের

হাতে মরলেন, বাবুর বাবা ঔ বাঘের হাতে মরলেন, তাই বাবু এখানে না করে দুসরা জায়গা দুসরা জঙ্গলে চলে গেলেন।'

মহীতোষবাবুর বাবাও যে বাঘের হাতে মরেছিলেন সেটা এই প্রথম শুনলাম। ফেলুদা জিগ্যেস করাতে চন্দন বলল যে, মহীতোষবাবুর বাবা নাকি মাচা থেকে বাঘকে গুলি করেছিলেন, আর দেখে মনে হয়েছিল বাঘটা মরে গেছে। মিনিট দশেক পরে মাচা থেকে বাঘের দিকে যেতেই সেটা নাকি ভদ্রলোককে আক্রমণ করে সাংঘাতিকভাবে জখম করে। ক্ষত সেপটিক হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি ভদ্রলোক মারা যান।

খবরটা শুনে ফেলুদা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খোলার বাড়িটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'তুমি ওই বাড়িতে থাক?'

'হাঁ, হুজুর।'

'রাত্তিরে ঘুমোয় কখন?'

চন্দন প্রশ্নটা শুনে একটু থতমত খেয়ে ফেলুদার দিকে চাইল। ফেলুদা এবার আসল প্রশ্নে চলে গেল।

'কাল রাত্তিরে যে বাবু খুন হলেন—'

'তোড়িতবাবু?'

'হ্যাঁ। উনি বেশ বেশি রাত্তিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলেন। তুমি তাকে যেতে দেখেছিলে কি?'

চন্দর মিসির বলল, গতকাল না দেখলেও তড়িৎবাবুকে সে তার আগের দিন, এবং তারও আগে বেশ কয়েকদিনই সন্ধ্যেবেলা জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছে। গতকাল তড়িৎবাবুকে না দেখলেও আরেকজনকে দেখেছে।

কথাটা শুনে ফেলুদার মুখের ভাব বদলে গেল।

'কাকে দেখেছিলে?'

'তা জানি না হুজুর। তোড়িতবাবুর টর্চের মুখটা বড়—তিন সেলের পুরোন টর্চ। আর এটা ছিল ছোট টর্চ, তার মুখ ছোট। তবে তাই বলে আলো কম নয়।'

'তুমি কেবল আলোই দেখেছ? আর কিছু দেখনি?'

'নেহি হুজুর। আউর কুছ নেহি দেখা।'

ফেলুদা আরো কি বিষয়ে জানি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখি মহীতোষবাবুর চাকর ব্যস্তভাবে দৌড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'বাবু আপনাদের ডেকেছেন। বললেন জরুরি দরকার।'

আমরা ফিরে এসে দেখি মহীতোষবাবু গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ফেলুদাকে দেখামাত্র বললেন, 'আপনার অনুমান ঠিক। ভড়িংকে গুণ্ডা বদমাইসে মারেনি।'

'কী করে জানলেন ?'

'যে অস্ত্রটা দিয়ে তাকে মারা হয়েছিল সেটা আমাদেরই বাড়িতে ছিল। কাল যে তরোয়ালটা আপনাকে দেখিয়েছি, সেইটা। সেটা আর ঠাকুরদার আলমারিতে নেই।'

॥ ৭ ॥

কানাই চাকরটাই আদিত্যনারায়ণের ঘরে ধুনো দিতে গিয়ে তলোয়ারের অভাবটা লক্ষ্য করে, আর করেই মহীতোষবাবুকে খবর দেয়। ঘরে অনেক বইপত্তর আছে যেগুলো মহীতোষবাবুর লেখার কাজে দরকার হয়; তাই আর ঘরটায় চাবি দেওয়া হত না। চাকর সবই পুরোন আর বিশ্বাসী। চুরি এ বাড়িতে বহুকাল হয়নি, তাই ও নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না। তার মানে এই যে, বাড়ির যে-কেউ ইচ্ছে করলে ও তলোয়ার বার করে নিতে পারত।

আলমারিটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করেও ফেলুদা কোনো ক্লু বা ওই জাতীয় কিছু পেল না। শুধু তলোয়ারটাই নেই, আর সব যেখানে যেমন ছিল সেইভাবেই আছে।

পরীক্ষা শেষ হলে পর ফেলুদা বলল যে, ও তড়িৎবাবুর শোবার ঘর, আর তড়িৎবাবু যেখানে কাজ করত সেই জায়গাটা একটু দেখতে চায়।—'তবে তার আগে আপনার মনে কোনোরকম সন্দেহ হচ্ছে কিনা সেটা জানতে চাই।'

মহীতোষবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে মাথা নেড়ে বললেন, 'তড়িৎকে খুন করার কোনো কারণ থাকতে পারে এমন কোনো লোক ত এখানে আছে বলে মনে হয় না। ওর এমনিতেও মেলামেশা কম ছিল, কাজ নিয়ে থাকত; মাঝে মাঝে হেঁটে বাইরে বেড়াতে যেত। যতদূর জানি, বদ অভ্যাস-টভ্যাসও কিছু ছিল না। আর ঠাকুরদার তলোয়ার দিয়েই যদি তাকে মেরে থাকে তাহলেও ত আমাদের বাড়িরই লোক। নাঃ—আমি ত ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

আমরা তিনজনে মহীতোষবাবুর সঙ্গে তড়িৎবাবুর ঘর দেখতে গেলাম। আমাদের ঘরেরই মতো বড় একটা ঘর। আসবাব ছাড়া তড়িৎবাবুর নিজের জিনিসপত্র বলতে নীল রঙের একটা বড় সুটকেস, একটা কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ, আলনায় টাঙানো শার্ট প্যান্ট পায়জামা গেঞ্জি তোয়ালে ইত্যাদি, একটা তাকে প্রসাধনের জিনিসপত্র, একটা ছোট টেবিলের উপর রাখা ইংরেজি আর বাংলা কিছু গল্পের বই, একটা অ্যালার্ম ক্লক, একটা সুলেখা ব্লু-ব্ল্যাক কালি, আর দুটো

পেনসিল। এ ছাড়া খাটের পাশে একটা টেবিলের উপর রাখা ফ্লাস্ক-আর জলের গেলাস, আর একটা ছোট ট্রানজিস্টার রেডিও।

সুটকেসটায় চাবি ছিল না। ফেলুদা সেটা খুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে খুব পরিপাটি করে কাপড়চোপড় সাজানো রয়েছে। ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক কলকাতায় যাবার জন্য তৈরিই হয়ে ছিলেন।'

মিনিট পাঁচেক পরে তড়িৎবাবুর ঘর থেকে আমরা মহীতোষবাবুর আপিস ঘরের দিকে রওনা দিলাম। যাবার পথে ফেলুদা মহীতোষবাবুকে জিগেস করল, 'সেক্রেটারি বলতে ঠিক কী ধরনের

কাজ করতেন তড়িৎবাবু, সেটা একটু বলবেন কি?'

মহীতোষবাবু বললেন, 'চিঠিপত্র লেখার কাজ ত আছেই, তাছাড়া আমার হাতের লেখা ভালো নয় বলে পাণ্ডুলিপি ও-ই কপি করে দিত। তারপরে প্রুফ দেখত, কলকাতায় গেলে পাবলিশারদের সঙ্গে দেখা করা, কথাবার্তা বলা, এসবও করত। ইদানিং আমার বংশের ইতিহাস লেখার ব্যাপারে ওকে অনেক পুরনো বই কাগজপত্র দলিল চিঠি ইত্যাদি ঘাঁটতে হয়েছে। সে-সব পড়ে তথ্য নোট করে রাখত।'

'এগুলো বুঝি সেই সব নোটের খাতা?' ফেলুদা তড়িৎবাবুর ডেস্কের উপর রাখা গোটা আষ্টেক বড় সাইজের খাতার দিকে দেখাল। মহীতোষবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'আর এগুলো কি আপনার নতুন শিকার কাহিনীর প্রুফ?'

লম্বা লম্বা কাগজের তাড়া, দেখলেই বোঝা যায় সেগুলো প্রুফ। ফেলুদা এক তাড়া প্রুফ তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছিল।

'প্রুফ-দেখিয়ে হিসেবে কি খুব নির্ভরযোগ্য ছিলেন তড়িৎবাবু?'

প্রশ্নটা শুনে মহীতোষবাবু বেশ অবাক হয়েই বললেন, 'আমার ত তাই ধারণা। আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'প্রথম পাতার প্রথম প্যারাগ্রাফেই দুটো ভুল দেখছি শুধরনো হয়নি।'

'তাই নাকি?'

গর্জন কথাটার রেফ বাদ পড়ে গেছে, আর হরিণের র-রে ফুটকি নেই।'

'আশ্চর্য...আশ্চর্য...'

মহীতোষবাবু অন্যমনস্কভাবে প্রুফের কাগজগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

'সম্প্রতি তড়িৎবাবুকে কি চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন বলে মনে হত আপনার?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'কই, সেরকম তো কিছু লক্ষ্য করিনি।'

ফেলুদা তড়িৎবাবুর কাজের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। একটা প্যাড খোলা রয়েছে, তার উপর হিজিবিজি লেখা। ফেলুদা প্যাডটা হাতে তুলে নিয়ে কাগজের উপর চোখ রেখে বলল, 'আপনাদের বংশের ইতিহাস লেখার জন্য কি মহাভারত ঘাঁটার দরকার হচ্ছিল?'

'কেন বলুন ত?'

'তড়িৎবাবু এই প্যাডে বোধ হয় অন্যমনস্কভাবেই কয়েকটা কথা

লিখেছেন। এই যে দেখুন না—অর্জুন, কীচক, নারায়ণী, উত্তর, অশ্বত্থামা। এর সবই ত মহাভারতের নাম। নারায়ণী হল কৃষ্ণের সেনার নাম। কীচক ছিল বিরাট রাজার শালা, আর উত্তর হল বিরাটের ছেলে, অভিমন্যুর শালা।'

মহীতোষবাবু বললেন, 'আমার কাজের জন্য ওকে মহাভারত পড়তে হয়নি, তবে ব্যাপারটা কী জানেন, তড়িৎ ছিল বইয়ের পোকা। ঠাকুরদাদার লাইব্রেরিতে কালীপ্রসন্নর মহাভারত রয়েছে। সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকতে পারে।'

আমরা মহীতোষবাবুর আপিস ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একটা চেনা গুরুগম্ভীর গলায় থিয়েটারের ঢং-এ কথা কানে এল—

'সব ধ্বংস হয়ে যাবে...সব ধ্বংস হয়ে যাবে! সত্যের ভিত টলমল করছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে!'

শুধু গলাটাই শুনলাম, মানুষটাকে দেখতে পেলাম না। মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বৈশাখ মাসটা প্রতি বছরই দাদার এরকম হয়। তারপর বর্ষা এলে গরমটা কমলে কিছুটা নিশ্চিন্ত।'

আমরা আমাদের ঘরের সামনে পৌঁছে গেছি। ফেলুদা বলল, 'কাল একবার জঙ্গলে যাব ভাবছিলাম। একটু অনুসন্ধানের প্রয়োজন। আপনি কী বলেন?'

মহীতোষবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তড়িৎকে যেখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল বাঘ, তার কাছাকাছি সে আর আসবে না বলেই ত মনে হয়। বিশেষ করে দিনের বেলা। অন্তত বাঘ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। কাজেই আপনারা যদি ওই স্পটের কাছাকাছি থাকেন তাহলে বেশি রিস্ক নেই। সত্যি বলতে কি, এ জঙ্গলে যে বড় বাঘ এখনো রয়ে গেছে সেটাই ত আমার কাছে একটা বিরাট বিস্ময়।'

'সঙ্গে মাধবলালকে পাওয়া যাবে ত? আর একটা জীপ...?'

'নিশ্চয়ই।'

মহীতোষবাবু চলে গেলেন। বললেন, তলোয়ারের খবরটা ইনস্পেক্টর বিশ্বাসকে দিতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিকেলের পর থেকে আকাশের মেঘ একদম কেটে গেছে। লালমোহনবাবু অনেকক্ষণ থেকে চুপচাপ ছিলেন; দেখে মনে হচ্ছিল হয়ত কোনো গল্পের প্লট মাথায় আসছে, কারণ মাঝে মাঝে পকেট থেকে লাল টুকটুকে একটা টাটার ডায়রি বার করে কী যেন নোট করছিলেন। ঘরে এসে পাখাটা খুলে দিয়ে খাটে বসে

বললেন, 'কি রকম বোনাসে পেয়ে গেলেন বলুন। এটা আমারই দৌলতে সেটা স্বীকার করছেন ত?'

'একশোবার।'

ফেলুদা তড়িৎবাবুর ডেস্কের উপর থেকে সেই মহাভারতের নাম লেখা প্যাডটা আর 'কোচবিহারের ইতিহাস' বলে একটা বই নিয়ে এসেছিল। এখন সে খাটে বসে প্যাডের দিকে চেয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, 'সব ক'টাই মহাভারতের নাম তাতে সন্দেহ নেই, কেবল এই "উত্তর" কথাটা...। উত্তর...উত্তর। উত্তর নামও হতে পারে, উত্তর দিকও হতে পারে, আবার উত্তর মানে উত্তর কাল—পরবর্তীকাল—এও হতে পারে। আবার উত্তর মানে প্রশ্নের উত্তর... জবাব...জবাব...'

ফেলুদা হঠাৎ যেন চমকে উঠল। তারপর খাটের পাশের টেবিলের উপর থেকে নিজের খাতাটা নিয়ে সংকেতের পাতাটা খুলল।

'দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।—থ্যাঙ্ক ইউ তড়িৎবাবু। আপনার উত্তর বিরাটরাজার ছেলে হতে পারে—আমার উত্তর হল উত্তর দিক। দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে। অর্থাৎ দিক পাও ঠিক ঠিক উত্তরে। তার মানে উত্তর দিকটাই হল ঠিক দিক। হাত গোন ভাত পাঁচ। পঞ্চম হাত। উত্তর দিকে পঞ্চম হাত। কিন্তু তারপর? ফাল্গুন তাল জোড়, দুই মাঝে ছুঁই ফোঁড়। ফাল্গুন...এই ফাল্গুনটা নিয়েই যত গণ্ড—'

আবার ফেলুদার সেই চমকে উঠে কথা থেমে যাওয়ার ব্যাপার।

'তড়িৎবাবুর টেবিলের উপর একটা বাংলা অভিধান ছিল না?' সে চাপা গলায় বলে উঠল।

লালমোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সংসদের অভিধান। লাল রঙ। আমারও আছে।'

'ওটা দেখা দরকার।'

ফেলুদার পিছন পিছন আমরাও ছুটলাম মহীতোষবাবুর আপিস ঘরে।

অভিধান খুলে 'ফাল্গুন' বার করে ফেলুদার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'ফাল্গুন—ফাল্গুন হল অর্জুনের একটা নাম! আর অর্জুন শুধু পঞ্চপাণ্ডবের একজন নয়, অর্জুন গাছও বটে। এ জঙ্গলে অর্জুন গাছ কালও দেখেছি।'

'তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?' লালমোহনবাবু জিনিসটা ভালো করে না বুঝেও উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

'ফাল্গুনে তাল জোড়, দুই মধ্যে ছুঁই খোঁড়। একটা অর্জুন গাছ আর জোড়া তাল গাছের মাঝখানে জমি খুঁড়তে হবে।

'কিন্তু সেরকম গাছ কোথায় আছে সেটা জানছেন কি করে?'

ফেলুদা বলল, 'আরেকটা কোনো বুড়ো গাছের উত্তরে পঞ্চাশ হাত গেলেই পাওয়া যাবে।'

'আরেব্বাবা, বুড়ো গাছ! বুড়ো গাছ ছাড়া ছোক্‌রা গাছ আছে নাকি এ অঞ্চলে? আর গাছ ত মশাই সব কেটে ফেলেছে। মহীতোষ-বাবুর নিজেরই ত কাঠের ব্যবসা। এ সংকেত লেখা হয়েছে কদ্দিন আগে? সত্তর পঁচাত্তর বছর হবে না?'

আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এসেছি। ফেলুদা আবার চুপ, আবার গম্ভীর। মেঝেতে বাঘছালের দিকে চেয়ে রয়েছে অন্যমনস্কভাবে। প্রায় মিনিটখানেক ওইভাবে থেকে বলল, 'যা ভাবছি তাই যদি হয় তাহলে বড় বাঘের ছালটা তড়িৎবাবুরই পাওয়া উচিত ছিল। সংকেত সমাধানের ব্যাপারে তড়িৎ সেনগুপ্ত ফেলু মিত্তিরের চেয়ে কম যায় না। ধুড়ি, যেতেন না।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু প্যাডে যে আরো সব মহাভারতের নাম রয়েছে? কীচক, অশ্বত্থামা—এদের সঙ্গে সংকেতের কী সম্পর্ক?'

'সেই কথাই ত আমিও ভাবছি...'

ফেলুদা আবার প্যাডের দিকে চাইল। তারপর বলল, 'অবিশ্যি এই কাগজের সব ক'টা নামই যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। এবং এগুলো যে একই সময় লেখা সেটাও ভাবার কোনো কারণ নেই। এই দেখুন—কীচক আর নারায়ণী ডট পেন দিয়ে লেখা। দেখলেই বুঝতে পারবেন। কালির রঙ সবই এক বলে মনে হয়, কিন্তু অন্য লেখাগুলোর নিচের দিকের টানগুলো ঈষৎ মোটা—যেটা ডট পেনে কখনো হয় না।'

লালমোহনবাবু প্রায় গোয়েন্দার মতো করে কাগজটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তাহলে কীচক আর নারায়ণীর সঙ্গে সংকেতের—'

কথাটা শেষ হবার আগেই দরজার দিক থেকে গম্ভীর গলায় কথা এসে পড়ায় লালমোহনবাবু চমকে উঠে হাত থেকে প্যাডটা ফেলেই দিলেন।

'কীচকদের নিয়ে কথা হচ্ছে কি?'

দেবতোষবাবু।

পর্দা ফাঁক হল। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে এলেন। আবার সেই

বেগ্নী ড্রেসিং গাউন। ভদ্রলোকের কি আর কোনো জামা নেই? ফেল্দা বলল, 'আস্ন দেবতোষবাব্, ভিতরে আস্ন।' ভদ্রলোক ফেল্দার কথায় কান না দিয়ে একটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'প্থ্রাজা দীঘির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন কেন জান?'

'আপনি বল্ন। আমরা জানি না।' ফেল্দা বলল।

'কারণ কীচকদের সংস্পর্শে এসে পাছে ধর্মনাশ হয়, সেই ভয়ে।'

'কীচক একটা জাতির নাম?' ফেল্দা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'যাযাবর জাতি। জঙ্গলে গেলে একবার একট্ খোঁজ করে দেখো ত তারা এখানে আছে কিনা। বনমোরগ শিকার করত তীর-ধন্ক নিয়ে।'

'নিশ্চয়ই দেখব খোঁজ করে,' ফেল্দা খ্ব স্বাভাবিকভাবে বলল। তারপর বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি কি?'

দেবতোষবাব্ কেমন যেন অবাক ফ্যালফ্যালে ভাব করে ফেল্দার দিকে চাইলেন।

'জিগ্যেস করবে? আমাকে ত কেউ কিছ্ জিগ্যেস করে না!'

'আমি করছি। এখানে প্রাচীন গাছ বলতে কোনো বিশেষ গাছ আছে কি? আপনি স্থানীয় ইতিহাস ভালো করে জানেন বলেই আপনাকে জিগ্যেস করছি।'

'প্রাচীন গাছ?'

'হ্যাঁ। মানে এমন গাছ যাকে লোকে ব্ড়ো গাছ বলে জানে।'

প্রাচীন গাছ শ্নে, দেবতোষবাব্র ঘোলাটে চোখ আরো ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল, এখন হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'ব্ড়ো গাছ? তাই বল। প্রাচীন গাছ আর ব্ড়ো গাছ কি এক হল? ব্ড়ো নাম ত শ্ধ্ বয়সে ব্ড়ো বলে নয়। গাছের গায়ে একটা ফোকর আছে, সেটা দেখতে ঠিক একটা ফোক্লাদাঁত ব্ড়োর হাঁ করা ম্খের মতো। সেই গাছের নিচে ঠাকুরদাদার সঙ্গে গিয়ে চড়্ইভাতি করেছি। ঠাকুরদাদা বলতেন ফোক্লা ফকিরের গাছ।'

'গাছটা কী গাছ?' ফেল্দা জিগ্যেস করল।

'কাটা ঠাকুরানীর মন্দির দেখেছ? সে-ও রাজ্র হাত থেকে নিস্তার পায়নি। সেই মন্দিরের পশ্চিম দিকে হল ফোক্লা ফকিরের গাছ। অশ্বথ গাছ। সেই গাছেই একদিন মহী—'

'দাদা, চলে এস!'

দেবতোষবাব্ কথা শেষ করতে পারলেন না। কারণ মহীতোষ-

বাবু দরজার বাইরে থেকে তাঁর বাজখাঁই গলায় হাঁক দিয়েছেন। পর্দা আবার ফাঁক হল। মহীতোষবাবু গম্ভীর মুখ করে ঘরে ঢুকলেন। বুঝলাম সেই কঠিন মানুষটা আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

'তোমার ওষুধ খাবার কথা; খেয়েছ?'

'ওষুধ?'

'মন্মথ দেয়নি?'

দেবতোষবাবুর জন্য একজন আলাদা চাকর আছে, নাম মন্মথ।

'আমি ত ভাল আছি, আবার ওষুধ কেন? আমার মাথার যন্ত্রণা—'

মহীতোষবাবু তাঁর দাদাকে এক রকম জোর করেই ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে ছোট ভাইয়ের ধমক শুনতে পেলাম।

'ভাল আছ কি না-আছ সেটা ডাক্তার বুঝবে। তোমাকে যা ওষুধ দেওয়া হয়েছে সেটা তুমি খাবে।'

গলা মিলিয়ে এল; আর সেই সঙ্গে পায়ের শব্দও।

'ভদ্রলোককে সত্যিই কিন্তু আজ অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদার কানে যেন কথাটা গেলই না। সে আবার বিড়বিড় শুরু করেছে।

'অশ্বত্থ গাছে...অশ্বত্থ গাছ...অশ্বত্থ...। কিন্তু মুড়ো হয় কেন? মুড়ো হয় বুড়ো গাছ...মুড়ো হয়...'

হঠাৎ হাত থেকে খাতাটা প্রচণ্ড জোরে বিছানায় ফেলে দিয়ে ফেলুদা লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল—'হয়! হয়! হয়! হয়!'

'কী হয়?' লালমোহনবাবু যথারীতি ভ্যাবাচ্যাকা।

'বুঝতে পারছেন না? মুড়ো হয় বুড়ো গাছ। তার মানে বুড়ো গাছ, তার মুড়ো, মানে মুণ্ডু, অর্থাৎ গোড়া—হল হয়।'

'হল হয়? সে আবার কী?' লালমোহনবাবু আরো হতভম্ব। সত্যি বলতে কি, আমারও মনে হচ্ছিল ফেলুদা একটু আবোল তাবোল বকছে। এবার ফেলুদা যেন বেশ বিরক্ত হয়েই লালমোহনবাবুর দিকে চোখ পাকিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, 'আপনি না সাহিত্যিক? হয় মানে জানেন না? ঘোড়া, ঘোড়া, ঘোড়া। হয় মানে ঘোড়া। হয় মানে অশ্ব। বুড়ো গাছের গোড়া হল অশ্ব। আরো বলতে হবে?'

'অশ্বত্থ!' চেঁচিয়ে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'অশ্বত্থ। তড়িৎবাবু অশ্বত্থই লিখেছিলেন এমনি কলম দিয়ে, আর পরে খেয়ালবশত আ-কার আর মা জুড়ে দিয়েছেন ডট পেন দিয়ে। আর আমি ভাবছি মহাভারত। ছি ছি ছি ছি!'

॥ ৮ ॥

আমি জানি ফেলুদা কাল অনেক রাত অবধি ঘুমোয়নি। আমি আর লালমোহনবাবুও জেগে ছিলাম প্রায় এগারোটা অবধি। তড়িৎবাবুর মতো একজন আশ্চর্য বুদ্ধিমান লোক কী বিশ্রীভাবে ও কী রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন সেই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কতকগুলো ব্যাপার যে ফেলুদাকেও রীতিমতো ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। ফেলুদা নিজেই সেগুলোর একটা লিস্ট করেছিল; সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

১। তড়িৎবাবু ছাড়া আর কে কাল রাত্রে জঙ্গলে গিয়েছিল? যে গিয়েছিল সে-ই কি তলোয়ার নিয়েছিল? সেই কী খুনী? না সে ছাড়াও আরও কেউ গিয়েছিল? হাল ফ্যাসানের টর্চ কার কাছে আছে?

২। প্রথম রাত্রে মহীতোষবাবু কার সঙ্গে ধমকের সুরে কথা বলছিলেন?

৩। দেবতোষবাবু কাল মহীতোষবাবু সম্পর্কে কী ঘটনা বলতে যাচ্ছিলেন, সে সময় মহীতোষবাবু এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন?

৪। দেবতোষবাবু সেদিন যুধিষ্ঠিরের রথের কথাটা বললেন কেন? সেটা কি পাগলের প্রলাপ, না তার কোনো মানে আছে?

৫। শশাঙ্কবাবু এত চুপচাপ কেন? সেটা কি ওঁর স্বভাব, না বিশেষ কোনো কারণে উনি চুপ মেরে গেছেন?

লালমোহনবাবু সব শুনেটুনে বললেন, 'মশাই, আমি কিন্তু একটি লোককে মোটেই ভরসার চোখে দেখতে পাচ্ছি না। ওই দাদা ব্যক্তিটি পাগল হতে পারেন, কিন্তু ওঁর হাতের কব্জিটা দেখেছেন? মহীতোষবাবুর চেয়েও চওড়া। আর কালাপাহাড়ের উপর যা আক্রোশ দেখলাম, কাউকে কালাপাহাড় মনে করে ধাঁ করে একটা তলোয়ারের ঘা বসিয়ে দেওয়া কিছুই আশ্চর্য না।'

কথাটা শুনে ফেলুদা কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমার সঙ্গে মিশে আপনার কল্পনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা যে যুগপৎ বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দেবতোষবাবু যে তলোয়ারের আঘাতে খুন করার ক্ষমতা রাখেন সেটা আমিও বিশ্বাস করি। তবে তড়িৎবাবুর খুনের পেছনে যে-ধরনের হিসেবী কার্যকলাপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—আদিত্যনারায়ণের আলমারি খুলে তলোয়ার নেওয়া, তড়িৎবাবুকে অনুসরণ করে এতখানি পথ হেঁটে জঙ্গলে যাওয়া—তাও আবার দুর্যোগের রাতে—তারপর অন্ধকারেই তাগ করে তলোয়ার চালানো—এটা মনে রাখতে হবে যে এক হাতে টর্চ জেলে অন্য হাতে তলোয়ার চালানো সম্ভব নয়—এই এতগুলো কাজ একজন পাগলের পক্ষে সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে আরেকবার জঙ্গলে গিয়ে অনুসন্ধান না করলে চলছে না। যা ঘটেছে সব ত ওইখানে। কাজেই বাড়িতে বসে শুধু কল্পনা-কল্পনার সাহায্যে বেশি দূর এগোন যাবে না। এটা ঠিক যে তড়িৎবাবু সংকেতের সমাধান করে গুপ্তধনের সন্ধানেই গিয়েছিলেন। গুপ্তধন নিয়ে সোজা কলকাতায় চলে যাবেন, এটাই ছিল তাঁর প্ল্যান। কিন্তু এমন একটা আরামের চাকরি ছেড়ে গুপ্তধনের প্রতিই বা তার ঝোঁকটা গেল কেন? ভদ্রলোককে ত রাজার হালে রেখেছিলেন মহীতোষবাবু। মাইনেও যে ভালো দিতেন সেটা তড়িৎবাবুর জামাকাপড়, হাতের ঘড়ি, প্রসাধনের জিনিসপত্র ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায়। সিগারেটটাও খেতেন বিলিতি, এই মাগ্গির বাজারে।'

আজ সকাল থেকে আবার মেঘ করে আছে, তবে বৃষ্টি পড়ছে না। জানালা দিয়ে জঙ্গলটা চোখে পড়তেই কেমন জানি গা ছম ছম করে ওঠে। ফেলুদা সবেমাত্র বলেছে একবার মহীতোষবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া উচিত, এমন সময় চাকর এসে খবর দিল—নিচে ডাক পড়েছে। একটা জীপের আওয়াজ কিছুক্ষণ আগেই পেয়েছিলাম। নিচে গিয়ে দেখলাম ইন্সপেক্টর বিশ্বাস হাজির।

'আপনি খুশি ত?' বিশ্বাস ফেলুদাকে দেখেই প্রশ্নটা করলেন।

'কেন?'

'একটা রহস্য পেয়ে গেলেন। এই বাড়ি থেকেই অস্ত্র নিয়ে গিয়ে তড়িৎবাবুকে খুন করা হয়েছে, সেটা ত আপনার কাছে একটা জোর খবর, তাই নয় কি?'

'অস্ত্র নেই মানেই যে সেটা দিয়ে খুন করা হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই আপনি মনে করেন না।'

'আমি তা মনে করব কেন? কিন্তু আপনি তাই ভাবছেন না কি?'

দুজনেই বেশ ভদ্রভাবে কথা বললেও বেশ বুঝতে পারছিলাম

যে দুজনের মধ্যে একটা চাপা রেষারেষি চলেছে। কোনো দরকার ছিল না; মিস্টার বিশ্বাসেই প্রথম ঠেস দিয়ে কথা বলেছেন। ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আমি এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছইনি। আর আপনি যদি মনে করেন যে আমি খুশি হয়েছি, তাহলে বলতে বাধ্য হব যে আপনার ধারণা ভুল। খুনের ব্যাপারে আমি কোনো দিনই খুশি না। বিশেষ করে তড়িৎবাবুর মতো একজন বুদ্ধিমান লোক এত অল্প বয়সে এভাবে প্রাণ হারাবেন, এতে খুশি হবার কী আছে মিস্টার বিশ্বাস?'

'বুদ্ধিমান লোক?' বিশ্বাস ঠাট্টার সুরে বললেন। 'বুদ্ধিমান লোকের এমন মতিভ্রম হবে কেন যে রাত দুপুরে বাঘের জঙ্গলে যাবে সফর করতে? এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন আপনি, মিস্টার মিত্তির?'

'পারি।'

আমরা ছাড়া ঘরে তিনজন লোক—মহীতোষবাবু, বিশ্বাস আর শশাঙ্কবাবু। তিনজনেই ফেলুদার কথায় যেন তটস্থ হয়ে ওর দিকে চাইল। ফেলুদা বলল, 'তড়িৎবাবুর জঙ্গলে যাবার একটা পরিষ্কার কারণ ছিল।' এবার ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিকে চাইল। 'আপনার সংকেতের মানে আমি বার করেছি মহীতোষবাবু—তবে আমারও আগে করেছিলেন তড়িৎ সেনগুপ্ত। কাজেই বাঘছালটা ওঁরই প্রাপ্য ছিল। আমার বিশ্বাস উনি জঙ্গলে গিয়েছিলেন গুপ্তধনের সন্ধানে।'

মহীতোষবাবুর চোখ কপালে উঠে গেছে দেখে ফেলুদা তাঁকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। ফোকলা ফকিরের গাছের কথা শুনে মহীতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কই, ওরকম কোনো গাছ আছে বলে ত জানি না।'

'কিন্তু আপনার দাদা যে বললেন ছেলেবেলা আপনারা ওখানে চড়ুইভাতি করতে যেতেন, আপনার ঠাকুরদাদার সঙ্গে?'

'দাদা বললেন?' মহীতোষবাবুর কথায় পরিষ্কার ব্যঙ্গের সুর। 'দাদা যা বলেন তার কতটা সত্যি কতটা কল্পনা তা আপনি জানেন? আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে দাদার মাথার ঠিক নেই।'

ফেলুদা চুপ করে গেল। দেবতোষবাবুর মাথার ব্যারাম নিয়ে তাঁরই আপন ভাইয়ের সঙ্গে সে কীভাবে তর্ক করবে?

এদিকে মহীতোষবাবু কিন্তু বেশ ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'তার মানে তড়িৎ গুপ্তধন নিয়ে কলকাতায় পালানোর মতলব করছিল। হয়ত আর ফিরেও আসত না।

অথচ আমি এর কিছুই জানতে পারিনি।'

মিস্টার বিশ্বাস সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুষি মেরে বললেন, 'যাক্, তাহলে ভদ্রলোকের বনে যাবার একটা কারণ পাওয়া গেল। এবার জানা দরকার আততায়ী কে।'

'এই বাড়িরই লোক তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। আছে কি?' ফেলুদা একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে জিগ্যেস করল।

মিস্টার বিশ্বাস একটা বাঁকা হাসি হেসে চোখ দুটোকে ছোট ছোট করে বললেন, 'তা ত বটেই। তবে এ বাড়ির লোক বলতে আপনিও কিন্তু বাদ যাচ্ছেন না, মিস্টার মিত্তির। আপনি নিজে তলোয়ারটা দেখেছিলেন। ওটা হাত করার সুযোগ এ বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের যেমন ছিল, তেমনি আপনারও ছিল। আপনি তড়িৎবাবুকে আগে থেকে জানতেন কি না, তার প্রতি আপনার কোনো আক্রোশ ছিল কি না, সে সব কিন্তু কিছুই জানা যায়নি।'

মিস্টার বিশ্বাসের কথায় ফেলুদা আরেকটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, 'কেবল দুটো জিনিস সকলেই জানে। এক, আমি এখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি, এমনিতে আসার কথা ছিল না; দুই, তড়িৎ-বাবু যে ছুরির আঘাতে মরে থাকতে পারেন সেদিকে আমিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নাহলে তাকে বাঘের শিকার বলেই চালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।'

মিস্টার বিশ্বাস এবার একটা হালকা হাসি হেসে বললেন, 'আপনি আমার কথাটা এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন? ভয় নেই, আমাদের লক্ষ্য আপনার দিকে নয়, অন্য দিকে।'

লক্ষ্য করলাম যে, কথাটা বলার পর বিশ্বাস আর মহীতোষবাবুর মধ্যে, যাকে বলে দৃষ্টি বিনিময়, সেরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল—বোধহয় এক সেকেণ্ডের জন্য। ফেলুদা বলল, 'আপনি কালকে যে কথাটা বলেছিলেন সেটা এখনো বলছেন ত?'

'কী কথা?' জিগ্যেস করলেন মিস্টার বিশ্বাস।

'আমি আমার ইচ্ছেমতো অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারি ত?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কেবল আমার আর আপনার কাজটা ক্ল্যাশ না করলেই ভালো। কেউ কারুর বাধা সৃষ্টি করলেই কিন্তু মুশকিল হবে।'

'সেটার বোধ হয় কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি জঙ্গলের দিকটা-তেই তদন্ত চালাবো প্রধানত। সে ব্যাপারে বোধ হয় আপনার খুব

একটা উৎসাহ নেই।'

'এনিথিং ইউ লাইক'—বললেন মিস্টার বিশ্বাস।

এবার ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিকে ফিরল।

'দেবতোষবাবুর সঙ্গে কথা বলে কোন ফল হবে না বলছেন?'

মহীতোষবাবু অধৈর্য হলেন কিনা জানি না, তবে মনে হল এক-বার যেন ওঁর চওড়া চোয়ালের হাড়টা একটু শক্ত হল। পরমুহূর্তেই আবার স্বাভাবিক হয়ে শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'দাদার শরীরটা কাল থেকে একটু বেশি খারাপ হয়েছে। ওঁকে ডিসটার্ব করাটা ঠিক হবে না।'

ফেলুদা ছাইদানে সিগারেট ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে বলল, 'আমি ত আর অনির্দিষ্টকাল আপনার অতিথি হয়ে থাকতে পারি না, বা থাকতে চাইও না। কালই আমাদের মেয়াদের শেষ দিন। আপনাকে বলেছিলাম একবার জঙ্গলে যেতে চাই। আপনি যদি একটু মাধবলালকে বলে দেন, আর আপনার একটা জীপ...'

দুটোর ব্যবস্থাই হয়ে গেল। এখন সাড়ে আটটা। ঠিক হল আমরা দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব। জঙ্গলে ঘোরার জন্য হান্টিং বুট ছিল আমার আর ফেলুদার; আমরা দুজনেই সেগুলো বার করে পরে নিলাম, যদিও জানি যে আমাকে হয়ত জীপ থেকে নামতেই দেবে না। আমার ধারণা ছিল লালমোহনবাবু হয়ত নিজে থেকেই নামতে চাইবেন না, কিন্তু এখন লালমোহনবাবুর হাবভাব দেখে বেশ অবাক লাগল। বাথরুমে গিয়ে ধুতি ছেড়ে খাকি প্যান্ট পরে এলেন, আর বাক্স থেকে একটা জবরদস্ত বুট জুতো বার করে নিয়ে সেটা পরতে লাগলেন। ফেলুদা ব্যাপারটা শুধু একবার আড়চোখে দেখে নিল, মুখে কিছু বলল না।

'আচ্ছা, বাঘের চাহনি শুনেছি নাকি সাংঘাতিক ব্যাপার? সত্যি নাকি মশাই?' বুট পায়ে দিয়ে মেঝের উপর মিলিটারি মেজাজে পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা তৈরি হয়ে জানালার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, এখন শুধু জীপ আর শিকারীর অপেক্ষা। সে লালমোহনবাবুর প্রশ্নের জবাবে বলল, 'তা ত বটেই; তবে শিকারীরা এটাও বলে যে বাঘ নাকি মানুষকে ভয় পায়। একজন লোক যদি বাঘ দেখলে পরে তার চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে বাঘ নাকি উল্টো-মুখে ঘুরে চলে যায়। আর শুধু চাহনিতে যদি কাজ না দেয়, তাহলে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে পারলেও নাকি একই ফল হয়।'

'কিন্তু ম্যানইটার ?'

'সেখানে আলাদা ব্যাপার।'

'তাই বলুন। কিন্তু তাহলে আপনি যে...?'

'আমি যাচ্ছি কেন? তার কারণ দিনের বেলা বাঘ বেরোবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। যদি বেরোয় তার জন্য বন্দুক ত সঙ্গেই থাকছে। আর তেমন বেগতিক দেখলে জীপ ত রয়েইছে, উঠে পড়লেই হল।'

এর পরে জীপ আসার আগে লালমোহনবাবু শুধু একটা কথাই বলেছিলেন।

'খুনের ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই। একেবারে টোটাল ডার্কনেস।'

ফেলুদা বলল, 'অন্ধকারটা যাতে না দূর হয় তার জন্য চেষ্টা চলছে লালমোহনবাবু। সেই চেষ্টাকে বিফল করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।'

॥ ৯ ॥

যেখানে তড়িৎবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, আমরা সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছি। সেদিনও এই সময়টাতেই এসেছিলাম, কিন্তু আজ কিছুক্ষণ হল মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ওঠার ফলে আলোটা অনেক বেশি। এখানে ওখানে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ মাটিতে পড়েছে, আর লক্ষ্য করছি সেদিনের চেয়ে পাখিও ডাকছে অনেক বেশি। লালমোহনবাবু অবিশ্যি যে কোনো পাখি ডেকে উঠছে, সেটাকেই বাঘ কাছাকাছি থাকার লক্ষণ বলে মনে করছেন।

তড়িৎবাবুর মৃতদেহ সেদিনই সকালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কলকাতায় টেলিফোন করে খবর দেওয়াতে ওঁর বড় ভাই এসেছিলেন, শেষ কাজ তিনিই করে দিয়ে গেছেন। আজ আর সেই বাঁশঝাড়টার আশেপাশে সেদিনকার সাংঘাতিক ঘটনার কোনো চিহ্নই নেই। কিন্তু তাও ফেলুদা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চারদিকের জমি পরীক্ষা করছে। মাধবলালও ফেলুদার সঙ্গে কাজে লেগে গেছে। মনে হল বেশ উৎসাহই পাচ্ছে। লোকটাকে যত দেখছি ততই ভালো লাগছে। চেহারাটাও বেশ। হাসলেই গালের দু' পাশে দুটো খাঁজ পড়ে, আর ভুরু না কুঁচকালেও কপালে পাঁচ-ছ'টা লাইন পড়েই আছে। জীপে আসতে আসতে ও বলছিল, বনবিভাগ থেকে মানুষখেকোর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে এর মধ্যেই বেশ কয়েকজন শিকারী নাকি বাঘটা মারার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে কার্সিয়াং-এর এক চা বাগানের ম্যানেজার মিস্টার সাপ্রু নাকি আজকালের মধ্যেই এসে পড়বেন। সাপ্রু নামকরা শিকারী, তেরাইয়ের জঙ্গলে নাকি এককালে অনেক বাঘ মেরেছেন। মাধবলাল নিজেই অনেক বাঘ হরিণ বুনো শুয়োর ইত্যাদি মেরেছে, তারই একটি গল্প সে সবে বলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ বাঁশঝাড়ের দিক থেকে তার নাম ধরে ডাক দিল। মাধবলাল ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল ফেলুদার দিকে, তার পিছন পিছন আমরাও। এটা বলা দরকার যে আমাদের দুজনের জীপ থেকে নামার ব্যাপারে ফেলুদা আজ কোনো আপত্তি করেনি।

ফেলুদা মাটিতে উবু হয়ে বসে একটা বাঁশের গোড়ার দিকে

চেয়ে আছে।

'দেখুন ত এটা কী ব্যাপার, ফেলুদা মাধবলালকে উদ্দেশ্য করে বলল।

মাধবলাল ঝুঁকে পড়ে এক ঝলক দেখেই বলল, ''বুলেট লাগা থা।'

মাধবলালের পদবী দুবে, বাড়ি সাহেবগঞ্জ, কিন্তু বাংলা বুঝতে বা বলতে কোনো অসুবিধা হয় না।

বাঁশটার গায়ে যে একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লালমোহনবাবু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন। ফেলুদাও যে অবাক সেটা বোঝাই যাচ্ছে। বার তিনেক অস্থিরভাবে নিজের হাতের তেলোতে ঘুঁষি মেরে বলল, 'দাগটা পুরোন কি টাটকা সেটা বলতে পারেন?'

মাধবলাল বলল, 'দিন দুয়েকের বেশি পুরোন হতেই পারে না।'

'ব্যাপারটা কী?...ব্যাপারটা কী?...' ফেলুদা বিড়বিড় করে বলল, 'বন্দুক...তলোয়ার...সব যে গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তড়িৎবাবুকে মারল তলোয়ারের খোঁচা, বাঘকে মারল গুলি...সে গুলি ত আবার মনে হচ্ছে বাঘের গায়ে লাগেনি। নাকি—'

মাধবলাল বাঁশঝাড়ের নিচ থেকেই কী যেন কুড়িয়ে নিয়েছে। এমনি চোখে ভালো দেখাই যায় না। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম, ইঞ্চি দুয়েক লম্বা লম্বা কতকগুলো রোঁয়া।

'বাঘের লোম কি?' বলল ফেলুদা।

'বাঘের লোম', বলল মাধবলাল। 'গুলি বাঘের গা ঘেঁষে গিয়েছিল বলে মনে হয়।'

'আর তাই কি বাঘ খানিকটা মাংস খেয়েই পালিয়েছিল?'

'সেই রকমই মালুম হচ্ছে।'

ফেলুদা দু-এক পা করে এগিয়ে যেতে শুরু করল। মাধবলালও হাতে বন্দুক নিয়ে দৃষ্টি সজাগ রেখে তাকে অনুসরণ করল। আমরা দুজনের মাঝামাঝি সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটা বেছে নিলাম। ফেলুদার পকেটে রিভলভার আছে জানি, আর তাতে টোটাও ভরা আছে। কিন্তু তাতে ত আর বাঘের কিছু হবে না। পিছন থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ শুনে বুঝলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জীপটাও এগোচ্ছে। তার ফলে ব্যবধান কিছুটা কমলেও জীপ আমাদের কাছে আসতে পারবে না, কারণ আমরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর চলে এসেছি।

মিনিট তিনেক এভাবে হাঁটার পর ফেলুদা হঠাৎ কী জানি দেখে

ডান দিকে কোণাকুণিভাবে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

একটা কাঁটা ঝোপ। তার মধ্যে একটা কাপড়ের টুকরো আটকে রয়েছে। সবুজ কাপড়। নিঃসন্দেহে তড়িৎবাবুর শার্টের অংশ। মাধবলাল না বললেও আন্দাজ করেছিলাম, বাঘ তড়িৎবাবুকে মুখে করে নিয়ে যাবার সময় ঝোপের কাঁটায় তড়িৎবাবুর শার্টের একটা অংশ ছিঁড়ে আটকে গিয়ে এই চিহ্ন রেখে গেছে।

এবার দেখলাম মাধবলাল আমাদের ছাড়িয়ে নিজেই এগিয়ে গেল। বুঝলাম সে-ই এবার পথ দেখাবে, কারণ সে আন্দাজ করেছে বাঘ কোন পথে এসেছিল। বোধ হয় আমাদের কথা ভেবেই মাধবলাল ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, কারণ চারদিকে কাঁটা ঝোপ।

সামনে একটা তেঁতুল গাছ। তার গুঁড়ির কাছ থেকে জমিটা ঢালু হয়ে পিছন দিকে নেমে গেছে বলেই বোধ হয় সেখানটা শুকনো রয়েছে। মাধবলাল সেখানে পৌঁছে থেমে গেল, তার দৃষ্টি মাটির দিকে। আমরাও এগিয়ে গেলাম।

যদিও এ জিনিসটা এর আগে কোনোদিন দেখিনি, তাও বুঝতে অসুবিধা হল না যে, আমরা বাঘের পায়ের ছাপ দেখছি। আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকেই গেছে ছাপগুলো।

কাঁপা ফিসফিসে গলায় লালমোহনবাবুর প্রশ্ন এল, 'একি দু-পেয়ে বাঘ নাকি মশাই?'

মাধবলাল হেসে উঠল। ফেলুদা বলল, 'এইভাবেই বাঘ হাঁটে। সামনের পা আর পিছনের পা ঠিক একই জায়গায় ফেলে, তাই মনে হয় দু' পায়ে হাঁটছে।'

মাধবলাল এগিয়ে চলেছে, আমরা তার পিছনে। জীপের আওয়াজ আর পাচ্ছি না। বোধ হয় হাল ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা কুলকুল শব্দ পাচ্ছি। একটা নালা জাতীয় কিছু আছে বোধ হয় কাছাকাছির মধ্যে। লালমোহনবাবুর নতুন বুটটা প্রথম দিকে বড্ড বেশী মচ মচ শব্দ করছিল, তাতে ফেলুদা মন্তব্য করেছিল, সেটা নাকি ম্যানইটারের কৌতূহল উদ্রেক করার পক্ষে আইডিয়াল, কিন্তু এখন কাদায় ভিজে আওয়াজটা প্রায় মরে এসেছে।

একটা শিমুল গাছ পেরিয়ে কয়েক পা যেতেই মাধবলাল আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপকা পাস রিভলভার হ্যায় না?'

এবার আমাদের চোখ গেল হাত বিশেক দূরে সামনের ঘাসের দিকে। ঘাসগুলো চিরে কী যেন একটা জিনিস এগিয়ে আসছে।

'ক্রেইৎ', বলল মাধবলাল।

নামটা জানি। অসম্ভব বিষধর সাপ।

এবার সাপটাকে দেখতে পেলাম। চলা থামিয়ে স্থির হয়ে ঘাসের উপর দিয়ে মাথাটা তুলে আমাদের দেখছে। ফণা নেই। সারা গায়ে হলদে আর কালো ডোরা।

ফেলুদা যে কখন রিভলভারটা বার করল টেরই পেলাম না। হঠাৎ একটা কানফাটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সাপের মাথাটা থেঁতলে গেল। আরেকটা গুলি। এবার সব স্থির। গাছ থেকে পাখি ডেকে উঠেছে। দূরে আরেকটা গাছ থেকে বাঁদরের কিচির মিচির। মাধবলাল শুধু বলল, 'সাবাস', আর লালমোহনবাবু হাঁচি হাসি আর কাশি মিলিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে একদম চুপ মেরে গেলেন।

ফেলুদা বাঁ দিকে যাচ্ছে দেখে মাধবলাল বারণ করল। বলল, ওদিকে একটা নালা আছে, সেটা পেরোলেই নাকি একটা উঁচু পাথুরে ঢিবি আর অনেকগুলো বড় বড় পাথরের চাঁই। ওখানে নাকি বাঘের বিশ্রামের খুব ভালো জায়গা রয়েছে, কাজেই ওদিকটায় যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। অগত্যা ফেলুদা মাধবলালের নির্দেশ মতো সোজাই চলল।

বন যে সব জায়গায় সমান ঘন তা নয়। বাঁ দিকে চাইলেই বোঝা যায় ওদিকে নালা থাকার দরুন বন পাতলা হয়ে গেছে। জানোয়ারের মধ্যে এক বাঁদরই দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—ল্যাজ পাকিয়ে গাছের ডাল থেকে দোল খাচ্ছে, এগাছ থেকে ওগাছে দিব্যি লাফিয়ে চলে যাচ্ছে, আর আমাদের দেখলে দাঁত খিঁচোচ্ছে।

ফেলুদা নিশ্চয়ই আশা করছিল যে, আরো অনুসন্ধান করলে আরো কিছু পাবে, কিন্তু এবারে পাওয়াটা জুটে গেল লালমোহন-বাবুর কপালে। লালমোহনবাবুর বুটের ঠোকর খেয়ে একটা জিনিস ছিটকে প্রায় দশ হাত দূরে গিয়ে পড়তেই আমাদের চোখ সেদিকে গেল।

একটা গাঢ় ব্রাউন রঙের চামড়ার মানিব্যাগ। ফেলুদা সেটা খুলতেই তার ভিতর থেকে দুটো একশো টাকার নোট আর বেশ কিছু অন্য ছোট ছোট নোট বেরিয়ে পড়ল। এসব ছিল বড় খাপটায়। অন্য খাপ থেকে কয়েকটা রং চটে যাওয়া কুড়ি পয়সার ডাকটিকিট, দু-একটা ক্যাশ মেমো আর একটা ওষুধের প্রেসক্রিপশন বেরোল। বৃষ্টিতে ভিজে ব্যাগটার অবস্থা বেশ শোচনীয় হলেও নোটগুলো এখনো দিব্যি ব্যবহার করা চলে।

ফেলুদা সব জিনিস আবার ব্যাগের মধ্যে পুরে ব্যাগটা শার্টের বুকপকেটে ঢুকিয়ে নিল।

আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

এদিকটায় জঙ্গল বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ, মাঝে মাঝে অন্য গাছ—সেগুন, শিমুল, আম, কাঁঠাল, ছাতিম। অর্জুন গাছও রয়েছে এখানে সেখানে। আমি জানি ফেলুদা সেগুলোর দিকে বিশেষভাবে চোখ রাখছে, আর এও জানি যে অর্জুনের কাছাকাছি কোনো তাল গাছ এখনো পর্যন্ত চোখে পড়েনি। মাধবলাল এরই মধ্যে এক ফাঁকে পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে দুটো গাছের ডাল কেটে আমাকে আর লালমোহনবাবুকে দিয়েছে; আমরা সেগুলো লাঠি হিসাবে ব্যবহার করছি। ফেলুদা হাঁটতে হাঁটতেই মাধবলালকে প্রশ্ন করল, 'বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বাঘ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়, তাই না?'

মাধবলাল বলল, 'হ্যাঁ, এটাকে বেশ বড় বাঘ বলেই তো মনে হয়।'

আমি মনে মনে ভাবছিলাম—একটা আস্ত মানুষের লাশ মুখে করে বাঘটা এতখানি পথ এসেছে, তার মানে, কী সাংঘাতিক শক্তি বাঘের! অবিশ্যি মানুষের আর কীই বা ওজন। গরু মোষ মেরেও ত শুনেছি বাঘ ওইভাবেই মুখে করে নালাটালা লাফিয়ে ডিঙিয়ে মাইলের পর মাইল পথ চলে যায়। মহীতোষবাবুর বইয়েতেই নাকি আছে যে বাঘের ছাল ছাড়ালেই দেখা যায় ভিতরে কেবল মাস্‌ল আর মাস্‌ল।

ফেলুদা এবার আরেকটা প্রশ্ন করল মাধবলালকে।

'মহীতোষবাবু এ জঙ্গলে কখনো শিকার করেননি। তাই না?'

মাধবলাল বলল, মহীতোষবাবুর কুসংস্কারের কথাটা সে জানে। তবে এরকম কুসংস্কার নাকি অনেক শিকারীর মধ্যেই দেখা যায়। 'আমার নিজের নেই', মাধবলাল বলল, 'তবে আমার বাবার ছিল। জোয়ান বয়সে একবার বাঘ মারতে যাবার আগে হাতে বিছুটি লেগেছিল, আর সেইদিনই একটা প্রায় দশ ফুট লম্বা বাঘকে বন্দুকের এক গুলিতে ঘায়েল করেছিলেন। সেই থেকে বাঘ মারতে যাবার আগে হাতে বিছুটি ঘষে নিতেন।'

ফেলুদা বলল, 'করবেট সাহেবেরও কুসংস্কার ছিল। ম্যানইটার মারতে যাবার দিন সকালে একটা সাপ দেখলে তার মনটা খুশি হয়ে যেত।'

মহীতোষবাবুর বাপ-ঠাকুরদা দুজনেই এ জঙ্গলে বাঘের হাতে প্রাণ দেন, কাজেই মহীতোষবাবুর পক্ষে এখানে শিকার করায় আপত্তিটা খুব স্বাভাবিক।

আমরা মাধবলালের পিছন পিছন প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে হাঁটার পর ফেলুদা আসলে যে জিনিসটা খোঁজার জন্য এসেছিল, সেটা পেয়ে গেল। হাল্কা বেগুনী রঙের ছোট ছোট ফুলে ভরা একটা ঝোপের ধারে পড়ে আছে, তার পাথরবসানো হাতলটা খালি দেখা যাচ্ছে, ইস্পাতের অংশটা ঝোপে ঢাকা।

আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার।

জিনিসটা চোখে পড়তেই ফেলুদা প্রায় বাঘের মতোই নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ারটা মাটি থেকে তুলে নিল।

খুব মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় তলোয়ারের ডগায় এখনো খয়েরি রঙের রক্তের দাগ।

ফেলুদা তলোয়ারটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে বলল, 'তার মানে খুনের জায়গাটা এর চেয়ে খুব বেশি দূরে নয়। আরো একটু এগোন যায় কি, মাধবলালজি?'

মাধবলাল বলল, 'আর একশো গজ গেলে ত মন্দির পড়বে।'

'কী মন্দির?'

'এখানে বলে কাটা ঠাকুরানীর মন্দির। ভিতরে কিছু নেই। শুধু দালানটা ভাঙাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।'

কাটা ঠাকুরানীর মন্দিরের কথা কালই বিকেলে শুনেছি। দেবতোষবাবুর কাছে। ওরই পশ্চিমে ফোকলা ফকিরের গাছ।

ফেলুদা আর কিছু না বলে এগিয়ে চলল, তার হাতে আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার। দেখে মনে হয় সেও যেন শের শাহ্‌র মতোই তলোয়ার হাতে বাঘ মারতে চলেছে।

কাটা ঠাকুরানীর মন্দির যে বহুকালের পুরোন সেটা দেখলেই বোঝা যায়। তার ফাটল থেকে অশথ গাছের চারা বেরিয়েছে। তার মাথাটাকে পাশের একটা বটগাছের ঝুরি নেমে আঁকড়ে ধরে পিষে যেন তার প্রাণটাকে বের করে দিয়েছে। ফেলুদা কিন্তু মন্দিরের দিকে দেখছিলই না। তার চোখ চলে গেছে মন্দিরের ডানদিকে। প্রায় বিশ হাত দূরে একটা সত্যিই বুড়ো প্রকাণ্ড অশথ গাছ শুকনো ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছে পাতা প্রায় নেই বললেই চলে। যেটা আছে সেটা হল মাটি থেকে প্রায় এক মানুষ উঁচুতে একটা ফোকর।

ফেলুদার পিছন পিছন আমরাও প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে গাছটার

দিকে এগিয়ে যেতে ক্রমে ফোকরের চারিদিক ঘিরে গাছের গায়ের হোপছাপ এবড়ো-খেবড়ো শিরা উপশিরা সব মিলিয়ে একটা দাড়ি-ওয়ালা বুড়োর চেহারা আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দাড়িটা গজিয়েছে যেন ফোকরের ঠিক নিচে। হাঁ করা ফোকলা বুড়োর সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

ফেলুদার দৃষ্টি আবার ঘুরে গেল।

'ওই দিকটা উত্তর দিক কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল মাধবলালকে।

'হ্যাঁ—ওটাই উত্তর।'

'হতেই হবে। ওই ত অর্জুন গাছ। আর ওই যে জোড়া তাল।'

অবাক হয়ে দেখলাম সংকেতের নির্দেশের সঙ্গে সব হুবহু মিলে যাচ্ছে।

'পঞ্চাশ হতেই হবে। সেখানেও ভুল নেই', বলে ফেলুদা অর্জুন গাছটার দিকে এগিয়ে গেল।

গাছটার কাছে পৌঁছে জোড়া তাল গাছ লক্ষ করে খানিক দূরে এগোতেই একটা ঝোপড়ার পিছনে জলকাদায় ভরা একটা বেশ বড় গর্ত চোখে পড়ল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গর্তটা এই কয়েকদিন আগেই খোঁড়া হয়েছে।

আর এটাও বোঝা যাচ্ছে যে তার ভিতর থেকে একটা হাঁড়িটাঁড়ি গোছের জিনিস বার করে নেওয়া হয়েছে।

'গুপ্তধন হাওয়া?' লালমোহনবাবু এই প্রথম গলা চড়িয়ে কথা বললেন।

ফেলুদার মুখের ভাব থমথমে। এটাকে অবিশ্যি নতুন কোনো রহস্য বলা চলে না। বোঝাই যাচ্ছে তড়িৎবাবুকে যে খুন করেছে সেই গুপ্তধন হাত করেছে। ফেলুদা তবুও গর্তের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'তোরা একটু জিরিয়ে নে। আমি আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিচ্ছি।'

সত্যি বলতে কি, এতক্ষণ পা টিপে টিপে কাঁটা বাঁচিয়ে জঙ্গলে হেঁটে বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তাই আমি আর লালমোহনবাবু বিশ্রামের একটা সুযোগ পেয়ে খুশিই হলাম। ফোকলা ফকিরের তলায় একটা শুকনো জায়গা বেছে আমরা মাটিতেই বসলাম, আর মাধবলাল গাছের গুঁড়িতে বন্দুকটাকে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে আমাদের সামনে বসে তার তেরো বছর বয়সে সে ভালুকের আক্রমণ থেকে কীভাবে উদ্ধার পেয়েছিল সেই গল্প বলতে লাগল। আমার

মন কিন্তু পুরোপুরি গল্পের দিকে যাচ্ছে না, কারণ একটা চোখ রয়েছে ফেলুদার দিকে। সে ঠোঁটের ফাঁকে একটা টাটকা ধরানো চারমিনার নিয়ে মন্দিরের চারপাশটা সার্ভে করছে। একবার মনে হল একটা সিগারেটের টুকরো তুলে নিয়ে আবার সেটাকে ফেলে দিল। আরেকবার হাঁটু গেড়ে বসে কোমরটাকে ভাঁজ করে প্রায় মাটিতে নাক ঠেকিয়ে কী যেন দেখল।

প্রায় দশ মিনিট ধরে তন্ন তন্ন করে চারিদিকে সার্ভে করে ফেলুদা মন্দিরের ভেতর ঢুকল। ধন্যি সাহস ফেলুদার। বাইরের থেকে মন্দিরের ভেতরটা অন্ধকূপের মতো মনে হয়। এককালে নাকি দশভুজার মূর্তি ছিল, কালাপাহাড়ের দৌলতে সে মূর্তির মাথা, চারটে হাত আর পেটের খানিকটা কাটা যায়। সেই থেকে মন্দিরের নাম হয়ে যায় পেটকাটি বা কাটা ঠাকুরানীর মন্দির। এখন ওর ভিতরে নির্ঘাৎ সাপ, তক্ষক আর গিরগিটির বাসা। তাও ফেলুদা নির্বিকারে মন্দিরের ভিতর ঢুকে সার্ভে করে মিনিটখানেক পরে বেরিয়ে এসে রহস্যজনকভাবে বলল, 'তাজ্জব ব্যাপার। আলো পেতে হলে যে অন্ধকারে প্রবেশ করতে হয় তা এই প্রথম জানলাম।'

'কী মশাই, ডার্কনেস গন?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'খানিকটা', বলল ফেলুদা, 'অমাবস্যার পর প্রতিপদের চাঁদ বলতে পারেন।'

'তাহলে ত ষোলকলা পুরতে এখনো অনেকদিন মশাই।'

'আপনি শুধু চাঁদের কথা ভাবছেন কেন? সূর্য বলেও ত একটা জিনিস আছে। রাতটা কেটে গেলেই ত তার দেখা পাওয়ার কথা।'

'কালই, তার মানে, ক্লাইম্যাক্স বলছেন?'

'আমি আর কিছুই বলছি না লালমোহনবাবু, শুধু বলছি যে এই প্রথম একটা আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি। চ তোপসে, বাড়ি চ।'

॥ ১০॥

আমরা বেরিয়েছিলাম দশটায়, ফিরতে ফিরতে হল প্রায় সাড়ে বারোটা। ফেলুদা তলোয়ারটা সোজা মহীতোষবাবুর হাতে তুলে দেবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু এসে শুনলাম উনি আর শশাঙ্কবাবু বেরিয়ে গেছেন। বনবিভাগের বড় কর্তা নাকি এসে কালবনি ফরেস্ট বাংলোতে রয়েছেন, সেখানেই গেছেন। কাজেই তলোয়ারটা এখন আমাদের ঘরে, আমাদেরই কাছে।

ঘরে আসার আগে অবিশ্যি আমরা একতলায় কিছুটা সময় কাটিয়ে এসেছি। ফেলুদার মাথায় কী যেন ঘুরছিল; ও দোতলায় না গিয়ে সোজা চলে গেল ট্রোফি রুমে। সেই যেখানে জানোয়ারের ছাল আর মাথাগুলো রয়েছে, আর র‍্যাকে রাখা রয়েছে বন্দুকগুলো। ফেলুদা র‍্যাক থেকে একটা একটা করে বন্দুক নামিয়ে সেগুলো খুব মন দিয়ে দেখল। বন্দুকের নল, বন্দুকের বাঁট, বন্দুকের ট্রিগার, সেফটি ক্যাচ—প্রত্যেকটা জিনিস ও খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফেলুদা তাকে ধমকে থামিয়ে দিল।

'এখন কথা বলার সময় নয় লালমোহনবাবু, এখন চিন্তা করার সময়।'

লালমোহনবাবু এতদিনে ফেলুদার গতিগতি খুব ভালোভাবেই জেনে গেছেন, তাই আর দ্বিতীয়বার মুখ খুললেন না।

দোতলায় উঠে বারান্দা দিয়ে আমাদের ঘরের দিকে যেতে ফেলুদা থমকে থেমে গেল। তার দৃষ্টি দেবতোষবাবুর ঘরের দিকে।

'সেকি, দাদার ঘরে তালা কেন?'

সত্যিই ত! ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে গেলেন কোথায়? আর তালা লাগিয়ে যাবারই বা কারণটা কী?

ফেলুদা কী ভাবল জানি না। মুখে কিছুই বলল না। আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ফেলুদার এখনকার অবস্থাটা আমার খুব চেনা। জটিল রহস্যের জট ছাড়ানোর প্রথম অবস্থায় ওর ভাবটা এরকমই হয়। দু' মিনিট

ভুরু কুঁচকে চুপ করে বসে থেকেই আবার উঠে দাঁড়াল, তারপর খানিকটা পায়চারি করে আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা হেঁট করে চোখ বুজে ডান হাতের মাঝের আঙুলের ডগা দিয়ে কপালে আস্তে আস্তে টোকা মারা, তারপর আবার হাঁটা, আবার বসা—এই রকম আর কি। এইভাবেই একবার খাট ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'কেউ যখন নেই, আর দেবতোষবাবুর ঘর যখন বন্ধ, তখন এই ফাঁকে একটু চোরা অনুসন্ধান চালালে বোধহয় মন্দ হয় না।'

কথাটা বলে ফেলুদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখলাম, ও এদিক ওদিক দেখে মহীতোষবাবুর কাজের ঘরে ঢুকল।

বাঘের পায়ের ছাপ দেখে অবধি লালমোহনবাবুর সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে। উনি এখন দিব্যি বাঘছালটার উপর চিত হয়ে শুয়ে বাঘের মাথাটা বালিশের মতো ব্যবহার করছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ সিলিং-এর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী শুভক্ষণেই বইটা মহী-তোষবাবুকে উৎসর্গ করেছিলাম বল ত। এমন একটা থ্রিলিং অভিজ্ঞতা কি না হলে হত? আজ সকালের কথাটাই চিন্তা কর—বাঁশের ভেতর বুলেট, ঘাসের মধ্যে সাপ, রয়েল বেঙ্গলের পায়ের ছাপ, পোড়ো মন্দির, গুপ্তধন, জরাগ্রস্ত অশথ গাছ—আর কত চাই? এখন এক-বারটি ম্যানইটারের মুখোমুখি পড়তে পারলেই অভিজ্ঞতা কমপ্লীট।'

'শেষেরটা কি সত্যি করেই চাইছেন আপনি?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'আর ভয় নেই', একটা বিরাট হাই তুলে বললেন লালমোহনবাবু, 'মাধবলাল শিকারী আর ফেলু মিত্তির শিকারী দুপাশে থাকলে মানুষখেকোর বাপের সাধ্যি নেই কিছু করে।'

লালমোহনবাবু প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর আমি মহীতোষ-বাবুর শিকারের বইটা পড়ছিলাম, এমন সময় ফেলুদা ফিরে এল।

'কিছু পেলেন?'

ফেলুদার পায়ের আওয়াজ পেয়েই লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসেছেন।

ফেলুদা গম্ভীর। বলল, 'যা খুঁজছিলাম তা পাইনি, আর সেটাই সিগ্নিফিক্যান্ট।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটিতে ঠেকল কেন জানেন ত

লালমোহনবাবু?'

'সেই অশ্বত্থামা হত ইতি গজ-র ব্যাপার ত?'

'হ্যাঁ। যুধিষ্ঠির পুরোপুরি সত্যি কথা বলেননি তাই। কিন্তু আজকের দিনে মিথ্যে বললেই যে চাকা মাটিতে ঠেকে যাবে এমন কোনো কথা নেই। এ যুগে মানুষের দোষের শাস্তি মানুষই দিতে পারে, ভগবান নয়।'

এর পরে একটা শাঁখের আওয়াজ পাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই চাকর এসে খবর দিল যে, ভাত বাড়া হয়েছে, বাবু এসেছেন, খেতে ডাকছেন।

মহীতোষবাবুর বাড়িতে খাওয়াটা ভালোই হয়। সব সময় হয় কি না জানি না, কিন্তু আমরা যে ক'দিন রয়েছি সে ক'দিন রোজই মুরগি হয়েছে। কাল রাত্রে বিলিতি কায়দায় রোস্ট হয়েছিল, লালমোহনবাবু কাঁটা চামচ ম্যানেজ করতে পারছেন না দেখে মহীতোষবাবু বললেন যে, পাখির মাংস হাত দিয়ে খেলে নাকি কেতায় কোনো ভুল হয় না। আজকেও খাওয়ার তোড়জোড় ভালোই ছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই কথাবার্তা এমন গুরুগম্ভীর মেজাজে শুরু হল যে খাওয়ার দিকে বেশি নজর দেওয়া হল না। আমরা খাবার ঘরে ঢুকতেই মহীতোষবাবু বললেন, 'মিস্টার মিত্তির, সংকেতের ব্যাপারটা যখন চুকেই গেছে, তখন ত আর আপনাদের এখানে ধরে রাখার কোনো মানে হয় না। কাজেই আপনি যদি বলেন তাহলে আপনাদের ফেরার বন্দোবস্ত আমার লোক করে দিতে পারে। জলপাইগুড়িতে লোক যাচ্ছে, আপনাদের রিজার্ভেশনটা করে আনতে পারে।'

ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'আমাদের দিক থেকেও আপনার আতিথেয়তার সুযোগ আর নেবো না বলেই ভাবছিলাম। তবে আপনার যদি খুব বেশি আপত্তি না থাকে তাহলে আজকের দিনটা থেকে কাল রওনা হতে পারি। বুঝতেই ত পারছেন, আমি গোয়েন্দা মানুষ, আমি থাকতে থাকতে একজন এভাবে খুন হলেন, তার একটা কিনারা না করে যেতে পারলে মনটা খুঁতখুঁত করবে। আমিই করি, বা পুলিশই করুক, কীভাবে ঘটনাটা ঘটল সেটা জেনে যেতে পারলে ভাল হত।'

মহীতোষবাবু খাওয়া বন্ধ করে ফেলুদার দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'সুস্থ মস্তিষ্কে খুন করতে পারে এমন লোক আমার বাড়িতে কেউ নেই, মিস্টার মিত্তির।

ফেলুদা যেন কথাটা গায়েই করল না। বলল, 'আপনার দাদাকে কি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ওঁর ঘরে তালা দেখছিলাম।'

মহীতোষবাবু সেইরকম গম্ভীরভাবেই বললেন, 'দাদা ঘরেই আছেন। তবে কাল রাত থেকে ওঁর একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ওষুধ খাননি। তাই ওঁকে একটু সংযত করে রাখা দরকার। নইলে আপনাদেরও বিপদ আসতে পারে। আপনারাও ত দোতলাতেই থাকেন। উনি বাইরের লোককে এমনিতেই সন্দেহের চোখে দেখেন। শুধু তাই না, যে সব ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে ওঁর মনে বিরূপ ভাব আছে, বাইরের লোককে সেইসব চরিত্র বা তাদের অনুচর বলে কল্পনা করেন। তড়িৎকে ত কালাপাহাড় ভেবে একদিন ওর টুঁটি টিপে ধরেছিলেন। শেষটায় মন্মথ গিয়ে কোনোমতে ছাড়ায়।'

ফেলুদা খাওয়া না থামিয়ে দিব্যি স্বাভাবিকভাবে বলল, 'তড়িৎবাবুর খুন হওয়াটাই কিন্তু একমাত্র ঘটনা নয়। আপনার গুপ্তধনও কে যেন সরিয়ে ফেলেছে। খুব সম্ভবত সেই একই রাত্রে।'

'সে কি!'—এবার মহীতোষবাবুর মুখের গ্রাস আর মুখ পর্যন্ত পৌঁছল না—গুপ্তধন নেই? আপনি দেখে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। গুপ্তধন নেই, তবে তলোয়ারটা পাওয়া গেছে। আর তাতে রক্তের দাগও পাওয়া গেছে।'

মহীতোষবাবু বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। এবার ফেলুদা তার তৃতীয় বোমাটা দাগল।

'তড়িৎবাবুকে যখন বাঘে খাচ্ছিল, তখন সেই বাঘের দিকে তাগ করে কেউ একটা গুলি ছোঁড়ে। সেটা বাঁশের গুঁড়িতে লাগে। গুলিটা সম্ভবত বাঘের গা ঘেঁষে গিয়েছিল, কারণ বাঘের কিছু লোম পাওয়া গেছে, মাটিতে পড়ে ছিল। কাজেই মনে হচ্ছে সে রাত্রে বেশ কয়েকজন লোক বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে জঙ্গলের একটা বিশেষ অংশে ঘোরাফেরা করছিল।'

'পোচার।'

কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন শশাঙ্কবাবু। পোচার মানে যে চোরা শিকারী সেটা জানতাম। শিকারের বিরুদ্ধে আইন পাশ হবার পরেও এরা লুকিয়ে লুকিয়ে শিকার করে বাঘের চামড়া, হরিণের সিং, গণ্ডারের সিং, এইসব বিক্রি করে। এমন কি বাঘভাল্লুকের বাচ্চা ধরেও মাঝে মাঝে বিক্রি করে।

শশাঙ্কবাবু বলে চললেন, 'তড়িৎকে যে-ই খুন করে থাকুক, তাকে বাঘে ধরে নিয়ে যাবার পর জঙ্গলে নিশ্চয়ই কোনো পোচার ঢোকে। পোচারই বাঘটাকে গুলি করেছিল, যে গুলি বাঘের গায়ে আঁচড় কেটে বাঁশের গুঁড়িতে লেগেছিল।'

ফেলুদা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা অবিশ্যি অসম্ভব নয়। কাজেই বন্দুকের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের না ভাবলেও চলবে। কিন্তু অন্য দুটো রহস্য রয়েই যাচ্ছে।'

'দুটো নয়, একটা', বললেন মহীতোষবাবু। 'গুপ্তধন। ওটা পাওয়া দরকার। ওটা না পেলে সিংহরায় বংশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওটা পেতেই হবে।'

'তাহলে এক কাজ করুন না কেন', ফেলুদা বলল, 'আমরা সবাই চলুন আরেকটিবার ওখানে যাই। জায়গাটা হল কাটা ঠাকুরানীর মন্দিরের পাশে।'

* * *

মহীতোষবাবু জঙ্গল অভিযানে আপত্তি করেননি। কিন্তু হলে কী হবে, বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে চারিদিক অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত যখন সে বৃষ্টি থামল না, তখন আমরা জঙ্গলে যাবার আশা ত্যাগ করলাম। ফেলুদা গম্ভীর থেকে এখন একেবারে গোমড়া হয়ে গেছে। মহীতোষবাবু যে আমরা চলে গেলে খুশি হন সেটা ওঁর কথায় পরিষ্কার বোঝা গেছে। কালও যদি খারাপ থাকে তাহলে হয়ত ফেলুদাকে তড়িৎবাবুর খুনের রহস্য সমাধান না করেই চলে যেতে হবে। অবিশ্যি আরেকবার কাটা ঠাকুরানীর মন্দিরে গেলেই যে ফেলুদার মনের অন্ধকার কীভাবে দূর হবে তা জানি না। তবে ও যে মনে মনে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে সেটা ওর চোখ মাঝে মাঝে যেভাবে জ্বলে উঠেছিল তা থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

এর মধ্যে আমরা তিনজনেই একবার বাইরের বারান্দায় বেরিয়েছিলাম। তখন গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। তখনও দেখলাম দেবতোষবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। লালমোহনবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'একবার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে এলে হত না ভদ্রলোক কী করছেন! এ তল্লাটে ত কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা অবিশ্যি লালমোহনবাবুর অনেক কথার মতোই এটাতেও কান দিল না।

সাতটার সময় মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে তারা দেখা দিল। মনে হচ্ছিল কুচকুচে কালো আকাশের গায়ে তারাগুলো এই মাত্র পালিশ করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেলুদা হাতে তলোয়ার নিয়ে খাটে বসে আছে। আমরা দু'জনে সবে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় লালমোহনবাবু আমার শার্টের আস্তিনটা খামচে ধরে

ফিসফিস গলায় বললেন, 'সবুজ টর্চ!'

দারোয়ানের বাড়িটা আমাদের জানালা থেকে দেখা যায়। আমাদের বাড়ি আর ওর বাড়ির মাঝামাঝি একটা গোলঞ্চ গাছ। তার নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটা টর্চওয়ালা লোক সেই লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। এটা সেই ধরনের টর্চ যেগুলো বাড়ির প্লাগ পয়েন্টে গুঁজে দিলে চার্জ হয়ে থাকে। ছোট্ট বালব, ছোট্ট কাচের মুখ, কিন্তু আলোর বেশ তেজ।

এবার ফেলুদা ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'মাধবলাল', ফেলুদা ফিসফিস করে বলল।

যে লোকটা অপেক্ষা করছিল তাকে আমারও মাধবলাল বলে মনে হয়েছিল, কারণ এই অন্ধকারেও হলদে শার্টের রঙটা আবছা আবছা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু যে লোকটার হাতে টর্চ সে যে কে তা বোঝা ভারি মুশকিল। সে মহীতোষবাবুও হতে পারে, ওঁর দাদাও হতে পারে, শশাঙ্কবাবুও হতে পারে, আবার অন্য লোকও হতে পারে।

এখন টর্চের আলো নিভে গেছে। কিন্তু দুজনে দাঁড়িয়ে যে খুব নীচু গলায় কথা বলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ পর হলদে শার্টটা নড়ে উঠল। তারপর টর্চের আলোটা জ্বলে উঠে আমাদের বাড়ির দিকে চলে এল। ফেলুদা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে দিল।

লালমোহনবাবু বোধহয় নিজেই নিজের মনের মতো করে গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাচ্ছেন, তাই তিনি হঠাৎ এক ফাঁকে বারান্দায় বেরিয়ে কী জানি দেখে এলেন।

'কী দেখলেন? দরজায় এখনো তালা?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ।' লালমোহনবাবু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন।

'আপনার কি ধারণা উনিই গিয়েছিলেন মাধবলালের সঙ্গে কথা বলতে?'

'আমি ত গোড়াতেই বলেছি মশাই, দাদাটিকে আমার ভাল লাগছে না। পাগল জিনিসটা বড়ো ডেঞ্জারাস। আমাদের নর্থ ক্যাল-কাটায় এক পাগল ছিল, সে আপার সারকুলার রোডের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রাম আর বাস লক্ষ্য করে বেমক্কা ঢিল ছুঁড়ত। কী ডেঞ্জারাস বলুন ত!'

'দেবতোষবাবুর দরজা বন্ধতে কী প্রমাণ হল?'

'তার মানে ভদ্রলোক নিচে যাননি।'

'কী করে প্রমাণ হয় সেটা; ভদ্রলোক আদৌ ঐ তালা-বন্ধ দরজার পিছনে আছেন কিনা সেটা আপনি কী করে জানলেন? সারাদিনে তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পেয়েছেন কি?'

লালমোহনবাবু যেন বেশ খানিকটা দমে গেলেন। একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বললেন, 'মশাই, কত চেষ্টা করি আমার চিন্তা ঠিক আপনার চিন্তার সঙ্গে এক লাইনে চালাব—কোথায় যেন গণ্ডগোল হয়ে যায়।'

'গণ্ডগোল না। কোলিশন। আপনি উল্টো পথে চলেন কিনা। আপনি আগে ক্রিমিনাল ঠিক করে নিয়ে তারপর তার ঘাড়ে ক্রাইমটা বসাতে চেষ্টা করেন, আর আমি ক্রাইমের ধাঁচটা বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী ক্রিমিন্যাল খোঁজার চেষ্টা করি।'

'এই ব্যাপারেও তাই করছেন?'

'ও ছাড়া ত আর রাস্তা নেই লালমোহনবাবু।'

'কোনখান থেকে শুরু করেছেন?'

'কুরুক্ষেত্র।'

এর পরে আর লালমোহনবাবু কোনো প্রশ্ন করেননি।

আমাদের মশারি বদলে দেওয়াতে ঘুমটা ভালোই হচ্ছিল, কিন্তু মাঝরাত্তিরে একটা চিৎকারে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসতে হল। চিৎকারটা করেছে ফেলুদা। জেগে দেখি ও দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝ-খানে, হাতে রয়েছে আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার। বাইরে থেকে চাঁদের আলো এসে ইস্পাতের ফলাটার উপর পড়াতে সেটা ঝিলিক মারছে। যে কথাটা শুনে ঘুমটা ভেঙেছিল সেটা ফেলুদা আরো দু'বার বলল, তবে অত চেঁচিয়ে নয়। 'ইউরেকা! ইউরেকা!'

আর্কিমিডিস কী যেন একটা আবিষ্কার করে উল্লাসের সঙ্গে এই গ্রীক কথাটা বলে উঠেছিল। তার মানে হল 'পেয়েছি।' ফেলুদা যে কী পেয়েছে সেটা বোঝা গেল না।

॥ ১১ ॥

সকালে চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কবাবু আমাদের ঘরে এলেন দেখে বেশ একটু অবাক লাগল। ফেলুদা ভদ্রলোককে বেশ খাতির-টাতির করে বসতে বলে বলল, 'আপনার সঙ্গে আর আলাপই হল না ঠিক করে। মহীতোষবাবুর বন্ধু হিসেবে আপনারও নিশ্চয়ই অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

শশাঙ্কবাবু টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসে বললেন, 'অভিজ্ঞতার শুরু কি সেই আজকে? মহীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পঞ্চাশ বছরের উপর। সেই ইস্কুল থেকে।'

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'মহীতোষ সম্পর্কে?'

'না। তড়িৎবাবু সম্পর্কে।'

'বলুন।'

'আপনার মতে উনি কেমন লোক ছিলেন?'

'চমৎকার। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির যুবক ছিল তড়িৎ।'

'আর কাজের দিক দিয়ে?'

'অসাধারণ।'

'আমারও তাই ধারণা...'

এবার শশাঙ্কবাবু ফেলুদার দিকে সোজা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।'

'বলুন।'

শশাঙ্কবাবুকে এই প্রথম সিগারেট খেতে দেখলাম। ফেলুদারই দেওয়া একটা চারমিনার ধরিয়ে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এই তিন দিনে আপনার অনেক রকম অভিজ্ঞতা হল। আপনি নিজেও বুদ্ধিমান, তাই সাধারণ লোকের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি দেখেছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন। আজ হয়ত আপনার এখানে শেষ দিন। আজ কী ঘটবে তা জানি না। যাই ঘটুক না কেন, এই বিশেষ জায়গার এই বিশেষ জমিদার পরিবারটি সম্বন্ধে আপনি যা জেনে

গেলেন, সেটা যদি আপনি গোপন রাখতে পারেন, এবং আপনার এই বন্ধুটিকেও গোপন রাখতে বলেন, তাহলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব। আমি জানি মহীতোষও এটাই চাইবে। বাংলাদেশের প্রায় যে কোনো জমিদার বংশের ইতিহাস ঘাঁটলেই অনেক সব অদ্ভুত অপ্রিয় ঘটনা বেরিয়ে পড়বে সে ত আপনি জানেন। সেরকম সিংহ-রায় বংশের ইতিহাসেও অনেক অপ্রিয় তথ্য লুকিয়ে আছে সেটা বলাই বাহুল্য।'

ফেলুদা বলল, 'শশাঙ্কবাবু, আমি তিন দিন ধরে মহীতোষ-বাবুর আতিথেয়তা ভোগ করেছি। সে কারণে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কলকাতায় গিয়ে সিংহরায় পরিবার সম্পর্কে বদনাম রটাব, এটা কখনো হবে না। এ আমি কথা দিতে পারি।'

এর পর একটা প্রশ্ন ফেলুদা বোধহয় না করে পারল না।

'দেবতোষবাবুর ঘরের দরজা কাল থেকে বন্ধ দেখছি। এ ব্যাপারে আপনি কোনো আলোকপাত করতে পারেন কি?'

শশাঙ্কবাবু একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ফেলুদার দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, 'আমার বিশ্বাস আজকের দিনটা ফুরোবার আগে আপনিই পারবেন।'

'পুলিশ কি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে?'

'উঁহু।'

'সে কি! হঠাৎ বন্ধ করার কারণটা কি?'

'যার উপর সন্দেহটা পড়ছে, মহীতোষ চায় না যে পুলিশ তাকে কোনোরকমভাবে বিব্রত করে।'

'আপনি দেবতোষবাবুর কথা বলছেন?'

'আর কে আছে বলুন?'

'কিন্তু দেবতোষবাবু যদি খুন করেও থাকেন, তিনি ত আর অভিযুক্ত হবেন না, কারণ তাঁর ত মাথা খারাপ।'

'তা হলেও, ব্যাপারটা প্রচার হয়ে পড়বে ত। মহীতোষ সেটাও চায় না।'

'সিংহরায় বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য?'

'ধরুন যদি তাই হয়!'—বলে শশাঙ্কবাবু উঠে পড়লেন।

সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজও প্রথম দিনের মতো দুটো জীপ। একটায় ফেলুদা, লালমোহনবাবু আর আমি, অন্যটায় মহীতোষবাবু, শশাঙ্কবাবু, মাধবলাল আর মহী-

তোষবাবুর একজন বেয়ারা। আজ আমাদের সঙ্গে তিনটে বন্দুক। একটা নিয়েছে মাধবলাল, একটা মহীতোষবাবু, আর একটা—ফেলুদা। বন্দুক নেবার ইচ্ছেটা ফেলুদাই প্রকাশ করল। ফেলুদার রিভলভার চালানোর কথা মাধবলালই মহীতোষবাবুকে খুব ফলাও করে বলেছিল, তাই বন্দুক চাইতে মহীতোষবাবু আর আপত্তি করলেন না। বললেন, 'আপনার খুশিমতো একটা বেছে নিন। বাঘের জন্যই যদি হয় ত থ্রি-সেভেন-ফাইভটা নিতে পারেন।' ওসব নম্বর-টম্বর আমি বুঝি না, তবে বেশ জবরদস্ত রাইফেল সেটা দেখে বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবুর মধ্যেও একটা চাপা উত্তেজনার ভাব, কারণ ফেলুদা তার হাতে আদিত্যনারায়ণের তলোয়ারটা ধরিয়ে দিয়েছে। দেবার সময় বলল, 'একদম হাতছাড়া করবেন না। আজকের নাটকে ওটার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।'

ভোরে যখন উঠেছিলাম তখন আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার ছিল, কিন্তু এখন আবার মেঘ করে এসেছে। কালকের বৃষ্টির ফলে রাস্তায় কাদা হয়েছিল, তাই আমাদের পৌঁছতে খানিকটা বেশি সময় লাগল। কাটা ঠাকুরানীর মন্দির একেবারে জঙ্গলের ভিতরে, জীপ অতদূর যাবে না। কাল যেখানে নেমেছিলাম আজ সেখান থেকে প্রায় আরো আধ মাইল ভিতরে গিয়ে আমাদের জীপ থামল। মাধবলাল রাস্তা চেনে; সে বলল, 'সামনে একটা নালা পেরিয়ে মিনিট পনের হাঁটলেই আমরা মন্দিরে পৌঁছে যাব।'

অল্প অল্প মেঘের গর্জন আর গাছের পাতা কাঁপানো ঝিরঝিরে বাতাসের মধ্যে আমাদের অভিযান শুরু হল। গাড়ি থেকে নামবার আগেই ফেলুদা রাইফেলে টোটা ভরে নিয়েছে। মহীতোষবাবু নিজে তার বন্দুকটা নেননি; ওটা রয়েছে বেয়ারা পর্বত সিং-এর হাতে। পর্বত সিং নাকি সব সময়ে মহীতোষবাবুর সঙ্গে শিকারে গেছে। বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা চেহারা, দেখলেই বোঝা যায় গায়ে অসম্ভব জোর।

আজ খানিকদূর হাঁটার পরই দূরে একপাল হরিণ দেখে মনটা নেচে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে উঠল। এই জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও হয়ত সেই মানুষখেকো বাঘটা রয়েছে। এমনিতে বাঘ নাকি শিকারের খোঁজে রোজ অক্লেশে পঁচিশ-তিরিশ মাইল হেঁটে এ বন থেকে ও বন চলে যায়। কিন্তু এ বাঘ যদি জখমী বাঘ হয়ে থাকে তাহলে হয়ত তার পক্ষে বেশি দূর হাঁটা সম্ভবই না। আর এমনিতেই জঙ্গল আর আগের মতো বড় আর ছড়ানো নেই। গত

বিশ-পঁচিশ বছরে মাইলের পর মাইল গাছ কেটে ফেলে সেখানে চাষের জমি হয়েছে, চা বাগান হয়েছে, লোকের বসতি হয়েছে। কাজেই বাঘ যে খুব দূরে চলে যাবে সে সম্ভাবনা কম। দিনের বেলা বাঘ সাধারণত বেরোয় না এটা ঠিক; কিন্তু মেঘলা দিনে নাকি বেরোন অসম্ভব না। এ ব্যাপারটা কালকেই ফেলুদা আমাকে বলেছে।

যে নালাটা আজ আমাদের পেরোতে হল সেটা কালকেও পেরিয়েছি। কাল প্রায় শুকনো ছিল, আজ কুলকুল করে জল বইছে। নালার ধারে বালি, তাতে জানোয়ারের পায়ের ছাপ। বাঘ নেই, তবে হরিণ, শুয়োর আর হাইনার পায়ের ছাপ মাধবলাল চিনিয়ে দিল। আমরা নালা পেরিয়ে, ওপারের বনের মধ্যে ঢুকলাম। একটা কাঠ-ঠোকরা মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে, দূর থেকে একটা ময়ূরের ডাক শুনতে পাচ্ছি, আর কয়েকটা ঝিঁঝি ক্রমাগত ডেকে চলেছে। পায়ের সামনে ঘাসের উপর মাঝে মাঝে সড়াৎ সড়াৎ শব্দ পাচ্ছি, আর বুঝতে পারছি যে গিরগিটির দল মানুষের পায়ের তলায় পিষে যাবার ভয়ে এক ঝোপড়া থেকে আরেক ঝোপড়ার পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

ক্রমে আমরা আমাদের চেনা জায়গায় পৌঁছে গেলাম। কাল এখানে এসেছিলাম অন্য পথ দিয়ে। এই যে সেই তলোয়ারের জায়গা। আমাদের দলপতি মাধবলাল অত্যন্ত সাবধানে শব্দ না করে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে, আর বাকি সকলে তার দেখাদেখি সেই ভাবেই চলার চেষ্টা করছি। মাটি এমনিতেই ভিজে নরম হয়ে আছে, শুকনো পাতা প্রায় নেই বললেই চলে, তাই সাতজন লোক একসঙ্গে হাঁটা সত্ত্বেও প্রায় কোনো শব্দই হচ্ছিল না।

সামনের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ইঁটের পাঁজা দেখা যাচ্ছে। কাটা ঠাকুরানীর ফাটা মন্দির।

একজনও একটাও কথা না বলে একটুও শব্দ না করে মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেলাম। সকলে থামল। সেদিন শুধু ফোকলা ফকিরের গাছ, অর্জুন গাছ আর জোড়া তাল গাছের দিকে লক্ষ্য ছিল বলে আশেপাশে যে আরো কতরকম গাছ আছে সেটা খেয়াল করিনি। সেই সব গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির করে বাতাস আসছে, আর আসছে নালার কুলকুল শব্দ। মন্দিরের পিছন দিকেই নালা। ওই নালায় জল খেতে আসে জন্তু জানোয়ার। বাঘও আসে। মানুষখেকোও।

ফেলুদা অর্জুন আর জোড়া তালের মাঝখানে গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল। মহীতোষবাবুও গেলেন পিছন পিছন। আজ গর্তে আরো বেশি জল। ফেলুদা সেদিকে আঙুল দেখিয়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে

দিয়ে প্রথম কথা বলল।

'এই গর্তে ছিল আদিত্যনারায়ণের গুপ্তধন।'

'কিন্তু...সেটা গেল কোথায়?' চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন মহীতোষবাবু।

'কাছাকাছির মধ্যেই আছে, যদি না কালকের মধ্যে কেউ সেটা সরিয়ে থাকে।'

মহীতোষবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আছে? আপনি সত্যি বলছেন আছে?'

'আপনি জানেন সে গুপ্তধন কী জিনিস?' ফেলুদা পালটা প্রশ্ন করল।

উত্তেজনায় মহীতোষবাবুর কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। বললেন, 'না জানলেও অনুমান করতে পারি। আমার পূর্বপুরুষ যশোবন্ত সিংহরায় ছিলেন কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ভূপের সেনাধ্যক্ষ। যশোবন্তের উপার্জিত টাকা—নরনারায়ণের নিজের টাঁকশালের টাকা—যার নাম ছিল নারায়ণী টাকা—সেই টাকা ছিল আমাদের বাড়িতে। এক হাজারের উপর রৌপ্যমুদ্রা, চারশো বছরের পুরোন। আদিত্যনারায়ণ যখন এ টাকা লুকিয়ে রাখেন, তখন তাঁর মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে—ষাট বছর বয়সে ছেলেমানুষী দুষ্টুবুদ্ধি খেলছে। তিনি মারা যাবার পর সে টাকা খুঁজেও আর পাওয়া যায়নি। এতদিনে এই সংকেত তার সন্ধান দিয়েছে। ও টাকা আমার চাই মিস্টার মিত্তির, ওটা হারালে চলবে না।'

ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিক থেকে ঘুরে মন্দিরের দিকে এগোচ্ছে। মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোপ্সে, বন্দুকটা ধর ত। মন্দিরের ভিতর রিভলভারই কাজ দেবে।'

আমার হাত কাঁপতে শুরু করেছে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বন্দুকটা হাতে নিলাম। জিনিসটা যে এত অসম্ভব রকম ভারি সেটা দেখে বুঝতে পারিনি।

ফেলুদা মন্দিরের ভাঙা দরজা দিয়ে অন্ধকারের ভিতর ঢুকল। চৌকাঠ পেরোনোর সময় লক্ষ্য করলাম, ও পকেটে হাত ঢোকাল।

পাঁচ গোনার মধ্যেই পর পর দু'বার রিভলভারের আওয়াজে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। তারপর মন্দিরের ভিতর থেকে ফেলুদার কথা শোনা গেল।

'মহীতোষবাবু, আপনার লোকটিকে একবার পাঠান ত।'

পর্বত সিং বন্দুকটা তার মনিবের হাতে দিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে এক মিনিটের মধ্যেই একটা সর্বাঙ্গে কাদা-মাখা পিতলের ঘড়া নিয়ে বেরিয়ে এল, তার পিছনে ফেলুদা। মহীতোষবাবু পর্বত সিং-এর দিকে ছুটে গেলেন। ফেলুদা বলল, 'কেউটের যে রৌপ্যমুদ্রার প্রতি মোহ থাকতে পারে এটা ভাবিনি। কালই শিসের শব্দ পেয়েছিলাম, আজ দেখি ঘড়াটাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে পড়ে আছেন বাবাজী।'

মহীতোষবাবু হাত থেকে বন্দুক ফেলে দিয়ে সেই ঘড়াটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার ভিতর থেকে সবে একমুঠো রুপোর টাকা বার করেছেন, এমন সময় একটা কাকর হরিণ ডেকে উঠল। আর তার ঠিক পরেই এক সঙ্গে অনেকগুলো বাঁদর আশপাশের গাছ থেকে চেঁচাতে আরম্ভ করল।

তারপরে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল যে ভাবতেও মন ধাঁধিয়ে যায়। প্রথমে মহীতোষবাবুর মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল। এক মুহূর্ত আগে যিনি এক-সঙ্গে এতগুলো রুপোর টাকা দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি হাত থেকে সেই টাকা ফেলে দিয়ে ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো করে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। আমরা সবাই যে যেখানে আছি সেখানেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছি। ফেলুদাই প্রথমে মুখ খুলল। কিন্তু তার গলার স্বর চাপা ফিসফিসে—'তোপসে, গাছে ওঠ। লালমোহনবাবু, আপনিও।'

আমার পাশেই ফোকলা ফকিরের গাছ। ফেলুদার হাতে বন্দুকটা চালান করে দিয়ে ফোকলা ফোকরে পা দিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে একটা বড় ডাল ধরে দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমি মাটি থেকে দশ হাত উপরে উঠে গেলাম। তার পরেই লালমোহনবাবু তার হাতের তলোয়ারটা আমার হাতে চালান দিয়ে একটা তাজ্জব ব্যাপার করলেন। অবিশ্যি উনি পরে বলেছিলেন যে ছেলেবেলায় আমতায় থাকতে নাকি অনেক গাছে চড়েছেন, কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সেও যে তিনি এক নিমেষে আমার চেয়ে উপরের একটা ডালে উঠে পড়তে পারবেন এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বাকি ঘটনাগুলো আমি উপর থেকেই দেখেছিলাম। লালমোহন-বাবু কিছুক্ষণ দেখে আর দেখতে পারেননি, কারণ তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন; তবে এমন আশ্চর্যভাবে তাঁর হাত-পা গাছের চওড়া

ডালের দু'দিকে ঝুলে ছিল যে তিনি মাটিতে পড়ে যাননি।

চারদিক থেকে বিশেষ বিশেষ জানোয়ার আর পাখির ডাক শুনেই বোঝা গিয়েছিল যে কাছাকাছির মধ্যে বাঘ এসে পড়েছে। অবিশ্যি বাঘ এদিকে আসার আরেকটা কারণ ছিল সেটা পরে জেনেছিলাম। মোট কথা বাঘ আসছে বুঝেই ফেলুদা আমাদের গাছে চড়তে বলেছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার করলেন মহীতোষবাবু। তার এই চেহারা যে কোনদিন দেখব সেটা ভাবিনি। অবাক হয়ে দেখলাম ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে ঘুরে দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, 'মিস্টার মিত্তির, আপনার যদি প্রাণের মায়া থাকে ত চলে যান।'

'কোথায় যাব মহীতোষবাবু?'

দু'জনের হাতেই বন্দুক। মহীতোষবাবুরটা উপর দিকে উঠছে ফেলুদার দিকে।

'বলছি যান!' আবার বললেন মহীতোষবাবু। 'জীপ রয়েছে ওই দিকে। আপনি চলে যান। আমি আদেশ করছি, আপনি—'

মহীতোষবাবুর কথা শেষ হল না। একটা বাঘের গর্জনে সমস্ত বনটা কেঁপে উঠেছে। শুনলে মনে হবে না যে একটা বাঘ, মনে হবে পঞ্চাশটা হিংস্র জানোয়ার একসঙ্গে গর্জন করে উঠেছে।

এবার গাছের উপর থেকে দেখতে পেলাম—মন্দিরের পিছনে আরো কতগুলো অর্জুন গাছের সাদা ডালের ফাঁক দিয়ে একটা গনগনে আগুনের মতো চলন্ত রং। সেটা লম্বা ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে একটা প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘের চেহারা নিল। বাঘটা এগিয়ে আসছে কালী ঠাকুরানীর ডান পাশ দিয়ে, আমাদের এই খোলা জায়গাটার দিকে।

মহীতোষবাবুর হাতের বন্দুকটা নিচে নেমে এসেছে। একে ভারি বন্দুক তার উপর ওঁর হাত থর থর করে কাঁপছে।

এদিকে ফেলুদার বন্দুকের নলটা উপর দিকে উঠছে। আরো তিনজন লোক আছে আমাদের সঙ্গে—শশাঙ্কবাবু, মাধবলাল আর পর্বত সিং। পর্বত সিং এইমাত্র একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে পালাল। অন্য দুজন কী করছে জানি না, কারণ আমার চোখ একবার বাঘ আর একবার ফেলুদার দিকে যাচ্ছে।

এখন বাঘটা মন্দিরের পাশে এসে পড়েছে।

বাঘের মুখটা ফাঁক হল। তার দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। এতগুলো শিকার এক সঙ্গে চোখের সামনে সে নিশ্চয়ই দেখেনি কখনো।

বাঘটা থেমে গেছে। তার শরীরটা একটু নীচু হল। এটা লাফ মারার আগের অবস্থা, যাকে ওত পাতা বলে। এইভাবে লাফ দিয়ে প'ড়ে বাঘ একটা মোষকেও—

দুম! দুম!

প্রায় একই সঙ্গে দুটো বন্দুক গর্জিয়ে উঠল। আমার কান ঝালাপালা। দৃষ্টিটাও যেন এক মুহূর্তের জন্য ঝাপসা হয়ে গেল।

তারই মধ্যে দেখলাম বাঘটা লাফ দিয়ে যেন শূন্যপথে একটা অদৃশ্য বাধার সামনে পড়ে উল্টো দিকে একটা ডিগবাজি খেয়ে একেবারে গুপ্তধনের কলসীটার ঠিক পাশে আছড়ে পড়ল, তার ল্যাজের ঝাপটায় কলসীটা প্রচণ্ড খটাং শব্দে ছিটকে গড়িয়ে গিয়ে তার থেকে চারশো বছরের পুরোন নারায়ণী টাকা ছড়িয়ে পড়ল।

ফেলুদা বন্দুকটা নামিয়ে নিয়েছে। মাধবলাল বলল, 'উয়ো মর গিয়া।'

'কার গুলিতে মরল বলুন ত?

প্রশ্নটা করল ফেলুদা। মহীতোষবাবুর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি মাথা হেঁট করে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে আছেন। তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বন্দুকটা এখন শশাঙ্কবাবুর হাতে।

শশাঙ্কবাবু বাঘটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'এসে দেখুন মিস্টার মিত্তির। একটা গুলি গেছে চোয়ালের তলা দিয়ে গিয়ে একেবারে মাথার খুলি ভেদ করে; আরেকটা গেছে কানের পাশ দিয়ে। দুটোর যে কোনোটাতেই বাঘটা মরে থাকতে পারে।'

জোড়া বন্দুকের গুলির আওয়াজে উত্তর দিকের গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এসেছে। তারা মহা ফুর্তিতে বাঘটাকে মন্দিরের ওপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে কাঁধে তোলার আয়োজন করছে। এটাই যে মানুষখেকো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরো দুটো গুলির চিহ্ন বাঘের গায়ে পাওয়া গেছে; একটা পিছনের পায়ে, আরেকটা চোয়ালের কাছে। এর যে কোনো একটার ফলে বাঘ তার স্বাভাবিক শিকারের ক্ষমতা হারিয়ে মানুষের পিছনে ধাওয়া করতে পারে। বাঘটার বয়সও যে বেশি সেটা তার গালের দু'পাশের ঘন লোম থেকেই বোঝা যায়।

পর্বত সিং ফিরে এসেছে। সে মহীতোষবাবুর হাত ধরে তুলে তাঁকে মন্দিরের ভাঙা সিঁড়ির উপর বসিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক এখনো ঘন ঘন ঘাম মুছছেন। লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। গাছ থেকে নামাটা তাঁর পক্ষে ওঠার মতো সহজ হয়নি, আমার সাহায্য নিতে হয়েছে। নেমে এসেই, যেন কিছু হয়নি এমন ভাব করে আমার হাত থেকে তলোয়ারটা আবার নিয়ে নিয়েছেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপের পর ফেলুদা কথা বলল।

'মহীতোষবাবু, আপনি বৃথাই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। আমি আপনার শিকারের অক্ষমতা কারুর কাছে প্রকাশ করব না সেটা আমি শশাঙ্কবাবুকে কথা দিয়েছি। আমি ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করেছি। লালমোহনবাবুর চিঠিতে আপনার সই দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি বৃদ্ধ। লিখতে গেলে যদি আপনার হাত কাঁপে, তাহলে বন্দুক ধরলে সে হাত স্থির থাকবে কী করে সে চিন্তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে, আপনার হাত খুব সম্প্রতি বিকল হয়েছে; বইয়ে যে সব শিকারের কথা লিখেছেন সে-সব আপনিই করেছেন। কিন্তু আমার মনে নতুন করে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলেন আপনার দাদা। দেবতোষবাবু অসংলগ্ন কথা বললেও, তাঁর একটা কথার সঙ্গে আরেকটা কথার সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তিনি যে আজগুবি মিথ্যে বলছেন এটা কিন্তু আমার কখনো মনে

হয়নি। তিনি যা বলছেন তার মধ্যে খুঁজলে অর্থ পাওয়া যায়, এটাই আমার মনে হয়েছিল। আপনি শিকারের বই লিখছেন সেটা নিশ্চয়ই উনি জানতেন, আর আপনি যে এত বড় একটা মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন তাতে তিনি নিশ্চয় খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। এই মিথ্যে নিয়ে আক্ষেপ আমি দু'বার তাঁর মুখে শুনেছি। সবার হাতে হাতিয়ার বাগ মানে না এটাও তিনি—'

ফেলুদার কথা বন্ধ করে মহীতোষবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—

'বাগ মেনেছিল। সাত বছর বয়সে আমি এয়ারগান দিয়ে শালিক মেরেছি, চড়ুই মেরেছি—পঞ্চাশ গজ দূরে থেকে। কিন্তু...'

মহীতোষবাবুর দৃষ্টি বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার দিকে চলে গেল। তারপর বললেন, 'একদিন চড়ুইভাতি করতে এসে ওই গাছে চড়েছিলাম—ওই ডালে—যেখানে আপনার ভাইটি উঠেছিল। দাদা বলল বাঘ আসছে, আর আমি বাঘ দেখব বলে লাফ মেরে—'

'হাত ভাঙলেন?'

'কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার', এগিয়ে এসে বললেন মহীতোষবাবুর বন্ধু শশাঙ্ক সান্যাল। 'কোনোদিনই হাড় জোড়া লাগেনি ভাল করে।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু বংশের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য শিকারী হবার শখ হল? আর নিজের দেশে নিজের জঙ্গলে মিথ্যে ধরা পড়ে যাবে বলে উড়িষ্যা আর আসামের জঙ্গলে শিকার করলেন? আপনি করলেন মানে, করলেন শশাঙ্কবাবু, কিন্তু লোকে বুঝল যে সিংহরায় পরিবারে তিন পুরুষ ধরে বাঘ শিকারের ধারা চলে আসছে। তাই না মহীতোষবাবু?'

মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শশাঙ্ক যা করেছে তার বন্ধুর জন্য, তেমন আর কেউ করে না। ওর মতো শিকারী আমাদের পরিবারেও কেউ জন্মায়নি।'

'কিন্তু সম্প্রতি সেই বন্ধুত্বে কি একটু চিড় ধরেছিল?'

মহীতোষবাবু আর শশাঙ্কবাবু দুজনেই চুপ করে আছেন দেখে ফেলুদা বলে চলল, 'বই বেরোবার আগে আমি অন্তত মহীতোষ সিংহরায়ের নাম শুনিনি। কিন্তু বেরোবার পরে আজ হাজার হাজার লোকে তাঁর নাম শুনেছে, এবং একটা বিরাট মিথ্যেকে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছে। আসল শিকারী কিন্তু তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেটা কি তিনি খুব সহজেই মেনে নিতে পারছেন? বন্ধুত্বের খাতিরে কতটা আত্মত্যাগ সম্ভব? আপনি সেদিন রাত্রে শশাঙ্কবাবুকেই কথা শোনাচ্ছিলেন না? আমি কি অনুমান করতে পারি যে,

বেশ কিছুদিন থেকেই শশাঙ্কবাবু আর আপনার মধ্যে একটা মনোমালিন্য ও কথা কাটাকাটি চলছে?'

এখনো দুজনে চুপ। ফেলুদা স্থিরদৃষ্টিতে মহীতোষবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ বলেই ধরে নিচ্ছি। আর, আরেকটা ব্যাপারেও আপনার বোধহয় মৌন অবলম্বন ছাড়া রাস্তা নেই।'

মহীতোষবাবু ভয়ে ভয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা বলল, 'তড়িৎবাবুর সাহিত্যকীর্তির জন্যই যে আপনি প্রশংসা পাচ্ছেন, সেটাও বোধহয় সত্যি। তাই নয়, মহীতোষবাবু? আপনি সেদিন আপনার পাণ্ডুলিপির কথা বললেন, কিন্তু আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আপনার লেখা একটি টুকরো কাগজও কোথাও পেলাম না। আসলে আপনি লিখতেন না, আপনি মুখে মুখে আপনার মতো করে বলতেন, আর তড়িৎবাবু সেটাকে তাঁর আশ্চর্য সাবলীল ভাষায় সাজিয়ে দিতেন আর সেই সাজানো লেখা প্রকাশিত হত আপনার নামে। তড়িৎবাবুকে আপনি ভাল মাইনে দিতেন, তাকে আরামে রেখেছিলেন, তোয়াজে রেখেছিলেন এ সবই ঠিক। কিন্তু একজন সত্যিকারের গুণী স্রষ্টার পক্ষে ওগুলো যথেষ্ট নয় মহীতোষবাবু। সে সবচেয়ে বেশি যেটা আশা করে সেটা হল তার গুণের আদর—যেটা না পেয়ে তড়িৎবাবুর মন ক্রমে ভেঙে যায়। তারপর সংকেতটা হাতে পড়ে, আর তার সমাধানও হয়ে যায়। নারায়ণীমুদ্রার কথাটা হয়ত তিনি আপনার পারিবারিক কাগজের মধ্যে পেয়েছিলেন। মোট কথা তিনি স্থির করেন যে, গুপ্তধন নিয়ে আপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হল না।'

মহীতোষবাবু যেন বেশ কষ্ট করেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সবই ত বুঝলাম মিস্টার মিত্তির, এর সবই ঠিক এবং কোনোটাই আমার শুনতে ভালো লাগছে না। কিন্তু তড়িৎকে এভাবে হত্যা করল কে? তার না হয় আমার উপর আক্রোশ ছিল, কিন্তু তার উপর কারো আক্রোশ ছিল বলে ত আমি জানি না তড়িৎ ছাড়া আর কে এসেছিল সেদিন জঙ্গলে?'

'কে এসেছিল তা বোধহয় আমি বলতে পারি।'

মহীতোষবাবু পায়চারি আরম্ভ করেছিলেন, ফেলুদার কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'পারেন?'

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেল।

'শশাঙ্কবাবু, আপনি সেদিন রাত্রে ট্রোফি রুম থেকে একটি উইনচেস্টার রাইফেল নিয়ে এই জঙ্গলে আসেননি? কাল রাত্রে ওটার বাঁটে সামান্য একটু মাটি লেগে রয়েছে দেখলাম, যেটা পরশু রাত্রে দেখিনি।'

শশাঙ্কবাবুর নার্ভ বোধহয় বাঘ শিকার করেই আশ্চর্যরকম শক্ত হয়ে গিয়েছিল। উনি অদ্ভুত ঠাণ্ডাভাবে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'যদি এসেই থাকি—আপনি তার কী মানে করতে চাইছেন সেটা বলবেন কি?'

ফেলুদাও ঠিক শশাঙ্কবাবুর মতোই শান্তভাবে বলল, 'বন্ধু সম্পর্কে আপনার হতাশা জাগলেও আপনি তার গুপ্তধনের ওপর লোভ করবেন সেটা আমি মোটেই ভাবছি না। তবে আমার ধারণা, তড়িৎবাবু যে সংকেতের সমাধান করে ফেলেছেন সেটা আপনি জানতেন, তাই না?'

শশাঙ্কবাবু বললেন, 'শুধু তাই না, তড়িৎ গুপ্তধন পেলে তার অর্ধেক আমাকে অফার করেছিল। তড়িৎ বুঝেছিল মহীতোষ আমাদের দুজনকেই একইভাবে বঞ্চিত করছে। কিন্তু আমি তড়িতের প্রস্তাবে রাজী হইনি। শুধু তাই নয়, আমি গুপ্তধনের সন্ধানে এখানে আসতে অনেকবার বারণ করেছিলাম। কারণ ওই ম্যানইটার। শেষটায় সেদিন রাত্রে জানালা দিয়ে ওর টর্চের আলো দেখে আমি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এখানে এসে দেখি গুপ্তধন পড়ে আছে, কিন্তু তড়িৎ নেই। তারপর অনুসন্ধান করে দেখলাম রক্তের দাগ, বাঘের পায়ের ছাপ। গুপ্তধন মন্দিরের ভিতর রেখে, সেই চিহ্ন ধরে আমি এগিয়ে যাই বাঁশবনের কাছাকাছি পর্যন্ত। বিদ্যুতের আলোতে দেখি বাঘ তড়িতের মৃতদেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অন্ধকারে আন্দাজে গুলি চালাই। বাঘ পালায়। তারপর...'

শশাঙ্কবাবু কেন জানি চুপ করে গেলেন। ফেলুদা বলল, 'বাকিটা আমি বলি? এটাও অনুমান। ভুল হলে আমাকে শুধরে দেবেন।'

'বেশ। বলুন।'

'আপনিই কাল রাত্রে মাধবলালের সঙ্গে কথা বলছিলেন না?'

শশাঙ্কবাবু অস্বীকার করলেন না। ফেলুদা এবার আর একটা প্রশ্ন করল।

'সেটা কি মন্দিরের পিছনে বাঘের জন্য টোপ ফেলার প্রস্তাব দিতে? ওই শিমুল গাছটার মগডালে শকুনির পাল দেখে মনে হচ্ছে ওর কাছাকাছি একটা মরা জানোয়ার পড়ে আছে।'

'মোষের বাচ্চা,' চাপা গলায় বললেন শশাঙ্কবাবু।

'তার মানে আপনি চাইছিলেন যে আজ বাঘ বেরোক, যাতে আপনি অন্তত একজন বাইরের লোকের সামনে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে শিকারী আসলে হচ্ছেন আপনি, মহীতোষবাবু নন।'

মহীতোষবাবু হঠাৎ ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন, 'মিস্টার মিত্তির, আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব, আপনাকে সেটা রাখতে হবে।'

'কী অনুরোধ?'

'এই গুপ্তধনের কিছু অংশ আমি আপনাকে দিতে চাই। সেটা আপনাকে নিতে হবে।'

ফেলুদা মহীতোষবাবুর চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বলল, 'রৌপ্যমুদ্রা আমি চাই না মিস্টার সিংহরায়। কিন্তু একটা জিনিস আমি নেবো।'

'কী জিনিস?'

'আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার।'

লালমোহনবাবু কথাটা শোনা মাত্র এগিয়ে এসে ফেলুদার হাতে তলোয়ারটা দিয়ে দিল।

'এই তলোয়ার আপনি চাইছেন?' মহীতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন। 'নারায়ণী রৌপ্যমুদ্রা না নিয়ে ইস্পাতের তলোয়ার নেবেন?'

'এ তলোয়ারকে আর সাধারণ তলোয়ার বলা চলে না মহীতোষবাবু। এর সঙ্গে ইতিহাস ছাড়াও আরো কিছু জড়িত হয়ে পড়েছে।'

'আপনি তড়িতের খুনের কথা বলছেন?'

'না।'

'তবে?'

'খুনের কথা বলছি না, কারণ তড়িৎবাবু খুন হননি।'

'তবে? আত্মহত্যা?'

'তাও না।'

'আপনি কি হেঁয়ালি তৈরি করছেন মিস্টার মিত্তির?' মহীতোষবাবুর গলার স্বরে বুঝলাম, তার ভিতরের কঠিন মানুষটা আবার বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ফেলুদা বলল, 'না, তা করছি না, মহীতোষবাবু। যা ঘটেছিল সেটাই বলতে যাচ্ছি। সেটা এত স্পষ্ট বলেই আমাদের দৃষ্টি সেদিকে যাচ্ছিল না। তলোয়ারটা তড়িৎবাবু নিজেই আদিত্যনারায়ণের ঘর থেকে সরিয়েছিলেন।'

'সে কি, কেন?'

'কারণ গুপ্তধন পেতে হলে তাকে মাটি খুঁড়তে হবে, আর তার জন্য শাবল জাতীয় একটা কিছুর দরকার। তড়িৎবাবুর হাতের সবচেয়ে কাছে ছিল এই তলোয়ারটা।'

'তারপর?'

'তারপর কী—সেটা বলার আগে এই তলোয়ারের একটা বিশেষত্ব আমি আপনাদের দেখাতে চাই।'

এই বলে ফেলুদা তলোয়ারটা নিয়ে কেন জানি শশাঙ্কবাবুর দিকে এগিয়ে গেল। শশাঙ্কবাবু সাহসী হলেও ফেলুদাকে ওইভাবে অস্ত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে একটু যেন উসখুস করে উঠলেন। এবার ফেলুদা এক আশ্চর্য খেল দেখাল। সে তলোয়ারটা শশাঙ্কবাবুর হাতের বন্দুকের নলের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেল, আর খুব কাছাকাছি আসতেই একটা খটাং শব্দ করে ইস্পাতে ইস্পাতে জোড়া লেগে গেল।

'একি, এ যে চুম্বক!' বলে উঠলেন শশাঙ্কবাবু।

'হ্যাঁ, চুম্বক', বলল ফেলুদা। 'তলোয়ারটাই চুম্বক, বন্দুকটা না। আগে চুম্বক ছিল না, কারণ আদিত্যনারায়ণের আলমারিতে তলোয়ারের পাশেই আরো ছোটখাটো অনেক লোহা আর ইস্পাতের জিনিস ছিল। চুম্বক হলে তলোয়ার বার করা বা রাখার সময় সেগুলো এর গায়ে আটকে যেত নিশ্চয়ই, কিন্তু যায়নি। এ তলোয়ার চুম্বকে পরিণত হয়েছে পরশু রাত্রে।'

'কী করে?' জিগ্যেস করলেন মহীতোষবাবু। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে ফেলুদার কথা শুনছে।

ফেলুদা বলল, 'কোনো মানুষের হাতে লোহা বা ইস্পাতের কোনো জিনিস থাকা অবস্থায় যদি তার উপর বাজ পড়ে, তাহলে সে জিনিস চুম্বকে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, সে জিনিস অনেক সময় বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে। তড়িৎবাবুর মৃত্যু হয়েছিল বজ্রাঘাতে, এবং হয়ত এই তলোয়ারই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। মাটি খুঁড়ে কলসী বার করার পর বৃষ্টি নামে, তার সঙ্গে বাজ ও বিদ্যুৎ। তড়িৎবাবু অশ্বত্থগাছের নিচে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসেন। বাজ পড়ে। তড়িৎবাবু ছিটকে পড়ার সময় তার হাতের তলোয়ার বুকে বিঁধে যায়। সম্ভবত মৃত্যুর পরমুহূর্তেই তলোয়ার তার দেহে প্রবেশ করে।'

মহীতোষবাবুর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। তাঁর দৃষ্টি অশ্বত্থ গাছটার দিকে গেল। ভাঙা ভাঙা অস্ফুট স্বরে বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, এই গাছটা হঠাৎ এত বুড়ো হয়ে গেল কী করে!'

মহীতোষবাবুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, 'তড়িৎবাবু শেষটায় তড়িৎপৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন।'

দুঃখের বিষয় ওঁর এই চমৎকার কথাটায় কান দেবার মতো মনের অবস্থা তখন কারুরই ছিল না।

• • •

আমরা আজ কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। আজ বাইরে রোদ, দু'দিন বৃষ্টি হওয়ার দরুন গরমও কম। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরে বসে আছি. মাঝে মাঝে বাইরে থেকে দেবতোষবাবুর গলা পাচ্ছি। সকালে উঠেই দেখেছি ওঁর ঘরের দরজায় আর তালা নেই। গাছ থেকে নামার সময় লালমোহনবাবুর হাঁটু ছড়ে গিয়েছিল। ক্ষতের উপর উনি স্টিকিং প্লাস্টার লাগাচ্ছেন, এমন সময় মহীতোষবাবুর চাকর একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক মাথায় করে ঘরে ঢুকে সেটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, মহীতোষবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফেলুদা সেটা খুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে খুব সবধানে প্যাক করা রয়েছে একটা চমৎকার বাঘছাল। একটা খামও ছিল ট্রাঙ্কটার মধ্যে, তার ভিতরে তিন লাইনের একটা চিঠি—

'ডিয়ার মিস্টার মিত্তির, আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই বাঘছালটি গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ১৯৫৭ সালে সম্বলপুরের নিকটবর্তী এক জঙ্গলে আমার বন্ধু শ্রীশশাঙ্কমোহন সান্যাল কর্তৃক এই বাঘটি নিহত হইয়াছিল।'

লালমোহনবাবু চিঠিটা পড়ে বললেন, 'দু'জনের গুলিতে যেটা মরল, সেটা কি দু'ভাগে ভাগ করা হবে?'

ফেলুদা বলল, 'না। ওটা শশাঙ্কবাবু আমাকেই দেবেন বলেছেন।'

'ও, তার মানে আপনি একাই...'

'না, একা না। দুটোর একটা আপনাকে উপহার দেবো বলে স্থির করেছি।'

'উপহার?'

'উপহার। গাছের ডালে উঠে অজ্ঞান হয়েও যে মাটিতে না পড়ে ঝুলে থাকা যায়, সেইটে সর্বপ্রথম আপনিই প্রমাণ করেছেন।'

লালমোহনবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

'আরে মশাই, আমি ত বলেইছি আমার কল্পনাশক্তিটা সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি। আপনারা বলছেন বাঘ, আর আমি দেখছি একটা লেলিহান অগ্নিশিখা, আর তার মধ্যে একটা পৈশাচিক দানব দাঁত খিঁচুচ্ছে, আর সেই সঙ্গে কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা এক হুঙ্কার

ছেড়ে একটা জেট প্লেন টেক অফ্ করছে আমারই উপর ল্যান্ড করবে বলে। এতেও যদি সংজ্ঞা না হারাই ত সংজ্ঞা জিনিসটা রয়েছে কী করতে?'

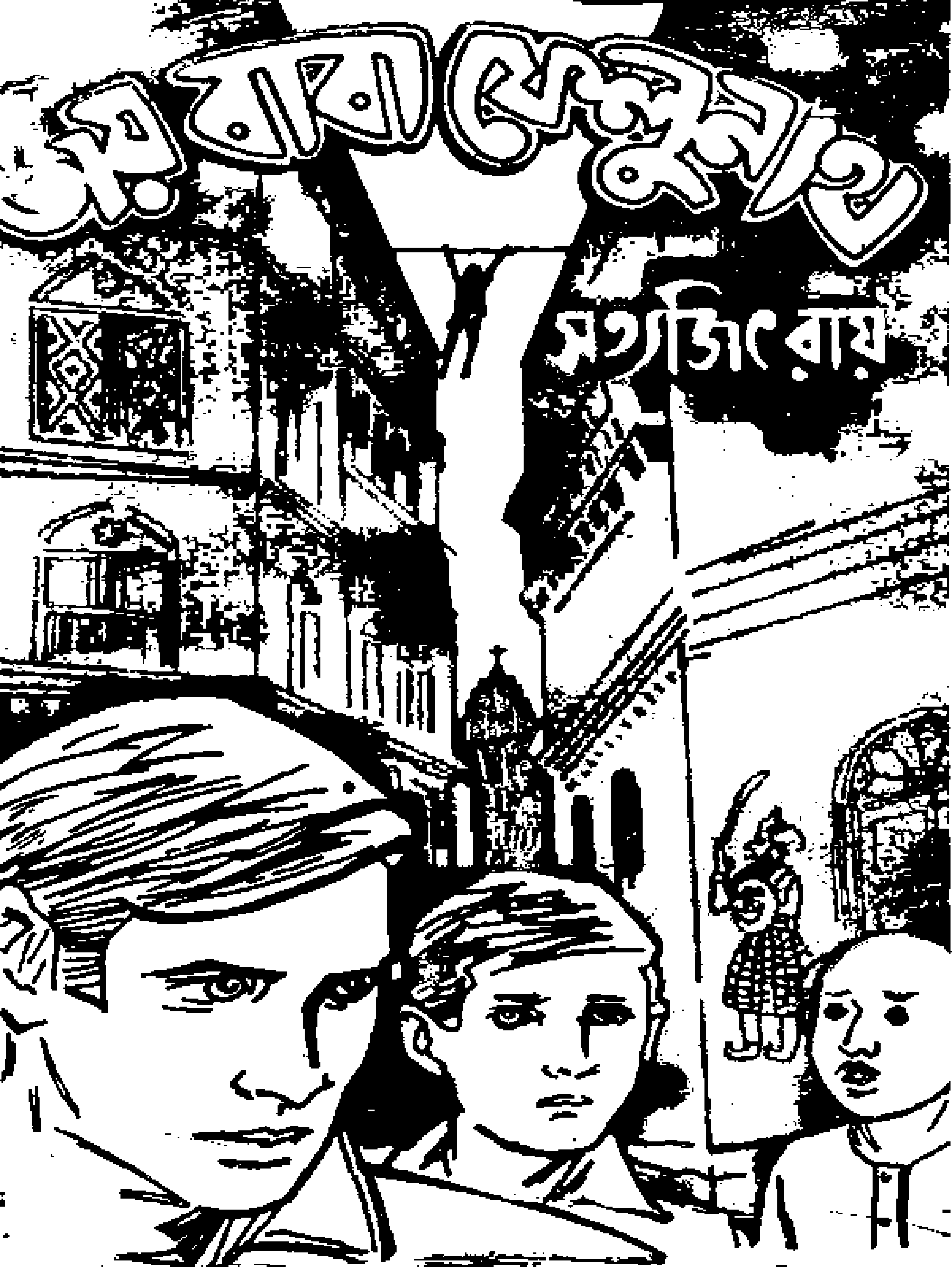
সত্যজিৎ রায়

এক

রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু প্লেট থেকে একটা চীনাবাদাম তুলে নিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে সেটার উপর একটা হালকা হুঁশিয়ার চাপ দিতেই ব্রাউন খোলসের মধ্যে থেকে মসৃণ ফরসা বাদামটা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে তাঁর বাঁ হাতের তেলোর উপর পড়ল। সেটা মুখে পুরে খোসাটা সামনের টেবিলে রাখা অ্যাশ-ট্রেতে ফেলে দিয়ে হাত ঝেড়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'দশাশ্বমেধ ঘাটে বিজয়া দশমী দেখেছেন কখনো?'

ফেলুদার সামনে দাবার বোর্ড, তার উপরে একটা সাদা রাজা, একটা সাদা গজ আর একটা সাদা ঘোড়ে, আর একটা কালো রাজা আর দুটো কালো ঘোড়া। বোর্ডের পাশে গ্রেট গেম্‌স অফ চেস বলে একটা বই খোলা; ফেলুদা তার মধ্যে থেকে একটা চ্যাম্পিয়নশিপ গেম বেছে নিয়ে তার চালগুলো বই দেখে দেখে চালছিল। খেলার প্রায় মাঝামাঝি লালমোহনবাবু এসে পড়েন। আজকাল আর ওঁর সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম ভদ্রতা না করলেও চলে, তাই ফেলুদা শ্রীনাথকে চা আনতে বলে খেলাটা শেষ করে নিচ্ছিল, আর চালের ফাঁকে ফাঁকে লালমোহনবাবুর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। এ-প্রশ্নটার জবাবেও সে বই থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'উঁহু।'

'ওঃ—সে যা ব্যাপার না! সে এক, যাকে বলে, জমজমাট ব্যাপার। সে দৃশ্য আপনি না দেখলে ইম্যাজিন করতে পারবেন না।'

ফেলুদা খেলার শেষ চালটা চেলে বোর্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি কি আমায় লোভ দেখাবার চেষ্টা করছেন?'

'তা কতকটা ঠিকই ধরেছেন, হেঃ হেঃ!'

'কিন্তু আপনি যে-ভাবে বর্ণনা করলেন তাতে আপনার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।'

'কেন?'—লালমোহনবাবুর ভুরু দুটো নাকের উপর জুড়ে গিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট হয়ে গেল।

ফেলুদা বোর্ড ভাঁজ করে ঘুঁটিগুলো বাক্সে ভরতে ভরতে বলল, 'কারণ কোনো ঘটনা বা দৃশ্য সম্পর্কে কেবলমাত্র জমজমাট বিশেষণটা ব্যবহার করলে

আসলে কিছুই বলা হয় না। ওতে চোখের সামনে কোনো ছবি ফুটে ওঠে না, ফলে দশাশ্বমেধে বিজয়া-দশমীর বিশেষত্বটা কিছুই বোঝা যায় না, আর তার ফলে ফেলু মিত্তিরের মনে কোনো সাড়া জাগে না। আপনি উপন্যাস লেখেন, আপনার বর্ণনা এত সাদামাটা হবে কেন?'

'ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন,' লালমোহনবাবু জিভ কেটে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন। 'আসলে প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল ত, তাই ডিটেলগুলো সব মাথার মধ্যে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। তবে দশাশ্বমেধে ভাসান দেখে চোখ-কান ধাঁধিয়ে গেসল এটা বেশ মনে আছে।'

'ওইত—চোখ এবং কান। বর্ণনায় ওই দুটোর জন্য খোরাক চাই, সম্ভব হলে নাকও।'

'নাক!'—লালমোহনবাবুর ভুরু দুটো উপর দিকে উঠে এক জোড়া সিলেন হয়ে গেল।

'সম্ভব হলে।...কলকাতার রাস্তাঘাটে এমনিতে কোনো যে বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায় তা না। লেক মার্কেটের কাছে বিকেলের দিকটা বেলফুলের গন্ধ, বা নিউ মার্কেটের পশ্চিম দিকে বার্ট্রাম স্ট্রীটের কোনো বিশেষ অংশে শুঁটকি মাছের গন্ধ, হাসপাতালের কাছে ডিসইনফেক্ট্যান্টের গন্ধ, শ্মশানের কাছে মড়া পোড়ার গন্ধ—এই সবই নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবেন। তেমনি কাশীর বর্ণনাতেও কিছু কিছু গন্ধের উল্লেখ না করলে কি চলে? বিশ্বনাথের গলিতে ধূপ ধুনো গোবর শুকনো ফুল আর মানুষের ঘাম মেশানো গন্ধ, আবার গলি ছেড়ে বাইরে এসে বড় রাস্তা দিয়ে ঘাটের দিকে হাঁটার সময় কিছুক্ষণ প্রায় একটা নিউট্রাল গন্ধহীন অবস্থা, আবার ঘাটের সিঁড়ি যেই শুরু হল অমনি ধাপে ধাপে একটা উগ্র গন্ধ ক্রমে বেড়ে গিয়ে প্রায় পেটের ভাত উলটে আসার অবস্থা। সেটা যে ওই খোকাপাঁঠাগুলোর গা থেকে বেরোচ্ছে সেটা যে না জানে তার বুঝতে কিছুটা সময় লাগবে। তারপর ছাগলগুলোকে পিছনে ফেলে একটু এগোলেই পাবেন একটা গন্ধ যাতে জল মাটি তেল ঘি ফুল চন্দন ধূপ ধুনো সব একসঙ্গে মিশে রয়েছে।'

'তার মানে আপনি বেনারস গেছেন', মন্তব্য করলেন জটায়ু।

'গেছি। তখন কলেজের ছাত্র। হিন্দু ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গেসলাম।'

লালমোহনবাবু পকেট হাতড়াচ্ছেন দেখে ফেলুদা বলল, 'আপনি যে কাগজের কাটিংটা খুঁজছেন, সেটা আপনি ঘরে ঢোকার আধ মিনিটের মধ্যে আপনার পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে এখন ওই টেলিফোনের টেবিলের পায়ায় লটকে আছে।'

'এঃ হে—রুমালটা বার করার সময়...'

লালমোহনবাবু ওঠার আগেই আমি কাগজটা তুলে ওঁর হাতে এনে দিলাম। ফেলুদা বলল, ওটা সেই কলকের খবরটা ত? কাশীর সেই সাধুবাবার ব্যাপার?'

লালমোহনবাবু ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আপনি জানেন, তবু এতক্ষণ কিছু বলেননি? কী রহস্যজনক ব্যাপার বলুন ত।'

আমি লালমোহনবাবুর হাত থেকে কাটিং-টা নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

বারাণসীর মছলি-বাবা

বারাণসীতে গত বৃহস্পতিবার এক সাধুবাবার আবির্ভাব শহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে বলে জানা গেল। অভয়চরণ চক্রবর্তী নামক বাঙালীটোলার জনৈক প্রবীণ বাসিন্দা কেদার ঘাটে প্রথম সাধুবাবার সাক্ষাৎ পান, এবং অচিরেই তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পান। সাধুবাবা আপাতত শ্রীচক্রবর্তীর গৃহেই অবস্থান করছেন। ভক্তগণের নিকট ইনি মছলি-বাবা নামে পরিচিত। তাঁরা বলেন, বাবাজী নাকি প্রয়াগ থেকে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান অবস্থায় বারাণসীতে এসে পৌঁছেছেন।

এ-ধরনের সাধুবাবার কথা আজকাল এত শোনা যায় যে আমার কাছে খবরটা তেমন একটা কিছু বলে মনে হল না। কিন্তু লালমোহনবাবু দেখলাম ভয়ঙ্করভাবে মেতে উঠেছেন। বললেন, 'হয়ত সেই একেবারে তিব্বতে গঙ্গার সোর্স থেকে ভাসা শুরু করেছেন। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।'

'গঙ্গার সোর্স তিব্বতে এ খবর কে দিল আপনাকে?'

'ও হো হো, সরি—ওটা বোধ হয় ব্রহ্মপুত্র। যাই হোক্—তিব্বত না হোক হিমালয় ত! তাই বা কম কিসে?'

'আপনার কি তাকে দর্শন করার ইচ্ছে জেগেছে?'

'যেমন-তেমন সাধু হলে হত না, কিন্তু এর মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন না আপনি? মছলি-বাবা—নামটাই ত ইউনিক।'

ফেলুদা তক্তপোষ থেকে উঠে পড়ল।

'নামটা মন্দ হয়নি সেটা স্বীকার করছি। খবর পড়ে ওই একটি জিনিসই মনে দাগ কাটে, আর কিছু নয়। কাশী যদি যেতেই হয় ত মছলি-বাবার জন্য নয়। কচৌরি গলির হনুমান হালুইকরের রাবড়ির স্বাদ এখনো মুখে লেগে রয়েছে। ও জিনিসটা ত কলকাতার বাজার থেকে উঠেই গেছে।'

'আর ধরুন যদি গিয়ে দেখেন যে হালুইকরকে কোনো অজ্ঞাত আততায়ী খুন করে গেছে—তার রাবড়ির রসে রক্তের ছিটে পড়ে রস গোলাপী হয়ে

গেছে—তাহলে ত কথাই নেই। কাশীও হল, কেসও হল, ক্যাশও হল—হ্যাঃ হ্যাঃ। এক ঢিলে তিন পাখি। আপনি ত বেশ কিছুদিন বসে, তাই না?'

কথাটা ঠিকই। মাস তিনেক হল ফেলুদার হাতে কোনো কাজ নেই। অবিশ্যি তার একটা কারণ আছে, আর সেটা আমি এর আগেও বলেছি। ফেলুদা বলে একটা ক্রাইমের পিছনে যদি কোনো তীক্ষ্ণবুদ্ধি ক্রিমিনালের কারসাজির ছাপ না থাকে, তাহলে সে-ক্রাইমের কিনারা করতে বিশেষ মাথা-খাটানোর প্রয়োজন হয় না, আর মাথা না খাটাতে পারলে ফেলুদার তৃপ্তি হয় না। কাজেই কেস মামুলি বুঝতে পারলে সে বেশির ভাগ সময়ই মক্কেলকে ফিরিয়ে দেয়।

এক কথায় ফেলুদা চায় তার তীক্ষ্ণবুদ্ধিটাকে শানিয়ে নেবার সুযোগ। সে সুযোগ গত তিন মাসের মধ্যে আসেনি। এই অবসরে অবিশ্যি ফেলুদা অজস্র বই পড়েছে, নিয়মিত যোগব্যায়াম করেছে, সিগারেট খাওয়া কমিয়েছে, দাবা খেলেছে, দুবার চুল ছাঁটিয়েছে, দুটো বাংলা, একটা হিন্দী আর পাঁচটা বিদেশী ছবি দেখেছে, একদিন আমাকে সঙ্গে করে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ি অবধি হেঁটে এসেছে এক ঘন্টা সাতাশ মিনিটে। এর মধ্যে একবার দাড়ি গোঁফ রাখবে বলে সাতদিন শেভিং বন্ধ করে আট দিনের দিন আয়নায় নিজের চেহারা দেখে মত পালটিয়ে আবার পুরোন চেহারায় ফিরে গেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনার কেস নেই, আর আমার মাথায় গপ্পের প্লট নেই। এই প্রথম পুজোয় আমার বই বেরোল না, জানেন ত? আগে ত এ-বই, সে-বই থেকে এটা ওটা খামচে নিয়ে তার উপর কিছুটা রং চড়িয়ে যা হোক একটা কিছু খাড়া করে দিতাম; আপনার হাতে বার বার ধরা পড়ে চুরি বিদ্যে ত নো লংগার বড় বিদ্যে, তাই এখন নিজেরই মাথা খাটাতে হয়। ভাবছিলুম কলকাতার এই বদ্ধ আবহাওয়া থেকে বেরোতে পারলে বোধ হয় ব্রেনটা কিছুটা খুলত।'

'যেতে পারি, তবে একটা রিস্ক আছে।'

'কী রিস্ক?'

'গিয়ে-টিয়ে শেষটায় আমিও কেস পেলাম না, আপনিও প্লট পেলেন না।'

বেনারস গিয়ে লালমোহনবাবু গল্পের প্লট পেয়েছিলেন ঠিকই; তবে ফিরে আসার দুমাস পরে বড়দিনে তাঁর যে রহস্য উপন্যাসটা বেরোল, সেটার সঙ্গে টিনটিনের একটা গল্পের আশ্চর্য মিল।

ফেলুদার কিন্তু গিয়ে সত্যিই লাভ হয়েছিল। তা না হলে অবিশ্যি এ বইটাই লেখা হত না। ফেলুদার জীবনে সবচেয়ে ধুরন্ধর ও সাংঘাতিক

প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তাকে এই বেনারসেই লড়তে হয়েছিল। ও পরে বলেছিল— 'এই রকম একজন লোকের জন্যই অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করছিলাম রে তোপ্‌সে। এসব লোকের সঙ্গে লড়ে জিততে পারলে সেটা বেশ একটা টনিকের কাজ দেয়।'

দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তার উপর পঞ্চাশ বছরের পুরোন বাংগালী হোটেল ক্যালকাটা লজ। হোটেলের ম্যানেজার নিরঞ্জন চক্রবর্তী লালমোহনবাবুর গড়পারের প্রতিবেশী পুলক চ্যাটার্জির ভায়রা ভাই। পুলকবাবু আগে থেকে আমরা আসছি বলে জানিয়ে দেওয়াতে হোটেলে জায়গা পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। অমৃতসর মেলে আমরা বেনারস পেঁছিলাম সকাল সাড়ে নটায়। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে আসতে আসতে হয়ে গেল দশটা।

ম্যানেজার মশাই নিজে তখন হোটেলে নেই, কিন্তু তার জায়গায় যিনি ছিলেন তিনিই, চাকর হরকিষণের হাতে আমাদের জিনিসপত্র উপরে পাঠিয়ে খাতায় আমাদের নাম-ধাম লিখিয়ে সই করিয়ে নিলেন।

দোতলায় গিয়ে দেখি ঘরে চারটে খাট। তার একটার নিচে একটা মাঝারি সুটকেশ, আর যেমন-তেমনভাবে গুটিয়ে রাখা একটা হোল্ড-অল। এ ছাড়া খাটের পাশে তাকে আর আলনায় কিছু জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় ইত্যাদি রয়েছে। ফেলুদা সেগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে চাপা গলায় বলল, 'নাসিকা গর্জনে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না ত?'

'কেন? কই, আপনার ত নাক ডাকে না।'

'আমার না; আমি আমাদের রুম-মেটের কথা বলছি।'

'সেকি মশাই, আপনি লোকটার ওই ক'টা জিনিসপত্র দেখেই—'

'সঠিক বলে বলছি না; এটা অনুমান-মাত্র। সাধারণত মোটা লোকেরাই নাক ডাকায় বেশি, আর ইনি যে শীর্ণকায় নন সেটাও এঁর সার্ট আর প্যান্টের বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার উপরে ফেনসের শিশি থেকে অনুমান করা যায় যে এঁর মাঝে মাঝে নাক বন্ধ হয়ে যায়। সেখানেও নাক ডাকার একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।'

'সর্বনাশ!—আরো কিছু বুঝলেন নাকি?'

'তাকের উপর প্রসাধনের জিনিসের মধ্যে শেভিং-এর সরঞ্জামের অভাবটা অর্থপূর্ণ নয় কি? অবিশ্যি যদি ইনি মাকুন্দ হয়ে থাকেন তাহলে আলাদা কথা, না হলে বয়ব দাড়ি-গোঁফ অবশ্যম্ভাবী।'

হরকিষণের আনা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তিনজন ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। যে-রাস্তার উপরে বারান্দা, সেটাই পুব দিকে চলে গেছে সোজা দশাশ্বমেধ ঘাটে। রাস্তার দুদিকে সারি সারি দোকানে হিন্দি

আর ইংরাজিতে লেখা সাইনবোর্ড। ফেলুদা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোপ্‌সে, তোকে যদি বলা যায় কলকাতার পাট উঠিয়ে এখানে এসে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে—পারবি?'

একটু ভেবে বললাম, 'বোধহয় না।'

'কিন্তু এখানে এসেছিস মনে করেই মনটা নেচে উঠছে—তাই নয় কি?'

সত্যিই তাই। কাশীতে সারাজীবন থাকতে ভালো লাগবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু যখনই ভাবছি আট-দশ দিনের বেশি থাকবার দরকার নেই তখনই মন বলছে বেনারসের মতো জায়গা হয় না।

'তার কারণটা কী জানিস?'—ফেলুদা বলল—'তুই যে নিচের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা রাস্তা দেখছিস তা ত নয়; তুই দেখছিস বেনারসের রাস্তা। বেনারস! কাশী! বারাণসী!—চাট্টিখানি কথা নয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর, পুণ্যতীর্থ, পীঠস্থান! রামায়ণ মহাভারত মুনিঋষি যোগী সাধক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন সব মিলে এই বেনারসের একটা ভেলকি আছে যার ফলে শহরটা নোংরা হয়েও ঐতিহ্যে ঝলমল করতে থাকে। যারা এখানে বসবাস করে তারা দিন গুজরানোর চিন্তায় আর এসব কথা ভাববার সময় পায় না, কিন্তু যারা কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে আসে তারা এইসব ভেবেই মশগুল হয়ে থাকে।'

লালমোহনবাবু এই ফাঁকে কখন জানি ভিতরে চলে গিয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি তিনি সঙ্গে একজন অচেনা লোককে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। বছর পঞ্চাশেক বয়স, মাঝারি রঙ, মাথার কাঁচাপাকা চুল মাঝখানে সিঁথি করে পিছন দিকে টান করে আঁচড়ানো। চোখা নাকের নিচে পাতলা পান-খাওয়া ঠোঁট অল্প হাসিতে ফাঁক হয়ে আছে। ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন, 'আপনার পরিচয় পেলুম এনার কাছ থেকে। আমার হোটেলের সম্মান বাড়ল, হেঃ হেঃ।'

বুঝলাম ইনিই হলেন ম্যানেজার নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

'কোনো অসুবিধা-টসুবিধা—?'

'না না—দিব্যি ব্যবস্থা।'

'আসুন, নিচে আসুন আমার ঘরে। আপনাদের চা দিয়েছে? শুধু চা? আঃ—ছি ছি!'

দেয়ালে তিনটে ইংরিজি আর দুটো বাংলা ক্যালেন্ডার, আর রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বোস বিবেকানন্দ আর শ্রীঅরবিন্দর ছবি টাঙানো। ম্যানেজারের ঘরে বসে আমরা আরেক কাপ চা আর হালুয়া সোহন খেলাম। এ ঘরটা বাড়ির ভিতরের দিকে, তাই সাইকেল রিকশার হর্ন ছাড়া রাস্তার আর কোনো শব্দই আসে না।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, 'আমার হোটেলে গত মার্চ মাসে শ্রীমতী গুণময় বাগচী থেকে গেছেন—ওই আপনাদের তিন নম্বর ঘরটাতেই। ওঃ—কী মাস্ল মশাই! আপিস পাঞ্জাবি প'রে গোধুলিয়ার মোড়ে পান কিনতে গেছে, আর তিন মিনিটে রাস্তায় ভীড় জমে গেছে। হাত ভাঁজ করে পান মুখে পুরছে আর তাতেই বাইসেপ ঠেলে বেরুচ্ছে।...আপনি কিন্তু যাবার আগে আমাদের অ্যালবামে দু লাইন লিখে দিয়ে যাবেন। অনেক গুণী লোকের লেখা রয়েছে ওতে। তবে মাগ্গির বাজার, বোঝেন ত—মনের মতো মেনু দিতে পারব না আপনাদের, এই যা দুঃখ।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি শুধু আমার লেখা চাইছেন কেন—ইনিও কিন্তু খ্যাতিতে কম যান না।'

লালমোহনবাবু বিনয় করার ভাব করে কী একটা বলতে গিয়েও বললেন না। নিরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, 'ওঁর কথা আমার ভায়রা ভাই আগেই জানিয়েছিল। আপনার আসাটা সারপ্রাইজ কিনা, তাই বলছি আর কি।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন, এবার আর থাকতে না পেরে বললেন, 'কাগজে দেখলুম—এখানে একটি সাধুবাবার আবির্ভাব হয়েছে?'

'কে, আবলুস বাবা?'

'কই না ত। আবলুস ত নয়। মছলি-বাবা নাম দিয়েছে যে কাগজে।'

'ওই হল। হিন্দিওয়ালারা মছলি বলছে। আবলুস নাম আমার দেওয়া। গিয়ে দেখলে বুঝবেন নামকরণটা কেমন হয়েছে।'

'সত্যিই সাঁতরে এসেছেন নাকি?'

প্রশ্নগুলো লালমোহনবাবুই করছেন, ফেলুদা শ্রোতা। নিরঞ্জনবাবু বললেন, 'তাই ত বলছে। বলে এখন নাকি প্রয়াগ থেকে আসছেন। তবে স্টার্টিং পয়েন্ট হল গিয়ে হরিদ্বার। এখেন থেকে যাবেন মুঙ্গের-পাটনা। তারপর একদিন হয়ত দেখবেন কাবুঘাটে গিয়ে নোঙর ফেলেছেন বাবাজী!'

'অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপারটা কী মশাই?'

'যা শুনছি তাই বলছি। কেদার ঘাটে চিৎপাত হয়ে পড়ে ছিলেন বাবাজী। ভোর রাত্তিরে অভয় চক্কোত্তি ঘাটে নেমেছেন। পঁয়ত্রিশ বছরের অভ্যেস মশাই—ঘড়ি ধরে সাড়ে চারটে—ফার্স্ট টু অ্যারাইভ—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কোনো তফাত নেই। সত্তর বছর বয়স, চোখে ছানি। পা ফেলতে গিয়ে পায়ের বদলে নরম নরম কী ঠেকেছে, ঝুঁকে দেখেন মানুষ। গায়ের চামড়া কুচকালো, মনে হয় অনেকক্ষণ জলে ছিল। লোকটা এপাশ ওপাশ করছিল—যেন সেন্সলেস অবস্থা থেকে সবে জ্ঞান ফিরছে। চক্কোত্তি মশাই ঘাড় নিচু করে দেখছেন, এমন সময় বাবাজী চোখ খুলে তাঁর দিকে চেয়ে হিন্দি টানে বাংলা ভাষায়

বললেন, 'যা এত জল দিয়ে ঘিরে রেখেছে তোকে, তাও তোর আগুনের ভয়?'
—ব্যাস, ওই এক কথাতেই অভয় চক্কোত্তি কাত।'

আমরা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি দেখে নিরঞ্জনবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

'কাশী আসার আগে অভয় চক্কোত্তি থাকতেন চুঁচড়োয়। সেইখেনে একবার কালীপুজোয় তাঁর বাড়িতে আগুন লাগে। তাতে তাঁর স্ত্রী আর একটি চোদ্দ

বছরের ছেলে মারা যায়। সেই থেকে ভদ্রলোক বিবাগী হয়ে কাশীবাসী হয়ে যান। অত্যন্ত সদাশয়, সাত্ত্বিক মানুষ। বাবাজীর এই কথায় তার মনের কী অবস্থা হবে সে ত বুঝতেই পারচেন।'

'সেদিন থেকেই বাবাজী অভয় চক্কোত্তির বাড়িতে?'

'সেদিন কী মশাই, কয়েক ঘন্টার মধ্যে দীক্ষা-টীক্ষা কমপ্লিট। তারপর যা হয়। খবর রটে যায়। লোক আসতে শুরু করে। রেগুলার দর্শন। ঘাটের

কাছেই অভয় চক্রবর্তীর বাড়ি। ভেতরে উঠোন। দাওয়ার উপর বাবাজী বসেন, উঠোনে ভক্তরা। একটি একটি ভক্ত কাছে যায়, বাবাজী তাদের একটি করে মন্ত্রপূত শল্ক দিয়ে দেন।

'শল্ক কী মশাই?' প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'মাছের আঁশ মশাই, মাছের আঁশ। লোকেরা বলছে স্বয়ং বিষ্ণু আবার মাছ হয়ে এসেছেন।'

'সে আঁশ কি খেতে হয় নাকি মশাই?' লালমোহনবাবু এমনভাবে নাক কুঁচকেছেন যেন আঁশটে গন্ধ পাচ্ছেন।

'খেতে হবে কেন? পরদিন সূর্য ওঠার ঠিক আগে—যাকে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত—সেই সময়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেই হল।'

'ওটা করে কী কেউ কোনো ফল পাচ্ছে?'

'আর পাঁচজনের কথা ত বলতে পারি না—আমার একটা কলিক পেনের মতো হচ্ছিল; গোপেন ডাক্তার ম্যাগ্‌ফস্ খেতে বলেছিল। খাচ্ছিলুম। বাবাজী এলেন, দর্শন করলুম, আঁশ পেলুম—পরদিন জলে ভাসিয়ে দিলুম। এখন পেনটা নেই বললেই চলে—তা সে হোমিওপ্যাথির গুণে না আঁশপ্যাথির গুণে তা বলতে পারি না।'

'কদ্দিন থাকবেন এখানে কিছু জানেন?'

'ইনি ভাই কোনোখানেই নাকি বেশিদিন থাকেন না। তবে এঁর যাওয়ার দিনটা নাকি ভক্তরাই ঠিক করে দেন।'

'কিরকম?'

'সেটা আজ সন্ধেবেলা জানা যাবে। আপনাদের নিয়ে যাব। আজই নাকি জানা যাবে বাবাজীর কাশীর মেয়াদ আর কদ্দিন।'

দুই

নিরঞ্জনবাবুর ঘরে বসে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক বললেন ওঁর হাতে কিছুটা সময় আছে, তারপর নাকি ব্যাঙ্কে যেতে হবে, তার আগে পর্যন্ত উনি আমাদের সঙ্গে ঘুরবেন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে কিছু দূর গেলেই রাস্তার লোক আর গাড়ি চলাচলের শব্দের সঙ্গে একটা নতুন শব্দ কানে আসতে থাকে। আরো কিছু দূর গেলেই একটা মোড় ঘুরে সামনে গঙ্গা দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকে রাস্তাটা ঢালু হয়ে সিঁড়ির ধাপ আরম্ভ হয়ে যায়। প্রত্যেক ধাপের মাঝখানে আর দু পাশে লাইন করে ভিখিরী। এক সঙ্গে এতো ভিখিরী এর আগে কখনো দেখিনি। এই ভিখিরীর আশেপাশেই চরে বেড়াচ্ছে বোকা-পাঁঠার দল। লালমোহনবাবু বললেন, 'ধন্যি আপনার নাকের স্মরণশক্তি মশাই। এ গন্ধ ত আমি নিজেও পেয়েছি আগের বার—কিন্তু ভুলে গেলাম কি করে?'

দশাশ্বমেধ ঘাটের বর্ণনা দিতে গেলে আমিও হয়ত লালমোহনবাবুর মতো জমজমাট কথাটা ব্যবহার করতাম, কিন্তু ফেলুদার ধমকের পর আর করব না। হোটেলে ফিরে এসে ঘাটের লোককে কী কী কাজ করতে দেখেছি তার একটা নম্বর দেওয়া লিস্ট করতে গিয়ে একশো তেরো অবধি পৌঁছে থেমে গেলাম। সেটা আবার ফেলুদা পড়ে বলল, 'দিব্যি হয়েছে—কেবল গোটা ত্রিশেক বাদ পড়েছে।'

ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে চাইলে রেলের ব্রিজটা দেখা যায়, আর পূব দিকে নদীর ওপারে দেখা যায় রামনগর—যেখানে রাজা আছে, কেল্লা আছে, আর নদীর ধারে নাকি সন্ন্যাসীদের একটা আস্তানা আছে।

দশাশ্বমেধের পাশেই উত্তরে হল মানমন্দির ঘাট। ঘাটের উপরেই একটা বাড়ির ছাতে প্রায় চারশো বছর আগে রাজা জয়সিংহের তৈরি জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি রয়েছে। দিল্লিরটার মতোই এটাও একটা ছোটখাটো যন্তর-মন্তর। ফেলুদা হয়ত সেটা দেখবার মতলবেই মানমন্দির ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

এটা বলা দরকার যে এদিকটায় দশাশ্বমেধের স্নানের হট্টগোল প্রায় পৌঁছয় না বললেই চলে। আওয়াজের মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসা লাউডস্পীকারে

হিন্দি ফিল্মের গান, আর আমাদের থেকে বেশ কয়েক ধাপ নিচে দুজন লোকের কাপড় কাচার শব্দ। আমাদের ডান দিকে একটা বটগাছ, তাতে কতগুলো বাঁদর বাঁদরামো করছে। গাছের উপর দিকের ডালপালা একটা পাশের বাড়ির ছাতের উপর নুয়ে পড়েছে। একটা চীৎকার শুনে আমাদের চারজনেরই দৃষ্টি ছাতটার দিকে চলে গেছে।

একটি ছেলে ছাতের পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। তিনতলা বাড়ির ছাত। ছেলেটি যেখানে দাঁড়িয়েছে তার সামনে একটা সরু গলি, আর গলির ওপাশে আরেকটা তিনতলা বাড়ি। সেটার রং লাল। সেটার ছাতেও নিশ্চয়ই একজন কেউ আছে, যদিও তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাকেই উদ্দেশ্য করে প্রথম ছেলেটি চ্যাঁচাচ্ছে।

'শয়তান সিং!'

হাঁক দেবার মেজাজটা যেন সে একটা ফিল্মের হিরো।

পাশ থেকে নিরঞ্জনবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'ঘোষালদের বাড়ির ছেলে। দুর্দান্ত ডানপিটে।'

আমার তলপেটটা কেমন জানি করছে। ছেলেটি যদি একবার টাল হারায় ত চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট নিচে পাথরে বাঁধানো রাস্তায় পড়বে।

'আর লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি জানি তুমি কোথায় আছ!'—আবার চীৎকার করে উঠল ছেলেটি।

ফেলুদাও টান হয়ে উপরের দিকে চেয়ে ঘটনাটা দেখছে। এবার লালমোহন-বাবুর খসখসে চাপা গলা শোনা গেল।

'শয়তান সিং হচ্ছে অক্রূর নন্দীর লেখা পাঁচখানা বইয়ের ভিলেন মশাই—রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ।'

'আমি আসছি তোমার কাছে!—' আবার চীৎকার এল—'তুমি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হও!'

ছেলেটি হঠাৎ পাঁচিল থেকে নেমে উধাও। ভাবছি এবার কী নাটক দেখব কে জানে, এমন সময় হঠাৎ দেখি একটা বাঁশ হলদে বাড়ির পাঁচিলের উপর দিয়ে বেরিয়ে সামনের লাল বাড়ির ছাতের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই বাড়ির মাঝখানে একটা ব্রিজ তৈরি করল। এইবার ফেলুদা মুখ খুলল, যদিও গলার স্বর চাপা।

'ওনার মতলবটা কী?'

'শয়তান সিং!'—আবার হুঙ্কার। 'তুমি দশ গুণতে গুণতে আমি তোমার কাছে এসে পড়ব!'

এবার যেটা ঘটল তাতে আমাদের সকলেরই ঘাম ছুটে গেল।

ছেলেটি পাঁচিল থেকে কার্নিশে নেমে খপ্ করে বাঁশটা ধরে শূন্যে ঝুলে

পড়ল।

'এক...দুই...তিন...চার...'

উল্টো দিকের ছাত থেকে শয়তান সিং গুণতে শুরু করেছে, আর এ ছেলেটি বাঁশ ধরে ঝুলতে ঝুলতে এগোচ্ছে।

'একটা কিছু করুন মশাই।' নিরঞ্জনবাবু ধরা গলায় বললেন,—'আমার কলিক পেনটা আবার—'

ফেলুদার ডান হাতের তর্জনীটা গোখরোর ফোঁস করার মতো এক লাফে ঠোঁটে চলে এল। আমরা সবাই দম বন্ধ করে এই খুদে ছেলের দুঃসাহসিক ব্যাপারটা দেখতে লাগলাম।

'ছয়...সাত আট...ন—য়!',

নয় গোনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি উল্টো দিকে পৌঁছে গিয়ে কার্নিশে পা ফেলেই বাঁশেরই উপর ভর করে পাঁচিল টপকে লাল বাড়ির ছাতে নেমে গেল। তারপর শোনা গেল একটা অচেনা গলায় এক বিকট চীৎকার, আর সেই সঙ্গে প্রথম ছেলেটির এক অদ্ভুত উল্লাসের হাসি।

লালমোহনবাবু বললেন, 'মেরেই ফেললে নাকি মশাই?—কোমরে যেন ছোরা গোছের কী একটা ঝুলতে দেখলুম।'

ফেলুদা গলির দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'ভিলেনটি কিরকম জানি না, হিরোটি যে দুর্দান্ত সাহসী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

নিরঞ্জনবাবু বললেন, 'ঘোষাল বাড়িতে রিপোর্ট করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।'

আমরা আরেকটু এগোতেই লাল বাড়িটার দরজার সামনে পৌঁছে গেলাম। ভিতরে অন্ধকার। কাছেই বোধ হয় সিঁড়ি, কারণ দুপ দাপ পায়ের শব্দ পাচ্ছি, আর সেই সঙ্গে ছেলেটির কথা এগিয়ে আসছে।

...'তারপর ঝপাং করে পড়বে জলে, আর ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে চলে যাবে একেবারে সমুদ্রে, আর সেখানে একটা হাঙর এসে টপ্ করে গিলে ফেলবে। আর সেই হাঙরটা যখন ক্যাপ্টেন স্পার্কের দিকে চার্জ করবে, তখন ক্যাপ্টেন স্পার্ক হারপুন দিয়ে ঘ্যাচাং করে মারবে সেটার পেটে, আর—'

এইটুকু বলে আর বলা হল না, কারণ ঘামে চপ্ চপ্ ছেলে দুটি দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে, আর প্রথম ছেলেটি আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে। বয়স বছর দশের বেশি নয়, ধপধপে ফরসা রং, চোখ নাক একেবারে রাজপুত্তুরের মতো। অন্য ছেলেটির বয়স কিছুটা বেশি। ইনি যে বাঙালী নন সেটা দেখলেই বোঝা যায়। দুজনেরই চোয়াল যেভাবে চলছে তাতে বোঝাই যায় তারা মুখে চুইং গাম পুরে নিয়েছে।

ফেলুদা প্রথম ছেলেটিকে বলল, 'ও-ত শয়তান সিং আর তুমি কে?'

'ক্যাপ্টেন স্পার্ক', চাবুকের মতো উত্তর দিল ছেলেটি।

'তোমার আরেকটা নাম আছে না? তোমার বাবা তোমাকে কী বলে ডাকেন?'

'আমার নাম ক্যাপ্টেন স্পার্ক। আমার বাবাকে বিষাক্ত তীর মেরে খুন করেছিল শয়তান সিং আফ্রিকার জঙ্গলে। তখন আমার বয়স সাত। তখন থেকে আমার চোখে প্রতিহিংসার বিদ্যুৎ জ্বলে, তাই আমার নাম স্পার্ক।'

'সর্বনাশ,' বললেন লালমোহনবাবু, 'এ যে অক্রূর নন্দীর বই মুখস্থ করে ফেলেছে মশাই!'

ছেলেটি লালমোহনবাবুর দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে তার বন্ধুকে নিয়ে গম্ভীরভাবে গলি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'বর্ন অ্যাক্টর'—মন্তব্য করলেন জটায়ু।

ফেলুদা নিরঞ্জনবাবুকে জিগ্যেস করল, 'ঘোষাল বাড়িতে কাউকে চেনেন?'

'চিনব না? আদ্দিন রয়েছি কাশীতে। ওদের সকলেই চেনে। প্রায় একশো বছর হল বেনারসে বাস। এই যে খোকাকে দেখলেন, এর ঠাকুরদা অম্বিকা ঘোষাল এখানেই থাকেন। ওকালতি করতেন, বছর বারেক হল ছেড়ে দিয়েছেন। খোকার বাপ উমানাথ ঘোষাল কলকাতায় থাকেন, কেমিক্যালের ব্যবসা। প্রত্যেক পুজোয় ফ্যামিলি নিয়ে এখেনে আসেন। এদের বাড়িতেই দুর্গাপুজো হয়। খানদানি পরিবার মশাই। এদের জমিদারি ছিল ইস্টবেঙ্গলে পদ্মার ধারে।'

'একবার উমানাথের সঙ্গে দেখা করা যায়?'

'কেন যাবে না? আপনারা ত মছলিবাবা দর্শনে যাবেন বলছিলেন, সেখানেও দেখা হয়ে যেতে পারে। শুনেছি নাকি ইনিও দীক্ষা নেবেন নেবেন করছেন।'

মছলিবাবাকে দেখে নিরঞ্জনবাবুর নামকরণের তারিফ না করে পারা যায় না। ফেলুদা দেখেছে কিনা জানি না, আমি নিজে জীবনে এত মিশকালো লোক দেখিনি। শুধু কালো নয়, এমন মসৃণ কালো যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় গায়ে বুঝি সাপের খোলসের মতো একটা কিছু পরে আছেন। তার উপরে কাঁধ অবধি ঢেউ খেলানো চুল, আর বুক অবধি ঢেউ খেলানো দাড়ি—দুটোই কুচকুচে কালো। সাধুবাবা জোয়ান লোক; বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি হলে আশ্চর্য হব। অবিশ্যি জোয়ান নাহলে আর এত সাঁতার কাটেন কী করে। বাবার চেহারা আরো খোলতাই হয়েছে তার গায়ের টকটকে লাল সিল্কের চাদর আর লুঙ্গির জন্য।

আমরা চারজন উঠোনে ভক্তদের ভীড়ের পিছনে দাঁড়িয়েছি, বাবাজী

বারান্দায় শীতল-পাটির উপর বিছানো একটা সাদা চাদরে বসেছেন, তার দু'পাশে দুটো আর পিছনে একটা হলদে মখমলের তাকিয়া। বাবার বাঁ পাশে একজন বৃদ্ধ চোখ বুজে হাত জোড় করে বসে আছেন, বোঝাই যাচ্ছে ইনি হলেন অভয় চক্রবর্তী। বাবা নিজে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে অল্প অল্প দুলছেন, আর ডান হাতের তেলো দিয়ে হাঁটুতে হাত বুলোচ্ছেন। দোলানিটা হচ্ছে তালে তালে, কারণ বারান্দার এক ধারে বসে একজন লোক কাঠের খঞ্জনি বাজিয়ে একটা হিন্দুস্থানী ভজন গাইছে। গানের প্রথম দুটো লাইন মনে ছিল, হোটেলে ফিরে এসে খাতায় লিখে রেখেছিলাম—

ইতনী বিনতি রঘুনন্দন সে
দুখ দ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী—

আজ আর সেই মাছের আঁশের ব্যাপারটা হচ্ছে না। তার বদলে আজ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটবার কথা আছে; মছলিবাবা আজ তার ভক্তদের কাছ থেকে জেনে নেবেন আর কদ্দিন পরে তাঁকে কাশী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেটা যে কী ভাবে জানা হবে তা এখনো কেউ জানে না।

লালমোহনবাবুর দেখছি বেনারসে এসেই ভক্তিভাবটা একটু বেড়ে গেছে। সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে ওঁকে বার তিনেক বেশ গলা উঁচিয়ে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলতে শুনেছি। এখানে এসে দেখছি বাবাজীকে দেখেই ওঁর হাত দুটো আপনা থেকেই জোড় হয়ে গেছে। এত ভক্তি দেখালে অ্যাডভেঞ্চার গল্পের প্লট মাথায় কী করে আসবে জানি না। বোধ হয় ভাবছেন মছলিবাবা ওঁকে স্বপ্নে প্লট দিয়ে দেবেন।

কালো প্যান্ট আর নীল রঙের গুরু সার্ট পরা একজন ভদ্রলোক সবেমাত্র আমাদের পিছন দিয়ে ঢুকে আমাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে বোধহয় ভাবছেন ভীড় ঠেলে কী করে এগোন যায়। নিরঞ্জনবাবু লোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ঘোষাল সাহেব এলেন না?' ভদ্রলোক গলা নামিয়ে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে না, ওনার খুড়তুতো ভাই আর তার স্ত্রী এসে পৌঁছেছেন আজ দুর্গাপুর থেকে, বাড়িতে তাই...'

ভদ্রলোকের রং ফরসার দিকে, হুলিয়াটা হাল ফ্যাশানের, চোখে চশমা, সব মিলিয়ে মোটামুটি চালাক চতুর চেহারা। 'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই'—নিরঞ্জনবাবু ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন—'ইনি বিকাশ সিংহ—উমানাথবাবুর সেক্রেটারি।'

তারপর আমাদের তিনজনেরও পরিচয় করিয়ে দিলেন নিরঞ্জনবাবু। ফেলুদার নাম শুনেই সিংহ মশাইয়ের ভুরুটা কুঁচকে গেল।

'প্রদোষ মিত্র? গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র!'

'হ্যাঁ মশাই'—নিরঞ্জনবাবু গলা চাপতে ভুলে গেলেন—'স্বনামধন্য ডিটেক-

চিত। আর ইনিও আবাঁশা কম হয়ে নন—'

নিরঞ্জনবাবু লালমোহনবাবুর দিকে দেখানো সত্ত্বেও সিংহ মশাইয়ের দৃষ্টি ফেলুদার দিকেই রয়ে গেল। ভদ্রলোক কী যেন বলতে চাইছেন।

'ইয়ে আপনি এখানে আছেন জানলে...কোথায় উঠেছেন বলুন ত?'

'আমারই হোটেলে মশাই!'—নিরঞ্জনবাবু এবার খেয়াল করে গলাটা নামিয়ে কথাটা বললেন।

'ঠিক আছে, মানে...' বিকাশবাবু এখনো আমতা-আমতা করছেন—'একবারটি বোধ হয়...ঠিক আছে, কাল না হয় যোগাযোগ করব।'

ভদ্রলোক নমস্কার করে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন।

'এক ব্রহ্ম, এক সূর্য, এক চন্দ্র!'

মছলিবাবা দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছেন। ভজন থেমে গেল। ভক্তরা সবাই থমকে গিয়ে সোজা হয়ে বসল। এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এবার দেখলাম বাবার যেদিকে অভয়বাবু বসেছেন তার উল্টোদিকে আরেকটি ভদ্রলোক—বছর চল্লিশেক বয়স—সামনে একটা নকশা করা থলি নিয়ে বসেছেন। থলির পাশে স্তূপ করে কালো কালো কী জানি রাখা রয়েছে।

'দু হাত দু পা দু চোখ দু কান!'—বাবাজী আবার শুরু করলেন। এসব বলার কী মানে কিছুই বুঝতে পারছি না; অন্যেরা কেউ বুঝছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না।

'তিন কুল তিন কাল চারদিক চার বর্গ পঞ্চ ভূত পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ নদ পঞ্চ পাণ্ডব—এক, দো, তিন, চার, পাঁচ!'

বাবাজী একটু থামলেন। থলিওয়ালা ভদ্রলোক তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন, ভক্তরাও সব চেয়ে আছে। লালমোহনবাবু আমার কানের কাছে ফিস-ফিস করে বললেন, "থ্রিলিং।" বাবাজী আবার শুরু করলেন—

'ছে রিপু ছে ঋতু, সপ্ত সুর সপ্ত সিন্ধু, অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধি, নবরত্ন নবগ্রহ, দশকর্ম দশ মহাবিদ্যা দশাবতার দশাশ্বমেধ—এক থেকে দশ।'

এইটুকু বলে বাবাজী থলিওয়ালা ভদ্রলোকের দিকে ইশারা করলেন। ভদ্রলোক ফিসফিস করে বাবাজীকে কী যেন বলে দিলেন। তারপর ভক্তদের দিকে ফিরে অস্বাভাবিক রকম সরু গলায় বললেন, 'এবার আপনারা এক থেকে দশের মধ্যে একটি সংখ্যা বেছে নিয়ে একে একে বাবাজীর সামনে এসে এই থলির মধ্যে থেকে একটি কাগজের টুকরো নিয়ে তাতে এই কাঠকয়লার সাহায্যে সংখ্যাটি লিখে আমার হাতে দিয়ে দেবেন।' প্রথমে বাঙলায় বলে আবার সেটা হিন্দি করে বললেন।

ফেলুদা নিরঞ্জনবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'যে সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি বার পড়বে, সেটাই কি বলে দেবে বাবা ক'দিন থাকবেন?'

'হয়ত তাই। সেটা ত বললে না কিছু।'

'যদি তাই হয় তাহলে বোধহয় বাবাজীর সাতদিনের বেশি মেয়াদ নেই।'

'আপনি লিখবেন নাকি?'

'না মশাই। বাবা থাকছেন কি যাচ্ছেন সে নিয়ে ত আমাদের অত মাথা-ব্যথা নেই। আমরা দেখতে এসেছি, দূর থেকে দেখে চলে যাব—বাস্। তবে একটা জিনিস জানার কৌতূহল হচ্ছে। এইসব ভক্তদের মধ্যে কিছু কিছু গণ্যমান্য লোকও আছেন ত, নাকি সবাই সাজানো ভক্ত?'

'কী বলছেন মশাই!'—নিরঞ্জনবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। 'এরা সব বলতে পারেন একেবারে ক্রীম অফ কাশী। ওই দেখুন—সাদা চাদর গায়ে, মাথায় টাক—উনি হলেন শ্রুতিধর মহেশ বাচস্পতি, মহাপণ্ডিত—আজন্ম কাশীতে রয়েছেন। তারপর ওই দেখুন মৃত্যুঞ্জয় সেন কবিরাজ, দয়াশঙ্কর শুক্লা—এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের এজেন্ট। যিনি বাবাজীর পাশে থলি নিয়ে বসে আছেন তিনি হলেন অভয় চক্রবর্তীর ভাইপো—আলিগড় ইউনিভার্সিটিতে ইংরিজির প্রফেসর। উকীল ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রোফেসর হালুইকর—কিছু বাদ নেই মশাই। আর মহিলা কত আছেন সে ত দেখতেই পাচ্ছেন। আর ওই দেখুন—'

নিরঞ্জনবাবু একজন সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা বেনারসী টুপি পরা জাঁদরেল লোকের দিকে দেখালেন।

'ওকে চেনেন? উনি হলেন মগনলাল মেঘরাজ। ওঁর মতো পয়সা আর দাপট কাশীতে আর কারুর নেই। বেনারসে যদি বাঘ থাকত ত এখানকার বলদগুলোর সঙ্গে এক ঘাটে জল খেত ওঁর নামে।'

'মগনলাল মেঘরাজ?...নামটা চেনাচেনা মনে হচ্ছে।'

নিরঞ্জনবাবু ফেলুদার দিকে আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন—আর সেই সঙ্গে আমিও।

'দু'বার পুলিশ রেড হয়ে গেছে ওর বাড়িতে। একবার কলকাতায়—ওর বড়বাজারের গদিতে—একবার এখেনে। চোরা কারবার, কালো টাকা—যা ভাবতে চান ভাবুন না।'

'পুলিশ ত পায়নি কিছু—তাই না?'

'পুলিশ ত সব ওর হাতের মুঠোয় মশাই। রেড ত নামকাওয়াস্তে।'

ভক্তের দল এখনো একজন একজন করে গিয়ে কাগজে নম্বর নিয়ে আসছে। দেখে মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। আমরা আরো মিনিট পাঁচেক দেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গেটের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে পিছন থেকে একটা ডাক শুনে ঘুরে দেখি যার সঙ্গে নিরঞ্জনবাবু আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন, সেই মিস্টার সিংহ ব্যস্তভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে

আসছেন।

'আপনারা চললেন?'—ভদ্রলোক বিশেষ করে ফেলুদার দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করলেন। উত্তরে ফেলুদা কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, 'ইয়ে, আপনাদের এখনই একবারটি আমাদের বাড়ি আসা সম্ভব হবে কি? মিস্টার ঘোষাল আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে খুশি হতেন।'

ফেলুদা হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, 'আমাদের আর কী অসুবিধা বলুন। নিরঞ্জনবাবুকে অবিশ্যি হয়ত হোটেলে ফিরে যেতে হবে।'

'আপনারা তিনজনে ঘুরে আসুন,' নিরঞ্জনবাবু বললেন, 'তবে বেশি রাত না করলে খাবারটা গরম গরম খেতে পারবেন—এইটে শুধু বলে রাখলাম। আজ আপনাদের জন্য ফাউল কারি করতে বলেছি।'

তিন

'আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনিই ত ভুবনেশ্বরের যক্ষীর ভাঙা মাথা উদ্ধার করে দিয়েছিলেন—তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—ফেলুদা ওর পক্ষে যতটা সম্ভব বিনয়ী হাসি হেসে বলল। উমানাথ ঘোষালের বয়স চল্লিশের বেশি না, গায়ের রং ছেলেরই মতো টকটকে, চোখ দুটো কটা আর ঢুলুঢুলু। কথা বলার সময় লক্ষ করলাম যে দুটো ভুরু এক সঙ্গে কখনই উপরে উঠছে না; একটা ওঠে ত অন্যটা নিচে থেকে যায়।

'এঁরা সব আপনার— ?'—ভদ্রলোকের দৃষ্টি ফেলুদার দিক থেকে আমাদের দুজনের দিকে ঘুরে গেছে।

'এটি আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ, আর ইনি লালমোহন গাঙ্গুলী, জটায়ু ছদ্মনামে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখেন।'

'জটায়ু?'—উমানাথের ডান ভুরুটা উঠে গেল। 'নামটা চেনা চেনা লাগছে। রুকুর কাছে ওঁর কিছু বই দেখেছি বলে যেন মনে পড়ছে। তাই না হে বিকাশ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন বিকাশবাবু, 'খান তিনেক আছে বোধহয়।'

'বোধহয় আবার কি। তুমিই ত যত রাজ্যের রহস্যের বই কিনে দাও ওকে!'

বিকাশবাবু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, 'ও ছাড়া ও আর কিছু পড়তেই চায় না।'

'এ বয়সে ত ওসব পড়বেই, পড়বেই,' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। সকালে ক্যাপ্টেন স্পার্ক আর শয়তান সিং-এর নাম শোনা অবধি উনি বেশ মনমরা হয়ে ছিলেন; এখন আবার মুখে হাসি ফুটেছে। রহস্য রোমাঞ্চ বইয়ের বাজারে অক্রূর নন্দী নাকি জটায়ুর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

ফেলুদা বলল, 'আমি এমনিতেই একটা কারণে আপনার কাছে আসতে চেয়েছিলাম।...আপনার ছেলের সঙ্গে আজ আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তার আসল নামটা যদিও এখনো জানতে পারিনি; তবে সে যে ভূমিকায় অভিনয় করছিল তার নামটা জানি।'

'অভিনয়?'—উমানাথবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন। 'আরে ও যে শুধু নিজে অভিনয় করে তা ত নয়, অন্যদেরও সে নামটাম বদলে অভিনয় করায়।

তোমাকেও একটা কী নাম দিয়েছিল না, বিকাশ?'

'মাত্র একটা?' বিকাশবাবুও হেসে উঠলেন।

'যাই হোক—তা, কোথায় দেখা হল আমার ছেলের সঙ্গে?'

ফেলুদা কোনোরকম বাড়াবাড়ি না করে অল্প কথায় অত্যন্ত গুছিয়ে সকালের ঘটনাটা উমানাথবাবুকে বলল। ভদ্রলোক শুনে প্রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

'কী সর্বনাশের কথা!—ছেলে আমার ডানপিটে সে ত জানি; তা বলে তার এতটা দুঃসাহস সে ত জানতাম না। ও ত মরতে মরতে বেঁচে গেছে! রুকুকে একবার ডেকে পাঠাও ত হে বিকাশ।'

মিস্টার সিংহ ছেলেটির খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুদা বলল, 'ডাক-নাম রুকু সে ত জানলাম। ভালো নামটি কী?'

'রুক্মিণীকুমার,' বললেন উমানাথবাবু। 'ও-ই আমার একমাত্র ছেলে; কাজেই ঘটনাটা শুনে আমার মনের অবস্থা কী হচ্ছে সে ত বুঝতেই পেরেছেন।'

দুর্গাকুণ্ড রোডের উপর বিরাট কম্পাউন্ডের মধ্যে বিশাল বাড়ি ঘোষালদের। রাত্রে বাড়ির বাইরেটা ভালো করে দেখতে পাইনি—শুধু গেটের উপর মার্বেল ফলকে লেখা শংকরী-নিবাস নামটা দেখেছি। আমরা বসেছি একতলার বৈঠকখানায়। আমাদের ডান পাশে দরজা দিয়ে পুজোর দালান দেখা যাচ্ছে। আমি যেখানে বসেছি সেখান থেকে প্রতিমার আধখানা দেখতে পাচ্ছি। রঙের কাজ এখনও চলেছে।

চাকর ট্রেতে করে চা-মিষ্টি এনে আমাদের সামনের টেবিলে রেখে যাবার পর উমানাথবাবু বললেন, 'আপনারা মছলিবাবা দর্শনে গিয়েছিলেন শুনলাম। কী মনে হল দেখেটেখে?'

ফেলুদা একটা পেঁড়ার আধখানা কামড় দিয়ে মুখে ফেলে বলল, 'আমরা অল্পক্ষণই ছিলাম। শুনলাম আপনিও নাকি যাচ্ছেন?'

'যাচ্ছি মানে একবারই গেছি। দ্বিতীয়বার যাবার আর বাসনা নেই, কারণ সেদিন আমি না-থাকার জন্যেই দুর্ঘটনা ঘটল।'

উমানাথবাবু চুপ করলেন। আমরাও চুপ। লালমোহনবাবু দেখলাম আড়চোখে একবার ফেলুদার দিকে দেখে নিলেন।

'দুর্ঘটনা?'—ফেলুদা ফাঁক ভরাবার জন্য প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।' উমানাথবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'শুধু দামের দিক দিয়ে নয়, প্রভাবের দিক দিয়েও একটি অমূল্য জিনিস গত বুধবার—অর্থাৎ আমি যেদিন বাবাজীকে দেখতে যাই সেদিন—আমার বাবার ঘর থেকে উধাও হয়ে গেছে। আপনি যদি সেটিকে উদ্ধার করতে পারেন ত আমাদের অশেষ উপকার হবে, এবং সেই সঙ্গে আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেব।'

আমার বুকের ভিতরে আমার খুব চেনা একটা ধুকপুকুনি আরম্ভ হয়ে গেছে।

'জিনিসটা কী সেটা জানতে পারি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'ছোট্ট একটা জিনিস,' মিস্টার ঘোষাল দু' আঙুল ফাঁক করে জিনিসটার সাইজ বুঝিয়ে দিলেন। 'আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা গণেশের মূর্তি। সোনার মূর্তি, তার উপর দামী পাথর বসানো।'

'ওটা কীভাবে এলো আপনাদের বাড়িতে?'

'বলছি সেটা। একেবারে গল্পের মতো।...আপনার ত বোধহয় চারমিনার ছাড়া চলে না—'

ভদ্রলোক নিজে একটা ভার্জিনিয়া মুখে পুরতেই ফেলুদা আগুন এগিয়ে দিয়ে সেই সঙ্গে নিজেও একটা চারমিনার ধরিয়ে নিল। একটা বড় টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মিঃ ঘোষাল তাঁর কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

'আমার ঠাকুরদাদার বাবা সোমেশ্বর ঘোষালের ছিল ভ্রমণের নেশা। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি একা দেশ দেখতে বেরিয়ে যান। তখন নতুন রেলগাড়ি হয়েছে, কিছু পথ তাতে যাবেন, বাকিটা হয় হেঁটে, আর না হয়ত যা যানবাহন পাওয়া যায় তাতেই। দক্ষিণ ভারতে ঘুরছিলেন। ত্রিচিনপল্লী থেকে মাদুরা হয়ে সেতুবন্ধের দিকে যাচ্ছিলেন গরুর গাড়িতে, জঙ্গলে ভরা পাহাড়ে পথ দিয়ে। এই সময় মাঝরাত্তিরে তিনটি সশস্ত্র ডাকাত তাঁর গাড়ি আক্রমণ করে। সোমেশ্বর সাংঘাতিক শক্তিশালী লোক ছিলেন। সঙ্গে বাঁশের লাঠি ছিল। একা তিনজনের সঙ্গে লড়ে একটির মাথা ফাটিয়ে দেন, অন্য দুটি পালায়। ডাকাতদের একটা থলে পিছনে পড়ে থাকে। তার মধ্যে ছিল এই গণপতি। সেই মূর্তি সঙ্গে করে উনি দেশে ফেরেন। তারপর থেকেই আমাদের বংশের ভাগ্য ফিরে যায়। আমাকে আপনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেকেলে মানুষ বলে মনে করবেন না। আমাদের বংশে যা ঘটতে দেখেছি তার থেকে কতকগুলো বিশ্বাস আমার মনে জন্মেছে—ব্যস, এইটুকুই। সত্যি বলতে কি, গণেশ আসার পর থেকে আমাদের ফ্যামিলিতে কোনো বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে। ওটা আসার দু বছরের মধ্যেই পদ্মার ভাঙনে নদী আমাদের বাড়ির বিশ হাতের মধ্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু বাড়ির কোনো ক্ষতি হয়নি। অবিশ্যি এ ছাড়াও আরো অনেক নজির আছে, সব দিতে গেলে দীর্ঘ ইতিহাস হয়ে যাবে। আসল কথা এই যে, একশো বছর আমাদের ফ্যামিলিতে থাকার পর আজ সে মূর্তি উধাও। বাড়িতে পুজো, বাইরে থেকে আত্মীয়-স্বজন আসছে, কিন্তু সমস্ত সমারোহের উপর যেন একটা ছায়া পড়ে রয়েছে।'

উমানাথবাবু যেন ক্লান্ত হয়ে সোফায় এলিয়ে পড়লেন। ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'কবে গিয়েছিলেন আপনি মছলিবাবাকে দেখতে?'

'তিনদিন আগে। গত বুধবার। পনেরই অক্টোবর। আমরা এসেইছি মাত্র দিন দশেক হল। মছলিবাবার কথা শুনে আমার গিন্নীর দেখতে যাবার শখ হল; তাই ওঁকে আর রুকুকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম।'

'আপনার ছেলেও যেতে চাইল?'

'নামটা শুনে কৌতূহল! বলল ওর কোন্ এক বইয়েতে নাকি কার কথা রয়েছে যে সত্তর মাইল সাঁতার কেটে এসেছিল কুমীর হাঙরের মধ্যে দিয়ে। অবিশ্যি বাবাজীকে দেখে মোটেই ভালো লাগেনি। দশ মিনিটের মধ্যে উস্‌খুস্ শুরু হয়ে গেল। ওর জন্যেই ত তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি এই কাণ্ড।'

'সিন্দুক আপনার বাবার ঘরে থাকে বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ, তবে চাবিটা এমনিতে আমার ঘরেই থাকে। রিং-এর মধ্যে পাঁচ ছটা চাবি, তার মধ্যে একটিই হল ওই সিন্দুকের। এমনিতে কোথাও বেরোলে আমার স্ত্রীর কাছে চাবিটা থাকে, কিন্তু সেদিন ও-ও যাচ্ছে বলে বাবার ঘরের দেরাজে চাবিটা রেখে যাই। হয়ত খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি, কারণ কথা সন্ধের দিকে একটু আফিম-টাফিম খান, খুব একটা হুঁশ থাকে না। যাই হোক—যাবার সময় চাবিটা রেখে দেরাজটা একেবারে শেষ অবধি ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আধ ইঞ্চি খোলা। সন্দেহ হয়; তখন সিন্দুক খুলে দেখি গণেশ নেই।'

ফেলুদা একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বলল, 'আপনার বাড়িতে সেদিন সেই সময়ে কে কে ছিলেন সেটা জানতে পারি কি?'

ফেলুদা খাতা আনেনি, তবে উত্তরটা যে ওর মুখস্থ থাকবে, আর নামগুলো হোটেলে গিয়ে লিখে নিতে পারবে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ ঘোষাল বললেন, 'দারোয়ান ত্রিলোচনকে আপনারা গেটে দেখলেন; ও প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হল আমাদের বাড়িতে রয়েছে। চাকর ঠাকুর ঝি সবাই পুরোন। প্রতিমা গড়েন শশীবাবু আর তার ছেলে কানাই। শশীবাবু কাজ করছেন ত্রিশ বছরের উপর। ছেলেটিও খুব ভালো। এ ছাড়া মালী আছে, সে পুরোনো। আর আছে বিকাশ—যে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে এল।'

'বিকাশবাবু কদ্দিন আছেন?'

'সেক্রেটারির কাজ করছে বছর পাঁচেক, আছে অনেকদিন। ও প্রায় ফ্যামিলি মেম্বারের মতোই হয়ে গেছে। ওর বাবা অখিলবাবু আমাদের জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। ওর মা বিকাশ হবার সময়ই মারা যান। তার বছর দশেক পরে বাপও চলে গেলেন ডুপ্সিতে। অনাথ ছেলেটি সঙ্গদোষে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুনে আমার জ্যাঠামশাই ওকে বাড়িতে এনে রাখেন। ইস্কুল কলেজ সবই আমাদের বাড়িতে থেকেই। এমনি বুদ্ধিমান ছেলে। লেখাপড়ায় বেশ ভালোই ছিল।'

'চুরির খবরটা পুলিশে দেননি?'

'সেই রাত্রেই। এখনো পর্যন্ত কোনো হদিস পায়নি।'

'গণেশের খবর বাইরের কেউ জানত?'

উমানাথবাবু উত্তর দেবার আগেই বিকাশবাবুর সঙ্গে রুক্মিণীকুমার এসে হাজির হল। আমি ভেবেছিলাম ক্যাপ্টেন স্পার্কের ভাগ্যে বুঝি প্রচণ্ড ধমক আছে, কিন্তু দেখলাম উমানাথবাবু সেরকম লোক নন। শুধু আড়চোখে একবার ছেলের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাল থেকে পুজোর কটা দিন আর বাইরে যাবে না। বাড়িতে বাগান রয়েছে, ছাত আছে—যত খুশি খেলতে পার; ঘুড়ি আছে, ঘুড়ি ওড়াতে পার, বই আছে পড়তে পার, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছাড়া বাইরে বেরোবে না।'

'আর শয়তান সিং?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল রুক্মিণীকুমার।

'সে আবার কে?'—উমানাথবাবুর বাঁ ভুরুটা উঠে গেছে উপর দিকে।

'ও যে কারাগারের শিক ভেঙে পালিয়েছে।'

'ঠিক আছে, আমি ওর খবর এনে দেব তোমাকে,' হালকাভাবে হেসে আশ্বাসের সুরে বললেন বিকাশবাবু। রুকু মনে হল খানিকটা ভরসা পেয়েছে। অন্তত সে তার শাস্তির ব্যাপারে আর কোনো আপত্তি না করে বিকাশবাবুর হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উমানাথবাবু বললেন, 'বুঝতেই পারছেন আমার পুত্রটি একটু অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ। যাই হোক—আপনার প্রশ্নের জবাব দিই এবার—গণপতির খবর আমরা দেশে থাকতে অনেকেই জানত। ওটা একটা কিংবদন্তীর মতো মুখে মুখে রটে গিয়েছিল। সেটা অবিশ্যি আমার জন্মের আগে। পরের দিকে এ নিয়ে আর বিশেষ কেউ আলোচনা করত না। আমার নিজের ছাত্রজীবন কাটে কলকাতায়। কলেজে থাকতে দু'একটি বন্ধুকে আমি গল্পচ্ছলে গণেশের কথা বলেছিলাম। তার মধ্যে একটি বন্ধু—অবিশ্যি এখন তাকে আর বন্ধু বলি না—সম্প্রতি কাশীতে রয়েছেন। তার নাম মগনলাল মেঘরাজ।'

'বুঝেছি,' ফেলুদা বলল, 'তাঁকে আজ মছলিবাবার ওখানে দেখলাম।'

'জানি। আমি যেদিন গেছিলাম সেদিনও ছিল। তার বাবাজীর কাছে যাতায়াত করার একটা কারণ আছে। কিছুদিন থেকে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। খারাপের দিকে অবশ্যই। বছর দু'এক আগে ওর প্লাইউডের ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগা থেকে এর শুরু। তারপর এই গত কয়েক মাসের মধ্যে ওর গোলমেলে কারবার সম্বন্ধে অনেক গুজব বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ওর কলকাতার এবং বেনারসের বাড়িতে পুলিস রেড হয়ে যায়। আমি এখানে আসার দুদিন বাদেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সোজাসুজি বলল যে গণেশটা ওর দরকার। ওটা যে কলকাতায় আমার কাছে থাকে না,

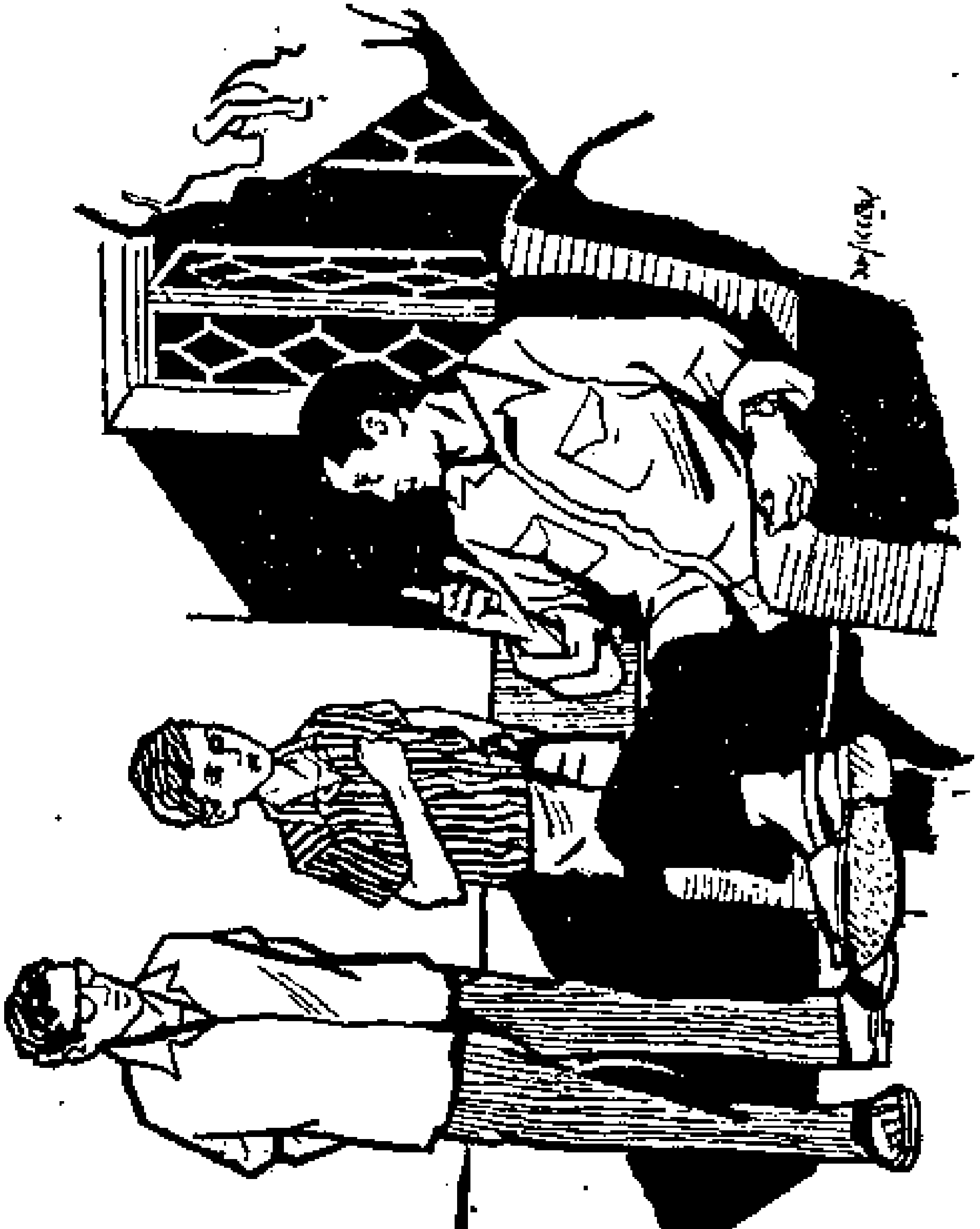

এখানে বাবার সিন্দুকে থাকে, সেটা ও জানত। চল্লিশ হাজার অবধি অফার করেছিল ওটার জন্য। আমি সোজাসুজি না বলে দিই। ও যাবার সময় শাসিয়ে যায় যে জিনিসটা ও হাত করে তবে ছাড়বে। তার ঠিক পাঁচদিন পরে গণেশ সিন্দুক থেকে উধাও হয়ে যায়।'

ভদ্রলোক চুপ করলেন। ফেলুদাও চুপ, চিন্তিত। আমি জানি ওর তিনমাসের অবসর এইখানেই শেষ হল। সামনের ক'টা দিন কাশীই হবে ওর কাজের জায়গা, তদন্তের জায়গা। লালমোহনবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ছে—এক ঢিলে তিন পাখি। অবিশ্যি কাশের ব্যাপারটা নির্ভর করছে—

'আমাদের খুব ভাগ্য ভাল যে আপনি ঠিক এই সময়ে এসে পড়লেন। আপনার উপর কাজের ভারটা দিতে পারলে—'

'নিশ্চয়ই। একশোবার!' ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছে। 'আপনি অনুমতি দিলে কাল সকালে একবার আসতে চাই। আপনার বাবার সঙ্গে একবার কথা বলা যাবে কি?'

'কেন যাবে না? বাবার ত এখন রিটায়ার্ড জীবন। অবিশ্যি বাবার মেজাজটা ঠিক যাকে বলে মোলায়েম তা নয়। তবে সেটা বাইরের খোলস। আর আপনি যদি আমাদের বাড়ির এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে চান, তাও পারেন স্বচ্ছন্দে। আমি ত্রিলোচনকে বলে রাখব আপনাকে এলে যেন ঢুকতে দেয়। আর বিকাশ রয়েছে, ও-ও সব ব্যাপারে আপনাদের হেলপ করতে পারে। আটটা নাগাত এলে ভাল—তাহলে বাবাকে তৈরি অবস্থায় পাবেন।'

বাড়ি ফেরার পথে পর পর দুটো অন্ধকার গলি দিয়ে আসবার সময় তিন তিনবার পায়ের আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে চাদর মুড়ি দেওয়া একই লোককে দেখতে পেয়ে সেদিকে ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলাম। ও যে শুধু পাত্তাই দিল না তা নয়—সারা রাস্তা ধরে গুনগুন করে ইশ্‌ক ইশ্‌ক ইশ্‌ক ছবির এমনিতেই একটা বাজে গান সমানে ভুল সুরে গেয়ে গেল।

চার

ক্যালকাটা লজের ঠাকুর ফাউল কারিটা দিব্যি রেঁধেছিল। এ ছাড়া রুই মাছের কালিয়া ছিল, রান্নাও ভালো হয়েছিল, কিন্তু লালমোহনবাবু খেলেন না। বললেন, 'মছলিবাবাকে দেখার পর থেকে আর মাছ খেতে মন চায় না মশাই।'

'কেন?' ফেলুদা বলল, 'খেলেই মনে হবে বাবাকে চিবিয়ে খাচ্ছেন? আপনার কি ধারণা বাবা নিজে মাছ খান না?'

'খান বুঝি?'

'শুনলেন ত বাবা জলেই থাকেন বেশির ভাগ সময়। জলে মাছ ছাড়া আর খাবার কী আছে বলুন। মাছেরাও যে মাছ খায় সেটা জানেন?'

লালমোহনবাবু চুপ মেরে গেলেন। আমার বিশ্বাস কাল থেকে উনি আবার মাছ খাবেন।

সারাদিনের নানারকম ঘটনার পর রাত্রে একটা লম্বা ঘুম দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু খানিকটা ব্যাঘাত করলেন রুম-মেট জীবনবাবু। জীবনবাবু মোটা, জীবনবাবু বেঁটে, জীবনবাবুর চাপ দাড়ি, আর জীবনবাবু বালিশে মাথা রাখার দশ মিনিটের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেন। ভদ্রলোক একটা ডাক্তারি কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ, দুদিন হল এসেছেন, কালই সকালে চলে যাবেন। ফেলুদার সঙ্গে পরিচয় হবার এক মিনিটের মধ্যে ব্যাগ খুলে কোম্পানির নাম খোদাই করা একটা ডট পেন ফেলুদাকে দিয়ে দিলেন—যদিও সেটা ওকে অদ্বিতীয় গোয়েন্দা বলে চিনতে পারার দরুণ কিনা বোঝা গেল না।

পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার মধ্যে আমরা তিনজন চানটান করে চা ডিম রুটি খেয়ে রেডি। বেরোবার মুখে নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ফেলুদা দুটো আজেবাজে কথার পর জিগ্যেস করল, 'মগনলাল মেঘরাজের বাড়িটা কোথায় জানেন?'

'মেঘরাজ? যদ্দুর জানি ওর দুটো বাড়ি আছে শহরে. দুটোই একেবারে হার্ট অফ কাশীতে। একটা বোধহয় জ্ঞানবাপীর উত্তর দিকের গলিটায়। আপনি ওখানে কাউকে জিগ্যেস করলেই দেখিয়ে দেবে। পরম ধার্মিক ত, তাই একেবারে খোদ বিশ্বনাথের ঘন্টা শুনতে শুনতে টাকার হিসেব করে!'

নিরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে আরেকটা খবর পেলাম। মছলিবাবা নাকি আর ক'দিন আছেন শহরে। কথাটা শুনে ফেলুদা শুধু ওর একপেশে হাসিটা হাসল, মুখে কিছু বলল না।

ঘড়ি ধরে আটটার সময় আমরা শংকরী নিবাসের গেটের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। ত্রিলোচনের চেহারাটা রাত্রে ভালো করে দেখিনি, আজ দিনের আলোতে গালপাট্টার বহর দেখে বেশ হকচকিয়ে গেলাম। বয়স সত্তর-টত্তর হবে নিশ্চয়ই, তবে এখনো মেরুদণ্ড একদম সোজা। আমাদের দেখেই হাসির সঙ্গে একটা স্মার্ট স্যালুট ঠুকে গেটটা খুলে দিল।

গাড়িবারান্দার দিকে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই বিকাশবাবু বেরিয়ে এলেন।

'জানালা দিয়ে দেখলাম আপনাদের ঢুকতে।' ভদ্রলোক বোধহয় সবেমাত্র দাড়ি কামিয়েছেন; বাঁ দিকের জুলপির নিচে এখনো সাবান লেগে রয়েছে। 'ভেতরে যাবেন? কর্তামশাই কিন্তু রেডি। আপনি ওঁর সঙ্গেই আগে কথা বলবেন ত?'

ফেলুদা বলল, 'তার আগে আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নোট করে নিতে চাই।'

'বেশ ত, বলুন না কী জানতে চান।'

বিকাশবাবুর কাছ থেকে কতকগুলো তারিখ নোট করে নিয়ে খাতায় যা দাঁড়াল তা এই—

১। মগনলাল উমানাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ১০ই অক্টোবর।

২। উমানাথবাবু তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে মছলিবাবা দর্শনে যান ১৫ই অক্টোবর সন্ধে সাড়ে সাতটায়। বাড়ি ফেরেন সাড়ে আটটার কিছু পরে। এই সময়ের মধ্যেই গণেশ চুরি যায়।

৩। ১৫ই অক্টোবর সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে শংকরী-নিবাসে ছিল—উমানাথবাবুর বাবা অম্বিকা ঘোষাল, বিকাশ সিংহ, অম্বিকাবাবুর বেয়ারা বৈকুণ্ঠ, চাকর ভরদ্বাজ, ঝি সৌদামিনী, ঠাকুর নিত্যানন্দ, মালী লক্ষ্মণ, তার বউ আর তাদের একটি সাত বছরের ছেলে, দারোয়ান ত্রিলোচন, প্রতিমার কারিগর শশী পাল ও তার ছেলে কানাই, আর প্রতিমার কাজে জোগান দেবার একজন লোক, নাম নিবারণ। এই এক ঘণ্টার মধ্যে বাইরে থেকে কেউ না এসে থাকলে বুঝতে হবে এদেরই মধ্যে কেউ না কেউ অম্বিকাবাবুর ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে গণেশ বার করে নিয়েছিল।

খাতায় নোট করা শেষ হলে ফেলুদা বিকাশবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'কিছু মনে করবেন না—এ ব্যাপারে ত কাউকে বাদ দেওয়া চলে না, কাজেই আপনাকেও—'

ফেলুদার কথা শেষ হবার আগেই বিকাশবাবু হেসে বললেন, 'বুঝেছি; এ ব্যাপারটা পুলিশের সঙ্গে এক দফা হয়ে গেছে। আমি সেদিন ওই এক ঘন্টা সময়টা কী করছিলাম সেটা জানতে চাইছেন ত?'

'হ্যাঁ—তবে তার আগে একটা প্রশ্ন আছে।'

'বলুন।—কিন্তু এখানে কেন, আমার ঘরে চলুন।'

বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে ডানদিকে দোতলায় যাবার সিঁড়ি, আর বাঁদিকে বিকাশবাবুর ঘর। বাকি কথা ঘরে বসেই হল।

ফেলুদা বলল, 'আপনি গণেশের কথাটা জানতেন নিশ্চয়ই।'

'অনেকদিন থেকেই জানি।'

'মগনলাল যেদিন উমানাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন সেদিন আপনি বাড়িতে ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমিই মগনলালকে রিসিভ করে বৈঠকখানায় বসাই। তারপর ভরদ্বাজকে দিয়ে দোতলায় মিস্টার ঘোষালের কাছে খবর পাঠাই।'

'তারপর?'

'তারপর আমি নিজের ঘরে চলে আসি।'

'দুজনের মধ্যে যে কথাকাটাকাটি হয়েছিল সেটা আপনি জানতেন?'

'না। আমার ঘর থেকে বৈঠকখানার কথাবার্তা কিছু শোনা যায় না। তাছাড়া আমার ঘরে তখন রেডিও চলছিল।'

'যেদিন গণেশটা চুরি গেল, সেদিনও কি আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন?'

'বেশির ভাগ সময়। মিস্টার ঘোষালরা যখন বাইরে যান তখন আমি ওঁদের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিই। ওখান থেকে যাই পুজোমণ্ডপে। শশীবাবুর কাজ দেখতে বেশ লাগে। সেদিন ভদ্রলোককে দেখে অসুস্থ মনে হল। জিগ্যেস করাতে বললেন শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। আমি ঘরে এসে ওষুধ নিয়ে ওঁকে দিয়ে আসি।'

'হোমিওপ্যাথিক কী? আপনার শেল্‌ফে দুটো হোমিওপ্যাথির বই দেখছি।'

'হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিক।'

'কী ওষুধ জানতে পারি?'

'পালসেটিলা থার্টি।'

'ওষুধ দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী করছিলেন ঘরে?'

'লখ্নৌ রেডিও থেকে আখতারি বাঈয়ের রেকর্ড দিচ্ছিল—তাই শুনছিলাম।'

'কতক্ষণ রেডিও শোনেন?'

'ওটা চালানোই ছিল। আমি ম্যাগাজিন পড়ছিলাম। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি।'

'তারপর মিস্টার ঘোষাল ফেরা না পর্যন্ত আর বাইরে বেরোন নি?'

'না। বেঙ্গলী ক্লাব কাবুলিওয়ালা থিয়েটার করছে; ওদের তরফ থেকে দুজনের আসার কথা ছিল মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দেখা করার জন্য—ওঁকে প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে। ওদের আসার অপেক্ষায় বসে ছিলাম।'

'ওরা এসেছিলেন?'

'অনেক পরে। নটার পরে।'

ফেলুদা দরজা দিয়ে দোতলায় যাবার সিঁড়িটার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনি যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে ওই সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছিল কি?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা দিয়ে কাউকে উঠতে বা নামতে দেখেছিলেন বলে মনে পড়ে?'

'না। তবে ওটা ছাড়াও আরেকটা সিঁড়ি আছে। পিছন দিকে। জমাদারের সিঁড়ি। সেটা দিয়ে কেউ উঠে থাকলে আমার জানার কথা নয়।'

বিকাশবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে আমরা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় অম্বিকাবাবুর ঘরে গেলাম।

জানালার ধারে একটা পুরোন আরাম কেদারায় বসে বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে স্টেট্‌সম্যান পড়ছেন। পায়ের আওয়াজ পেয়ে কাগজটা সরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে সোনার চশমার উপর দিয়ে ভ্রূকুটি করে আমাদের দিকে দেখলেন। ভদ্রলোকের মাথার মাঝখানে টাক, কানের দুপাশে ধপধপে সাদা চুল, দাড়ি গোঁফ কামানো, দু চোখের উপর কাঁচাপাকা মেশানো ঘন ভুরু।

বিকাশবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অম্বিকাবাবু মুখ খুলতেই বুঝলাম যে ওঁর দুপাটি দাঁতই ফল্‌স। কথা বলার সময় কিট্‌ কিট্‌ করে আওয়াজ হয়, মনে হয় এই বুঝি দাঁত খুলে পড়ল। প্রথমেই সোজা লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনারাও পুলিশ নাকি?' লালমোহনবাবু ভড়কে গিয়ে ঢোক গিলে বললেন, 'আমি? না না—আমি কিছুই না।'

'কিছুই না? এ আবার কিরকম বিনয় হল?'

'না। ইনিই, মানে, গো-গো—'

বিকাশবাবু এগিয়ে এসে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন।

'ইনি প্রদোষ মিত্র। গোয়েন্দা হিসেবে খুব নাম-ডাক। পুলিশ ত কিছুই করতে পারল না, তাই মিস্টার ঘোষাল বলছিলেন...'

অম্বিকাবাবু এবার সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন।

উমা কী বলেছে? বলেছে গণেশ গেছে বলে ঘোষাল বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে? ননসেন্স! ওর বয়স কত। চল্লিশ পেরোয়নি। আমার তিরাত্তর। ঘোষাল বংশের ইতিহাস সে আমার চেয়ে বেশি জানে? উমা ব্যবসায়ে উন্নতি করেছে সে কি গণেশের দৌলতে? নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি না থাকলে গণেশ কী করবে? আর তার যে বুদ্ধি সে কি গণেশ দিয়েছে? সে বুদ্ধি সে পেয়েছে

তার বংশের রক্তের জোরে। নাইনটিন টোয়েন্টিফোরে কেম্ব্রিজে ম্যাথমেটিকস্‌-এ ট্রাইপস করতে যাচ্ছিল অম্বিকা ঘোষাল—যাকে দেখছ তোমাদের সামনে। যাবার সাতদিন আগে পিঠে কারবাঙ্কল হয়ে যায় যায় অবস্থা। বাঁচিয়ে দিল না হয় গণেশ, কিন্তু বিলেত যাওয়া যে পন্ড হয়ে গেল চিরকালের জন্যে, তার জন্য কে দায়ী?...উমানাথের ব্যবসা বুদ্ধি আছে ঠিকই, তবে ওর জন্মানো উচিত ছিল একশো বছর আগে। এখন ত শুনেছি নাকি কোন্ এক বাবাজীর কাছে দীক্ষা নেবার মতলব করছে।'

'তার মানে আপনার গণেশটা যাওয়াতে কোনো আপসোস নেই?'

–অম্বিকাবাবু চশমা খুলে তার ঘোলাটে চোখ দুটো ফেলুদার মুখের উপর ফোকাস করলেন।

'গণেশের গলায় একটা হীরে বসানো ছিল সেটার কথা উমানাথ বলেছে?'

'তা বলেছেন।'

'কী হীরে তার নাম বলেছে?'

'না, সেটা বলেননি।'

'ঐ ত। জানে না তাই বলেনি। কৌস্তভ হীরের নাম শুনেছ?'

'সমুদ্র মন্থনের কি?'

ফেলুদার এই এককথায় অম্বিকাবাবু নরম হয়ে গেলেন। দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'অ, তুমি এ বিষয়ে কিছু আপটুডেট দেখছি। অত্যন্ত রেয়ার হীরে। আমার আপসোস হয়েছে কেন জান? শুধু দামী জিনিস বলে নয়; দামী ত বটেই; ওটার জন্য কত টাকা দিতে হয়েছিল শুনলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। আসল কথা হচ্ছে—ইট ওয়জ এ ওয়র্ক অফ আর্ট। এসব লাকটাক আমি বিশ্বাস করি না।'

'ওই টেবিলের দেরাজেই কি চাবিটা ছিল?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। অম্বিকাবাবুর আরাম কেদারা থেকে তিন-চার হাত দূরেই দুটো জানালার মাঝখানে টেবিলটা। এটা ঘরের দক্ষিণ দিক। সিন্দুকটা রয়েছে উত্তর-পশ্চিম কোণে। দুটোর মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড আদ্যিকালের খাট, তার উপর একটা ছ' ইঞ্চি পুরু তোষকের উপর শীতলপাটি পাতা। অম্বিকাবাবু ফেলুদার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে উল্টে আরেকটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'আমি সন্ধেবেলা নেশা করি সেটা উনি বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ফেলুদা এত নরমভাবে কারুর সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি। অম্বিকাবাবু বললেন, 'গণেশ নাকি চাইলে সিদ্ধি দেন; আমি খাই আফিং। সন্ধের পর আমার বিশেষ হুঁশ থাকে না। কাজেই সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আমার ঘরে কেউ এসেছিল কিনা সেকথা আমাকে জিগেস করে ফল হবে না।'

'আপনার চেয়ার এখন যে ভাবে রাখা রয়েছে, সন্ধেবেলাও কি সেইভাবেই থাকে?'

'না। সকালে কাগজ পড়ি, তাই জানালা থাকে আমার পিছনে। সন্ধের আকাশ দেখি, তাই জানালা থাকে সামনে।'

'তাহলে টেবিলের দিকে পিঠ করা থাকে। তার মানে ওদিকের দরজা দিয়ে কেউ এলে দেখতেই পাবেন না।'

'না।'

ফেলুদা এবার টেবিলটার দিকে এগিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে টান দিয়ে দেরাজটা খুলল। কোনো শব্দ হল না। বন্ধ করার বেলাতেও তাই।

এবার ও সিন্দুকটার দিকে এগিয়ে গেল। চৌকির উপরে রাখা পেল্লায় সিন্দুকটা প্রায় আমার বুক অবধি পৌঁছে গেছে।

'পুলিশ নিশ্চয়ই এটার ভিতর ভালো করে খুঁজে দেখেছে?'

বিকাশবাবু বললেন, 'তা তো খুঁজেইছে, আঙুলের ছাপের ব্যাপারেও পরীক্ষা করে দেখেছে, কিছুই পায়নি।'

অম্বিকাবাবুর ঘরের দরজা দিয়ে বেরোলে ডাইনে পড়ে নিচে যাবার সিঁড়ি, আর বাঁয়ে একটা ছোট্ট ঘর। ঘরটা দিয়ে ডান দিকে বেরিয়ে একটা

চওড়া শ্বেত পাথরে বাঁধানো বারান্দা। এটা বাড়ির দক্ষিণ দিক। পুব দিকে বাগানের নিম আর তেঁতুল গাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে গঙ্গার জল সকালের রোদে চিক্‌চিক্‌ করছে। আমাদের সামনে আর ডাইনে বেনারস শহর ছড়িয়ে আছে। আমি মন্দিরের চূড়ো গুনছি, ফেলুদা বিকাশবাবুকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা মুখে পুরেছে, এমন সময় ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে উপর দিক থেকে কী যেন একটা জিনিস পাক খেতে খেতে নেমে এসে লালমোহনবাবুর পাঞ্জাবির উপর পড়ল। লালমোহনবাবু সেটা খপ্‌ করে ধরে হাতের মুঠো খুলতেই দেখা গেল সেটা আর কিছুই না—একটা চুইংগামের র‍্যাপার।

'রুক্মিণীকুমার ছাতে আছেন বলে মনে হচ্ছে?' ফেলুদা বলল।

'আর কোথায় থাকবে বলুন', বিকাশবাবু হেসে বললেন, 'তার ও এখন বন্দী অবস্থা। আর তাছাড়া ছাতে তার একটি নিজস্ব ঘর আছে।'

'সেটা একবার দেখা যায়?'

'নিশ্চয়ই। সেই সঙ্গে চলুন পিছনের সিঁড়িটাও দেখিয়ে দিই।'

একরকম লোহার সিঁড়ি হয় যেগুলো বাড়ির বাইরের দেয়াল বেয়ে পাক খেয়ে উপরে উঠে যায়। এটা দেখলাম সেরকম সিঁড়ি নয়। এটা ইঁটের তৈরি, আর বাড়ির ভিতরেই। তবে এটাও পাকানো সিঁড়ি। ওঠবার সময় ঠিক মনে হয় কোনো মিনার বা মনুমেন্টে উঠছি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই ছাতের ঘর, আর বাঁ দিকে ছাতে যাবার দরজা। ঘরের ভিতরে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে রুকু। একটা লাল-সাদা পেটকাটি ঘুড়ি মাটিতে ফেলে হাঁটুর চাপে সেটাকে ধরে রেখে তাতে সুতো পরাচ্ছে। আমাদের আসতে দেখেই কাজটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল। আমরা চারজনে ছোট্ট ঘরটাতে ঢুকলাম।

বোঝাই যায় এটা রুকুর খেলার ঘর—যদিও রুকুর জিনিস ছাড়াও আরো অনেক কিছু কোণঠাসা করে রাখা রয়েছে—দুটো পুরোনো মর্চে ধরা ট্রাঙ্ক, একটা প্যাকিং কেস, একটা ছেঁড়া মাদুর, তিনটে হ্যারিকেন লন্ঠন, একটা কাৎ করা লেকাই জালা, আর কোণে ডাঁই করা পুরোন খবরের কাগজ আর মাসিক পত্রিকা।

'তুমি গোয়েন্দা?'

ফেলুদার দিকে সটান একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রুকু। আজ দেখছি ফরসা রংটা রোদে পুড়ে যেন একটু তামাটে লাগছে। তার মুখে যে চুইংগাম রয়েছে সেটা তার চোয়াল নাড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ফেলুদা হেসে বলল, 'খবরটা ক্যাপ্টেন স্পার্ক কি করে পেলেন সেটা জানতে পারি?'

'আমার অ্যাসিসট্যান্ট বলেছে,' গম্ভীর ভাবে জানাল রুকু। সে আবার

ঘুড়ির দিকে মন দিয়েছে।

'কে তোমার অ্যাসিসট্যান্ট?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'স্পার্কের অ্যাসিসট্যান্ট যে স্যারজেন্ট মিটা জান না? তুমি কিরকম গোয়েন্দা!'

লালমোহনবাবু ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে তাঁর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'ক্ষুদিরাম রক্ষিত। সাড়ে চার ফুট হাইট। স্পার্কের ডান হাত।'

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলল, 'কোথায় আছে তোমার অ্যাসিসট্যান্ট?'

উত্তরটা এল বিকাশবাবুর কাছ থেকে। ভদ্রলোক একটা অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, 'ও ভূমিকাটা এখন আমাকেই পালন করতে হচ্ছে।'

'তোমার রিভলভার আছে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল রুকু।

'আছে,' বলল ফেলুদা।

'কী রিভলভার?'

'কোল্ট।'

'আর হারপুন?'

'উঁহু। হারপুন নেই।'

'তুমি জলের তলায় শিকার করো না?'

'এখন পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি।'

'তোমার ছোরা আছে?'

'ছোরাও নেই। এমনকি এরকম ছোরাও নেই।'

রুকুর মাথার উপরেই দেয়ালে পেরেক থেকে একটা খেলার ছোরা ঝুলছে। এটাই কাল ওর কোমরে বাঁধা দেখেছিলাম।

'ওই ছোরা আমি শয়তান সিং-এর পেটে ঢুকিয়ে ওর নাড়িভুঁড়ি বার করে দেব।'

'সে ত বুঝলাম,' ফেলুদা রুকুর পাশে মেঝেতে বসে পড়ে বলল, 'কিন্তু তোমাদের বাড়ির সিন্দুক থেকে যে একজন শয়তান সিং একটা সোনার গণেশ চুরি করে নিয়ে গেল তার কী হবে?'

'শয়তান সিং এবাড়িতে ঢুকতেই পারবে না।'

'ক্যাপ্টেন স্পার্ক সেদিন মছলিবাবাকে দেখতে না গেলে এ ব্যাপারটা হত না—তাই না?'

'মছলিবাবার গায়ের রংটা কঙ্গোর গঙ্গোরিলার মতো কালো।'

'সাবাস!' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু, 'তুমি গোরিলার গোগ্রাস পড়েছ রুকুবাবু?'

গণ্ডারিয়া যে লালমোহনবাবুরই লেখা গোরিলার গোগ্রাস-এর নব্বই ফুট লম্বা অতিকায় রাক্ষুসে গোরিলার নাম সেটা আমি জানতাম। গল্পের আইডিয়াটা কিং কং থেকে নেওয়া, সেটা লালমোহনবাবু নিজেও স্বীকার করেন। জটায়ুর বর্ণনায় গোরিলার গায়ের রং ছিল কষ্টিপাথরে আলকাতরা মাখালে যেরকম হয় সেইরকম। লালমোহনবাবু 'ও বইটা আসলে আম—' বলেই ফেলুদার কাছ থেকে একটা কড়া ইশারা পেয়ে থেমে গেলেন।

রুকু বলল, 'গণেশ ত একজন রাজার কাছে আছে। শয়তান সিং পাবেই না। কেউ পাবে না। ডাকু গণ্ডারিয়াও পাবে না।'

'আবার অক্রূর নন্দী!'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন জটায়ু।

বিকাশবাবু হেসে বললেন, 'ওর কথার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে আগে রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ গুলে খেতে হবে।'

ফেলুদা এখনও মাটিতে বসে আড়চোখে রুকুর দিকে চেয়ে আছে, তার ভাব দেখে মনে হয় যেন সে রুকুর আজগুবী কথাগুলোর ভিতর থেকে আসল মানুষটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। রুকু তার কথার মধ্যেই দিব্যি ঘুড়িতে সুতো লাগিয়ে চলেছে। এবার ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'কোথাকার রাজার কথা বলছ তুমি রুকু?'

উত্তর এল—'আফ্রিকা।'

ঘোষালবাড়ি থেকে চলে আসার আগে আমরা আরেকজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি হলেন শশিভূষণ পাল। শশীবাবু নারকোলের মালায় হলদে রং নিয়ে নিজের তৈরি তুলি দিয়ে কার্তিক ঠাকুরের গালে লাগাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স ষাট পঁয়ষট্টি হবে নিশ্চয়ই, রোগা প্যাকাটি চেহারা, চোখে পুরু কাচের চশমা। ফেলুদা জিগ্যেস করাতে বললেন উনি নাকি ষোল বছর বয়স থেকে এই কাজ করছেন। ওঁর আদি বাড়ি ছিল কৃষ্ণনগর, ঠাকুরদাদা অধর পাল নাকি প্রথম কাশীতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন সিপাহী বিদ্রোহের দু' বছর পরে। শশীবাবু থাকেন গণেশ মহল্লায়। সেখানে নাকি ওঁরা ছাড়াও আরো কয়েকঘর কুমোর থাকে। ফেলুদা বলল, 'আপনার জ্বর হয়েছিল শুনলাম; এখন ভাল আছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সিংহি মশাইয়ের ওষুধে খুব উপকার হয়েছিল।'

শশীবাবু কথা বলছেন, কিন্তু কাজ বন্ধ করছেন না।

আপনার কাজ শেষ হচ্ছে কবে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আজ্ঞে পরশুই ত ষষ্ঠী। কাল রাত্তিরের ভেতরই হয়ে যাবে। বয়স হয়ে গেল ত, তাই কাজটা একটু ধরে করতে হয়।'

'তাও আপনার তুলির টানে এখনো দিব্যি জোর আছে।'

'আজ্ঞে এ কথা আপনি বলছেন, আর, আরেকবছর এই দুর্গাঠাকুর দেখেই ওই একই কথা বলেছিলেন কলকাতার আর্ট ইস্কুলের একজন শিক্ষক। এ জিনিসের কদর আর কে করে বলুন। সবাই ঠাকুরই দেখে, হাতের কাজটা আর ক'জন দেখে!'

'বিকাশবাবু যেদিন আপনাকে ওষুধ দেন, সেদিনই সন্ধ্যায় বাড়ির দোতলায় সিন্দুক থেকে একটা জিনিস চুরি যায়। এ খবর আপনি জানেন?'

শশীবাবুর হাতের তুলিটা যেন একমুহূর্তের জন্য কেঁপে গেল। গলার সুরটাও যেন একটু কাঁপা। বললেন—

'আজ পঞ্চাশ বছর হল প্রতি বছর এসে এই একই কাজ করে যাচ্ছি এই ঘোষালবাড়িতে, আর আমায় কিনা এসে পুলিশে জেরা করল! হাতে তুলি নিলে আমার আর কোনো হুঁশ থাকে না, জানেন, নাওয়া খাওয়া ভুলে যাই! আপনি জিগ্যেস করুন সিংহি মশাইকে, উনি ত মাঝে মাঝে এসে দাঁড়িয়ে দেখেন। আপনি খোকাকে জিগ্যেস করুন। সেও ত এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখে আমার কাজ। কই বলুন ত তাঁরা—আমি ঠাকুরের সামনে ছেড়ে একটা মিনিটের জন্যে কোথাও যাই কি না!'

শশীবাবুর সঙ্গে আরেকটি বছর কুড়ির ছেলে কাজ করছে। জানলাম ইনিই হলেন শশীবাবুর ছেলে কানাই। কানাইকে তার বাপের একটা ইয়াং সংস্করণ বলা চলে। কাজ দেখলে মনে হয় সে বংশের ধারা বজায় রাখতে পারবে। কানাই নাকি গণেশ চুরির দিন সাতটার পরে ঠাকুরের সামনে ছেড়ে কোথাও যায়নি।

বিকাশবাবু আমাদের সঙ্গে গেট অবধি এলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনাদের বাড়িতে এখন অনেক লোক তাই আর উমানাথবাবুকে বিরক্ত করলাম না। আপনি শুধু বলে দেবেন যে আমি হয়ত মাঝে মাঝে এসে একটু ঘুরে টুরে দেখতে পারি, প্রয়োজন হলে একে-ওকে দু'একটা প্রশ্ন করতে পারি।'

বিকাশবাবু বললেন, 'মিস্টার ঘোষাল যখন আপনার উপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছেন তখন ত আপনার সে অধিকার আছেই।'

বেরোবার মুখে একটা শব্দ পেয়ে ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখটাও বাড়ির ছাতের দিকে চলে গেল।

রুকু তার লাল-সাদা পেটকাটিটা সবে মাত্র উড়িয়েছে। সুতোর টানে ঘুড়িটাই হাওয়া কেটে ফরফর শব্দ করছে। রুকুকে এখান থেকে দেখতে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে তার লাটাই সমেত হাত দুটো মাঝে মাঝে ছাতের পাঁচিলের উপর দিয়ে উঁকি মারছে।

'ছেলেটিকে খুব একা বলে মনে হয়,' ফেলুদা ঘড়িটার দিকে চোখ রেখে বলল। 'সত্যিই কি তাই?'

বিকাশবাবু বললেন, 'রুকু উমানাথবাবুর একমাত্র ছেলে। এখানে ত তবু একটি বন্ধু হয়েছে। আপনি ত দেখেছেন সুরথকে। কলকাতায় ওর সমবয়সী বন্ধু একটিও নেই।'

পাঁচ

এখানে এসে অবধি বেশির ভাগ সময়টা ঘরে বসে বাঙালীদের সঙ্গে কথা বলে মাঝে ভুলে যেতে হচ্ছিল যে আমরা কাশীতে এসেছি। এখন সাইকেল রিকশা, টাঙ্গা আর লোকের ভীড় বাঁচিয়ে মদনপুরা রোড দিয়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আবার কাশীর মেজাজটা ফিরে পেলাম। বড় রাস্তার গোলমাল এড়িয়ে হোটেলে যাবার শর্টকাটের গলিটাতে ঢুকলাম আমরা তিনজনে। লালমোহনবাবু একটা ছাগলের বাচ্চার পিঠে ছাতা দিয়ে একটা ছোট্ট খোঁচা মেরে বললেন, 'আমার একটা ব্যাপার কী জানেন ফেলুবাবু—কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও গেলেই সেই জায়গার মেজাজটা আমাকে কেমন যেন পেয়ে বসে। সেবার রাজস্থান গিয়ে খালি খালি নিজেকে রাজপুত বলে মনে হচ্ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে মাথায় হাত দিয়ে পাগড়ির বদলে টাক ফীল করে রীতিমত চমকে চমকে উঠছিলুম।'

'এখানে এসে কি জটার অভাব ফীল করে চমকে চমকে উঠছেন?'

'ঘাটে গিয়ে যে একটু বৈরাগী-বৈরাগী ভাব হয় নি তা বলতে পারি না। আবার এই সব অলিগলিতে ঢুকলে মনে হয় কোমরে একটা ছোরা থাকলে হাতলটাতে মাঝে মাঝে বেশ হাত বোলানো যেত।'

আমি কিন্তু কালকের সেই লোকটাকে আবার দেখেছি। আমি জানি শংকরী-নিবাস থেকে বেরোবার কিছু পরেই সে আমাদের পিছু নিয়েছে। কিন্তু কালকে ফেলুদার ঢিলেঢালা ভাবের পর আজ আর কিছু বলতে পারছি না। সকালবেলা গলিতে বিস্তর লোক—কেউ স্নান করে ফিরছে, কেউ বাজার থেকে ফিরছে, কিছু বুড়ো দাওয়ায় বসে আড্ডা মারছে, এখানে ওখানে বাচ্চার দল হইহল্লা করছে—তারই মধ্যে পিছন ফিরলে চাপা পায়জামার উপর গাঢ় বেগুনী চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিশ-ত্রিশ হাত পিছনে সমানে আমাদের ফলো করে চলেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনার এই গণেশের মামলাটি বিলক্ষণ ডিফিকাল্ট বলে মনে হচ্ছে মশাই।'

ফেলুদা বলল, কোনো মামলা একটা বিশেষ অবস্থায় পৌঁছানোর আগে সেটা সহজ কি কঠিন তা বোঝা সম্ভব নয়। আপনার কি ধারণা সেই স্টেজ

পৌঁছে গেছে?'

'যায় নি বুঝি?'

'একেবারেই না।'

'কিন্তু যিনি আসল ভিলেন, তাঁর পক্ষে তো ও জিনিস চুরি করার কোনো স্কোপই ছিল না।'

'কাকে ভিলেন ভাবছেন আপনি?'

'কেন, ওই যে মেঘরাম না মেঘলাল না কী নাম বললে। যাকে দেখলুম মছলিবাবার ওখানে।'

'আপনার কি ধারণা মেঘরাজ গণেশ চুরি করার জন্য নিজেই পাঁচিল টপকে ঘোষাল বাড়িতে ঢুকবেন?'

'এজেন্ট লাগাবে বলছেন?'

'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? আর তা ছাড়া গে শাসিয়ে গেছে বলে যে সে-ই চুরি করেছে এমন তো নাও হতে পারে।'

লালমোহনবাবু একটুক্ষণ চুপ মেরে হঠাৎ যেন শিউরে উঠে বললেন, 'ওরকম কাঁধ দেখিনি মশাই। না জানি সামনের দিক থেকে কি রকম দেখতে। ওর মাথায় এক জোড়া শিং লাগিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে ছেড়ে দিলে নির্ঘাৎ ঢুঁ মারবে।'

ক্যালকাটা লজে ঢুকে সামনেই আপিসঘর। ম্যানেজারের চেয়ার ছাড়া আরো তিনটে চেয়ার আর একটা বেঞ্চি আছে। সেগুলোতে দু-তিনজন করে নিরঞ্জনবাবুর আলাপী লোক প্রায় সব সময়ই বসে আড্ডা মারে। আজ ঢুকে দেখলাম নিরঞ্জনবাবুর উল্টো দিকে একজন প্যান্ট-শার্ট পরা বেশ জোয়ান লোক বসে চা খাচ্ছেন, আর হাত নেড়ে নিরঞ্জনবাবুকে কী যেন বোঝাচ্ছেন। আমাদের ঢুকতে দেখেই ম্যানেজার মশাই পানমুখে একগাল হেসে বললেন, 'এই যে—ইনি আপনার জন্য প্রায় কুড়ি মিনিট বসে। আলাপ করিয়ে দিই —সাব-ইন্‌স্পেক্টর তেওয়ারি—আর ইনি—'

নিরঞ্জনবাবু পর পর আমাদের তিনজনের নাম বলে বললেন, 'ভয় নেই—হিন্দী বলতে হবে না—ইনি দিব্যি বাংলা বলেন।'

তেওয়ারি ফেলুদার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। চোখের কোণে হাসি এই এলো বলে, আর ফেলুদার চোখে ভ্রূকুটি, সেটাও মনে হচ্ছে একটা হাসির অপেক্ষায় রয়েছে।

'সে কি মশাই'—ফেলুদার ভ্রূকুটি হাওয়া—'আপনি এলাহাবাদে ছিলেন না?'

দারোগা সাহেব ঝকঝকে দাঁত বার করে হেসে ফেলুদার হাত ধরে

ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'আমি শিওর ছিলাম না আপনি চিনবেন কি না।'

'চেনা মুশকিল। গোঁফটা যা ছিল তার চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে। রোগাও হয়েছেন বেশ খানিকটা।'

ভদ্রলোক ফেলুদার সমান লম্বা আর গড়নেও ফেলুদারই মতো ছিমছাম। বছর দুএক আগে এলাহাবাদে ফেলুদার একটা কেস পড়েছিল। পুলিশ প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুদা দু-দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে দিয়ে চার দিনের ভিতর কলকাতায় ফিরে এসেছিল। বুঝলাম সেইবারেই তেওয়ারির সঙ্গে আলাপ হয়।

'আমি মিস্টার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলাম কাল রাত্রে আপনি চলে আসার পর। তখনই শুনলাম আপনি এসেছেন আর কালকাটা লজে আছেন।'

নিরঞ্জনবাবু চায়ের অর্ডার দিয়েছেন, আমরা তিনজনে বসলাম। ফেলুদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক্‌!—মিস্টার ঘোষাল পুলিশের কথা বলাতে আমার একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল; এখন আপনাকে দেখে অনেকটা হালকা লাগছে। আপনার সঙ্গে ক্ল্যাশ হবে না। আর মনে হয় দুটো মাথা এক করলে বোধ হয় কাজের সুবিধেই হবে। বেশ গোলমেলে ব্যাপার—তাই না মশাই?'

তেওয়ারি একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ সো গোলমেলে যে আমি তো আপনাকে এখানে বারণ করতে।'

'কেন বলুন তো?'

'মগনলাল যে ব্যাপারে আছে, সে ব্যাপারে এই হচ্ছে আমার অ্যাডভাইস। আপনি দুদিন গেলেন মিস্টার ঘোষালের বাড়ি, তার জন্য আমার খুব ভাবনা হচ্ছে। আপনাকে খুব সাবধান থাকতে হবে। ওর স্পাই আর ভাড়াটে গুণ্ডা সারা বেনারস শহরে ছড়িয়ে আছে।'

হরকিষণ চা নিয়ে এল। ফেলুদা চিন্তিতভাবে একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, 'কিন্তু মগনলাল যে এ ব্যাপারে সত্যিই জড়িত সে সম্বন্ধে আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

মিস্টার তেওয়ারি ভুরুটো কুঁচকে বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে টেবিলের উপর কয়েকটা টোকা মেরে বললেন, 'আমরা যে লাইনে ইনভেস্টিগেশন করছি, তাতে মগনলালকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। ওর মতো কানিং লোক আর নেই।'

'আপনারা কোন লাইনে তদন্ত চালাচ্ছেন সেটা......

'বলছি আপনাকে। আপনার কাছে আমি কিছুই লুকোব না। ঘোষাল-বাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে কি?'

'চাকর-বাকর বাদে আর মোটামুটি সকলের সঙ্গেই হয়েছে।'

'শশীবাবুকে দেখেছেন তো?'

'হ্যাঁ, দেখেছি বই কি। আজই সকালে তার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'ওর ছেলেটিকে দেখেছেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ—সেও তো কাজ করছিল।'

'কিন্তু শশীবাবুর আরেকটি ছেলে আছে সেটা জানেন?'

এ খবরটা অবিশ্যি আমরা কেউই জানতাম না।

'এ ছেলেটির নাম নিতাই। ভেরি ব্যাড টাইপ। আঠারো বছর বয়েস, আর এ বয়সে যত খারাপ দোষ থাকতে পারে সবই আছে। আমরা এখনো কোনো প্রমাণ পাইনি, কিন্তু ধরুন, যদি সে মগনলালের খপ্পরে পড়ে থাকে—'

ফেলুদা হাত তুলে বলল, 'বুঝেছি। মগনলাল নিতাইকে হাত করবে, নিতাই হয় তার বাপকে না হয় দাদাকে ধমকি দিয়ে তাদের সিন্দুক খুলিয়ে গণেশ চুরি করাবে।'

'এগ্‌জ্যাক্টলি,' বললেন মিস্টার তেওয়ারি। 'নিতাইয়ের ব্যাপারটা জানার পর থেকেই মনে হচ্ছে একটা রাস্তা পাওয়া গেছে। আমার অ্যাডভাইস আপনি এখন চুপচাপ থাকুন। দসেরা টাইমে বেনারসে অনেক কিছু দেখবার আছে—সেই সব দেখুন, কিন্তু ঘোষালবাড়িতে বেশী যাতায়াত করবেন না।'

ফেলুদা অল্প হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

'আপনারা মছলিবাবা সম্বন্ধে কোনো তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করছেন না?'

তেওয়ারি হাতের কাপটা টেবিলের উপর রেখে একটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, 'আপনাদের এর ভিতরেই মছলিবাবা দর্শন হয়ে গেছে? কী মনে হল?'

'তদন্তের কথা যখন তুললাম, তখন বুঝ যে একটা ভক্তি জাগেনি মনে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

'সে তো আপনার কথা হল, কিন্তু আপনি তার ভক্তদের দেখেছেন? আপনি ইনভেস্টিগেশনের কথা বলছেন—খোলাখুলি ভাবে কিছু করতে গেলে ওরা আমাদের আস্ত রাখবে?'

কথাটা বলে মিস্টার তেওয়ারি আড়চোখে নিরঞ্জনবাবুর দিকে চাইতে ভদ্রলোক হাত তুলে বলে উঠলেন, 'আমার দিকে কী দেখছেন মশাই! আমাদের ভক্তি মানে কী? ভক্তিটক্তি কিছু না—মছলিবাবা হলেন আমাদের ছকে ফেলা একঘেয়ে জীবনে সামান্য একটু বৈচিত্র্যের ছিটেফোঁটা—ব্যস্।'

ফেলুদা বলল, 'একটা জিনিস আপনি করতে পারেন মিস্টার তেওয়ারি—হরিদ্বার আর এলাহাবাদে খবর নিয়ে দেখতে পারেন সেখানে গত মাস-খানেকের মধ্যে মছলিবাবা নামে কোনো সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল

কি না।'

'ভেরি গুড। এটা করতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি দু'দিনের মধ্যে আপনাকে ইনফরমেশন এনে দেব।'

দারোগা সাহেব ঘাড় দেখে উঠে পড়লেন। দরজার মুখে ভদ্রলোক ফেলুদার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'একদিন ঢোকে আমাদের থানায় আসুন না। কি রকম কাজ হচ্ছে দেখে যান। আর—' তেওয়ারি গম্ভীর—'আমি আপনাকে সিরিয়াসলি বলছি—আপনি যত ইচ্ছে হলিডে করুন, কিন্তু এ বেপারে জড়াবেন না।'

দুপুরের ডাল ভাত কপির তরকারি মাছের ঝোল আর দইয়ের সঙ্গে জিলিপি খেয়ে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পান কিনলাম। লালমোহনবাবুকে এমনিতে কখনো পান খেতে দেখিনি; এখানে দেখলাম সাত রকম মশলা দেওয়া রুপোর তবক দিয়ে মোড়া একটা প্রকাণ্ড পান চার আঙুল দিয়ে ঠেলে মুখের ভিতর পুরে দিব্যি চিবোতে লাগলেন। আমরা কোনো বিশেষ জায়গায় যাবো বলে বেরিয়েছি কিনা জানি না, কারণ ফেলুদা কিছু বলেনি। লালমোহনবাবু একবার আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার দাদা বোধ হয় সেই হালুইকরের দোকানে গিয়ে রাবড়ি খাবেন।' আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম—যদিও সেটা আমি মুখে প্রকাশ করলাম না। ফেলুদাকে অনুসরণ করে আমরা হোটেলের উল্টো দিকে একটা গলিতে ঢুকে এগিয়ে চললাম।

একটু এগিয়ে বুঝতে পারলাম এদিকটায় বাঙালীর নামগন্ধ নেই। লালমোহনবাবু চাদরটিকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনি চোখ, কান আর নাকের কথা বললেন, কিন্তু টেমপারেচারের কথা তো বললেন না। এদিকটায় বেশ শীত শীত লাগছে মশাই।'

দু-দিকে তিন তলা চার তলা বাড়ি উঠে গেছে, আর তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে গলি। সূর্যের আলো প্রায় পৌঁছায় না বললেই চলে। ফেলুদা বলল বেনারসের গলির বেশির ভাগ বাড়িই নাকি দেড়শো থেকে দুশো বছরের পুরোনো। রাস্তার দু-দিকের দেয়ালে যেখানে সেখানে ছবি আঁকা—হাতি, ঘোড়া, বাঘ, টিয়া, ঘোড়সওয়ার। কারা কখন এঁকেছে জানি না, কিন্তু দেখতে বেশ লাগে। মাঝে মাঝে এক একটা হাতে-লেখা হিন্দি বিজ্ঞাপন—তার মধ্যে 'নওজোয়ান বিড়ি' সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

এতক্ষণ চারদিকে বেশ চুপচাপ ছিল—এবার ক্রমে ক্রমে কানে নানারকম নতুন শব্দ আসতে আরম্ভ করল। তার মধ্যে সব ছাপিয়ে উঠছে ঘণ্টার শব্দ। ঘণ্টার ফাঁকগুলো ভরিয়ে রেখেছে যে শব্দটা তাকেই বলা হয় কোলাহল।

ফেলুদা বলে এই কোলাহল জিনিসটা খুব মজার। হাজার লোক এক জায়গায় রয়েছে, সবাই নিজেদের মধ্যে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলছে, কেউ গলা তুলছে না, অথচ সব মিলিয়ে যে শব্দটা হচ্ছে তাতে কান ফেটে যাবার জোগাড়।

এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা ষাঁড় আমাদের সামনে পড়েছে, আর প্রতিবারেই লালমোহনবাবু বলে উঠেছেন, 'ওই দেখুন, মেঘরাম!' শেষটায় ফেলুদা বলতে বাধ্য হল যে তার ধারণা মেঘরাজের চেয়ে ষাঁড় জিনিসটা অনেক বেশী নিরীহ এবং নিরাপদ।—'আমি মশাই একজন ডাকসাইটে প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে মনে উৎসাহ আনার চেষ্টা করছি, আর আপনি বার বার ষাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করে তাকে খাটো করছেন!'

চোখ, কান আর নাককে একসঙ্গে আক্রমণ করতে বিশ্বনাথের গলির মতো আর কিছু আছে কিনা জানি না। এখানে এসে আর নিজের ইচ্ছেমতো হাঁটা যায় না; ভীড় যে দিকে নিয়ে যায় সেই দিকে যেতে হয়। আমরাও এগিয়ে চললাম ভীড়ের সঙ্গে। 'দর্শন হবে বাবু?' 'বাবু বিশ্বনাথ দর্শন হবে?' পাণ্ডারা চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। ফেলুদা নির্বিকার। আমরা তিনজনেই তাদের কথায় কান না দিয়ে যন্দুর পারি ধাক্কা বাঁচিয়ে পকেট বাঁচিয়ে রাস্তার পিছল জায়গাগুলো বাঁচিয়ে এগিয়ে চললাম। লালমোহনবাবুর মনে যতই ভক্তিভাব জাগুক না কেন, ওঁর চোখ কিন্তু চলে গেছে মন্দিরের সোনায় মোড়া চুড়োর দিকে। একবার ফেলুদাকে কী যেন প্রশ্নও করলেন চুড়োর দিকে আঙুল দেখিয়ে। গোলমালে কী বললেন শুনতে পেলাম না, তবে 'ক্যারেট' কথাটা কানে এল। চুড়োর দিকে চাইতে গিয়েই চোখে পড়ল আকাশে দশ-বারোটা চিল চক্কর দিচ্ছে, আর তারই এক পাশে একটা লাল-সাদা পেটকাটি ঘুড়ি গোঁৎ খেয়ে মন্দিরের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেলুদাও ঘুড়িটাকে দেখেছে।

আমরা দুজন ফেলুদারই পিছন পিছন আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম—যদি আবার ঘুড়িটাকে দেখা যায়। হ্যাঁ—এই ত আবার দেখা যাচ্ছে—লাল-সাদা পেটকাটি। ওই তো উপর দিকে উঠল, আর ওই তো আবার গোঁৎ খেয়ে নিচের দিকে নেমে একটা চারতলা বাড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'মোস্ট ইন্টারেস্টিং...'

চাপা গলায় বললেও, ফেলুদার ঠিক পাশেই থাকায় ওর কথাটা আমি শুনতে পেলাম।

লালমোহনবাবু বললেন, 'শুধু ইন্টারেস্টিং কেন বলছেন মশাই—আমার কাছে তো ডিস্টার্বিং বলেও মনে হচ্ছে। মানে, ঘুড়িটার কথা বলছি না। চারদিকে এত দাড়ি আর জটার মধ্যে মেঘরাজের কত স্পাই ঘোরাফেরা করছে ভাবতে পারেন? একটি লোক তো আপনার দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না।

আমি আড়চোখে ওকে লক্ষ করে যাচ্ছি প্রায় তিন মিনিট ধরে।'

ফেলুদা আকাশের দিক থেকে চোখ না নামিয়েই বলল, 'গোঁফ-দাড়ি-জটা-যষ্টি-কমণ্ডুল, আর গায়ে টাটকা নতুন-কেনা হিন্দি নামাবলী তো?'

'ফুল মার্কস,' বললেন জটায়ু।

আমরা আবার এগিয়ে গেলাম। সামনেই একটা ষাঁড়ের পিছনে একটা সিঁদুর আর জবাফুলে বোঝাই দোকানের পাশে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। ফেলুদা তার সামনে এসে বেশ জোর গলায় বলল, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ!' আমার হাসি পেলেও একদম চেপে গেলাম।

বিশ্বনাথ থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম জ্ঞানবাপী। এখানেই অওরঙ্গজেবের মসজিদ, আর এখানেই সেই প্রকাণ্ড খোলা চাতাল। চাতালটায় এসে আবার আকাশের দিকে চাইতে আর ঘুড়িটা দেখতে পেলাম না।

উত্তর দিকে যেখানে চাতালটা শেষ হয়েছে সেখান দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে রাস্তায়—কারণ চাতালটা রাস্তার চেয়ে প্রায় আট-দশ হাত উঁচুতে। ফেলুদা কী মতলবে বেরিয়েছে সেটা নিয়ে আমার মনে যে সন্দেহটা ছিল, এখন দেখলাম লালমোহনবাবুও সেই একই সন্দেহ করছেন।

'আপনি কি মশাই মেঘরাজের বাড়ি যাবার তাল করছেন নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'আমার আরাধ্য দেবতা আর কে আছে বলুন। ক্রাইম না থাকলে তো ফেলু মিত্তিরের রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং এখানকার সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যালের মন্দিরটা একবার দেখে যাব না?'

দিনের বেলা চারদিকে শরৎকালের ঝলমলে রোদ আর লোকের ভিড় বলে হয়ত ফেলুদার কথায় অতটা শিউরে উঠলাম না; তবে ওই এক কথায় বুকের ঘড়িটায় দম দেওয়া হয়ে গেছে, আর ধুকপুক শুরু হয়ে গেছে।

এখানে গোলমাল কম, তাই লালমোহনবাবু পরের প্রশ্নটা গলা নামিয়ে করতে পারলেন।

'আপনার অস্ত্রটি সঙ্গে নিয়েছেন তো?'

'কোন্ অস্ত্রটার কথা বলছেন? রিভলভার নিইনি। বাকি তিনটে সব সময় সঙ্গেই থাকে।'

লালমোহনবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফেলুদার দিকে চাইতে গিয়ে একটা হোঁচট খেয়ে কোনমতে সামলে নিয়ে আর কিছু বললেন না। ভদ্রলোকের বোঝা উচিত ছিল যে ফেলুদার তিনটে স্বাভাবিক অস্ত্র হল ওর মস্তিষ্ক, স্নায়ু আর মাংসপেশী। এর মধ্যে প্রথমটা অবিশ্যি আসল।

সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে সামনেই একটা দরজির দোকান। দোকানের সামনেই বসে একটা লোক পায়ে করে সেলাইয়ের কল চালাচ্ছে। ফেলুদা তাকে জিগ্যেস করতেই লোকটা মগনলাল মেঘরাজের বাড়ি বাতলে দিল। রাস্তাটা

ধরে পুব দিকে কিছুদূর গেলেই বাঁয়ে একটা মহাবীরের মন্দির পড়বে, তার দুটো বাড়ি পরেই মগনলালের বাড়ি। চেনা সহজ, কারণ সামনের দরজার দু-দিকে দুটো সশস্ত্র প্রহরীর ছবি আঁকা রয়েছে।

'ছবি ছাড়া এমনি প্রহরী নেই?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'হাঁ—তাও আছে।'

সোজা রাস্তা, এ-গলি ও-গলি ঘোরার বালাই নেই, তাই মগনলালের বাড়ি পেতে কোনোই অসুবিধা হল না। এখানটায় সত্যি করেই বিশ্বনাথের ঘন্টার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই পৌঁছায় না। আর দুপুরবেলা বলেই বোধ হয় গলিটা এত নিস্তব্ধ। ষাঁড় তো নেই-ই, এমন কি ছাগল কুকুর বেড়াল কিচ্ছু নেই।

মগনলালের বাড়ির দরজার দু-দিকে তলোয়ার উঁচোন প্রহরীর ছবি আছে ঠিকই, কিন্তু জ্যান্ত প্রহরী কাউকে দেখা গেল না। অথচ দরজার পাল্লা দুটোই হাঁ করে খোলা। ব্যাপারটা কী? লোকগুলো খেতে গেল নাকি? ফেলুদা নাক টেনে বলল, 'খানা হয়েছে মিনিট খানেক আগেই।' তারপর এদিক ওদিক দেখে বলল, 'আসুন। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বলব নতুন এসেছি, মানমন্দির ভেবে ঢুকেছি।'

ফেলুদাকে সামনে রেখে ঢুকে পড়লাম দরজা দিয়ে।

সর্বনাশ—এ কি মগনলালের বাড়ি, না গোয়ালঘর? অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে উঠোনে তিনটে জলজ্যান্ত গরু দাঁড়িয়ে নির্বিকারে জাবর কাটছে, আমাদের দিকে ফিরে দেখবারও কোন আগ্রহ নেই তাদের। গরুগুলো যে রাত্রেও এখানেই থাকে তার চিহ্নও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'এ ব্যাপারটা এখানে খুব কমন। এই সব গলির বাড়িতে এক উঠোন ছাড়া আর খোলা জায়গা বলে কিচ্ছু নেই। অথচ দুধ ঘি না হলে এদের চলে না।'

আমাদের ডাইনে বাঁয়ে উঁচু বারান্দা দু-দিকেই দুটো দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে, দুটোর পিছনেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আন্দাজে মনে হয় ওই অন্ধকারেই দোতলায় যাবার সিঁড়ি। বাড়িটা যে চারতলা সেটা বাইরে থাকতেই দেখেছি। উপর দিকে চাইলে লোহার গরাদের মধ্যে দিয়ে খোলা আকাশ দেখা যায়। গরাদের দরকার হয় বাঁদরের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।

এর পরে কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না, এমন সময় ডান দিকের বারান্দায় চোখ গেল।

একটা লোক নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে। মাঝবয়সী মাঝারি হাইটের লোক, গায়ে সবুজের উপর সাদা বুটি-দেওয়া কুর্তা, মাথায় কাজ-করা সাদা কাপড়ের টুপি। এক জোড়া পুরু

গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নেমে গালপাট্টা হতে হতে হয়নি।

লোকটা মুখ খুলল। গলার স্বর শুনলে মনে হয় অনেক দিনের পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে কথা বেরোচ্ছে। ফেলুদার দিকে তাকিয়ে লোকটা যে কথাটা বলল সেটা হচ্ছে এই—

'শেঠজী আপসে মিলনা চাহতে হেঁ'।

'কৌন শেঠজী?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'শেঠ মগনলালজী।'

'চলিয়ে', বলে ফেলুদা লোকটার দিকে পা বাড়াল।

ছয়

'জয় বাবা বিশ্বনাথ!'

লালমোহনবাবুর মুখের দিকে চাইতে ভরসা পাচ্ছিলাম না, তবে ওর গলার আওয়াজেই ওর মনের ভাবটা বেশ বুঝতে পারলাম।

'আপনার এত ভরসা বিশ্বনাথের উপর?'

ফেলুদা এখনো কি করে হালকাভাবে কথা বলছে জানি না।

'জয় বাবা ফেলুনাথ!'

'দ্যাটস বেটার।'

এত উঁচু উঁচু পাথরের ধাপওয়ালা এত অন্ধকার সিঁড়ি এর আগে কখনো দেখিনি। যে লোকটা ডাকতে এসেছিল তার হাতে আলোটালো কিছু নেই। লালমোহনবাবুকে বার-দুয়েক 'ব্ল্যাক হোল' কথাটা বলতে শুনলাম। ছেচল্লিশ ধাপ সিঁড়ি উঠে তিনতলায় পৌঁছলাম আমরা। লোকটা এবার সামনের একটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আমরাও ঢুকলাম তার পিছন পিছন।

একটা ঘর, তারপর একটা সরু প্যাসেজ, আর তারপর আরেকটা ঘর পেরিয়ে একটা অন্ধকার বারান্দা দিয়ে বেশ খানিকদূর গিয়ে একটা নিচু দরজা পড়ল। লোকটা এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরে ডান হাত বাড়িয়ে দরজার ভিতর যাবার জন্য ইশারা করল। কথা না বললেও লোকটার মুখ থেকে বিড়ির কড়া গন্ধ পাচ্ছিলাম।

যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা যে কত বড় সেটা তক্ষুনি বোঝা গেল না, কারণ প্রথমে ঢুকে কয়েকটা রঙীন কাচ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। বুঝলাম কাচগুলো জানালায় লাগানো বলে তাতে বাইরের আলো পড়েছে।

'নোমোস্কার মিস্টার মিটার।'

খসখসে সগম্ভীর দানাদার গলাটা আমাদের সামনে থেকেই এসেছে। এবারে চোখ অন্ধকারে সয়ে এসেছে। একটা সাদা গদি দেখতে পাচ্ছি—আমাদের সামনে কিছুটা দূরে মেঝেতে বিছানো রয়েছে। তার উপরে চারটে সাদা তাকিয়া। একটার ভর দিয়ে আড় হয়ে বসে আছে একটা লোক, যার শুধু পিছন দিকটা আমরা সেদিন দেখেছি মছলিবাবার ভক্তদের মধ্যে।

একটা খ্‌ট্‌ শব্দের সঙ্গে সিলিং-এ একটা বাতি জ্বলে উঠল। পিতলের বলের গায়ে ফ্‌টো ফ্‌টো জাফ্রির কাজ—সেটা হল বাতিটার শেড। ঘরের চারদিক এখন ফ্‌টিমার আলোর নকশায় ভরে গেছে।

এখন সব কিছ্‌ দেখতে পাচ্ছি। মগনলাল মেঘরাজের ভুর্‌র নিচে গর্তে বসা চোখ, তার নিচে ছোট্ট থ্যাবড়া নাক, আর তার নিচে এক জোড়া ঠোঁট, যার উপরেরটা পাতলা আর নিচেরটা প্‌র্‌। ঠোঁটের নিচে থ্‌তনিটা সোজা নেমে এসেছে একেবারে আদ্দির পাঞ্জাবির গলা অবধি। পাঞ্জাবির বোতাম-গ্‌লো হীরের হলে আশ্চর্য হব না। এ ছাড়া ঝলমলে পাথর আছে দশটা আঙ্‌লের আটটা আংটিতে, যেগ্‌লো এখন নমস্কারের ভঙ্গিতে এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে।

'বোস্‌ন আপনারা। দাঁড়িয়ে কেনো?'

দিব্যি বাঙলা।

'চাই তো গদিতে বস্‌ন। আর নয়তো চেয়ার আছে। যাতে ইচ্ছা বস্‌ন।'

চেয়ারগ্‌লো নিচু। পরে ফেল্‌দা বলেছিল ওগ্‌লো নাকি গ্‌জরাটের। আমরা গদিতে না বসে চেয়ারেই বসলাম—ফেল্‌দা একটাতে আর আমি আর লালমোহনবাব্‌ আরেকটাতে।

মগনলাল সেইভাবেই কাত হয়ে থেকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল, ভাবছিলাম আপনাকে ইনভাইট করে নিয়ে আসব। ভগওয়ানের কৃপায় আপনি নিজেই এসে গেলেন।' তারপর একট্‌ হেসে বললেন, 'আপনি আমাকে চিনেন না, কিন্তু হামি আপনাকে চিনি।'

'আপনার নামও আমি শ্‌নেছি', ফেল্‌দা পালটা ভদ্রতা করে বলল।

'নাম বলছেন কেন, বদনাম বল্‌ন। সাচ্চা কথা বল্‌ন!'

মগনলাল কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠলেন, আর তার ফলে তাঁর পানখাওয়া দাঁতগ্‌লোতে আলো পড়ে চকচক করে উঠল। ফেল্‌দা চুপ করে রইল। মগনলালের মাথাটা আমার দিকে ঘ্‌রে গেল।

'ইনি আপনার ব্রাদার?'

'কাজিন।'

'আর ইনি? আঙ্কল?'

মগনলালের চোখে হাসি, চোখ ঘ্‌রে গেছে জটায়্‌র দিকে।

'ইনি আমার বন্ধ্‌। লালমোহন গাঙ্গ্‌লি।'

'ভেরি গ্‌ড! লালমোহন, মোহনলাল, মগনলাল—সব লাল, লালে লাল—এ'? কী বলেন?'

লালমোহনবাব্‌ কিছ্‌ক্ষণ থেকে হাঁট্‌ নাচিয়ে 'আমি একট্‌ও নার্ভাস

হইনি', ভাব দেখানোর চেষ্টা করছিলেন, এবার মগনলালের কথাটা শুনেই হাঁটু দুটো খট্ খট্ শব্দ করে পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়ে নাচানো বন্ধ হয়ে গেল।

এবার মগনলালের বাঁ হাতটা একটা খাপপড়ের ভঙ্গিতে তাকিয়ার পিছনে নামাতেই ঠং করে একটা কলিং বেল বেজে উঠে লালমোহনবাবুকে বিষম খাইয়ে দিল।

'গলা সুখিয়ে গেলো?' বললেন মগনলাল।

বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি যে-লোকটা আমাদের উপরে নিয়ে এসেছিল সে আবার দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

'সরবৎ লাও,' হুকুম করলেন মগনলাল।

এখন ঘরের সব জিনিসই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মগনলালের পিছনের দেয়ালে দেবদেবীর ছবির গ্যালারী। ডান দিকে দেয়ালের সামনে দুটো স্টীলের আলমারি। গদির উপরে কিছু খাতাপত্র, একটা বোধ হয় ক্যাশবাক্স, একটা লাল রঙের টেলিফোন, একটা হিন্দি খবরের কাগজ। এ ছাড়া তাকিয়ার ঠিক পাশেই রয়েছে একটা রুপোর পানের ডিবে আর একটা রুপোর পিকদান।

'ওয়েল মিস্টার মিত্তির'—মগনলালের স্থির দৃষ্টিতে আর হাসির নামগন্ধ নেই—'আপনি বনারস হলিডের জন্যে এসেছেন?'

'সেটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।'

ফেলুদা সটান মগনলালের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলছে।

'তা হলে—আপনি—টাইম—ওয়েস্ট—করছেন—কেন?'

প্রত্যেকটা কথা ফাঁক ফাঁক আর স্পষ্ট করে বলা।

'সারনাথ দেখেছেন? রামনগর দেখেছেন? দুর্গাবাড়ি, মানমন্দির, হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেণীমাধোব ধ্বজা—এসব কিছুই দেখলেন না, আজ বিশ্বনাথজীর দরওয়াজার সামনে গেলেন, কিন্তু ভিতরে ঢুকলেন না, কচৌরি গলিতে মিঠাই খেলেন না...ঘোষালবাড়িতে কী কাম আপনার? আমার বজরা আছে আপনি জানেন? চৌতি ঘাটসে অস্‌সি ঘাট টিরিপ দিয়ে দেবো আপনাকে, আপনি চলে আসুন। গঙ্গার হাওয়া খেয়ে আপনার মনমেজাজ খুশ হয়ে যাবে।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন'—ফেলুদার গলা এখনো স্থির, যাকে বলে নিষ্কম্প—'যে আমি একজন পেশাদারী গোয়েন্দা। মিস্টার ঘোষাল আমাকে একটা কাজের ভার দিয়েছেন। সে কাজটা শেষ না করে ফুর্তি করার কোন প্রশ্ন আসে না।'

'কতো আপনার ফী?'

ফেলুদা প্রশ্নটা শুনে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'দ্যাট ডিপেণ্ডস—'

'এই নিন।'

তাজ্জব, দম-বন্ধ-করা ব্যাপার। মগনলাল ক্যাশবাক্স খুলে তার থেকে একতাড়া একশো টাকার নোট বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

ফেলুদার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

'বিনা পরিশ্রমে আমি পারিশ্রমিক নিই না মিস্টার মেঘরাজ।'

'বাহ্‌রে বাঃ!'—মগনলালের পান-খাওয়া দাঁত আবার বেরিয়ে গেছে—'আপনি পরিশ্রম করে কী করবেন? যেখানে চোরিই হল না, সেখানে আপনি চোর পাকড়াবেন কী করে মিস্টার মিত্তির?'

'চুরি হল না মানে?'—এবারে ফেলুদাও অবাক—'কোথায় গেল সে জিনিস?'

'সে জিনিস তো উমানাথ আমার কাছে বিক্রী করে দিয়েছে। তিন্‌ হাজার ক্যাশ দিয়ে আমি সে জিনিস কিনে নিয়েছি!'

'কী বলছেন আপনি উলটো-পালটা?'

ফেলুদার বেপরোয়া কথায় আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সিলিং-এর ঝাড়টা থেকে একটা আলোর নকশা লালমোহনবাবুর নাক আর ঠোঁটের উপর পড়েছে। বেশ বুঝলাম ওঁর ঠোঁট শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

মগনলাল ওর শেষ কথাটা বলে হেসে উঠেছিল, ফেলুদা কথাটা বলতেই মনে হল একটা হাসির রেকর্ডের উপর থেকে কে যেন সাউণ্ড-বক্সটা হঠাৎ তুলে নিল। মগনলালের মুখ এখন কালবৈশাখীর মেঘের মতো কালো, আর চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে এসে বুলেটের মতো ফেলুদাকে বিঁধতে চাইছে।

'উলটো-পালটা কে বলে জানেন? উলটো-পালটা বলে উলটো-পালটা আদমি। মগনলাল বলে না। উমানাথের বেপার কী জানেন আপনি? তার বেওসার বিষয় কিছু জানেন? উমানাথের দেনা কত জানেন? উমা নিজে আমাকে ডেকে পাঠাল জানেন? উমা নিজে সিন্দুক থেকে গণপতি চোরি করেছে জানেন? আপনি চোর কি ধরবেন মিস্টার মিত্তির—চোর তো আপনার মক্কেল নিজে!'

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন সেটা পরিষ্কার হচ্ছে না মগনলালজী। নিজের জিনিস চুরি করবার দরকারটা কোথায়? সোজা সিন্দুক থেকে বার করে আপনার হাতে তুলে দিয়ে টাকাটা নিয়ে নিলেই ত হতো।'

'কার সিন্দুক? সিন্দুক তো ওর বাবার।'

'কিন্তু গণেশটা তো—'

'গণেশ কার? ঘোষাল ফ্যামিলির। ফ্যামিলি তিন জায়গায় ভাগ হয়ে গেছে। বড় ছেলে বিলাইতে ডাকটর—ছোট ছেলে উমানাথ কলকাতায় কেমিক্যালস—আর বাবা বেনারসের উকীল—এখন প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। গণপতি ছিল অল অ্যালং বাবার কাছে। গণপতির ইনফ্লুয়েন্স দেখবেন তো ওনাকে দেখুন। কতো টাকা কামায়েছেন দেখুন, মেজাজ দেখুন, আরাম দেখুন। তার সিন্দুক থেকে গণেশ বার করে উমানাথ আমাকে বিক্রী করল—সে কথা সে বাপকে জানাবে কী করে? তার সাহস কোথায়?'

ফেলুদা ভাবছে। সে কি মগনলালের কথা বিশ্বাস করছে?

'সিন্দুক থেকে কবে গণেশ নিলেন উমানাথবাবু?'

মগনলাল তাকিয়াটা আরো বুকের কাছে টেনে নিল।

'শুনুন—অক্টোবর দশ তারিখ আমাকে ডেকে পাঠাল উমা। সেদিন কথা হল। আমি এগ্রি করলাম। আমার লাক্ তি কুছু খারাপ যাচ্ছে—আপনি হয়ত জানেন। লেকিন আমার টাকার অভাব এখনো হয়নি। আর উ গ্রীন ডায়মণ্ডকে কত দাম জানেন? উমা জানে না। আমি যা পে করলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। এনিওয়ে—দশ অক্টোবর কথা হল। উমা বলল আমাকে দো-তিন দিন টাইম দাও। আমি বললাম নাও। ফিফ্‌টিনথ অক্টোবর ইভনিং উমা আবার ফোন করল। বলল গণেশ আমার হাথে এসে গেছে। আমি বললাম তুমি চলে এসো মছলিবাবা দর্শন করাতে। উমা এসে গেল। আমি এসে গেলাম। আমার হাথে ব্যাগ, উর হাতেও ব্যাগ। উর ব্যাগে গণপতি, আমার ব্যাগে তিন-সও হাণ্ড্রেড-রুপি নোটস। দর্শন ভি হল, ব্যাগ বদল ভি হল। ব্যস্, খতম।'

মগনলাল যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তা হলে বলতে হবে উমানাথবাবু আমাদের সাংঘাতিক ধাওতা দিয়েছেন আর নিজের মান বাঁচানোর জন্য একটা চুরির গল্প খাড়া করে ফেলুদাকে তদন্ত চালাতে বলেছেন। অবশ্যি সেই সঙ্গে পুলিশকেও ধাওতা দিয়েছেন। পুরো ব্যাপারটাই ফেলুদার পক্ষে পণ্ডশ্রম হবে, আর পকেটে পয়সাও আসবে না। কিন্তু মগনলালই বা ফেলুদার প্রতি এত সদয় হবে কেন?

আমি প্রায় চমকে উঠলাম যখন ফেলুদা ঠিক এই প্রশ্নটাই মগনলালকে করে বসল। মগনলাল তার চোখ দুটোকে আরো ছোট করে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'কারণ আমি জানি আপনি বুদ্ধিমান লোক। অর্ডিনারি বুদ্ধি না, একসট্রা-অর্ডিনারি বুদ্ধি। আপনি আরো কিছুদিন তদন্ত করলে যদি আসল ব্যাপারটা বুঝে ফেলেন, তখন উমারও মুশকিল, আমারও মুশকিল। আমাদের এই লেনদেনের ব্যাপারটা তো ঠিক সিধা-সাফা নয়—সে তো আপনি বুঝেন মিস্টার মিত্তির!'

ফেলুদা চুপ করে আছে। তিন গেলাস সবুজ রঙের সরবত এসেছে—

আমাদের সামনে টেবিলের উপর রাখা। ফেলুদা একটা গেলাস হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'গণেশটা তা হলে আপনার কাছেই আছে। সেটা একবার দেখা যায় কি? যেটার সঙ্গে এত রকম ইতিহাস জড়িত, সেটা একবার দেখতে ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক এটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।'

মগনলাল মাথা নেড়ে বললেন, 'ভেরি সরি মিস্টার মিত্তির, আপনি তো জানেন আমার এ বাড়িতে একবার রেড হয়ে গেছে। ও জিনিস কি করে আমি এখানে রাখি বলুন। ওটা আমাকে একটা সেফ জায়গায় পাঠিয়ে দিতে হয়েছে।'

ফেলুদার পরের কথাতে ওর বেপরোয়া ভাবটা আমার কাছে আবার নতুন করে ফুটে বেরোল।

'তা পাঠিয়েছেন বেশ করেছেন, কিন্তু আপনি সত্যি বলছেন কিনা জানার জন্যও ত আমাকে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে মগনলালজী!—তাতে যদি আপনার কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তাহলে ত কথাই নেই, কিন্তু ধরুন যদি তা না হয়?'

মগনলালের তলার ঠোঁটটা বিশ্রীভাবে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল, আর তার ভুরুজোড়া আরো নেমে এসে চোখ দুটোকে অন্ধকারে ঠেলে দিল।

'আপনি আমার কথা বিসোয়াস করছেন না?'

লালমোহনবাবু সরবতের গেলাসটা তুলেই আবার ঠক করে নামিয়ে রাখলেন। ফেলুদার হাতের গেলাস আস্তে আস্তে ঠোঁটের কাছে চলে গেল। সরবতে একটা চুমুক দিয়ে একদৃষ্টে মগনলালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি নিজেই বললেন আপনাকে আমি চিনি না। কী করে আশা করেন প্রথম আলাপেই আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করব? আপনি নিজেই কি সব সময় নতুন লোকের কথা বিশ্বাস করেন—বিশেষ করে যখন সে লোক দিনকে রাত করে দেয়?'

মগনলাল সেইভাবেই চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। একটা ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি, যদিও সেটা কোথায় আছে তা জানি না।

এবার মগনলালের ডান হাতটা আবার ফেলুদার দিকে এগিয়ে এল—তাতে এখনো সেই নোটের তাড়া।

'তিন হাজার আছে এখানে মিস্টার মিত্তির। আপনি নিন এ টাকা। নিয়ে আপনি বিশ্রাম করুন, স্ফূর্তি করুন আপনার কাজিন আর আঙ্কলকে নিয়ে।'

'না মগনলালজী, ওভাবে আমি টাকা নিই না।'

'আপনি কাজ চালিয়ে যাবেন?'

'যেতেই হবে।'

'ভেরি গুড।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মগনলালের হাত আবার কলিং বেলের উপর

আছড়ে পড়ল। সেই লোকটা আবার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মগনলাল লোকটার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'অর্জুনকো বোলাও—আউর তেরা নম্বর বকস লাও—আউর তক্তা।'

লোকটা চলে গেল। কী যে আনতে গেল তা ভগবান জানে।

মগনলাল এবার হাসিহাসি বন্ধ করে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন। লালমোহনবাবুর ডান হাত এখনো সরবতের গেলাসটাকে ধরে আছে, যদিও সে গেলাস টেবিল থেকে এক ইঞ্চিও ওঠেনি।

'কেয়া মোহনভোগবাবু, আমার সরবৎ পসিন্দ হল না?'

'না না—বখসর—ইয়ে, সরবত—মানে...' আরো বললে আরো কথার গণ্ডগোল হয়ে যাবে মনে করেই বোধহয় লালমোহনবাবু গেলাসটা তুলে ঢক্ ঢক্ করে দু ঢোক সরবৎ খেয়ে ফেললেন।

'আপনি ঘাবড়াবেন না মোহনবাবু—উ সরবতে বিষ নেই।'

'না না—'

'বিষ আমি খারাপ জিনিস বলে মনে করি।'

'নিশ্চয়ই—বিষ ইজ'—আরেক ঢোক সরবৎ—'ভেরি ব্যাড।'

'তার চেয়ে অন্য জিনিসে কাম দেয় বেশি।'

'অন্য জিনিস?'

'কী জিনিস সেটা এবার আপনাকে দেখাব।'

'খাক্!'

'কী হল মোহনভোগবাবু?'

'বিষ—মানে বিষম লাগল।'

বাইরে পায়ের শব্দ।

একটা অদ্ভুত প্রাণী এসে ঘরে ঢুকল। সেটা মানুষ ত বটেই, কিন্তু এরকম মানুষ আমি কখনো দেখিনি। হাইটে পাঁচ ফুটের বেশি না, রোগা লিকলিকে শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরা-উপশিরায় গিজগিজ করছে, মাথার চুলে কদম ছাঁট, কান দুটো খাড়া হয়ে বেরিয়ে আছে, চোখ দুটো দেখলে মনে হয় নেপালী, কিন্তু নাকটা খাঁড়ার মতো উঁচু আর ছুঁচোল। আরো একটা লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, লোকটার সারা গায়ে একটাও লোম নেই। হাত পা আর বুকের অনেকখানি এমনিতেই দেখা যাচ্ছে, কারণ লোকটা পরেছে একটা শতছিন্ন হাতকাটা গেঞ্জী আর একটা বেগুনী রঙের ময়লা হাফ প্যান্ট।

লোকটা ঘরে ঢুকেই মগনলালের দিকে ফিরে একটা সালুট করল। তারপর হাতটা পাশে নামিয়ে কোমরটাকে একটু ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার ঘরে আরেকটা জিনিস ঢুকল। এটাই বোধহয় তের নম্বর বাক্স। দুটো লোক বাক্সটা বয়ে এনে গদির সামনে মেঝেতে রাখল। রাখার সময় একটা ঝনাৎ শব্দে বুঝলাম ভিতরে লোহা বা পিতলের জিনিসপত্র আছে।

আরো দুটো লোক এবার একটা বেশ বড় কাঠের তক্তা নিয়ে এসে আমাদের পিছনের দরজাটা বন্ধ করে তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। এতক্ষণে মগনলাল আবার মুখ খুললেন।

'নাইফ-থ্রোইং জানেন কী জিনিস মিস্টার মিত্তির? সার্কাসে দেখেছেন কখনো?'

'দেখেছি।'

সার্কাস আমি দেখেছি, কিন্তু নাইফ-থ্রোইং দেখিনি। ও-ই একবার বলেছিল ব্যাপারটা কিরকম হয়। একজন লোককে একটা খাড়া করা তক্তার সামনে দাঁড় করিয়ে দূর থেকে আরেকটা লোক তার দিকে একটার পর একটা ছোরা এমনভাবে মারতে থাকে যে, সেগুলো লোকটার গায়ে না লেগে তাকে ইঞ্চি খানেক বাঁচিয়ে তক্তার উপর গিয়ে বিঁধতে থাকে। সে নাকি এমন সাংঘাতিক খেলা যে দেখে লোম খাড়া হয়ে যায়। সেই খেলাই আজ দেখাবে নাকি এই অর্জুন?

তেরো নম্বর বাক্স খোলা হয়েছে। ঘরে আরো দুটো বাতি জ্বলে উঠল। বাক্সে বোঝাই করা কেবল ছোরা আর ছোরা। সেগুলো সবকটা ঠিক এক রকম দেখতে—সব কটার হাতির দাঁতের হাতল, সব কটায় ঠিক একরকম নকশা করা।

'হরবনসপুরের রাজার প্রাইভেট সার্কাস ছিল, সেই সার্কাসেই অর্জুন নাইফ থ্রোইং-এর খেল দেখাত। এখন ও হামার প্রাইভেট সার্কাসে খেল দেখায়—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ...'

বাক্স থেকে গুনে গুনে বারোটা ছোরা বার করে আমাদের সামনেই একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে একটা খোলা জাপানী হাতপাখার মতো করে।

'আসুন আঙ্কল।'

আঙ্কল কথাটা শুনে লালমোহনবাবু তিনটে জিনিস একসঙ্গে করে ফেললেন—হাতের খটখার গেলাসের অর্ধেক সরবত মাটিতে ফেললেন, পেটে ঘুঁষি খাবার মতো করে সোজা থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে গেলেন, আর 'আঁ' বলতে গিয়ে 'গ্যাঁ' বলে ফেললেন। পরে জিগ্যেস করাতে বলেছিলেন উনি নাকি 'আঁ' আর 'গেলুম' একসঙ্গে বলতে গিয়ে গ্যাঁ বলেছিলেন।

এবার ফেলুদার ইস্পাত-কঠিন গলার স্বর শোনা গেল।

'ওকে ডাকছেন কেন?'

মগনলালের হাসির চোটে তার কনুই আরো ইঞ্চি তিনেক তাকিয়ার ভিতর

ঢুকে গেল।

'ওকে ডাকব না ত কি আপনাকে ডাকব মিস্টার মিত্তির? আপনি তক্তার সামনে দাঁড়ালে খেল দেখবেন কী করে?...আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না মিস্টার মিত্তির। আমার কথা বিসোয়াস না করে আপনি আমাকে অনেক অপমান করলেন। আপনি জানবেন যে চাকু ছাড়াও অন্য হাতিয়ার আছে আমার কাছে। ওই ঘুলঘুলির দিকে দেখুন—দো ঘুলঘুলি, দো পিস্তল আপনার দিকে পয়েন্ট করা আছে। আপনি ঝামেলা না করেন ত আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনার বন্ধুর ভি কোনো ক্ষতি হবে না। অর্জুনের জবাব নেই, আপনি দেখে নেবেন।'

ঘুলঘুলির দিকে চাইবার সাহস আমার নেই। লালমোহনবাবুর দিকেও চাইতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু চাপা মিহি গলায় ওর একটা কথা শুনে না চেয়ে পারলাম না। ভদ্রলোক হাতল ধরে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে কথাটা বলছেন, তার ফাঁকে ফাঁকে ওঁর হাঁটুতে হাঁটু লেগে খটখট শব্দ হচ্ছে।

'বেঁচে থাকলে...পপ্-প্লটের আর ...চি-হি-হিন্তা নেই।'

দুজন লোক এসে লালমোহনবাবুকে দু দিক থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তক্তাটার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। লালমোহনবাবু চোখ বুজলেন।

তারপর আমার পিছন দিকে যে জিনিসটা ঘটল সেটা আর আমি দেখতে পারিনি। ফেলুদা নিশ্চয়ই দেখেছিল, কারণ না দেখলে নিশ্চয়ই ঘুলঘুলি থেকে পিস্তলের গুলি এসে ওর বুকে বিঁধত। আমার শব্দ শুনেই রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখ ছিল সামনের টেবিলের দিকে। তার উপর থেকে একটা একটা করে ছুরি তুলে নিচ্ছে অর্জুনের হাত, আর তার পরেই সে ছুরি খ্যাচাং শব্দ করে তক্তার কাঠ ভেদ করে ঢুকছে।

ক্রমে শেষ ছুরিটা তোলা হয়ে গিয়ে টেবিল খালি হয়ে গেল, আর খ্যাচাং শব্দ, আর অর্জুনের ফোঁস ফোঁস করে দম ফেলার শব্দ, আর মগনলালের ঘন ঘন 'বহুৎ আচ্ছা' থেমে গিয়ে রইল শুধু অদৃশ্য ঘড়ির টিক টিক আর বিশ্বনাথের ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ। আর তার পরে হল এক তাজ্জব কাণ্ড।

লালমোহনবাবু দরজার দিক থেকে ফিরে এসে অর্জুনের হ্যান্ড শেক করে 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' বলেই অজ্ঞান হয়ে হুমড়ি খেয়ে মগনলালের গদির উপর পড়ে সেটার অনেকখানি জায়গা ঘামে ভিজিয়ে চপচপে করে দিলেন।

সাত

পাঁচটা বাজে। আকাশে মেঘ। দশাশ্বমেধ ঘাটে এখন লোক নেই বললেই চলে। আমরা তিনজন জলের ধারে বসে আছি ঘাটের সিঁড়ির উপর। মগনলালের ঘরে বিভীষিকাময় ঘটনাটার পর প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে। মগনলালের লোকই লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে। তারপর মগনলাল নিজে দুধের সঙ্গে ব্রান্ডি মিশিয়ে খাইয়ে লালমোহনবাবুকে চাপ্পা করে বলেছিল, 'আঙ্কল, ইউ আর এ ব্রেভ ম্যান।' তারপর থেকে লালমোহনবাবু কথাটথা আর বিশেষ বলছেন না, কেবল ফেলুদাকে একবার জিগ্যেস করেছেন তার মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে কিনা। তাতে আমরা দুজনেই তাকে আশ্বাস দিয়েছি যে নতুন করে একটি চুলও পাকেনি।

মগনলালের হাবভাবে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে ফেলুদা তদন্ত চালাতে গেলেই সে খতম হয়ে যাবে—হয় ছুরিতে, না হয় গুলিতে। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত ফেলুদা একটা কনসেশন আদায় করে নিয়েছে; সে আরো একটি বার ঘোষালবাড়িতে যাবে, কারণ হঠাৎ ডুব মেরে গেলে সেটা তার সম্মানের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হবে। যাওয়ার ব্যাপারে দেরি করে লাভ নেই, কাজেই সেটা আজই বিকেলে সেরে ফেলতে হবে। মগনলাল আমাদের বিদায় দেবার আগে স্পষ্ট কথায় শাসিয়ে দিয়েছে—'আপনি জেনে রাখবেন মিস্টার মিত্তির যে আপনি বাড়াবাড়ি যা করবেন তা অ্যাট ইওর ওন রিস্‌ক। আর আপনার উপর নজর রাখার বেওস্থা আমার আছে সেটাও আপনি জানবেন।'

এটা বলতে খারাপ লাগছে যে এখন পর্যন্ত মগনলালই ফেলুদার উপর টেক্কা মেরে আছে। এটা আমি জানি যে যতই ডাকসাইটে প্রতিদ্বন্দ্বী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই ফেলুদার জয় হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে মগনলাল মেঘরাজের মতো সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে এর আগে ফেলুদাকে কখনো পড়তে হয়নি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকে ফেলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'গণেশটা ঘোষাল বাড়িতে রয়ে গেছে রে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নইলে লোকটা আমাকে তদন্ত বন্ধ করার জন্য এতগুলো টাকা অফার

করে না। কিন্তু কথা হচ্ছে—সেটা কোথায়? সেটা কেন এখনো পর্যন্ত মগনলালের নাগালের বাইরে? কখন কীভাবে সেটা সে হাত করার কথা ভাবছে? আর সব শেষে আরো দুটো প্রশ্ন—কে সেটা সিন্দুক থেকে সরাল, এবং ওবাড়ির কার সঙ্গে মগনলালের যোগসাজশ রয়েছে?'

ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে মিনিট পাঁচেক উল্টে-পাল্টে দেখল। বুঝতে পারছি ইতিমধ্যে সেটাতে বেশ কিছু নতুন জিনিস লেখা হয়েছে, কিন্তু সেটা যে কী তা এখনো জানি না। লালমোহনবাবুকে লক্ষ করছি মাঝে মাঝে শিউরে উঠছেন, আর নিজের শরীরের এখানে ওখানে হাত বুলিয়ে দেখছেন। তিনি যে অক্ষত আছেন সেটা বোধহয় এখনো ওঁর বিশ্বাস হচ্ছে না।

আমরা যখন ঘাট থেকে উঠলাম তখনো আকাশ ছাই রঙের মেঘের টুকরোতে ছেয়ে আছে। আকাশটা দেখতে গিয়েই লাল-সাদা পেটকাটি ঘুড়িটার দিকে চোখ গেল। ফেলুদাও দেখেছে, কারণ ওর সিঁড়ি-ওঠা থেমে গেল।

ঘুড়িটা উড়ছে যে বাড়িটার মাথার উপর সেটা আমাদের চেনা বাড়ি। এটা সেই লালবাড়ি—যার ছাতে শয়তান সিংকে ক্যাপ্টেন স্পার্কের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। বাড়ির ছাতে কে? শয়তান সিং না? হ্যাঁ—কোনো সন্দেহ নেই। এ হল রুকুর বন্ধু সুরয। সে এক দৃষ্টিতে আকাশের ঘুড়িটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

এবার ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে সুতোর টানে নিচের দিকে নেমে এল। সুরযের ডান হাতটা একটা ঝটকা দিয়ে উপর দিকে উঠল। তার ফলে একটা ঢিল শূন্যে উঠে ঘুড়িটার পিছন দিকে চলে গেল।

এবার বুঝলাম ঢিলটা একটা সুতোর সঙ্গে বাঁধা, আর সুতোটা ধরা সুরযের হাতে।

সেই সুতো ধরে সুরয টান দিচ্ছে, আর তার ফলে বন্দী ঘুড়িটা তার হাতে চলে আসছে।

গোধুলিয়ার মোড়ে একটা দোকানে বসে চা খেয়ে আমরা যখন শংকরী নিবাসে পৌঁছলাম তখন প্রায় চারটে বাজে। ত্রিলোচন পাণ্ডে সেলাম ঠুকে ফটক খুলে দিল। আমরা গাড়িবারান্দায় পৌঁছানর আগেই সকালেরই মতো বিকাশবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

'কী খবর? এনি প্রোগ্রেস?'

'উঁহু' ফেলুদা বলল। 'শহর দেখে বেড়ালাম সারা দিন।'

'ওঁরা ত সব বেরিয়েছেন।'

উমানাথবাবুর গাড়িটা দেখছিলাম না। তাছাড়া বাড়িটা দেখেও কেমন

জানি খালি খালি মনে হচ্ছিল।

'কোথায় গেছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'সারনাথ। আজও কিছু আত্মীয়স্বজন এসেছেন বাইরে থেকে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুটো গাড়ি বোঝাই করে বেরিয়েছেন সব, ফিরতে সন্ধে হবে।'

'রুকুও গেছে?'

'না। রুকুর সারনাথ দেখা হয়ে গেছে। ও গেছে টারজান দেখতে ওর এক মামার সঙ্গে।'

আসবার সময় রাস্তার দেয়ালে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। সেই আদ্যিকালের ছবি—আমার জন্মের আগে, ফেলুদার জন্মের আগে, এমন কি লালমোহনবাবুর জন্মের আগে—টারজান দি এপ ম্যান।

'আমার ঘরে এসে বসবেন একটু?' বিকাশবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'আগে একবার ছাতে যাব—যদি সম্ভব হয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনার জন্য এ বাড়ির সব দরজা খোলা।'

সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই চণ্ডীপাঠের আওয়াজ পেলাম। সেটা পুজোমণ্ডপ থেকে আসছে জানি, কিন্তু এত জোরে আওয়াজ ত কাল পাইনি। ডান দিকে চাইতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সিঁড়ির পিছনের দরজাটা আজ খোলা, আর সেটা দিয়ে দিব্যি পুজোর জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। আমরা চার জনেই দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে শশীবাবু এক মনে তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।

'কালই ত শশীবাবুর কাজ শেষ', বলল ফেলুদা।

'হ্যাঁ' বললেন বিকাশবাবু, 'ভদ্রলোকের জ্বর এখনো সম্পূর্ণ সারেনি, তাও এক নাগাড়ে তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।'

ছাত দেখা মানে যে আসলে রুকুর ঘর দেখা সেটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। সেদিন সকালে এ ঘরে রোদ ছিল না, আজ পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে চারিদিকের ছড়ানো জিনিসের উপর পড়েছে।

আমি ভেবেছিলাম আজ যখন রুকু নেই তখন ফেলুদা হয়ত তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাবে, কিন্তু তার পরেই মনে হল মগনলালের হুমকির কথা। বেশিক্ষণ শংকরী-নিবাসে থাকাটাই ফেলুদার পক্ষে বিপজ্জনক। তাছাড়া বেশি অনুসন্ধানের দরকার হল না, কারণ ফেলুদা যেটা খুঁজছিল সেটা ঘরে ঢুকেই পেয়ে গেল।

আজই বিকেলে সুরবের ফাঁসে বন্দী হতে দেখেছি এই লাল-সাদা পেটকাটিটাকে। মেঝের উপর লাটাই-চাপা অবস্থায় পড়ে আছে ঘুড়িটা; সেটার উপর যে উৎপাত হয়েছে সেটা দেখলেই বোঝা যায়; কাল আর এ ঘুড়ি

আকাশে উড়বে না।

ফেলুদা লাটাইটা তুলতেই একটা জিনিস চোখে পড়ল।

ঘুড়ির সাদা অংশটাতে নীল পেনসিল দিয়ে হিন্দি অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে। দুটো জায়গায় আলাদা করে লেখা।

কাছ থেকে পড়ে বুঝতে পারলাম ভাষাটা বাংলা। বোধহয় সবাই বাংলা পড়তে পারে না বলেই রুকুকে এটা করতে হয়েছে।

একটা লেখা হল এই—

'আমি বন্দী। সব ঠিক আছে হা হা। আবার বিকেলে। ইতি ক্যাপ্টেন স্পার্ক।'

অন্যটা হল—

'টারজন দেখতে যাচ্ছি। আবার কাল সকালে। ইতি ক্যাপ্টেন স্পার্ক।'

'বাপ্‌রে বাপ!' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। 'কোন জগতে বাস করেন মশাই এ ছেলে?'

ফেলুদা ঘুড়িটাকে আবার ঠিক যেইভাবে ছিল সেইভাবে রেখে বলল, 'রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের জগৎ। শিশুমনের উপর আপনাদের বইয়ের কী প্রভাব তার স্পষ্ট নিদর্শন এটা।'

আমরা রুকুর ঘর থেকে নিচে ফিরে এলাম। বিকাশবাবু চায়ের কথা আগেই বলে দিয়েছিলেন, তার ঘরে গিয়ে বসতেই ভরদ্বাজ ট্রে নিয়ে ঢুকল।

ঘরটা বেশ বড়। একদিকে খাট, অন্যদিকে একটা কাজের টেবিলের সামনে একটা চেয়ার। এ ছাড়াও বসবার জন্য একটা সোফা রয়েছে। ফেলুদা টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসল, আমরা দুজন সোফাতে, আর বিকাশবাবু খাটে। পাশের বৈঠকখানার ঘড়িতে মোলায়েম সুরে ঢং ঢং করে চারটে বাজল; শুনলেই বোঝা যায় জাত ঘড়ি।

'মিস্টার বোষালের কেমিক্যালের ব্যবসা কিরকম চলে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'ভালোই ত।' বিকাশবাবু যদি প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে থাকেন ত সেটা তার কথায় কিছু বোঝা গেল না—'অবিশ্যি মাঝে-মধ্যে যে স্ট্রাইক ইত্যাদি হয় না তা নয়। তা সে কোন ব্যবসায় হয় না বলুন!'

'হুঁ'...

ফেলুদা হঠাৎ হাতের কাপটা রেখে উঠে পড়ে বলল, 'একবার বৈঠকখানাটা দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

আমরা চারজনই চা খাওয়া বন্ধ রেখে বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। বিকাশবাবুর ঘর থেকে বৈঠকখানায় যাবার কোনো দরজা নেই; যেতে হলে

আগে একটা বারান্দা পড়ে।

'সেদিন মগনলাল আর উমানাথবাবু কোথায় বসেছিলেন সেটা জানতে পারি?'

বিকাশবাবু দুটো মুখোমুখি সোফা দেখিয়ে দিলেন।

'ওদিকে কি ঘর? না আরেকটা বারান্দা?'

আমরা যে বারান্দা দিয়ে ঢুকলাম সেটা পুব দিকে; ফেলুদা দক্ষিণ দিকের দুটো পর্দা দেওয়া দরজার দিকে দেখিয়ে প্রশ্নটা করল।

'ওদিকে দুটো দরজার পিছনে দুটো ঘর। একটা বড় কর্তার আপিস ঘর ছিল; অন্যটায় মক্কেলরা অপেক্ষা করত।'

আমরা দুটো ঘরের ভিতরেই ঢুকে মিনিটখানেক করে থেকে আবার বিকাশবাবুর ঘরে ফিরে এলাম। এবার ফেলুদা জিগেস করল, 'গণেশটা কি কলকাতায় থাকত, না এখানে?'

'এখানে', বিকাশবাবু বললেন, 'ওটা যাওয়াতে মিস্টার ঘোষালের যত না কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট হয়েছে ওঁর বাবার। ওঁর মন ভালো করার জন্যই মিস্টার ঘোষাল এতটা ইয়ে হয়ে পড়েছেন।'

ফেলুদা ইতিমধ্যে বিকাশবাবুর টেবিলের উপর থেকে ট্রানজিস্টারটা হাতে তুলে নিয়েছে। মাঝারি সাইজের মার্ফি রেডিও, চামড়ার খোলস দিয়ে ঢাকা। ফেলুদা নবটা ধরে ঘোরাতে সুইচের কোনো আওয়াজ হল না। তারপর সেটা উল্টো দিকে ঘোরাতে খট্ করে একটা শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল।

'একি, আপনার রেডিও ত খোলা ছিল।'

'তাই—তাই বুঝি?'

বিকাশবাবুর চেহারাটা যে ঠিক কি রকম হোল সেটা আমার পক্ষে লিখে বোঝান ভীষণ শক্ত। শুধু এটা পরিষ্কার মনে আছে যে বিকাশবাবু খাটের ডাণ্ডাটায় হেলান দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সুইচের আওয়াজটা হওয়া মাত্র পিঠ সোজা হয়ে গিয়ে হেলান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকে ফেলুদা রেডিওর পিছনে ব্যাটারির খোপের দরজাটা খুলে ফেলেছে। আড়চোখে দেখলাম বিকাশবাবু একটা ঢোক গিললেন। তিনটে ব্যাটারি রেডিওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

'আপনার ব্যাটারি ত লীক করেছে', ফেলুদা বলল, 'বেশ কিছুদিন হল এর আয়ু ফুরিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

বিকাশবাবু চুপ।

'রেডিও আপনি শোনেন নিশ্চয়ই, কিন্তু গত বেশ ক'দিন আর শোনা হয়নি। কেন বলুন ত?'

কোনো উত্তর নেই।

'আপনি যদি কিছু না বলেন, তাহলে আমাকেই বলতে দিন।' ফেলুদার গলায় আমার খুব চেনা একটা ধারালো সুর শুনতে পাচ্ছি।—'সেদিন মগনলালের কথা শোনার লোভ আপনি সামলাতে পারেননি, তাই না? রেডিও থামিয়ে দিয়ে আপনি নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন ওই দক্ষিণের বারান্দায়। দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনি বৈঠকখানার কথাবার্তা শুনেছিলেন। আপনি জানতেন মগনলাল মিস্টার ঘোষালকে শাসিয়ে গেছেন। আপনি জানতেন মগনলাল মিস্টার ঘোষালকে তিশ হাজার টাকা অফার করেছেন গণেশটার জন্য। তাই নয় কি?'

বিকাশবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই তিনি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

'এবার আরেকটা প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাব দিন ত'—ফেলুদা ব্যাটারিগুলো টেবিলের নিচে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'যেদিন অম্বিকাবাবুর ঘরের সিন্দুক থেকে গণেশ চুরি যায়—অর্থাৎ পনেরই অক্টোবর—সেদিন আপনি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত কী করছিলেন? আপনি রেডিও শোনেননি, কারণ রেডিও তার পাঁচ দিন আগেই—'

'বলছি, বলছি—আমাকে বলতে দিন!'—বিকাশবাবু যেন মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন। ফেলুদা কথা বন্ধ করে বিকাশবাবুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিকাশবাবু দম নিয়ে যেন বেশ কষ্টে তাঁর কথাগুলো বলতে শুরু করলেন—

'সেদিন মগনলালের হুমকি শোনার পর থেকেই আমার মনে ভীষণ একটা উৎকণ্ঠার ভাব ছিল। রোজই মনে হচ্ছিল একবার সিন্দুক খুলে দেখি গণেশটা আছে কিনা। কিন্তু সে সুযোগ প্রথম এল সেদিন মিস্টার ঘোষাল মহুলিধাবাকে দেখতে গেলেন। উনি যাবার দশ মিনিটের মধ্যেই আমি অম্বিকাবাবুর ঘরে যাই। দেরাজ থেকে চাবি বার করি, করে সিন্দুক খুলি।'

'তারপর?'

ফেলুদাকে প্রশ্নটা করতেই হল, কারণ বিকাশবাবুর কথা থেমে গিয়েছিল।

'সিন্দুক খুলে কী দেখলেন আপনি?' ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল।

বিকাশবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলাম—গণেশ নেই।'

'গণেশ নেই?' অবিশ্বাসে ফেলুদার ভুরু ভীষণভাবে কুঁচকে গেছে।

বিকাশবাবু বললেন, 'আমি জানি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমি শপথ করে বলছি যে সেদিন আমি সিন্দুক খোলার আগেই গণেশ চুরি হয়ে গিয়েছিল। আমি যে কেন একথাটা এতদিন আপনাকে বলিনি সেটার কারণ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিস্টার মিত্তির। সত্যি বলতে কি,

আমি যে কী অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্যে রয়েছি সেটা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

ফেলুদা আবার চায়ের কাপটা তুলে নিয়েছে।

'ও সিন্দুকটা কি এমনিতে প্রায়ই খোলা হয়?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'একেবারেই হয় না। আমি যতদূর জানি, এবার উমানাথবাবু আসার পরের দিনই একবার খোলা হয়েছিল—কিছু পুরোন দলিল নিয়ে বাপ আর ছেলের মধ্যে আলোচনা ছিল। এ ছাড়া খুব সম্ভবত আর একদিনও খোলা হয়নি।'

ফেলুদা চুপ করে বসে আছে। বিকাশবাবুর অবস্থা খুবই শোচনীয় বলে মনে হচ্ছে। প্রায় দু'মিনিট এইভাবে থাকার পর ভদ্রলোক আর না পেরে বললেন, 'আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না মিস্টার মিত্তির?'

ফেলুদার গলার স্বর এবার রীতিমত রুক্ষ।

'আই অ্যাম সরি মিস্টার সিংহ—কিন্তু যারা প্রথমবারেই সত্যি কথাটা বলেন না, তাঁদের উপর থেকে সন্দেহটা সহজে মুছে ফেলা যায় না।'

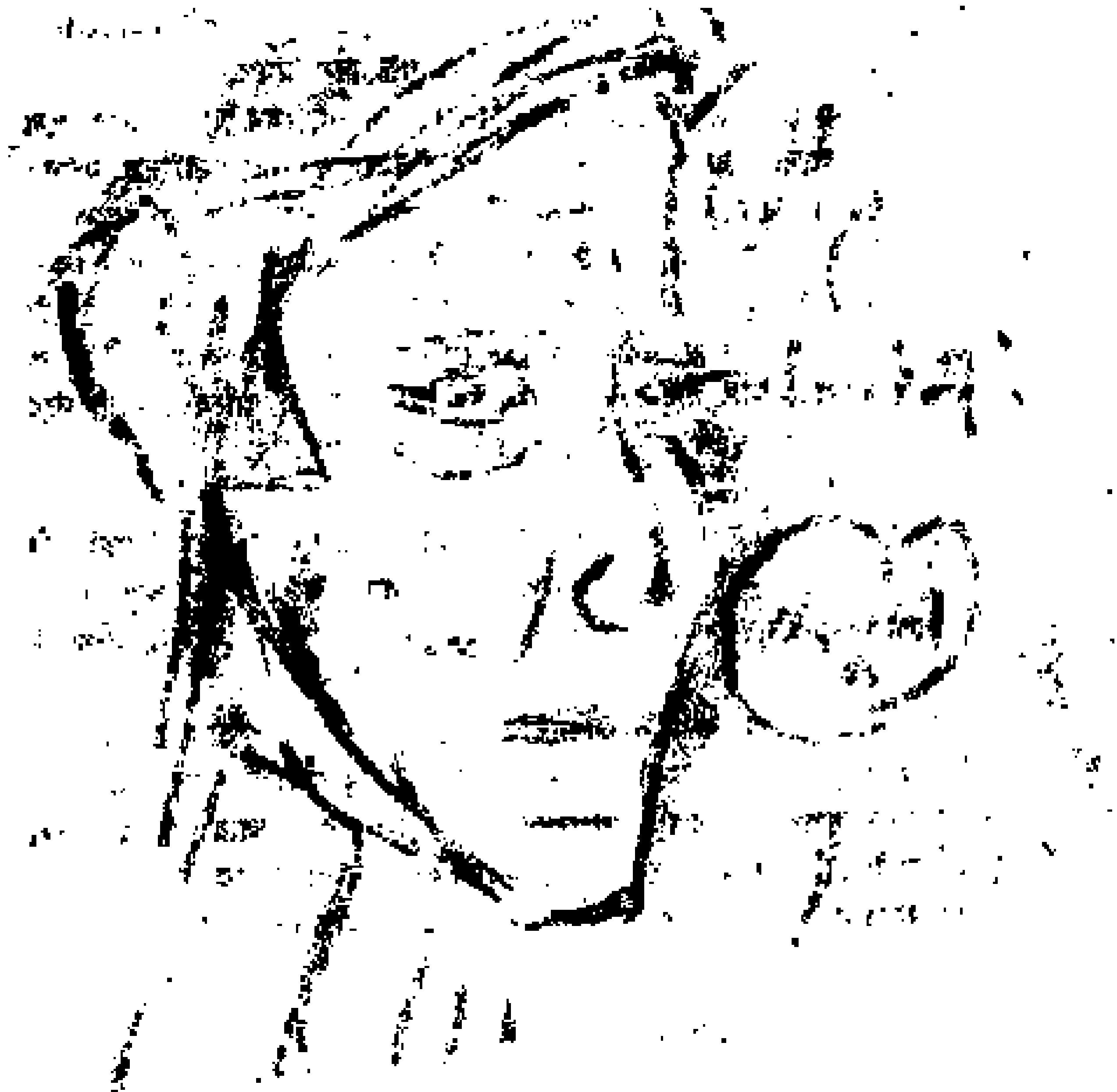

আট

পরদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। টিপ টিপ্ করে বৃষ্টিও পড়ছে, আর রাস্তার অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে সারারাত এই ভাবেই বৃষ্টি পড়েছে। আমি সাড়ে ছটায় উঠেছি। লালমোহনবাবু তখনও বিছানায় শুয়ে খর্ড়িম্বাস করছেন। চার নম্বর খাট খালি, কারণ সেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ কালকেই চলে গেছেন। ফেলুদা যে কখন উঠেছে জানি না। প্রথমে ভেবেছিলাম যে ও বেরিয়ে গেছে, তারপর বারান্দায় বেরিয়ে দেখি ও এক কোণে রেলিং-এর উপর পা তুলে চেয়ারে বসে নোটবুকের পাতা ওলটাচ্ছে। পায়ের পাতাটা যে বৃষ্টিতে ভিজছে সেদিকে ওর খেয়ালই নেই। ওর পাশে তেপায়া টেবিলের উপর একটা খালি চায়ের কাপ, চারমিনারের খোলা প্যাকেট, আর একটা ছোট্ট পাথরের বাটি—যেটাকে ও অ্যাশ-ট্রে হিসেবে ব্যবহার করছে। বৃষ্টির দিনেও যে ঘাটে যাবার লোকের অভাব হয় না সেটা রাস্তার দিকে চাইলেই বোঝা যায়। আর শব্দেরও কোনো কমতি নেই। অবিশ্যি এটা আমি জানি যে এ ধরনের গোলমালে ফেলুদার চিন্তার কোনো ব্যাঘাত হয় না। একবার ওকে জিগ্যেস করাতে ও বলেছিল, 'চিন্তা যদি গভীর হয় তাহলে আশেপাশের গোলমাল তার তলা অবধি পৌঁছতে পারে না। কাজেই, তুই যেটাকে ডিসটার্বেন্স ভাবছিস, সেটা আমার কাছে আসলে ডিসটার্বেন্স নয়।'

লালমোহনবাবু পৌনে সাতটায় বিছানা ছেড়ে উঠে বললেন, 'স্বপ্ন দেখলুম আমার সর্বাঙ্গে ছোরা বিঁধে রয়েছে, আর আমি সেইভাবেই রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের আপিসে লেখার প্রুফ আনতে গিয়েছি, আর পাবলিশার হেমবাবু বলছেন—আপনার ছদ্মনামটা চেঞ্জ করে জটায়ু থেকে সজারু করে দিন—দেখবেন বইয়ের কাটতি বেড়ে গেছে।'

আমরা দুজনে যখন মুখটুখ ধুয়ে চা খাচ্ছি, তখন ফেলুদা বারান্দা থেকে ঘরে এসে বলল, 'লালমোহনবাবু, আপনার কোনো বইয়েতে ঘুড়ির সাহায্যে মেসেজ পাঠানোর কোনো ঘটনা আছে?'

লালমোহনবাবু আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই, থাকলে ত খুশিই হতুম। ওটা বোধহয় মনে পড়ে নিশাচরের একটা বই থেকে নেওয়া। বোধহয় "মানুষের রক্তমাংস"।'

'নিশাচর কে?'

'ওটা ক্ষিতীশ চাকলাদারের ছদ্মনাম। রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজেরই আরেকজন লেখক। বলছি না—আপনাদের গুরুবাবাজী ওই সিরিজ একেবারে গুলে খেয়েছে।'

'আপসোস হচ্ছে! ফেলুদা খাটে বসে বলল—'এতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উচিত ছিল না আপনাদের ওই সিরিজটাকে। ইয়ে—এক থেকে দশের মধ্যে একটা নম্বর বলুন ত।'

'সাত।'

'হুঁ...। শতকরা সত্তর ভাগ লোক ওই নম্বরটা বলবে।'

'তাই বুঝি?'

'আর এক থেকে পাঁচের মধ্যে জিগ্যেস করলে বলবে তিন, আর ফুল জিগ্যেস করলে গোলাপ।'

সাড়ে আটটার সময় হোটেলের চাকর হরকিষণ এসে খবর দিল ফেলুদাকে ফোন এসেছে। শুনে বেশ অবাক হলাম। কে ফোন করছে এই সকালবেলা? একবার ভাবলাম ফেলুদার সঙ্গে যাই নিচে, কিন্তু এক দিকের কথা শুনে বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না বলে ধৈর্য ধরেই বসে রইলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফেলুদা ফিরে এসে বলল, 'তেওয়ারি ফোন করেছিল। প্রয়াগ বা হরিদ্বারে গত কয়েক মাসের মধ্যে কোনো নামকরা নতুন বাবাজীর আবির্ভাব ঘটেনি। নো মছলিবাবা, নাথিং।'

'বোঝো! ইনি তাহলে ফোর-টুয়েন্টি?' বললেন লালমোহনবাবু।

'সেরকম ত অনেক বাবাজীই, লালমোহনবাবু; কাজেই তার জন্য এঁকে আলাদা করে ভর্ৎসনা করার কিছু নেই। এই প্রতারণার পিছনে আর কোনো গূঢ় সিনস্টার অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে কিনা সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।'

'আপনি কি জোড়া-তদন্তে জড়িয়ে পড়ছেন নাকি মশাই?'

'জোড়া কথাটার দুটো মানে হয় জানেন ত? জোড়া মানে ডবল আবার জোড়া মানে যুক্ত। এক্ষেত্রে জোড়া মানে যে কী সেটা এখনো ঠিক জানি না।'

'তেওয়ারি আর কিছু বললেন না?'—আমি জিগ্যেস না করে পারলাম না। ফেলুদা প্রায় চার মিনিটের মতো টেলিফোনে কথা বলেছে, কিন্তু আমাদের এসে যেটা বলল তাতে এক মিনিটের বেশি লাগার কথা না।

ফেলুদা চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, 'রায়বেরিলির জেল থেকে হপ্তা তিনেক আগে এক জালিয়াত পালিয়েছে। এখনো নিখোঁজ। চেহারার বর্ণনা মছলিবাবার সঙ্গে খানিকটা মেলে, যদিও দাড়ি-গোঁফ নেই, আর এতটা কালো না।'

'তা সে ত মশাই মেক-আপের ব্যাপার', বললেন লালমোহনবাবু, 'একবার

দিনের বেলা কাছ থেকে ভালো করে দেখে এলে হয় না? ঘাটে গিয়ে বসে থাকলেও ত হয়। বাবা ঘাটে যান নিশ্চয়ই।'

'সে গুড়ে বালি। শুধু সন্ধ্যায় দর্শন দেন, বাকি সময়টা দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকেন। সেখানে অভয় চক্কোত্তি ছাড়া আর কারো প্রবেশ নেই। খাওয়া-দাওয়া সব ওই একই ঘরে—আর নাওয়াটা মাইনাস।'

আমরা দুজনেই অবাক। বাবাজী স্নান করেন না?

'এসব তেওয়ারি বললেন?'—লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'এত কথা হল তোমার সঙ্গে?'—আমি জুড়ে দিলাম।

ফেলুদা আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে তিনবার মাথা নেড়ে বলল, 'পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষায় ফেল। তুই বারান্দায় গেলি আর লক্ষ করলি না যে আমার ভিজে পাঞ্জাবি আর পায়জামা দড়িতে ঝুলছে? ঘরে বসে কাপড় ভেজে শুনেছিস কখনো?'

আমি চুন মুখে চুপ মেরে গেলাম।

ফেলুদা এবার যা বলল তা এই—ও চারটেয় উঠে সাড়ে চারটের আগে কেদার ঘাটে পৌঁছে অভয় চক্রবর্তীর জন্য অপেক্ষা করে শেষটায় তার দেখা পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে।—'একেবারে মাটির মানুষ। না, মাটি ভুল হল; মোমের মানুষ। গলেই আছেন। আমাকেও গলার অভিনয় করতে হল। বুড়ো মানুষের সঙ্গে ছল করতে ভালো লাগছিল না, কিন্তু এসব ব্যাপারে গোয়েন্দার কিছুটা নির্মম না হলে চলে না। ওঁর কাছেই বাবাজীর হ্যাবিট্স জানলাম। স্নান করেন না শুনে বোধহয় অজান্তে আমার নাকটা সিঁটকে গেসল, তাতে বললেন—"মনে যখন ময়লা নেই, তখন দশটা দিন গায়ে জল না ছোঁয়ালে ক্ষতি কী বাবা? জলেরই ত মানুষ, জল থেকেই ত উঠেছেন, আবার জলেই ত ফিরে যাবেন।"—গায়ে আঁশটে গন্ধ কিনা সেটা আর জিগেস করলাম না। একটি ছোকরা নাকি রোজ সকালে আসে একবার করে—মাছের আঁশ দিয়ে যায়, যেগুলো সন্ধ্যাবেলা বিলি হয়। অভয়বাবু ঘাট থেকে চলে যাবার পরও আমি কিছুক্ষণ ছিলাম। এক পাণ্ডা ওখানে ছাতার তলায় বসে, নাম লোকনাথ। সেদিনের ঘটনাটা দেখেছিল, যদিও গোড়ার দিকটা মিস্ করেছে। সে যখন এসেছে তখন বাবাজীর জ্ঞান হয়েছে। পাণ্ডাকে দেখে তার নাম ধরে ডেকে অনেক কিছু বলেছে। বাবাজী যদি ফোর-টুয়েন্টি হয়েও থাকেন, ওঁর যে একটি তুখোড় ম্যানেজার রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তিনি অভয় চক্কোত্তি নন?'

লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'না। অভয় চক্কোত্তি মশাই নিখাদ সজ্জন ব্যক্তি। ওঁর মনে সংশয় ঢোকানর চেষ্টা করেছিলাম। বললাম—প্রয়াগ থেকে সাঁতরে কাশী আসাটা প্রায় অবিশ্বাস্য

নয় কি?—তাতে বললেন, "সাধনায় কী না হয় বাবা।"—এদের বিশ্বাসের জোরেই ত এই যান্ত্রিক যুগেও কাশী আজও কাশী। দেখবে চাঁদের মাটির নিচে মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা হয়ে গেলেও কাশী কাশীই থেকে যাবে।'

সাড়ে চারটে নাগাত বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পাঁচটার সময় আমরা তিনজন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজকে ফেলুদা পুরোপুরি টুরিস্ট, কারণ তার কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে। এই দুদিন ওটা ওর সুটকেসেই বন্ধ ছিল। ফেলুদা আর লালমোহনবাবু দুজনেরই ইচ্ছে আজ কচৌরি গলিতে হনুমান হালুইকরের দোকানে গিয়ে রাবড়ি খাবে। আমারও যে ইচ্ছে সেটা বোধহয় না বললেও চলবে।

বিশ্বনাথের পাশেই কচৌরি গলি। এত বছর পরেও তার চেনা দোকানটা খুঁজে বার করতে ফেলুদার কোনো অসুবিধা হল না। দোকানের সামনে বেঞ্চি পাতা রয়েছে, তাতে বসে মাটির ভাঁড় থেকে রাবড়ি খেতে খেতে লালমোহনবাবু সবে বলেছেন 'রাবড়ির আবিষ্কারটা টেলিফোন-টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের চেয়ে কিসে কম মশাই'—এমন সময় কালকের সেই লোকটাকে দেখলাম বিশ-ত্রিশ হাত দূরে একটা দোকানের পাশে আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আরেকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। মগনলালের ব্যাপারটা মাঝে মাঝে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করি, ফেলুদা ওর কথা না মেনে একটা বেচাল চাললে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হতে পারে সেটাও না-ভাবার চেষ্টা করি, কিন্তু ওই ঝোলা গোঁফওয়ালা লোকটা আবার সব মনে করিয়ে দিচ্ছে। যাই হোক, রাবড়িটা এত বেশি ভালো যে মগনলালের চেহারাটা মনে পড়া সত্ত্বেও মুখের স্বাদ নষ্ট হল না।

ফেলুদার যা মনের অবস্থা তাতে ও যে খুব বেশিক্ষণ এই ঘিঞ্জি গলিতে থাকতে পারবে না সেটা আমি আগেই জানতাম। কচৌরি গলি থেকে বেরিয়ে মদনপুরা রোড ধরে গোধুলিয়ার মোড় ছাড়িয়ে আমরা বাঙালী-টোলার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। দুদিন ঘুরেই এদিকের রাস্তাগুলো বেশ চেনা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে হাঁটছি, ফেলুদা এদিক ওদিক দেখছে, দু-একবার ক্যামেরার শাটারের শব্দও পেয়েছি। আমি মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছি সেই লোকটা এখনো আমাদের ফলো করছে কিনা; কিন্তু বড় রাস্তায় পড়ে অবধি তার আর কোনো পাত্তা পাইনি। শেষটায় ফেলুদাকে বাধ্য হয়েই বলতে হয়, 'তোর কি ধারণা মগনলাল আমাদের উপর নজর রাখার জন্য মাত্র একটি লোক অ্যাপয়েন্ট করেছে?'

এর পর আমি আর পিছনে তাকাইনি।

ওই যে সেই অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের দোকান। ওর পরের বাঁ দিকের

ঘোড়টা নিতে হয় অম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি যাবার জন্য।

'মিস্টার মিত্তির! প্রদোষবাবু!'

পিছন থেকে ডাক। তিনজনেই থামলাম। গলাটা অচেনা। দুটি ভদ্রলোক, বয়েস বেশি না—একজনের চোখে চশমা, মুখে হাসি। ইনিই বোধহয় ডেকেছিলেন।

'আপনার হোটেলে গিয়েছিলাম খোঁজ করতে', ভদ্রলোক বললেন।

'কী ব্যাপার?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আমরা বেঙ্গলী ক্লাবের তরফ থেকে আসছি। আমার নাম সঞ্জয় রায়—ইনি গোকুল চ্যাটার্জি। ইয়ে—আপনাকে কিন্তু আসতে হবে। মানে আপনাদের তিনজনকেই। আমাদের ক্লাবে থিয়েটার আছে—পরশু—সপ্তমীর দিন।'

'কাবুলিওয়ালা?'

'আপনি জানেন?' ভদ্রলোক দুজনই অবাক এবং খুশি।

'আপনারা মিস্টার ঘোষালকে নেমন্তন্ন করতে গেছলেন না?'

'ওরে বাবা—আপনি দেখছি সবই জানেন, হেঃ হেঃ!'

'উনি ত জানবেনই', অন্য ভদ্রলোকটি সর্দি হওয়া গলায় হেসে বললেন। গোয়েন্দা হিসাবে ফেলুদার খ্যাতি বেঙ্গলী ক্লাবে পৌঁছে গেছে।

'আপনাদের কার্ডটা নিরঞ্জনবাবুর কাছে রেখে এসেছি। যাবেন কাইন্ডলি। আমরা সবাই কিন্তু এক্সপেক্ট করে থাকব।'

'বেশ ত, অন্য কোনো জরুরী ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়লে নিশ্চয়ই যাব।'

'জড়িয়ে মানে আপনি কি এখানেও কোন—?'

সঞ্জয় রায় আর গোকুল চ্যাটার্জির মাথা একসঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে এল। ফেলুদা এরকম অবস্থায় পড়লে একটা হাসি ব্যবহার করে যেটার তিনরকম মানে হয়—হ্যাঁ, না, আর হতেও পারে। এখানেও তাই করল। হাসির মানেটা না বুঝলে বোকা হতে হয়, তাই সঞ্জয় রায় আর গোকুল চ্যাটার্জি দুজনেই "বুঝে ফেলেছি" ভাবের একটা হাসি হেসে আবার কাবুলিওয়ালা দেখতে যাবার অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলেন।

রাস্তা আর দোকানের বাতি সব জ্বলে গিয়েছে, আকাশের রং রয়েল ব্লু থেকে পার্মানেন্ট ব্লু ব্ল্যাকের দিকে যাচ্ছে, কীর্তিরাম ছোটুরামের পানের দোকানে এই মাত্র ট্রানজিস্টার খোলাতে লতা মঙ্গেশকর সাইকেল রিকশার প্যাঁক-প্যাঁকানির সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় ফেলুদা অ্যানাউন্স করল যে তার ভক্তিভাব জেগেছে, একবার মছলিবাবার দর্শন না পেলেই নয়।

টেলিফোটো লেন্সে থ্রি পয়েন্ট ফাইভে হাফ সেকেন্ড এক্সপোজার দিয়ে ফেলুদা ভক্তদের পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে ক্যামেরা রেখে 'স্ট্যাচু হয়ে

থাক্, বলে মছলিবাবার একটা ছবি তুলল। আজ ভক্তের ভীড় সেদিনের চেয়েও বেশি—বোধহয় বাবাজী পাঁচদিন পরে চলে যাচ্ছেন বলে। মগনলালকে দেখলাম না। হয়ত এখনো আসেন নি—কিম্বা রোজ আসেন না। আমরা মিনিট কয়েক থেকে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা নতুন গলিতে এসে সামনে একটা কালো গরুকে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লালমোহনবাবু একটা ছোট্ট কাশি কেশে থেমে গেলেন।

'কী হল?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'ওটার হাইট কত হবে বলুন ত।'

'কেন?'

'এথিনিয়াম ইন্সটিটিউশনে হাইজাম্পের রেকর্ড ছিল মশাই আমার। তারপর একবার ভেল্ট্ হয়ে বাঁ হাঁটুটা...'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে গরুটার পাঁজরায় দু-তিনটে আলতো চাপড় দিতেই সেটা খড়্ খড়্ শব্দ করে একপাশে সরে গেল, আর আমরাও তিনজনে দিব্যি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

'কোথায় যাচ্ছি বলুন ত আমরা?'—আরো মিনিট পাঁচেক অলিগলিতে হাঁটার পর লালমোহনবাবু প্রশ্নটা করলেন।

'জানি না।'

আমি আর লালমোহনবাবু পরস্পরের দিকে চাইলাম। সব সময় যে চাইলেই এ-ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি তা নয়, কিন্তু ঠিক এই সময়টাতে একটা রাস্তার আলো মাথার উপর এসে পড়ায় লালমোহনবাবুর ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

'উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটলেও অনেক সময় মাথা খোলে', বলল ফেলুদা, 'এখানে মাথা খোলাটাই উদ্দেশ্য।'

'খুলছে কী?'

একটা ইঁদুর যদি মানুষ হতে পেত তাহলে বোধহয় লালমোহনবাবুর প্রশ্নটা এই ভাবেই করত। ফেলুদা কী উত্তর দিত জানি না, কারণ ঠিক এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটায় আমাদের মনটা অন্য দিকে চলে গেল।

এতক্ষণ এ-মোড় ও-মোড় ঘুরে আমরা যে গলিটায় পৌঁছেছিলাম সেটা একটু বিশেষ রকম নির্জন। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আশেপাশের বাড়িগুলোর ভিতর থেকে মানুষের গলার স্বর পেয়েছি, বাচ্চার কান্নার শব্দ পেয়েছি, রেডিও থেকে গানের আওয়াজ পেয়েছি। এখনের গলিটায় দূর থেকে ভেসে আসা মন্দিরের ঘণ্টা ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই। একটু এগোতে শোনা গেল

তার সঙ্গে আরেকটা শব্দও একটানা এক তালে হয়ে চলেছে—ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্...

লালমোহনবাবু আমাদের দুজনের মাঝখানে হাঁটছিলেন; শব্দটা শুনে দুদিকে হাত বাড়িয়ে আমাদের কোটের আস্তিন ধরে মৃদু টান দিয়ে হাঁটার স্পীড কমিয়ে দিলেন। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'হাইলি সাস্পিশাস।'

ফেলুদা নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ওটা সাস্পিশাস কিছু না; পানের তবক তৈরি হচ্ছে। সাস্পিশাস হচ্ছে ওইটে।'

এবার দেখলাম একটি লোককে আমাদের থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে। সে একটা মোড় ঘুরে সবেমাত্র এ গলিটায় ঢুকেছে।

লোকটা এগিয়ে এসে আমাদের দেখেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখে আলো পড়েনি, তাই এতদূর থেকে তাকে চেনা যাবে না। রাস্তার

আলোটা তার পিছন দিকে। সেই আলো তার পিঠে পড়াতে একটা প্রকাণ্ড লম্বা ছায়া সারা গলি জুড়ে প্রায় আমাদের পা অবধি পৌঁছে গেছে।

ছায়াটা অদ্ভুতভাবে দুলছে। লোকটা মাতাল নাকি?

ফেলুদা টেলিফোটো সমেত ক্যামেরাটা চোখে লাগাল।

'শশীবাবু!'

নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা বিদ্যুদ্বেগে দৌড়ে গেল সামনের দিকে। তিনজন প্রায় একসঙ্গেই গিয়ে পৌঁছলাম শশীবাবুর কাছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখে চেয়ে আছেন শশীবাবু ফেলুদার দিকে, তার ঠোঁট দুটো ফাঁক দেখে মনে হয় তিনি কিছু বলতে চাইছেন।

'কিছু বলবেন?'—ফেলুদা ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় জিগ্যেস করল।

'হাঁ...হাঁ...'

'কী হয়েছে শশীবাবু? কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'সিং...সিং...সিং!'

শশীবাবুর দেহটা সামনের দিকে এলিয়ে পড়ল।

তার পিঠে আলো পড়েছে।

সেই আলোতে দেখলাম শশীবাবুর পিঠে একটা ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে তার পাঞ্জাবির অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়েছে।

নয়

'গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেব রে।'

ফেলুদা এ ধরনের কথা আগে কোনোদিন বলেনি, কিন্তু এবার যে অবস্থায় পড়েছে, তাতে এটা বলা বোধহয় খুব অস্বাভাবিক নয়।

আজ সপ্তমী। সোমবার। এখন সকাল। শশীবাবু খুন হয়েছেন দুদিন আগে। আমরা সকালে চা রুটি ডিম খাওয়া সেরে আমাদের হোটেলের ঘরে যে যার খাটে বসে আছি। একটু আগে তেওয়ারি ফোন করে জানিয়েছেন যে শশীবাবুর ছোট ছেলে নিতাইকে নাকি অ্যারেস্ট করা হয়েছে। নিতাই খারাপ ছেলে এটা আগেই শুনেছি। তার সঙ্গে নাকি বাপের অনবরত খিটিমিটি লাগত। শশীবাবু নাকি প্রায়ই ওকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখাতেন। তাই ছেলের পক্ষে শেষ পর্যন্ত বাপকে খুন করাটা অস্বাভাবিক নয়। নিতাই কিন্তু খুন স্বীকার করেনি। সে নাকি সেদিন সন্ধেবেলা চৈতগঞ্জের একটা সিনেমায় হিন্দি ছবি দেখছিল। তার সার্টের পকেটে টিকিটের আধখানা পাওয়া গেছে। যে ছুরি দিয়ে শশীবাবুকে খুন করা হয়েছিল সেটা নাকি পাওয়া যায়নি।

মৃত্যুর দিন সন্ধ্যা ছটার মধ্যে শশীবাবু চক্ষুদানের কাজ শেষ করে দেন। বিকাশবাবু পুলিসকে বলেছেন যে কাজটা শেষ করেই শশীবাবু বিকাশবাবুর কাছে যান হোমিওপ্যাথিক ওষুধ চাইতে, কারণ তার নাকি আবার নতুন করে জ্বর এসেছিল। বিকাশবাবু ওষুধ দেন, শশীবাবু তখনই ওষুধ খেয়ে বাড়ি যাবার জন্য বেরিয়ে যান। পথেই তাকে খুন করা হয়।

'মাঝে মাঝে বোধহয় এ ধরনের একটা ধাক্কা খাওয়া ভালো।'—ফেলুদা আবার কথা বলছে। আমি জানি কথাটা ঠিক আমাদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে না। ফেলুদা যেটা করছে তাকে ইংরেজিতে বলে থিংকিং অ্যালাউড।—'বেশ লাগছে নিজেকে একটা সাধারণ স্তরের মানুষ বলে মনে করতে।—লালমোহনবাবু, আজ কাবুলিওয়ালা দেখতে যাবেন ত? এরা শুনেছি বেশ ভালো অভিনয় করে।'

'হ্যাঁ তা আপনি গেলে, মানে আপনি যদি...'

'আর কাল যাব চিরকুমার। পরশু জনাইর; তরশু রক্ত করবী। আর

দুর্গাবাড়িটাও একবার দেখিয়ে আনব আপনাদের। দেখবেন ওখানকার বাঁদর-গুলো ফেলু মিত্তিরের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।'

সত্যি সন্ধ্যাবেলা আমরা কাবুলিওয়ালা দেখতে বেঙ্গলী ক্লাবে হাজির হলাম, আর সত্যিই দেখলাম ওরা বেশ ভাল অ্যাকটিং করে।

পরদিন মহাষ্টমী। সকালে ঠাকুর দেখতে বেরোন হল। ঘোষাল বাড়ি ছাড়াও আরো অন্য বাড়িতে পুজো হয়। গোটা পাঁচেক ঠাকুর দেখে আমরা দুর্গাবাড়িতে গেলাম। লালমোহনবাবু মন্দিরের বাইরে রইলেন, কারণ বাঁদর জিনিসটা নাকি ওঁর খাঁচার বাইরে ভালো লাগে না। বললেন, 'ব্যাসদেব, থুড়ি—বাল্মীকিদেব যে কেন জানোয়ারটাকে জাতে তুলেছেন তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। যারা লাঠির খোঁচা না খেলে নাচতে পারে না তারা করবে সেতুবন্ধন? ছোঃ!—আর আমার গপ্পোকে বলা হয় গাঁজাখুরি!'

দুপুরে মিস্টার ঘোষাল ওঁদের বাড়িতে খেতে বলেছিলেন; ফেলুদা হোটেল থেকে ফোন করে বিকাশবাবুকে আপত্তি জানিয়ে দিল। আমরা হোটেলেই খেলাম। ফেলুদা দুবেলাই হাতের রুটি খায়। আজ হঠাৎ এক-গাদা ভাত খেয়ে বিছানায় শুয়ে এক ঘুমে সাড়ে চারটে বাজিয়ে দিল। পরে বুঝেছিলাম যে ঝড়ের আগে প্রকৃতির যে একটা ম্যাদামারা ভাব হয়, এ হল তাই; কিন্তু ফেলুদাকে কক্ষনো এরকম অকেজো আর ঝিমধরা অবস্থায় দেখিনি বলে এমনটা ভীষণ খারাপ লাগছিল।

লালমোহনবাবু অবিশ্যি ঠিক অকেজো ছিলেন না; তাঁর খাতায় তিনি একটা গল্পের খসড়া আরম্ভ করে দিয়েছেন গতকাল থেকে। দু লাইন লিখছেন আর সীলিং-এর দিকে চাইছেন। খালি একবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মুমূর্ষুতে কী অর্ডারে হ্রস্ব-উ দীর্ঘ-উ আসছে বলবে ভাইটি?'

শেষ পর্যন্ত টারজান দি এপ ম্যানও যাওয়া হল, কিন্তু ফেলুদার আর পুরো ছবিটা দেখা হল না। পুরো কেন বলছি—গোল্ডেন-গোল্ডউইন মেয়ারের নামের পর ছবির নামটা সবে পর্দায় পড়েছে, এমন সময় ফেলুদা দেখি সীট ছেড়ে উঠে পড়েছে।

'তোপ্সে, তোরা থাক। আমার একটু কাজ আছে।'

কিছু বলার আগেই ফেলুদা হাওয়া।

আমার মনের অবস্থা অদ্ভুত। ছবিটাও ভালো লাগছে, ফেলুদার মধ্যে হঠাৎ কেন জানি উৎসাহ জেগে উঠেছে, সেটাও ভালো লাগছে, অথচ ও যে কিসের জন্য চলে গেল সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

আটটার সময় ছবি শেষ হল; রিকশা নিয়ে হোটেলে ফিরলাম সোয়া আটটায়। ঘরে এসে দেখি ফেলুদা খাটে বসে খাতা খুলে ভীষণ মনোযোগ দিয়ে কি সব যেন হিসাব করছে। আমাদের দেখে বলল, 'তোরা খেয়ে নিস।

আমার জন্য এক পেয়ালা কফি পাঠিয়ে দিতে বলেছি।'

'তুমি খাবেই না?'

'পেট ভরা। তাছাড়া তেওয়ারির কাছ থেকে একটা জরুরী টেলিফোন আসছে।'

আজ অষ্টমী বলে হোটেলে লুচি মাংস ছিল, রান্নাও ভালো হয়েছিল, কিন্তু পাছে তেওয়ারির ফোন আসার আগে খাওয়া শেষ না হয় তাই সব-কিছু গোগ্রাসে গিলতে হল।

ফোনটা এল আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। এবার আমি ফেলুদার কাছে না থেকে পারলাম না। ফেলুদা যা বলল তা হচ্ছে এই—

'বলুন মিস্টার তেওয়ারি...হ্যাঁ. ভেরি গুড...না না, এখন কিছু করবেন না. একদম শেষ মুহূর্তে...হ্যাঁ, সেইজন্যেই ত গোড়ায় এত গণ্ডগোল লেগেছিল ...হ্যাঁ—আর ইয়ে—ওই বাড়িটায় খোঁজ করেছিলেন?...ভেরি গুড...ঠিক আছে, কাল দেখা হবে...গুড নাইট।'

লালমোহনবাবু আমার সঙ্গে নিচে যাননি। সিনেমা থেকে ফেরার পথেই আমাকে বলছিলেন, 'তোমার দাদার আজকের ভেল্কিবাজির ঠেলায় আমার প্লটের খেই হারিয়ে গেছে; আবার নতুন করে সব সাজাতে হবে।' ঘরে ফিরে এসে দেখি তিনি খাতা খুলে মুখ বেজার করে বসে আছেন। ফেলুদা ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করে দিল।

লালমোহনবাবু খাতা বন্ধ করে বললেন, 'খুব খারাপ হচ্ছে এটা, জানেন ত? না পারছি আমার গল্প এগোতে, না পারছি আপনার কেসের সঙ্গে পাল্লা দিতে। এদিকেও একটু ছিটেফোঁটা ছাড়ুন। আমাদেরও ত ব্রেন বলে একটা জিনিস আছে। একটু খাটাবার সুযোগ দিন!'

'কোনো আপত্তি নেই', ফেলুদা একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, 'আপনাকে পাঁচটা সূত্র দিচ্ছি, তা দিয়ে আপনি যত খুশি জাল বুনুন।'

'সূত্রো?'

'আফ্রিকার রাজা, শশীবাবুর সিং, হাঙরের মুখ, এক থেকে দশ, আর মগনলালের বজরা।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তার চেয়ে বললেই পারতেন চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, আর রুমালের মা। সে বরং ঢের সহজ হত।'

'কিন্তু একটা কথা আমাদের দিতে হবে আপনাদের'—ফেলুদা হঠাৎ সিরিয়াস—'কাল থেকে আর কোনো ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না।'

'একটা করেই যা জবাব পেলুম—আবার প্রশ্ন?'

ফেলুদা লালমোহনবাবুর রসিকতা অগ্রাহ্য করে বলে চলল, 'কাল থেকে আমাকে হয়ত মাঝে মাঝে বেরোতে হতে পারে, তবে আপনাদের সঙ্গে না। আপনারা দুজনে যেখানে খুশি যেতে পারেন; আমার মনে হয় না তাতে কোনো রিস্ক আছে। যদি তেমন বুঝি তাহলে আগে থেকেই বাইরে যেতে বারণ করব।...আর লালমোহনবাবু সাঁতার জানেন ত?'

'সাঁত—?'

'জলে নেমে ভেসে থাকতে পারেন ত?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—ফর্টি-ফোরে হেদোতে—'

'ওতেই হবে।—অবিশ্যি সাঁতারের যে প্রয়োজন হবেই তা বলছি না।'

পরের দিন নবমী। সকালে চা খেয়ে আমি আর লালমোহনবাবু বেরিয়ে পড়লাম। ফেলুদা বলল ও হোটেলেই থাকবে, কারণ ফোন আসতে পারে। লালমোহনবাবুর একা চড়ার শখ—এদিকে কাশীতে আজকাল ঘোড়ার গাড়ি মানে বেশির ভাগ টাঙ্গা। অনেক খুঁজে শেষে একটা একা পাওয়া গেল। সোনারপুরা রোড দিয়ে হিন্দু ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত গিয়ে দুর্গাকুণ্ড রোড দিয়ে ফেরার পথে মন্দির মসজিদ প্রাসাদ যা কিছু পড়ে সব দেখে সাড়ে এগারোটার সময় আমরা হোটেলে ফিরে এসে দেখি ফেলুদা বালিশ বুকের তলায় রেখে খাটের ওপর শুয়ে খুব মন দিয়ে তার তোলা কয়েকটা ছবির কোয়ার্টার সাইজ এনলার্জমেন্ট দেখছে। পরশু বেঙ্গলী ক্লাবে যাবার পথে ও কাউন ফোটো স্টোরসে ওর ফিল্মটা দিয়ে গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে তেওয়ারির টেলিফোন এল; ফেলুদা মিনিট দুয়েকের মধ্যেই কথা শেষ করে উপরে চলে এল। বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না, তাই আমি আর লালমোহনবাবু মণিকর্ণিকার শ্মশান দেখে এলাম। লালমোহনবাবু যাবার ও ফেরার পথে বার তিনেক বললেন, 'আজ আর কেউ ফলো করছে বলে মনে হচ্ছে না।'

ফিরে এসে শুনলাম ফেলুদা হোটেলেই ছিল। শংকরী-নিবাস থেকে বিকাশবাবু ফোন করেছিলেন; মিস্টার ঘোষাল জানতে চেয়েছেন ফেলুদা হাল ছেড়ে দিয়েছে কিনা।

'তুমি কি বললে?' আমি জিগ্যেস করলাম।

উত্তর এল, 'না।'

পরদিন ভোর ছটায় উঠে দেখি ফেলুদা নেই। বিছানা পরিপাটি করে চাদর দিয়ে ঢাকা, তার উপর ছাই ফেলার সেই পাথরের বাটি, আর তার তলায় এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা—'ফোন করব।'

তার মানে আমাদের হোটেলেই অপেক্ষা করতে হবে। তাতে আপত্তি নেই,

কেবল ফেলুদা যেন নিরাপদে থাকে, খুব বেশি রকম বেপরোয়া কিছু করে না বসে। ফেলুদা যদিও এ বিষয়ে কিছু বলেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস শশীবাবুকে মগনলালের লোক খুন করেছে। শশীবাবু নিশ্চয়ই ফেলুদার চেয়ে বড় শত্রু নয় মগনলালের। তাহলে ফেলুদাকেই যা—

আর ভাবব না। যা থাকে কপালে। কেবল মনে সাহস রাখতে হবে।

ভাত খাবার সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'মগনলাল সেদিন গণেশের কথা যা বললেন, সেটা তোমার দাদা বিশ্বাস করে হাত পা গুটিয়ে নিলেই পারতেন।'

আমি বললাম, 'গুটিয়ে ত নিয়েই ছিল; হঠাৎ সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে কী যে হল।'

'শেষটায় টারজানে যে এরকম সর্বনাশ করবে তা কে জানত বল।'

দুপুরে পর্যন্ত ফেলুদার কোনো ফোন এল না। খাবার পরে লালমোহনবাবু আর কিছু করার না পেয়ে শেষটায় গণেশ চুরি সম্পর্কে ওঁর নিজের কী ধারণা সেটা আমায় বললেন।

'বুঝলে তপেশ, গণেশটা আসলে চুরিই যায়নি। ওটা অম্বিকাবাবু আফিং-এর ঝোঁকে সিন্দুক থেকে বার করেছেন, আর তারপর নেশা কেটে যাবার পর ওটার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তাহলে এখন সেটা আছে কোথায়?'

'ওঁর তলাতলার চটিটা দেখেছ? ওঁর পায়ের চেয়ে চটি জোড়া কতখানি বড় সেটা লক্ষ করেছ? একজন বুড়ো মানুষ চটি পায়ে দিয়ে বসে থাকলে কে আর চটি খুলে তার ভেতরে সার্চ করতে যাবে বল?'

আমার একটু সন্দেহ হল। বললাম, 'আপনার নতুন গল্পে এরকম একটা ব্যাপার থাকছে বুঝি?'

লালমোহনবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'ঠিক ধরেছ। তবে আমার গল্পে গণেশের বদলে একটা দু' হাজার ক্যারেটের হীরে।'

'দু' হাজার!'—আমার চক্ষু চড়কগাছ।—'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরে স্টার অফ আফ্রিকা, কত ক্যারেট জানেন?'

'কত?'

'পাঁচশো। আর কোহিনুর হল মাত্র একশো দশ।'

লালমোহনবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'দু' হাজার না হলে গপ্প জমবে না।'

বিকেলে সাড়ে চারটার সময় হরকিষণ এসে বলল আমার টেলিফোন এসেছে। ঝড়ের মতো ছুটে নিচে গিয়ে নিরঞ্জনবাবুর অ্যাসিসট্যান্টের হাত থেকে ফোনটা প্রায় ছিনিয়ে নিলাম।

'কে, ফেলুদা?'

'শোন্',—গম্ভীর চাপা গলা—'খুব মন দিয়ে শোন্। দশাশ্বমেধের দক্ষিণে ওর ঠিক পরের ঘাট হল মুনশী ঘাট, আর তার পরে হল রাজা ঘাট। শুনছিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'মুনশী আর রাজার মাঝামাঝি একটা নিরিবিলি জায়গা আছে। একটা ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে আরেকটার ধাপ যেখানে শুরু হচ্ছে তার মাঝামাঝি।

'বুঝেছি।'

'দেখবি বৈদ্যনাথ মালসার একটা বিজ্ঞাপন আছে হিন্দিতে লেখা, পাথরের দেয়ালের গায়ে। আর তার নিচেই একটা মস্ত বড় চৌকো খুপরি।'

'বুঝেছি।'

'তোরা দুজন ওখানে গিয়ে পৌঁছবি ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। খুপরিটার সামনে অপেক্ষা করবি। আমি ছটা নাগাত পৌঁছব।'

'বুঝেছি।'

'আমি ছদ্মবেশে থাকব।'

কথাটা শুনে আমার বুকটা এমন ধড়াস করে উঠল যে আমি কিছু বলতেই পারলাম না। ফেলুদার ছদ্মবেশ মানে নাটকের ক্লাইমাক্স।

'শুনছিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'আমি ছটা নাগাত তোদের মীট করব।'

'ঠিক আছে।'

'না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবি।'

'ঠিক আছে। তুমি ঠিক আছ ত?'

'ছাড়ছি।'

খুট শব্দে ওদিকের টেলিফোনটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা যেন আবার কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দশ

দশাশ্বমেধে আজ দসেরার দিন ভীড় হবে বলে আমরা ঠিক করলাম অভয় চক্রবর্তীর বাড়ির রাস্তা দিয়ে আগে কেদার ঘাট যাবো। সেখান থেকে সিঁড়ি ধরে উত্তরে হাঁটলে প্রথমেই পড়বে রাজা ঘাট। লালমোহনবাবু আজ সকালে হোটেলের কাছেই একটা ডাক্তারি দোকান থেকে ষোল অক্ষরের নামওয়ালা কী একটা বড়ি কিনে এনে এরই মধ্যে দুবার দুটো করে খেয়ে নিয়েছেন। বললেন গতকাল রাতে নাকি ওঁর আধঘুমে অবস্থায় বার বার দাঁত কপাটি লেগে যাচ্ছিল, এখন সেটা একদম সেরে গেছে।

সাহস যে খানিকটা বেড়েছে সেটা বুঝলাম বড় রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে প্রথম গলিটায় ঢুকেই। সামনেই একটা ষাঁড়—গরু নয়, ষাঁড়—রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে। লালমোহনবাবু সটান এগিয়ে গিয়ে 'অ্যাই ষণ্ড, হ্যাট হ্যাট' বলে সেটাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে পাশ কাটিয়ে দিব্যি চলে গেলেন। আমি ভয় পাইনি, তবে মজা দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম; লালমোহনবাবু আমাকে 'এসো তপেশ, কিচ্ছু বলবে না' বলে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

অভয়বাবুর বাড়ির বাইরে আর ভিতরে বেশ ভীড় দেখলাম। কেন ভীড় সেটা ভাবতে গিয়েই খেয়াল হল যে আজই ত মছলিবাবার চলে যাবার দিন। আমরা এসেছি তৃতীয়াতে, আর আজ হল দশমী। যাক, তাহলে ভাসান ছাড়াও একটা বড় ঘটনা আছে আজকে।

বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তার মধ্যে আমাদের হোটেলের এক মুখচেনা ভদ্রলোককে দেখে তাঁকে জিগ্যেস করলাম মছলিবাবা কেদারঘাট থেকে যাবেন কিনা। ভদ্রলোক বললেন, 'না—বোধহয় দশাশ্বমেধ।' তাহলে আমাদের একটু দূরে থেকে দেখতে হবে ঘটনাটা। লালমোহনবাবুর তাতে আপত্তি নেই। বললেন, 'ভক্তদের চাপে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে দেখার চেয়ে একটু দূর থেকে দেখা ঢের ভাল।'

কেদার ঘাট থেকে উত্তর দিকে হাঁটা শুরু করে মিনিট পাঁচেক লাগল রাজাঘাট পৌঁছতে। ঘাটের পাশে সারি সারি উঁচু বাড়ি থাকার জন্য এদিকটা থেকে রোদ সরে যায় অনেক আগেই। বর্ষার পরে জল এগিয়ে এসেছে,

বাড়ির ছায়া জলের কিনারা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে আর রোদ থাকবেই না। আর তার পরেই ঝপ করে নামবে অন্ধকার। ঘাটের পাশে এক জায়গায় সারি সারি নৌকো, তার উপরে ডাঙা বাঁশের মাথায় কার্তিক মাসের বাতি জ্বলছে। উত্তরে বোধহয় দশাশ্বমেধ ঘাট থেকেই একটা শব্দের ঢেউ ভেসে আসছে—বুঝতে পারছি বহু লোকের ভীড় জমেছে সেখানে। তার মধ্যে ঢাকের শব্দ পাচ্ছি, আর মাঝে মাঝে পটকার শব্দ আর হাউইয়ের হুশ্।

রাজা ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে ভিজে মাটি শুরু হল। মিনিট খানেক হাঁটার পর বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। বৈদ্যনাথ সালসা। প্রায় এক-মানুষ বড় বড় এক-একটা হিন্দি অক্ষর। পরে ফেলুদাকে জিগ্যেস করাতে ও বলেছিল সালসা কথাটা নাকি পোর্তুগীজ; ওটার মানে হল একরকম রক্ত পরিষ্কার-করা ওষুধ।

জায়গাটা সত্যি খুব নিরিবিলি। শুধু তাই না—এখান থেকে দশাশ্বমেধ দিব্যি দেখা যাচ্ছে। ঘাটের ধাপে মানুষের ভীড় আর জলে নৌকো আর বজরার ভীড়।

'দুর্গা মাঈকী জয়!'

একটা ঠাকুর ভাসান হয়ে গেল। বজরার মাথায় তুলে খানিকটা নদীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই হল। দু নৌকো ফাঁক করে ভাসান দেওয়ার ব্যাপার এখানে নেই।

রোদ চলে গেল, কিন্তু ঘাটের গণ্ডগোল এখন বেড়েই চলবে। ছ'টা বাজতে কুড়ি। লালমোহনবাবু হাতের ঘড়িটা দেখে সবে বলেছেন 'তোমার দাদার টেলিস্কোপটা থাকলে খুব ভালো হত', এমন সময় একটা নতুন চিৎকার শোনা গেল—

'গুরুজী কি জয়! মছলিবাবা কি জয়! গুরুজী কি জয়!'

বেনারসের ঘাটে একরকম আটকোনা বুরুজ থাকে, যার উপর অনেক সময় ছাতার তলায় পাণ্ডারা বসে, পালোয়ানরা মুগুর ভাঁজে, আবার এমনি সাধারণ লোকও বসে। আমাদের ঠিক সামনেই হাত পঞ্চাশেক দূরে সেইরকম একটা বুরুজ জল থেকে চার-পাঁচ হাত উঁচুতে উঠে রয়েছে—সেটা এখন খালি। সেইরকম বুরুজ দশাশ্বমেধে অনেকগুলো আছে। তার মধ্যে যেটা আমাদের দিকে, তার উপর কিছু লোক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। 'গুরুজী কি জয়' শুনেই তাদের মধ্যে একটা ব্যস্ত ভাব দেখা গেল। তারা এখন সবাই ঘাটের সিঁড়ির দিকে চেয়ে রয়েছে।

এবার দেখলাম একটা প্রকাণ্ড দল সিঁড়ি দিয়ে নেমে বুরুজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দলের মাথায় যিনি রয়েছেন তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং মছলিবাবা। টকটকে লাল লুঙ্গিটা এখন মালকোঁচা দিয়ে ধুতির মতো করে

পরা। গায়ের লাল চাদরের উপর হলদে রঙ দেখে বুঝলাম বাবা অনেক গাঁদা ফুলের মালা পরে আছেন।

বুরুজ এবার প্রায় খালি হয়ে গেল। শুধু দুজন রইল, তারা বাবার হাত ধরে তাকে উপরে তুলল। বাবার মাথা এখন সবাইয়ের উঁচুতে।

বাবা এবার দু' হাত তুললেন ভক্তদের দিকে ফিরে। কী বললেন, বা কিছু বললেন কিনা সেটা এতদূর থেকে বোঝা গেল না।

এবার বাবা হাত তোলা অবস্থাতেই বুরুজের উল্টোদিকে এগিয়ে গেলেন। বাবার সামনে এখন গঙ্গা। পিছন থেকে আবার জয়ধ্বনি উঠল—'জয় মছলি-বাবা কী জয়!'

সেই জয়ধ্বনির মধ্যে বাবা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।

একটা অদ্ভুত আওয়াজ উঠল ভক্তদের মধ্যে। লালমোহনবাবু সেটাকে 'সমস্বরে বিলাপ' বললেন। বাবাকে কিছুক্ষণ জলের মধ্যে সাঁতরাতে দেখা গেল। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, 'ডুব সাঁতারে পোঁছে যাবে পাটনা—কী থ্রিলিং ব্যাপার ভাবতে পার?'

আরো একটা থ্রিলিং ব্যাপারে আমাদের প্রায় হার্টফেল হয়ে যাবার অবস্থা হল যখন দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে চোখ ঘুরিয়ে দেখি এই ফাঁকে কখন জানি একটি লোক এসে আবছা অন্ধকারে নিঃশব্দে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার বাঁ হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মাথায় পাগড়ি, মুখে গোঁফ-দাড়ি, গায়ে লম্বা সার্টের উপর ওয়েস্ট কোট, নিচে পায়জামা, আর তারও নিচে একজোড়া ডাকসাইটে কাবলি জুতো।

কাবুলিওয়ালা।

কাবুলিওয়ালা ডান হাতটা অল্প তুলে আমাদের আশ্বাস দিল।

ফেলুদা। কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশে ফেলুদা। এই মেক-আপই সেদিন ব্যবহার করেছিল বেঙ্গলী ক্লাবের ত্রিদিব ঘোষ।

'ওয়াণ্ডার—'

লালমোহনবাবুর প্রশংসা মাঝপথে থামিয়ে দিল ফেলুদার ঠোঁটের আঙুল।

কী ঘটতে যাচ্ছে জানি না, ছদ্মবেশের কী দরকার জানি না, অপরাধী কে বা কারা জানি না, তবু ফেলুদা যদি চুপ করতে বলে তাহলে চুপ করতে হবেই। এটা আমিও জানি, আর লালমোহনবাবুও আজ্দিনে জেনে গেছেন।

ফেলুদা এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। আমাদের চোখও সেইদিকে চলে গেল।

দূর থেকে একটা বজরা ভেসে আসছে ঘাটের দিকে। তার মাথায় একটা বাতি জ্বলছে। বড় বজরা। বজরার ছাতে চার পাঁচজন লোক। কাউকেই চেনা যায় না। এতদূর থেকে সম্ভব নয়।

'দুর্গা মাঈকি জয়! দুর্গা মাঈকি জয়!'

আরেকটা প্রতিমা আসছে ঘাটে। সিঁড়ি দিয়ে নামানো হচ্ছে। হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো পড়ে ঠাকুর মাঝে মাঝে ঝলমল করে উঠছে। দূর থেকেও চিনতে অসুবিধা নেই। এটা ঘোষালদের ঠাকুর।

ফেলুদার সঙ্গে আমরাও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বিসর্জন দেখতে লাগলাম।

বিরাট প্রতিমা বজরার মাথায় চড়ে গেল। বজরা এগোতে শুরু করল আরো গভীর জলের দিকে।

তারপর দেখলাম প্রতিমাটা একবার ঝাঁকি দিয়ে উপরে উঠে চিত হয়ে বজরার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝপাং শব্দটা এলো কিছু পরে—যেমন ক্রিকেট মাঠে বল মারাটা চোখে দেখার কিছু পরে শব্দটা আসে।

হঠাৎ মনে হল শশীবাবুর তুলির টান এখন জলের তলায়। হয়ত এর মধ্যেই সব ধুয়ে মুছে গেছে।

মছলিবাবাকে দেওয়া গাঁদা ফুলের মালাগুলো এখন ভেসে যাচ্ছে আমাদের সামনে দিয়ে।

যে বজরাটা দূর থেকে নদীর ধার দিয়ে আসছিল, সেটা এখন দশাশ্বমেধ ছাড়িয়ে আমাদের দিকে আসছে।

মগনলালের বজরা। মগনলালের বিশাল দেহটা দেখতে পাচ্ছি বজরার ছাতে। সে বাবু হয়ে বসে আছে, সঙ্গে আরো চারজন লোক।

ফেলুদার ডান হাতটা তার কোমরের কাছে, বাঁ হাতটা এখনো লাঠিটাকে ধরে আছে। আলো কমে এসেছে, কিন্তু তাও আমি বাঁশের একটা গাঁটের নিচে মুঠো করে ধরা বাঁ হাতটা দেখতে পাচ্ছি।

সেদিনের গলিতে শোনা ধুপ ধুপ শব্দটা আবার শুনতে পাচ্ছি। এখন সেটা হচ্ছে আমার বুকের ভিতরে।

আমার গলা শুকিয়ে আসছে।

আমার চোখ ওই বাঁ হাতটা থেকে সরাতে পারছি না।

ফেলুদার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা লম্বা।

কাবুলিওয়ালার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা কাটা।

ফেলুদার বাঁ হাতের কবজির কাছে একটা তিল।

কাবুলিওয়ালার বাঁ হাতের কবজির কাছে কোনো তিল নেই।...

এ লোকটা ফেলুদা নয়।

কে এসে দাঁড়িয়েছে কাবুলিওয়ালা সেজে আমাদের পাশে?

লালমোহনবাবু কি জানেন তাঁর পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে?

তিনি কি বুঝেছেন ও ফেলুদা নয়?

বজরাটা আমাদের সামনের বুরুজের কাছাকাছি চলে এসেছে। এখান থেকে

খুরুজটা প্রায় পঁচিশ গজ দূরে। বজরা এখন তারও প্রায় পঁচিশ গজ উত্তর দিকে। ব্যবধান কমে আসছে।

কাবুলিওয়ালা আমাদের ইশারা করল খুপরিটার ভিতর ঢুকে যেতে। লালমোহনবাবু নিজে ঢুকে আমার হাত ধরে টেনে নিলেন। এক হাতের বেশি গভীর নয় খুপরিটা। আমরা এখান থেকে সবই দেখতে পাচ্ছি, যদিও বাইরের লোকে আমাদের দেখতে পাবে না।

বজরা এবার থামো-থামো।

খুরুজের ঠিক পিছনে জলে কী যেন নড়ছে।

একটা লোকের শুধু মাথাটা জলের উপর উঠল। লালমোহনবাবু হাতটা বাড়িয়ে আমার কোটের আস্তিনটা খামচে ধরলেন।

একটা লোক বজরা থেকে প্রায় নিঃশব্দে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

লোক নয়—ছোকরা।

শুকুর বখ্শ সুরেশ।

সুরেশ সাঁতরে এগিয়ে এলো বুরুজের দিকে।

বুরুজের পিছনে জল থেকে এবার লোকের মাথাটা উঠতে শুরু করে কাঁধ অবধি বেরিয়ে এল। একি স্বপ্ন, না সত্যি? ও যে মছলিবাবা! দু' হাতে জাপটে কী যেন ধরে আছে। সুরেশ তার দিকেই এগিয়ে এসেছে। বজরার ছাতের লোকেরা ওদের দুজনের দিকেই দেখছে।

এবার আরেকটা—একটা নয়, পর পর দুটো—ধাঁধা লাগানো জিনিস ঘটল। মছলিবাবা তার হাত থেকে এবড়ো-খেবড়ো বলের মতো জিনিসটা ছুঁড়ে ঘাটের দিকে ফেলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালা হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে জিনিসটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ডান হাতে পকেট থেকে রিভলবার বার করে বজরার দিকে তাগ করে দাঁড়াল।

সেই মুহূর্তেই মগনলাল এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম তারও হাতে একটা রিভলভার এসে গেছে। তার পাশে লোকগুলোও উঠে দাঁড়িয়েছে, আর মনে হচ্ছে ওদের হাতেও অস্ত্র রয়েছে।

এদিকে আমাদের মাথার উপরেও পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ধুপ ধাপ করে দু'তিনটে সশস্ত্র পুলিস বোধহয় বৈদ্যনাথ সাদলার পিছনের চত্বরটা থেকে লাফিয়ে আমাদের দু'পাশে পড়ল।

তারপরেই শুরু হল কান ফাটানো গুলির শব্দ। একটা গুলি আমাদের খুপরির ঠিক পাশে দেয়ালের গায়ে লাগল। অমনি দেয়ালের গুঁড়ো গঙ্গার হাওয়ায় সোজা এসে ঢুকল লালমোহনবাবুর নাকের ভিতর।

'হ্যাঁচ্চো!'

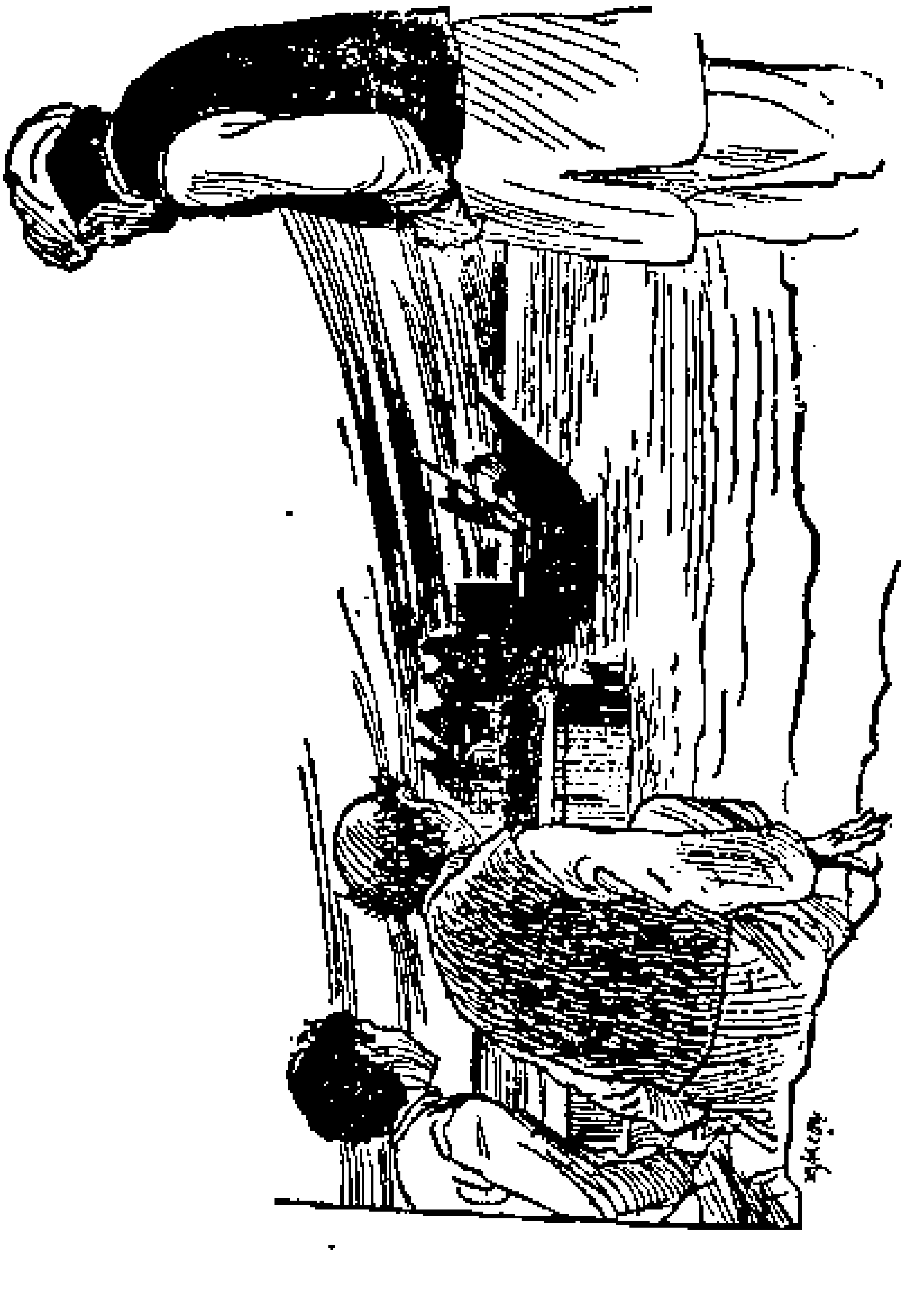

ওদিকে মগনলালের হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে গেছে। আর তার পরেই এক তাজ্জব ব্যাপার। ওই হিপোপটেমাসের মতো লোকটা বজরার উল্টোদিকে ছুটে গিয়ে এক বিকট চিৎকার দিয়ে হাত দুটো মাথার উপর তুলে একটা বিরাট লাফ দিয়ে গঙ্গায় পড়ে চতুর্দিকে জলের ফোয়ারা ছিটিয়ে দিল।

কিন্তু কোনো লাভ নেই। দুটো নৌকো এরই মধ্যে বজরার পাশে এসে পড়েছে, তাতে পুলিস বোঝাই।

আর মছলিবাবা?

তিনি সুরযকে বগলদাবা করে জল থেকে উঠে আসছেন।

এবার তিনি কাবুলিওয়ালার দিকে ফিরে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, তেওয়ারিজী।'

আর কাবুলিওয়ালা মছলিবাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে জল থেকে টেনে তুলে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার মিত্তির।'

আমি আর লালমোহনবাবু খাটিয়াতে বসে পড়লাম; না হলে হয়ত মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম।

সুরয একজন পুলিসের হাতে চলে গেল। ফেলুদা কাছে আসতে বুঝলাম তার মেক-আপটা কী অসাধারণ হয়েছে—যদিও এখন শরীরের কোনো কোনো জায়গায় কালো রঙের ফাঁক দিয়ে চামড়ার আসল রংটা বেরিয়ে পড়েছে।

'শ্বেতীর মতো লাগছে না রে তোপ্সে?'

'ওয়াণ্ডারফুল!'—বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা এবার তেওয়ারির দিকে ফিরে বলল, 'আপনার লোককে বলে দিন ত—ক্যাম্পে তোমার আর আমার জামাকাপড়গুলো রয়েছে—চট করে নিয়ে আসুক।'

এগার

বিজয়া দশমী, রাত পৌনে দশটা। ঘোষাল বাড়ির একতলার বৈঠকখানা। যাঁরা ঘরে রয়েছেন তাঁরা হলেন—গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্তির, লালমোহন গাঙ্গুলি, সাব-ইনসপেক্টর তেওয়ারি, অম্বিকা ঘোষাল, উমানাথ ঘোষাল, উমানাথবাবুর স্ত্রী, রুক্মিণীকুমার ঘোষাল, বিকাশ সিংহ, আর আরো সব যারা বাইরে থেকে এসেছেন যাদের নাম জানি না, আর আমি—তপেশরঞ্জন মিত্র। এ ছাড়া ঘরের দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারতে দেখছি তিনজন লোককে—দারোয়ান ত্রিলোচন পাণ্ডে, বেয়ারা বৈকুণ্ঠ আর বুড়ো চাকর অরুন্ধতী।

কোলাকুলি শেষ, মিষ্টি শেষ—অন্তত পেটে শেষ, যদিও কারুর কারুর চোয়াল এখনো নড়ছে। যেমন ফেলুদার। ঠাকুর ভাসান হয়ে যাবার পর বাড়ির লোকের মন খারাপ হয়ে যায়; এখানেও তাই হয়েছিল। কিন্তু এখন আবার এক ঠাকুর চলে গিয়ে আরেক ঠাকুর ফিরে পাবার আশায় সকলের মুখেই বেশ একটা হাসিহাসি উত্তেজনার ভাব। এটা বলে রাখি যে গণেশ পাওয়া গেছে কিনা সেটা কিন্তু এখনো জানা যায়নি। যেটা জানা গেছে সেটা হল মছলিবাবার ঘটনা। আজ বিকেল চারটের সময় ভক্তের দল আসার আধঘণ্টা আগে অভয়বাবুর বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পুলিস মছলিবাবাকে অ্যারেস্ট করে। বাবাজী আসলে ছিলেন সেই রায় বেরিলীর জেল থেকে পলাতক জালিয়াত। তা ছাড়াও তিনি ছিলেন মগনলালের একজন স্যাঙাৎ। তার আসল নাম নাকি পুরন্দর রাউত, বাড়ি পুর্ণিয়া। লোকটা অনেকদিন কলকাতায় ছিল, মনুমেন্টের তলায় হাত সাফাইয়ের খেলা দেখানো থেকে শুরু করে অনেক রকমের অদ্ভুত কাজ করে শেষটায় জালিয়াতি ধরে। অ্যারেস্টের এক ঘণ্টার মধ্যে বেঙ্গলী ক্লাবের কাছ থেকে ধার করা মেক-আপের সরঞ্জামের সাহায্যে মছলিবাবার চেহারা নিয়ে ফেলুদা ভক্তদের সামনে হাজির হয়। তার আগেই অবিশ্যি পুরন্দর রাউত পুলিসের চাপে পড়ে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছিল। আজ গঙ্গার ঘাটে যে দুর্ধর্ষ নাটকটা মগনলাল প্ল্যান করেছিল সেটাও পুরন্দর বলে দিয়েছিল। আসলে মছলিবাবাকে মগনলালই খাড়া করেছিল। তার পিছনে যে কি সাংঘাতিক শয়তানি ফন্দি ছিল সেটা পরে ফেলুদার কথা থেকে জানা যায়।

সবাই মুখ বন্ধ করে উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছে, সকলেরই দৃষ্টি ফেলুদার দিকে। লালমোহনবাবু যে কেন মাঝে মাঝে হেসে উঠছেন জানি না; হয়ত বিকাশবাবু ওকে জোর করে সিদ্ধি খাইয়েছেন বলে। সিদ্ধি খেলে নাকি হাসি পায়।

ফেলুদা জল খেয়ে হাতের কাঁচের গেলাসটা আওয়াজ বাঁচিয়ে খুব সাবধানে পিতলের কাশ্মিরী টেবিলটার উপর রেখে বলল, 'মগনলালই মছলিবাবার সৃষ্টিকর্তা একথা আমি আপনাদের আগেই বলেছি। মছলিবাবা অন্তর্যামী, মছলিবাবা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী—এধরনের কয়েকটা ধারণা রটাতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হয়। কেদার ঘাটে মছলিবাবাকে এনে ফেলার আগে অভয় চক্রবর্তী এবং লোকনাথ পাণ্ডা সম্বন্ধে দু'একটা কথা জেনে নেওয়া মগনলালের মতো লোকের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না। বাকি কাজটা সম্ভব হয়েছিল অভয়বাবুর অন্ধ ভক্তির জোরে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাসের জোরে।'

ফেলুদা থামল। লালমোহনবাবু হাসবার জন্য মাথা পিছনে হেলিয়ে মুখটা খুলতেই আমি ওর কনুইয়ে খোঁচা মেরে ওকে থামালাম। ঘরের আর প্রত্যেকটি লোক হাঁ করে ফেলুদার কথাগুলো গিলছে। ফেলুদা বলে চলল—

'মগনলালের সঙ্গে সম্প্রতি তার বাড়িতে বসে আমার কিছু কথা হয়েছিল। মগনলাল বলেছিল গণেশটা তার কাছে আছে, এবং উমানাথবাবু নিজে নাকি সেটা তাকে বিক্রী করেছেন।'

'অ্যাঁ!'—চোখ রাঙিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন উমানাথ ঘোষাল। 'আপনি বিশ্বাস করেছিলেন তার কথা?'

'রহস্যের একটা নতুন দিক হিসাবে কথাটা শুনতে যে খুব খারাপ লেগেছিল তা বলব না। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন মগনলাল তদন্ত বন্ধ করার জন্য আমাকে একটা মোটা ঘুষ অফার করলো, তখন মনে একটা খটকা লাগল। বন্ধ করার একটা কারণ অবিশ্যি মগনলাল বলেছিল, কিন্তু সেটা আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। তার কথা সত্যি হলে বরং আপনি আমাকে ঘুষ অফার করতে পারতেন—কারণ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেলে সেটা আপনার পক্ষে মোটেই সুবিধের হত না। অথচ আপনি আমাকে নিজে থেকে অনুসন্ধান চালাতে বলেছেন।'

'নিজে থেকে', প্রতিধ্বনি করলেন লালমোহনবাবু, 'হাঃ হাঃ—নিজে থেকে।'

ফেলুদা লালমোহনবাবুর পাগলামো অগ্রাহ্য করে বলে চলল—

'তখনই আমার প্রথম সন্দেহ হয় যে তাহলে হয়ত গণেশটা আপনাদের বাড়িতেই কোথাও রয়ে গেছে, এবং মগনলাল কোনো উপায়ে কোনো একটা সময়ে সেটা পাবার আশা করছে। বাড়িতে রয়েছে, অথচ সিন্দুকে নেই—

তাহলে গেল কোথায় জিনিসটা? সেই সঙ্গে আবার এটাও মনে হল যে এ বাড়ির সঙ্গে মগনলালের একটা যোগসূত্র না থাকলে সেই বা কী করে আশা করছে গণেশটা পাবার?

'এই সব যখন ভাবছি, তখন একটা কারণে হঠাৎ সন্দেহটা গিয়ে পড়ল মিস্টার সিংহের উপর; কারণ আমি জানতে পারলাম যে তিনি একটা জরুরী সত্য আমার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিলেন। জেরার ফলে বিকাশবাবু স্বীকার করলেন যে তিনি দশই অক্টোবর লুকিয়ে লুকিয়ে মগনলালের সঙ্গে উমানাথবাবুর কথাবার্তা শুনেছিলেন। শোনার পর থেকে তার মনে গণেশটা সম্পর্কে একটা উদ্বেগ থেকে যায়। মিস্টার ঘোষাল যেদিন মছলিবাবাকে দেখতে যান, সেদিন আর থাকতে না পেরে বিকাশবাবু দোতলায় অম্বিকাবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলেন। খুলে দেখেন গণেশ নেই।'

'গণেশ তখনই নেই?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন উমানাথবাবু। 'তার মানে তার আগেই চুরি হয়ে গেছে?'

'চুরি না', ফেলুদা বলল। ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছে—তার হাত দুটো প্যান্টের পকেটে। 'চুরি না। একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি গণেশটিকে মগনলালের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেটিকে লুকিয়ে রেখেছিল।'

'ক্যাপ্টেন স্পার্ক!'—বলে উঠল রুক্মিণীকুমার।

সবাইয়ের দৃষ্টি রুকুর দিকে ঘুরে গেল। সে ঘরের এক কোণে একটা দরজার পাশে পর্দা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'ঠিক বলেছ। ক্যাপ্টেন স্পার্ক, ওরফে আমাদের রুকুবাবু।—আচ্ছা, ক্যাপ্টেন স্পার্ক, সেদিন যখন তোমার বাবার সঙ্গে একজন মোটা ভদ্রলোক এ ঘরে বসে কথা বলছিলেন—'

রুকু ফেলুদার কথা শেষ না হতেই চেঁচিয়ে উঠল—'ডাকু গণ্ডারিরাম!—ক্যাপ্টেন স্পার্ক তাকে বার বার বোকা বানায়!'

'সে যখন কথা বলছিল, তুমি কি তখন এই পাশের ঘর থেকে শুনছিলে?'

রুকু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'শুনছিলাম ত। আর তক্ষুনি ত সিন্দুক খুলে গণেশ নিয়ে লুকিয়ে রাখলাম। না হলে ত ও নিয়ে নিত।'

'ভেরি গুড', ফেলুদা বলল। তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বলল, 'আমি ক্যাপ্টেন স্পার্ককে গণেশের কথা জিগ্যেস করেছিলাম। তাতে ও বলেছিল গণেশ পাওয়া যাবে না। কারণ সেটা রয়েছে আফ্রিকার এক রাজার কাছে। কথাটার মানে আমি তখন বুঝতে পারিনি। শেষে বুঝলাম একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে—পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরোন টার্জনের একটা ফিল্ম দেখতে গিয়ে।'

ফেলুদা থামতেই চারদিক থেকে—সে কি! অ্যাঁ? টার্জনের ছবি? ইত্যাদি

অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে শোনা গেল। ফেলুদা সরাসরি উত্তর না দিয়ে আবার রুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন স্পার্ক', টারজানের ছবির একেবারে শুরুটা কি সেটা মনে করে বলতে পার তুমি?'

'পারি', বলল রুকু, 'মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার প্রেজেন্টস—'

'ঠিক কথা—মিস্টার তেওয়ারি, দেখুন ত আমরা মেট্রো-গোল্ডউইনের খেলা কিছু দেখাতে পারি কিনা।'

তেওয়ারি তার চেয়ারের নিচ থেকে একটা খবরের কাগজের মোড়ক নিয়ে সেটা খুলে তার থেকে একটু অদ্ভুত জিনিস বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিল। তার উপরে বিজলীর ঝাড়ের আলোটা পড়তেই বুঝলাম সেটা একটা জলে নষ্ট হয়ে যাওয়া মাটির তৈরি হাঁ-করা সিংহের মাথা। ফেলুদা মাথাটা হাতে তুলে ধরে বলল, 'এই দেখুন আফ্রিকার পশুরাজ তথা দুর্গার বাহনের মাথা। এই সিংহের হাঁ-য়ের মধ্যে গণেশ লুকিয়ে রেখেছিল ক্যাপ্টেন স্পার্ক। তার ধারণা ছিল বিসর্জনের পর গণেশ ভাসতে ভাসতে চলে যাবে সমুদ্রে, আর সেখানে একটি হাঙর সেটাকে গ্রাস করবে, আর স্পার্কই আবার সেই হাঙরকে হারপুন দিয়ে মেরে গণেশটাকে পুনরুদ্ধার করবে। তাই না, ক্যাপ্টেন স্পার্ক?'

'তাই ত', বলল রুকু।

'আর মছলিবাবার প্ল্যান ছিল তিনি ঠাকুর ভাসানের আগে নিজে জলে ঝাঁপ দেবেন। তারপর কিছু দূর সাঁতরে গিয়ে আবার ডুব সাঁতারে ফিরে আসবেন ঘাটের দিকে—এসে নৌকোর আড়ালে অপেক্ষা করবেন। তারপর ভাসানের পরমুহূর্তে আবার ডুব দিয়ে সিংহের মাথাটি চাড় দিয়ে খুলে নিয়ে চলে যাবেন মুনশীঘাট আর রাজঘাটের মাঝামাঝি একটা নির্জন জায়গায়। ততক্ষণে মগনলালের বজরাও এসে যাবে সেইখানে। বাস্—বাকি কাজ ত সহজ।'

উমানাথবাবু বললেন, 'কিন্তু বাবাজী যে দসেরার দিনে যাবেন, সে ত তার ভক্তরাই ঠিক করে দিয়েছিল। আর গণেশ কোথায় আছে সে খবরই বা বাবাজী জানবেন কী করে? আর মগনলালই বা জানবে কী করে?'

'দুটোর উত্তরই খুব সহজ', বলল ফেলুদা। 'তৃতীয়ার দিনে বাবাজী তার ভক্তদের জিগ্যেস করেন এক থেকে দশের মধ্যে একটা নম্বর বলতে। যথারীতি অধিকাংশ উত্তরই হয় সাত। এটাই নিয়ম। ফলে হয়ে গেল তিনে সাতে দশ—অর্থাৎ দসেরা। আর সিংহের মুখে গণেশ লুকোনোর কথাটা ক্যাপ্টেন স্পার্ক সবাইকে না বললেও, তার বন্ধু সুরযকে নিশ্চয়ই বলেছিল, তাই না, ক্যাপ্টেন স্পার্ক?'

রুকু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভুরু কুঁচকে গেছে। সে ছোট্ট করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল।

ফেলুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শয়তান সিং সত্যিই শয়তান সিং।

সুরেশের পুরো নাম সুরেশলাল মেঘরাজ। সে মগনলালের ছোট ছেলে। যাকে বলে বাপকা বেটা। থাকত মানমন্দিরের কাছে মগনলালের দুটো বাড়ির একটাতে। ওটায় ফ্যামিলি থাকত। অন্যটায় থাকত মগনলাল নিজে। সুরেশই তার বাপকে খবরটা দেয়, এবং তার পরেই মগনলাল তার বিরাট চক্রান্তটি খাড়া করে।'

'বিশ্বাসঘাতক!'—বলে উঠল রুকু।

এতক্ষণে অম্বিকাবাবু মুখ খুললেন—

'সিংহের মাথাটা ত টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে, কিন্তু গণেশ কই?'

ফেলুদা মাথাটাকে আবার হাতে তুলে নিল। তারপর তার হাঁ-করা মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে টান দিয়ে যে জিনিসটা বার করল সেটা গণেশ নয় মোটেই। সেটা তার আঙুলের ডগায় লেগে থাকা চটচটে একটা সাদা জিনিস।

'ক্যাপ্টেন স্পার্ক গণেশটাকে আটকাতে একটা আশ্চর্য সহজ উপায় বার করেছিল।'

'চিকলেট!'—বলে উঠল রুক্মিণীকুমার।

'হ্যাঁ, চুইং গাম', বলল ফেলুদা, 'সেই চুইং গামের খানিকটা এখনো রয়ে গেছে, কিন্তু গণেশ আর এখানে নেই।'

ফেলুদার এই এক কথাতেই ঘোষাল বাড়ির সকলের মুখ কালো হয়ে গেল। উমানাথবাবু কপাল চাপড়ে বলে উঠলেন, 'তাহলে এত করে কী হল মিস্টার মিত্তির? গণেশই নেই?'

ফেলুদা সিংহের মাথাটা আরেকবার নামিয়ে রেখে বলল, 'আমি আপনাদের মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবার জন্য আপনাদের এখানে ডাকিনি, মিস্টার ঘোষাল। গণেশ আছে। সেটা কোথায় বলার আগে আমি আপনাদের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনাদের একজন খুব পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যুর কথা। শশীভূষণ পাল।'

'তাকে ত অন্য ছেলে মেরেছে' বলে উঠলেন উমানাথবাবু, 'সেই নিয়েছে নাকি গণেশ?'

'ব্যস্ত হবেন না', বলল ফেলুদা, 'আমার কথাটা আগে মন দিয়ে শুনুন। আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ, এবং সে প্রমাণ আমরা পাব বলেই আমার বিশ্বাস।'

ঘরের প্রত্যেকটি লোক আবার স্তব্ধ হয়ে ফেলুদার দিকে দেখছে। লালমোহনবাবু আর জোরে হাসছেন না, কিন্তু সব সময়েই তার মুখে হাসি লেগে রয়েছে। আর কেন জানি মাঝে মাঝে ডান হাত দিয়ে নিজের কপালে চাঁটি মারছেন।

ফেলুদা বলল, 'সিংহের মুখের মধ্যে যদি গণেশ লুকোন থাকে তাহলে সেটা দেখে ফেলার সবচেয়ে বেশি সুযোগ ছিল শশীবাবুর। বিশেষ করে

যেদিন তিনি সিংহের মুখের বাইরে এবং ভিতরে তুলির কাজ করছিলেন সেইদিন। অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন। অর্থাৎ যেদিন তিনি খুন হন। সেদিন আপনারা সন্ধ্যায় বাড়ি ছিলেন না মনে আছে কি? ত্রিলোচন বলেছে আপনারা বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি দেখতে গিয়েছিলেন।'

উমানাথবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। ফেলুদা বলল, 'আমরা পুলিসের কাছ থেকে জেনেছি যে শশীবাবু সেদিন আবার অসুস্থ বোধ করাতে তাঁর কাজ শেষ করে বিকাশবাবুর কাছে ওষুধ চাইতে গিয়েছিলেন। একথা বিকাশবাবুই পুলিশকে বলেছিলেন। শশীবাবু ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে যান। আমরা ত্রিলোচনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে শশীবাবু যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিকাশবাবুও বেরিয়েছিলেন। তিনি কেন বেরিয়েছিলেন সেটা তাঁকে জিগ্যেস করতে পারি কি?'

বিকাশবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'এটা জিগ্যেস করার কারণ কী বুঝতে পারছি না। যাই হোক, মিস্টার মিত্তির যে প্রশ্নটা করলেন তার উত্তর হচ্ছে—আমি সিগারেট কিনতে বেরিয়েছিলাম।.. আরো কিছু প্রশ্ন আছে কি মিস্টার মিত্তিরের?'

'হ্যাঁ, আছে।—সিগারেট কিনে বাড়ি ফিরতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগল কেন আপনার, বিকাশবাবু?'

'তার কারণ আমি গঙ্গার ঘাটে একটু হাওয়া খেতে গেলাম। কোন্ ঘাট জানতে চান ত তাও বলছি। হরিশ্চন্দ্র। সোনারপুরা রোডের ডাক্তার অশোক দত্তর সঙ্গে সেখানে দেখা হয়, মিনিট দশেক কথাও হয়। তাকে জিগ্যেস করে দেখতে পারেন।'

'আপনার হরিশ্চন্দ্র ঘাটে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি অবিশ্বাস করছি না বিকাশবাবু। আপনার সেখানে যাবার একটা বিশেষ কারণ ছিল। সেটায় আমরা আসছি এক্ষুনি; তার আগে ক্যাপ্টেন স্পার্ককে আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। ক্যাপ্টেন স্পার্ক, তুমি কি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট খুদে রুক্মিণীকে বলেছিলে সিংহের মুখে গণেশ লুকিয়ে রাখার কথা?'

'ও ত বিশ্বাসই করেনি', বলল রুকু।

'জানি। সেইজন্যেই ও সিন্দুক খুলে দেখতে গিয়েছিল রুকুর কথা সত্যি কিনা। যখন দেখল সত্যি, তখন থেকেই ওর লোভ হয় গণেশটার উপর। সেটা আপনিই চলে আসে ওর হাতে যখন শশীবাবু গণেশটা পেয়ে বাড়িতে আর কাউকে না পেয়ে বিকাশবাবুর হাতে সেটা জমা দিতে চায়। কিন্তু বিকাশ সিংহ ত জিনিসটা এভাবে পেতে চাননি! শশীবাবু যে পরের দিনই সব কথা ফাঁস করে দেবেন! তাকে খতম না করতে পারলে ত বিকাশবাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই তিনি শশীবাবুকে ধাওয়া করেন। যাবার পথে শ্রীধর

ভ্যারাইটি স্টোরস থেকে একটি ছোরা কেনেন। তাই দিয়ে গণেশ মহল্লার অন্ধকার গলিতে শশীবাবুকে নির্মমভাবে হত্যা করেন; তারপর হরিশ্চন্দ্র ঘাটে গিয়ে রক্তাক্ত ছুরিটা গঙ্গায়—'

'মিথ্যে! সর্বৈব মিথ্যে! প্রত্যেকটা কথা মিথ্যে!'—বিকাশবাবুর এরকম অদ্ভুত চেহারা কোনোদিন দেখব কল্পনা করিনি। তার চোখ দুটো আর কপালের রগ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—'গণেশ যদি আমি নেব ত সে গণেশ কোথায়? কোথায় সে গণেশ?'

'আর একদিন পরে হলে হয়ত সে গণেশ থাকত না। আপনি নিশ্চয়ই মগনলালকে বিক্রী করে দিতেন। কিন্তু পুজোর কটা দিন আপনার বাড়ি থেকে বেরোন সম্ভব হয়নি—তাই আপনাকে গণেশ লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল।'

'মিথ্যে কথা!'

'তেওয়ারিজী!' ফেলুদা দারোগা সাহেবের দিকে হাত বাড়াল। তেওয়ারি এবার আরেকটা জিনিস ফেলুদার হাতে তুলে দিল।

বিকাশবাবুর রেডিও।

ফেলুদা রেডিওটাকে চিত করে ব্যাটারির খুপরির ঢাকনাটা খুলে তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করল একটা লম্বা হীরে-বসানো আড়াই-ইঞ্চি সোনার গণেশ।

পরমুহূর্তেই অম্বিকাবাবুর বিশাল তালতলার চটির একটা পাটি গিয়ে সজোরে আছড়ে খেল বিকাশবাবুর গালে।

সবশেষে শুনলাম ময়ূরের রিনরিনে চিৎকার—

'বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!'

* * *

ঘোষালদের বাড়িতে তাবিজ আর তুরিজতোড় ছাড়া আর যে জিনিসটা পাওয়া গেল, সেটা রয়েছে এখন ফেলুদার পকেটে একটা খামের মধ্যে: আমরা মদনপুরা রোড দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছি। লালমোহনবাবুর সিদ্ধির নেশা ছুটেছে কিনা জানি না। হতে পারে ফেলুদার চোখ রাঙানি আর আমার চিমটির চোটে তিনি নিজেকে সামলে রেখেছেন।

কীর্তিরাম ছোটুরামের পানের দোকানের সামনে থামতে হঠাৎ আবার বেসামালভাবে হেসে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'কী হল মশাই', ফেলুদা বলল, 'আপনাকে রাঁচি পাঠাতে হবে নাকি? এত বড় একটা ঘটনা আপনার হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে?'

'আরে দূর মশাই', লালমোহনবাবু কোনো রকমে হাসি থামিয়ে বললেন,

'কী হয়েছে সে তো জানেন না। রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের তেষট্টি নম্বর বই—রক্ত-হীরক রহস্য বাই জটায়ু—সেদিন দেখলুম বুকুর তাকে। হিরো একটা হীরে লুকিয়ে রাখছে হাঁ-করা এক কুমীরের স্ট্যাচুর মুখের মধ্যে—ভিলেন যাতে না পায়। ভাবতে পারেন; আমারই লেখা বই আর আমিই কিনা ফেল মেরে গেলুম, আর ফেলু মিত্তির হয়ে গেলেন হিরো!'

ফেলুদা কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'আপনি ভুল করছেন লালমোহনবাবু। তার চেয়ে বরং বলুন আপনি আপনার কলমের জোরে এমন একটি রহস্য ফেঁদেছেন যে বাস্তবে তার সামনে পড়ে ফেলু মিত্তিরের গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেবার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই আপনিই বা হিরো কম কিসে?'

সাত রকম মশলাওয়ালা তবক দেওয়া পানটা চার আঙুলের ঠেলা দিয়ে মুখে পুরে লালমোহনবাবু বললেন, 'যা বলেছেন মশাই—জটায়ুর জবাব নেই।'

সত্যজিৎ রায়
ফেলুদা
এণ্ড কোং
বোম্বাইয়ের বোম্বেটে

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে

॥ ১ ॥

লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু-র হাতে মিষ্টির বাক্স দেখে বেশ অবাক হলাম। সাধারণত ভদ্রলোক যখন আমাদের বাড়িতে আসেন তখন হাতে ছাতা ছাড়া আর কিছু থাকে না। নতুন বই বেরোলে বইয়ের একটা প্যাকেট থাকে অবিশ্যি, কিন্তু সে তো বছরে দুবার। আজ একেবারে মির্জাপুর স্ট্রীটের হালের দোকান কল্লোল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পঁচিশ টাকা দামের সাদা কার্ড বোর্ডের বাক্স, সেটা আবার সোনালী ফিতে দিয়ে বাঁধা। বাক্সের দুপাশে নীল অক্ষরে লেখা 'কল্লোলস্ ফাইভ মিক্স সুইটমিটস'—মানে পাঁচ-মেশালী মিষ্টি। বাক্স খুললে দেখা যাবে পাঁচটা খোপ করা আছে, তার একেকটাতে একেকরকমের মিষ্টি। মাঝেরটায় থাকতেই হবে কল্লোলের আবিষ্কার 'ডায়মণ্ডা'—হীরের মতো পলকাটা রুপোর তবক দেওয়া রস ভরা কড়া পাকের সন্দেশ।

এমন বাক্স লালমোহনবাবুর হাতে কেন? আর ও'র মুখে এমন কেল্লো-ফতে হাসি হাসি ভাবই বা কেন?

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বাক্স টেবিলে রেখে চেয়ারে বসতেই ফেলুদা বলল, 'বোম্বাইয়ের সুখবরটা বুঝি আজই পেলেন?'

লালমোহনবাবু প্রশ্নটা শুনে অবাক হলেও তাঁর মুখ থেকে হাসিটা গেল না, কেবল ভুরু দুটো ওপরে উঠল।

'কী করে বুঝলেন, হে হে?'

'সাইরেন বাজার এক ঘন্টা পরে যখন দেখছি আপনার হাতঘড়ি বলছে সোয়া তিনটে, তার মানেই টাটকা আনন্দের আতিশয্যে ঘড়িটা পরার সময় আর ওটার দিকে চাইতেই পারেন নি।—স্প্রিং গেছে, না দম গেছে?'

লালমোহনবাবু তাঁর নীল র‍্যাপরের খসে পড়া দিকটা রোম্যান কায়দায় বাঁ কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, 'পঁচিশ চেয়েছিলুম; তা আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই চাকর এসে টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিলে। এই যে!'

লালমোহনবাবু পকেট থেকে একটা গোলাপী টেলিগ্রাম বার করে পড়ে শোনালেন—

'প্রোডিউসার উইলিং অফার টেন ফর বোম্বেটে প্লীজ কেবল কনসেন্ট।' আমি রিপ্লাই পাঠিয়ে দিয়ে এলুম—'হ্যাপিলি সেলিং বোম্বেটে ফর টেন টেক

রেসিংস।'

'দশ হাজার!' ফেলুদার মতো মাথাঠাণ্ডা মানুষের পর্যন্ত চোখ গোলগোল হয়ে গেল। 'দশ হাজারে গল্প বিক্রি হয়েছে আপনার?'

জটায়ু একটা হালকা মসৃণ হাসি হাসলেন।

'টাকাটা হাতে আসেনি এখনো। ওটা বম্বে গেলেই পাব।'

'আপনি বম্বে যাচ্ছেন?' ফেলুদার চোখ আবার গোল।

'শুধু আমি কেন? আপনারাও। অ্যাট মাই এক্সপেনস। আপনি ছাড়া ত এ গল্প দাঁড়াতোই না মশাই।'

কথাটা যে সত্যি সেটা ব্যাপারটা খুলে বললেই বোঝা যাবে।

জটায়ুর অনেক দিনের স্বপ্ন যে তার একটা গল্প থেকে সিনেমা হয়। বাঙলা ছবিতে পয়সা নেই, তাই হিন্দির দিকেই ওঁর ঝোঁক বেশি। এবারে তাই কোমর বেঁধে হিন্দি সিনেমার গল্প লেখা শুরু করেছিলেন। বম্বের ফিলম লাইনে লালমোহনবাবুর একজন চেনা লোক আছে, নাম পুলক ঘোষাল। আগে গড়পারেই থাকত, লালমোহনবাবুর দুটো বাড়ি পরে। কলকাতায় টালি-গঞ্জে তিনটে ছবিতে সহকারী পরিচালকের কাজ করে রোখের মাথায় বম্বে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে এখন সে নিজেই একজন হিট ডিরেক্টর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ অবধি গিয়ে গল্প আর এগোচ্ছে না দেখে জটায়ু ফেলু-দার কাছে আসেন। ফেলুদা তখন-তখনই লেখাটা পড়ে মন্তব্য করে—'মাঝপথে আটকে ভালোই হয়েছে মশাই। এ আপনার পণ্ডশ্রম হত। বোম্বাই নিত না।'

লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন, 'কী হলে নেবে মশাই বলুন ত। আমি ত ভেবেছিলুম খানকতক কারেন্ট হিট ছবি দেখে নিয়ে তারপর লিখব। দুদিন কিউয়ে দাঁড়ালুম; একদিন পকেটমার হল, একদিন সোয়া ঘন্টা দাঁড়িয়ে জানলা অবধি পোঁছে শুনলাম হাউস ফুল। বাইরে টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছিল, কিন্তু বারো টাকা খরচ করে শেষটায় কোডোপাইরিন খেতে হবে সেই ভয়ে পিছিয়ে গেলুম।'

শেষে ফেলুদাই একটা ছক কেটে দেবে বলল লালমোহনবাবুর জন্য। বলল, 'আজকাল ডবল রোলের খুব চল হয়েছে সেটা জানেন ত?'

লালমোহনবাবু ডবল রোল কী সেটাই জানেন না।

'একই চেহারার দুজন নায়ক হয় ছবিতে সেটা জানেন না?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'যমজ ভাই?'

'তাও হতে পারে, আবার আত্মীয় নয় অথচ চেহারায় মিল সেটাও হতে পারে। একই চেহারা, অথচ একজন ভালো লোক, একজন খারাপ লোক;

অথবা একজন শক্ত-সমর্থ, আর একজন গোবেচারা। সাধারণত এটাই হয়। আপনি একটু নতুনভাবে এক কাঠি বাড়িয়ে করতে পারেন;—একটা ডবল রোলের বদলে এক জোড়া ডবল রোল। এক নম্বর হিরো আর এক নম্বর ভিলেন হল জোড়া, আর দুই নম্বর হিরো আর দুই নম্বর ভিলেন হল আরেক জোড়া। এই দুই নম্বর জোড়া যে আছে সেটা গোড়ায় ফাঁস করা হবে না। তারপর—'

এখানে লালমোহনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'একটু বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে না?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'তিন ঘন্টার মালমশলা চাই। আজকাল নতুন নিয়মে খুব বেশি ফাইটিং চলবে না। কাজেই গপ্প অন্যভাবে ফাঁদতে হবে। দেড় ঘন্টা লাগবে জট পাকাতে, দেড় ঘন্টা ছাড়াতে।'

'তাহলে ডবল-রোলেই কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে বলছেন?'

'তা কেন? আরো আছে। নোট করে নিন।'

লালমোহনবাবু সুড়ুৎ করে বুক পকেট থেকে লাল খাতা আর সোনালী পেনসিল বার করলেন।

'লিখুন—স্মাগলিং চাই—সোনা হীরে গাঁজা চরস, যা হোক; পাঁচটি গানের সিচুয়েশন চাই, তার মধ্যে একটি ভক্তিমূলক হলে ভালো; দুটি নাচ চাই; খান দুয়েক পশ্চাদ্ধাবন দৃশ্য বা চেজ-সিকুয়েন্স চাই—তাতে অন্তত একটি দামী মোটরগাড়ি পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে ফেলতে পারলে ভালো হয়; অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য চাই; নায়কের গার্লফ্রেণ্ড হিসেবে নায়িকা এবং ভিলেনের গার্লফ্রেণ্ড হিসেবে ভ্যাম্প বা খল নায়িকা চাই; একটি কর্তব্যবোধসম্পন্ন পুলিশ অফিসার চাই; নায়কের ফ্ল্যাশব্যাক চাই; কমিক রিলিফ চাই; গল্প যাতে ঝুলে না পড়ে তার জন্য দ্রুত ঘটনা পরিবর্তন ও দৃশ্যপট পরিবর্তন চাই; বার কয়েক পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে গল্পকে নিয়ে ফেলতে পারলে ভালো, কারণ এক নাগাড়ে স্টুডিওর বন্ধ পরিবেশে শুটিং চিত্র তারকাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।—বুঝছেন ত?'

লালমোহনবাবু ঝড়ের মতো লিখতে লিখতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিলেন।

'আর সব শেষে—এটা একেবারে মাস্ট—চাই হ্যাপি এণ্ডিং। তার আগে অবিশ্যি বার কয়েক কান্নার স্রোত বইয়ে দিতে পারলে শেষটা জমে ভালো।'

লালমোহনবাবুর সেদিনই হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তারপর গল্প নিয়ে ঝাড়া দু মাসের ধস্তাধস্তিতে ডান হাতের দুটো আঙুলে কড়া পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস সে সময়টা ফেলুদার কলকাতার বাইরে কোনো কাজ ছিল না—

কেদার সরকারের রহস্যজনক খুনের তদন্তের ব্যাপারে ওকে সবচেয়ে বেশি দূরে যেতে হয়েছিল ব্যারাকপুরে—কারণ লালমোহনবাবু সপ্তাহে দুবার করে ফেলুদার কাছে এসে ধর্না দিচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও জটায়ুর বত্রিশ নম্বর উপন্যাস 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' মহালয়ার ঠিক পরেই বেরিয়ে যায়। আর গল্পটা যে-রকম দাঁড়িয়েছিল, তা থেকে ছবি করলে আর যাই হোক, সে ছবি দেখে কোডাপাইরিন খেতে হবে না। হিন্দি ছবির মালমশলা থাকলেও তাতে হিন্দি ছবির ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে বাঁচি বাড়াবাড়িটা নেই।

পাণ্ডুলিপির একটা কপি পুলক ঘোষালকে আগেই পাঠিয়েছিলেন লাল-মোহনবাবু। দিন দশেক আগে চিঠি আসে যে গল্প পছন্দ হয়েছে, আর খুব শিগগিরই কাজ আরম্ভ করে দিতে চান পুলকবাবু। চিত্রনাট্য তিনি নিজেই করেছেন, আর হিন্দি সংলাপ লিখেছেন ত্রিভুবন গুপ্তে, যার এক একটা কথা নাকি এক-একটা ধারালো চাকু, সোজা গিয়ে দর্শকের বুকে বিঁধে হলে পায়রা উড়িয়ে দেয়। এই চিঠির উত্তরে লালমোহনবাবু ফেলুদাকে কিছু না বলেই তাঁর গল্পের দাম হিসেবে পঁচিশ হাজার হাঁকেন, আর তার উত্তরেই আজকের টেলিগ্রাম। আমার মনে হল পঁচিশ চেয়ে লালমোহনবাবু যে একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন সেটা উনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আধবোজা চোখে একটা আঃ শব্দ করে লালমোহন-বাবু বললেন, 'পুলক ছোকরা লিখেছিল যে, গপ্পটা বিশেষ চেঞ্জ করেনি; মোটামুটি আমি—থুড়ি, আমরা, যা লিখেছিলাম—'

ফেলুদা হাত তুলে লালমোহনবাবুকে থামিয়ে বলল, 'আপনি বহুবচনটা না ব্যবহার করলেই খুশি হব।'

'কিন্তু—'

'আহাঃ - শেকসপিয়রও ত অন্যের গল্পের সাহায্য নিয়ে নাটক লিখেছে, তাবলে তাকে কি কেউ কখনো "আমাদের হ্যামলেট" বলতে শুনেছে? কখ্খনো না। উপাদানে আমার কিছুটা কনট্রিবিউশন থাকলেও, পাচক ত আপনি। আপনার মতো হাতের তার কি আর আমার আছে?'

লালমোহনবাবু কৃতজ্ঞতায় কান অবধি হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।—যাই হোক, যা বলছিলাম। কেবল একটি মাত্র মাইনর চেঞ্জ করেছে গপ্পে।'

'কিরকম?'

'সে আর বলবেন না মশাই। তাজ্জব ব্যাপার। আপনি শুনলেই বলবেন টেলিপ্যাথি। হয়েছে কি, আমার গপ্পের স্মাগলার ভিলেন চিরাগ ধুরন্ধরের বাস-স্থান হিসেবে একটা তেত্রিশ তলা বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের উল্লেখ করেছিলুম। আপনি খুঁটিনাটির ওপর নজর দিতে বলেন, তাই বাড়িটার একটা নামও দিয়ে-

ছিলুম—শিবাজী কাস্‌ল। বোম্বাই ত—তাই মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীরপুরুষের নামে বাড়ির নামটা বেশ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়েছিল। ওমা, পুলক লিখলে ওই নামে নাকি সত্যিই একটা উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি আছে, আর তাতে নাকি ওর ছবির প্রোডিউসার নিজেই থাকেন। বলুন, একে টেলিপ্যাথি ছাড়া আর কী বলবেন?'

'কুং-ফু থাকছে, না বাদ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে এনটার দ্য ড্র্যাগন দেখার পর থেকেই লাল-মোহনবাবুর মাথায় ঢুকেছিল যে গল্পে কুং-ফু ঢোকাবেন। ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে লালমোহনবাবু বললেন, 'আলবৎ থাকছে। সেটার কথা আমি আলাদা করে জিগ্যেস করেছিলুম; তাতে লিখেছে ম্যাড্রাস থেকে স্পেশ্যাল কুং-ফু-র জন্য ফাইট মাস্টার আসছে। বলে নাকি হংকং-ট্রেনড।'

'শুটিং শুরু কবে?'

'সেইটে জিগ্যেস করে আজ একটা চিঠি লিখছি। জানার পর আমাদের যাবার তারিখটা ফিক্স করব। আমাদের—থুড়ি, আমার গল্পের শুটিং শুরু হবে, আর আমরা সেখানে থাকব না সে কী করে হয় মশাই?'

ভায়মণ্ডা এর আগেও খেয়েছি, কিন্তু আজকে যতটা ভালো লাগল তেমন আর কোনোদিন লাগেনি।

॥ ২ ॥

পরের রবিবার আবার লালমোহনবাবুর আবির্ভাব। ফেলুদা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল ভদ্রলোককে অর্ধেক খরচ অফার করবে, কারণ ওর নিজের হাতেও সম্প্রতি কিছু টাকা এসেছে। শুধু কেস থেকে নয়; গত তিন মাসে ও দুটো ইংরাজি বই অনুবাদ করেছে—উনবিংশ শতাব্দীর দুজন বিখ্যাত পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনী—দুটোই ছাপা হচ্ছে, আর দুটো থেকেই কিছু আগাম টাকা পেয়েছে ও। এর আগেও অবসর সময় ফেলুদাকে মাঝে মাঝে লিখতে দেখেছি—কিন্তু আদা-নুন খেয়ে লিখতে লাগা এই প্রথম।

লালমোহনবাবু অবিশ্যি ফেলুদার প্রস্তাব এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'খেপেছেন? লেখার ব্যাপারে আপনি এখন আমার গাইড অ্যান্ড গড-ফাদার। এটা হল আপনাকে আমার সামান্য দক্ষিণা।'

এই বলে পকেট থেকে দুটো প্লেনের টিকিট বার করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, 'মঙ্গলবার সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশে ফ্লাইট। এক ঘণ্টা আগে রিপোর্টিং টাইম। আমি সোজা দমদমে গিয়ে আপনাদের জন্য ওয়েট করব।'

'শুটিং আরম্ভ হচ্ছে কবে?'

'বিষ্যুদ্‌বার। একেবারে ক্লাইম্যাক্সের সীন। সেই ট্রেন, মোটর আর ঘোড়ার ব্যাপারটা।'

এ ছাড়াও আরেকটা খবর দেবার ছিল লালমোহনবাবুর।

'কাল সন্ধেবেলা আরেক ব্যাপার মশাই। এখানকার এক ফিলিম প্রোডিউ-সার—ধরমতলায় আপিস—আমার পাবলিশারের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সোজা আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। সেও "বোম্বাইয়ের বোম্বেটে" ছবি করতে চায়। বলে বাঙলায় হিন্দি টাইপের ছবি না করলে আর চলছে না। গপ্প বিক্রি হয়ে গেছে শুনে বেশ হতাশ হল। বইটা অবিশ্যি উনি নিজে পড়েন নি; ওঁর এক ভাগনে পড়ে ওঁকে বলেছে। আমি বোম্বাই না গিয়েই বইটা লিখেছি শুনে বেশ অবাক হলেন। আমি আর ভাঙলুম না যে মারে-র গাইড টু ইন্ডিয়া আর ফেলু মিত্তিরের গাইডেন্স ছাড়া এ কাজ হত না।'

'ভদ্রলোক বাঙালী?'

'ইয়েস স্যার। বারেন্দ্র। সান্যাল। কথায় পশ্চিমা টান আছে। বললেন জব্বলপুরে মানুষ। গায়ে উগ্র পারফিউমের গন্ধ। নাক জ্বলে যায় মশাই।

পুরুষ মানুষ এভাবে সেন্ট মাখে এই প্রথম এক্সপেরিয়েন্স করলুম। যাই হোক, আমি চলে যাচ্ছি শুনে একটা ঠিকানা দিয়ে দিলেন। বললেন, "কোনো অসুবিধে হলে একে ফোন করতে পারেন। আমার এ বন্ধুটি খুব হেলপ্‌ফুল।'

কলকাতায় ডিসেম্বরে বেশ শীত পড়লেও বম্বেতে নাকি তেমন ঠাণ্ডা পড়ে না। আমাদের ছোট দুটো সুটকেসেই সব ম্যানেজ হয়ে গেল। মঙ্গলবার সকালে উঠে দেখি কুয়াশায় রাস্তার ওপারে পল্টুদের বাড়িটা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। প্লেন ছাড়বে ত? আশ্চর্য, নটার মধ্যে সব সাফ হয়ে গিয়ে ঝক্‌ঝকে রোদ উঠে গেল। ভি আই পি রোডে এমনিতেই শহরের চেয়ে বেশি কুয়াশা হয়, কিন্তু আজ দেখলাম তেমন কিছু নয়।

এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলাম তখন প্লেন ছাড়তে পঞ্চাশ মিনিট বাকি। লালমোহনবাবু আগেই হাজির। এমন কি বোর্ডিং কার্ডও দেখলুম উঁকি মারছে পকেট থেকে। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, ফেলুবাবু—লম্বা কিউ দেখে ভাবলুম যদি জানলার ধারে সীট না পাই, তাই আগেভাগেই সেরে রাখলুম। এইচ রো—দেখুন হয়ত দেখবেন কাছাকাছি সীট পেয়ে গেছেন।'

'আপনার হাতে ওটা কী? কী বই কিনলেন?'

লালমোহনবাবুর বগলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট দেখে আমার মনে হয়েছিল উনি নিজের বই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে কাউকে দেবেন বলে। ফেলুদার প্রশ্নের জবাবে ভদ্রলোক বললেন, 'কিনব কী মশাই; সেই সান্যাল—সেদিন যার কথা বলেছিলাম—সে দিয়ে গেল এই মিনিট দশেক আগে।'

'উপহার?'

'নো স্যার। বম্বে এয়ারপোর্টে লোক এসে নিয়ে যাবে। আমার নাম-ধাম তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কোন্ এক আত্মীয়ের কাছে যাবে এ বই।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'ইয়ে—একটা বেশ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছেন না?'

'পাওয়া মুশকিল', বলল ফেলুদা, 'কারণ ভারত কেমিকালস-এর গুল-বাহার সেন্টের গন্ধ আর সব গন্ধকে ম্লান করে দিয়েছে।'

গন্ধটা আমিও পেয়েছিলাম। সান্যাল মশাই এমনই সেন্ট মাখেন যে তার সুবাস এই প্যাকেটে পর্যন্ত লেগে রয়েছে।

'যা বলেছেন স্যার, হ্যাঃ হ্যাঃ', সায় দিলেন জটায়ু। 'তবে অনেক সময় শুনিচি এইভাবে লোকে উল্টোপাল্টা জিনিসও চালান দেয়।'

'সে ত বটেই। বুকিং কাউন্টারে ত নোটিসই লাগানো আছে যে অচেনা লোকের হাত থেকে চালান দেওয়ার জন্য কোনো জিনিস নেওয়াটা বিপজ্জনক। অবিশ্যি এ ভদ্রলোককে টেকনিক্যালি ঠিক অচেনা বলা চলে না, আর প্যাকেটটাও

যে বইয়ের সেটা সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখছি না।'

প্লেনে তিনজনে পাশাপাশি জায়গা পেলাম না; লালমোহনবাবু আমাদের তিনটে সারি পিছনে জানলার ধারে বসলেন। ফ্লাইটে বলবার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। কেবল লাউডস্পীকারে ক্যাপ্টেন দত্ত যখন বলছেন আমরা নাগপুরের উপর দিয়ে যাচ্ছি, তখন পিছন ফিরে দেখি লালমোহনবাবু সীট ছেড়ে উঠে প্লেনের ন্যাজের দিকটায় চলেছেন। শেষটায় একজন এয়ার হোসটেস ওঁকে থামিয়ে উল্টো দিক দেখিয়ে দিতে ভদ্রলোক আবার সারা পথ হেঁটে সোজা পাইলটের দরজা খুলে কক্‌পিটে ঢুকে তক্ষুনি বেরিয়ে এসে জিভ কেটে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। নিজের সীটে ফেরার পথে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে গেলেন, 'আমার পাশের লোক-টিকে এক ঝলক দেখে নাও। হাই-জ্যাকার হলে আশ্চর্য হব না।'

মাথা ঘুরিয়ে দেখে বুঝলাম জটায়ু অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে না থাকলে ওরকম নিরীহ, নেই-থুতনি মানুষটাকে কক্ষনো হাই-জ্যাকার ভাবতেন না।

স্যান্টা ক্রুজে প্লেন ল্যান্ড করার ঠিক আগেই লালমোহনবাবু ব্যাগ থেকে বইটা বার করে রেখেছিলেন। ডোমেস্টিক লাউঞ্জে ঢুকে আমরা তিনজনেই এদিক ওদিক দেখছি, এমন সময় 'মিস্টার গাঙ্গুলী?' শুনে ডাইনে ঘুরে দেখি গাঢ় লাল রঙের টেরিলিনের সার্ট পরা একজন লোক মাদ্রাজী টাইপের এক ভদ্রলোককে প্রশ্নটা করে তার দিকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে আছে। ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্ত ভাবেই মাথা নেড়ে না বলে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও বই হাতে লাল সার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আই অ্যাম মিস্টার গাঙ্গুলী অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম মিস্টার সান্যাল', এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন জটায়ু।

লাল সার্ট বইটা নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও কর্তব্য সেরে নিশ্চিন্তে হাত ঝাড়লেন।

আমাদের মাল বেরোতে লাগল আধ ঘন্টা। এখন একটা বেজে কুড়ি, শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে যাবে প্রায় দুটো। পুলক ঘোষাল গাড়ির নম্বরটা জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই, দেখলাম সেটা একটা গেরুয়া রঙের স্ট্যান্ডার্ড। ড্রাইভারটি বেশ শৌখিন ও ফিটফাট; হিন্দি ছাড়া ইংরেজিটাও মোটামুটি জানে। কলকাতার তিনজন অচেনা লোকের জন্য ভাড়া খাটতে হচ্ছে বলে কোনোরকম বিরক্তির ভাব দেখলাম না। বরং লালমোহনবাবুকে যেরকম একটা সেলাম ঠুকল তাতে মনে হল কাজটা পেয়ে সে কৃতার্থ। ড্রাইভারই খবর দিল যে

শহরের ভিতরেই শালিমার হোটেলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে, আর পুলকবাবু বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। গাড়ি আমাদের জন্য রাখা থাকবে, আমরা যখন খুশি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি।

ফেলুদা অবিশ্যি এখানে আসবার আগে ওর অভ্যাস মতো বম্বে সম্বন্ধে পড়াশুনো করে নিয়েছে। ও বলে কোনো নতুন জায়গায় আসার আগে এ জিনিসটা করে না নিলে নাকি সে জায়গা দূরেই থেকে যায়। মানুষের যেমন একটা পরিচয় তার নামে, একটা চেহারায়, একটা চরিত্রে আর একটা তার অতীত ইতিহাসে, ঠিক তেমনি নাকি শহরেরও। বম্বে শহরের চেহারা আর চরিত্র এখনো ফেলুদার জানা নেই, তবে এটা জানে যে শালিমার হোটেল হল কেম্পস কর্নারের কাছে।

আমাদের গাড়ি, হাইওয়ে দিয়ে গিয়ে একটা বড় রাস্তায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল—'উয়ো যো ট্যাক্সি হ্যায় না—এম আর পি থ্রি ফাইভ থ্রি এইট—উসকো পিছে পিছে চলনা।'

'কী ব্যাপার মশাই?' লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন।

'একটা সামান্য কৌতূহল', বলল ফেলুদা।

আমাদের গাড়ি একটা স্কুটার আর দুটো অ্যাম্বাসাডারকে ছাড়িয়ে ফিয়াট ট্যাক্সিটার ঠিক পিছনে এসে পড়ল। এবার ট্যাক্সিটার পিছনের কাচ দিয়ে দেখলাম ভিতরে বসা লাল টেরিলিনের সার্ট।

একটু যেন বুকটা কেঁপে উঠল। কিছুই হয়নি, কেন ফেলুদা ট্যাক্সিটাকে ধাওয়া করছে তাও জানি না, তবু ব্যাপারটা আমার হিসেবের বাইরে বলেই যেন একটা রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়া লাগল। লালমোহনবাবু অবিশ্যি আজকাল ধরেই নিয়েছেন যে ফেলুদার সব কাজের মানে জিগ্যেস করে সব সময়ে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না; যথাসময়ে আপনা থেকেই সেটা জানা যাবে।

আমাদের গাড়ি দিব্যি ট্যাক্সিটাকে চোখে রেখে চলেছে, আমরাও নতুন শহরের রাস্তাঘাট লোকজন দেখতে দেখতে চলেছি। একটা জিনিস বলতেই হবে—হিন্দি ছবির এত বেশি আর এত বড় বড় বিজ্ঞাপন আর কোনো শহরের রাস্তায় দেখিনি। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ধরে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো দেখে বললেন, 'সবাইয়ের নামই ত দেখছি, অথচ কাহিনীকারের নামটা যেন চোখে পড়ছে না। এরা কি গল্প লেখায় না কাউকে দিয়ে?'

ফেলুদা বলল, 'গল্প লেখক হিসেবে নাম যদি আশা করেন তাহলে বম্বে আপনার জায়গা নয়। এখানে গল্প লেখা হয় না, গল্প তৈরি হয়, ম্যানুফ্যাকচার হয়—যেমন বাজারের আর পাঁচটা জিনিস ম্যানুফ্যাকচার হয়। লাক্স সাবান

কে তৈরি করেছে তার নাম কি কেউ জানে?—কোম্পানির নামটা হয়ত জানে। টাকা পাচ্ছেন, ব্যস্, মুখটি বন্ধ করে বসে থাকুন। সম্মানের কথা ভুলে যান।'

'হুঁ...।' লালমোহনবাবু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। 'তাহলে মান হল গিয়ে আপনার বেঙ্গলে, আর বম্বেতে হচ্ছে মানি?'

'হক্ কথা', বলল ফেলুদা।

ফেলুদা যে-এলাকাটাকে মহালক্ষ্মী বলে বলল, সেটা ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে আমাদের মার্কামারা ট্যাক্সিটা একটা ডান দিকের রাস্তা ধরল। আমাদের ড্রাইভার বলল যে শালিমার হোটেল যেতে হলে আমাদের সোজাই যাওয়া উচিত।

ফেলুদা বলল, 'আপ দাঁয়া চলিয়ে।'

ডান দিকে ঘুরে মিনিট দু'এক যেতেই দেখলাম ট্যাক্সিটা বাঁ দিকে একটা গেটের ভিতর ঢুকে গেল। ফেলুদার নির্দেশে আমাদের গাড়ি গেটের বাইরেই থামল। আমরা তিনজনেই গাড়ি থেকে নামলাম, আর নামার সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু হিঁক করে একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন।

কারণটা পরিষ্কার। আমরা একটা বিরাট ঢ্যাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছি, তার তিন তলার হাইটে বড় বড় উঁচু উঁচু কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা—শিবাজী কাস্‌ল।

॥ ৩ ॥

নামটা দেখে আমার এত অবাক লাগল যে, কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। 'এ যে টেলিপ্যাথির ঠাকুরদাদা!'— বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা চুপ। দেখলাম ও শুধু বাড়িটাই দেখছে না, তার আশপাশটাও দেখছে। বাঁ দিকে পর পর অনেকগুলো বাড়ি, তার কোনোটাই বিশতলার কম না। ডানদিকের বাড়িগুলো নিচু আর পুরোন, আর সেগুলোর ফাঁক দিয়ে পিছনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

ড্রাইভার একটু যেন অবাক হয়েই আমাদের হাবভাব লক্ষ করছিল। ফেলুদা তাকে অপেক্ষা করতে বলে সোজা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। আমি আর লালমোহনবাবু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট তিনেক পরেই ফেলুদা বেরিয়ে এল।

'চলিয়ে শালিমার হোটেল।'

আমরা আবার রওনা দিলাম। ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'খুব সম্ভবত সেভেনটিন্‌থ ফ্লোরে, অর্থাৎ আঠারো তলায়, গেছে আপনার বইয়ের প্যাকেট।'

'আপনি যে ভেল্কি দেখালেন মশাই', বললেন লালমোহনবাবু, 'এই তিন মিনিটের মধ্যে অত বড় বাড়ির কোন তলায় গেছে লোকটা সেটা জেনে ফেলে দিলেন?'

'আঠারোতলায় গেছে কিনা জানবার জন্য আঠারোতলায় ওঠার দরকার হয় না। একতলার লিফ্‌টের মাথার উপরেই বোর্ডে নম্বর লেখা থাকে। যখন পৌঁছলাম তখন লিফ্‌ট উঠতে শুরু করে দিয়েছে। শেষ যে নম্বরটার বাতি জ্বলে উঠল, সেটা হল সতেরো। এবার বুঝেছেন ত?'

লালমোহনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝলুম ত। এত সহজ ব্যাপারটা আমাদের মাথায় কেন আসে না সেটাই ত বুঝি না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শালিমার হোটেলে পৌঁছে গেলাম। ফেলুদা আর আমার জন্য পাঁচতলায় একটা ডাব্‌ল রুম, আর লালমোহনবাবুর জন্য ওই একই তলায় আমাদের উলটো দিকে একটা সিঙ্গল। আমাদের ঘরটা রাস্তার দিকে, জানালা দিয়ে নিচে চাইলেই অবিরাম গাড়ির স্রোত, আর সামনের দিকে চাইলে দুটো ঢ্যাঙা বাড়ির ফাঁক দিয়ে দূরে সমুদ্র। বম্বে যে একটা গমগমে

'খুন।'

'সে কি!'—আমরা তিনজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম। খ-য়ে হ্রস্বউ আর ন—এই দুটো পর পর জুড়লে আপনা থেকেই যেন শিউরে উঠতে হয়।

'আমি খবর পাই এই আধঘন্টা আগে', বললেন পুলকবাবু। 'ও বাড়িতে ত আমার রেগুলার যাতায়াত মশাই! মিস্টার গোরেও শিবাজী কাসলেই থাকেন—ন্যায়ো মশ্বর ফ্লোরে। সাধে কি আপনার গপ্পে বাড়ির নাম চেঞ্জ করতে হয়েছে! প্রবিশ্যি উনি নিজে খুব মাইডিয়ার লোক।—আপনারা বাড়ির ভেতরে গেসলেন নাকি?'

'আমি গিয়েছিলাম,' বলল ফেলুদা, 'লিফটের দরজা অবধি।'

'ওরেব্বাবা! লিফটের ভেতরেই ত খুন। লাশ সনাক্ত হয়নি এখনো। দেখতে গুন্ডা টাইপ। তিনটে নাগাৎ ভাগরাজন বলে ওখানকারই এক বাসিন্দা তিন-তলা থেকে লিফটের জন্য বেল টেপে। লিফট ওপর থেকে নিচে নেমে আসে। ভদ্রলোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়েই দেখেন এই কাণ্ড। পেটে ছোরা মেরেছে মশাই। হরিব্‌ল ব্যাপার।'

'ওই সময়টায় লিফটে কাউকে উঠতে-টুঠতে দেখেনি কেউ?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'লিফটের আশেপাশে কেউ ছিল না। তবে বিল্ডিং-এর বাইরে দুজন ড্রাইভার ছিল, তারা ওই সময়টায় পাঁচ-ছ'জনকে ঢুকতে দেখেছে। তার মধ্যে একজনের গায়ে লাল সার্ট, একজনের কাঁধে ব্যাগ আর গায়ে খয়েরি রঙের—'

ফেলুদা হাত তুলে পুলকবাবুকে থামিয়ে বলল, 'ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি স্বয়ং আমি, কাজেই আর বেশি বলার দরকার নেই।'

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠেছে। সর্বনাশ!—ফেলুদা কি খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বে নাকি?

'এনিওয়ে', আশ্বাসের সুরে বললেন পুলক ঘোষাল, 'ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনিও না লালুদা। আপনার গপ্পে শিবাজী কাসলে স্মাগলার থাকে লিখেছেন, তাতে আর ভয়ের কি আছে বলুন। বম্বের কোন্ অ্যাপার্টমেন্টে স্মাগলার থাকে না? মিসায় আর কটাকে ধরেছে? এ তো সবে খোসা ছাড়ানো চলছে এখন, শাঁসে পৌঁছুতে অনেক দেরি। সারা শহরটাই ত স্মাগলিং-এর উপর দাঁড়িয়ে আছে।'

ফেলুদাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল। তবে সে ভাবটা কেটে গেল আরেকজন লোকের আবির্ভাবে। দ্বিতীয় টোকার শব্দ হতে পুলকবাবুই চেয়ার ছেড়ে 'এই বোধহয় ভিকটর' বলে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। চাবুকের মতো শরীরওয়ালা মাঝারি হাইটের একজন লোক ঘরে ঢুকল।

'পরিচয় করিয়ে দিই লালুদা—ইনি হলেন ভিকটর পেরুমল—হংকং-ট্রেনড কুং-ফু এক্সপার্ট।'

ভদ্রলোক দিব্যি খোলতাই হেসে আমাদের সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

'ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলেন,' পুলকবাবু বললেন, 'আর হিন্দি ত বটেই, যদিও ইনি দক্ষিণ ভারতের লোক। আর ইনি শুধু কুং-ফু শেখান না, এ'র স্টান্টেরও জবাব নেই। ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনের উপর লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারটা হিরোর ভাইয়ের মেক-আপ নিয়ে ইনিই করবেন।'

আমার ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল। হাসিটার মধ্যে সত্যিই একটা খোলসা ভাব আছে। তার উপরে স্টান্টম্যান শুনে ভদ্রলোকের উপর একটা ভক্তিভাবও জেগে উঠল। যারা সামান্য ক'টা টাকার জন্য দিনের পর দিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, আর তার জন্য বাহবা নিয়ে যায় প্রক্সি-দেওয়া হিরোগুলো, তাদের সাবাস বলতেই হয়।

ভিকটর পেরুমল বললেন তিনি শুধু কুং-ফু-ই জানেন না—'আই নো মোকাইরি অলসো।'

মোকাইরি? সে আবার কী? ফেলুদার যে-এত জ্ঞান, ও-ও বলল জানে না; আর লালমোহনবাবুর কথা ত ছেড়েই দিলাম, কারণ উনি নিজের লেখা

ছাড়া বিশেষ কিছু পড়েন-টড়েন না।

পেস্তমেল বলল, মোকাইরি হচ্ছে নাকি এক-রকম ফাইটিং যেটা করার জন্য পা শূন্যে তুলে ধরতে হাঁটতে হয়। এটা নাকি হংকং-এ চালু হয়েছে মাত্র মাস ছয়েক হল, যদিও জন্মস্থান জাপান।

'এটাও রয়েছে নাকি ছবিতে?' লালমোহনবাবু যেন কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন। পুলক ঘোষাল হেসে মাথা নাড়লেন। 'এক কুং-ফু-র ঠেলাই আগে সামলাই। এগারোজন লোককে সকাল-বিকেল ট্রেনিং দিতে হচ্ছে সেই নভেম্বরের গোড়া থেকে। আপনি ত লিখে খালাস, ঝক্কি ত পোয়াতে হচ্ছে আমাদের। অবিশ্যি আপনারা যে শুটিংটা দেখবেন তাতে কুং-ফু নেই। এতে দেখবেন স্টান্টম্যানের খেলা।...ক্লাস ছবি হবে আপনার গপ্পো থেকে লালুদা—কুছ পরোয়া নেহি।'

পুলক ঘোষাল আর ভিকটর চলে যাবার পর ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ট্রাফিকের শব্দে ঘর ভরে গেল। অবিশ্যি পাঁচতলা হওয়াতে তার জন্য কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। আসলে আমাদের কারুরই এয়ারকণ্ডিশনিং-এর অভ্যেসও নেই, ভালোও লাগে না। বাইরের শব্দ আসুক; তার সঙ্গে খাঁটি বাতাসটাও ত ঢুকছে।

জানালা থেকে ফিরে এসে সোফায় বসে ফেলুদা একটু যেন গম্ভীরভাবেই বলল, 'লালমোহনবাবু, অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধটা যেরকম উগ্র হয়ে উঠছে সেটা বেশ অস্বস্তিকর। আপনি ওই প্যাকেটটা চালানের ভার না নিলেই পারতেন। আমি যদি তখন থাকতাম, তাহলে আপনাকে বারণ করতাম।'

'কী করি বলুন,' লালমোহনবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'ভদ্রলোক বললেন, আমি এর পর যে গল্পটা লিখব সেটা যেন ওঁর জন্য রিজার্ভ করে রাখি। তারপরে আর কী করে না বলি বলুন।'

'ব্যাপারটা কী জানেন? এয়ারপোর্টে যখন সিকিউরিটি চেক হয়, তখন নিয়ম হচ্ছে প্যাসেঞ্জারের কাছে মোড়ক জাতীয় কিছু থাকলে সেটা খুলে দেখা। আপনাকে নিরীহ মনে করে আপনার বেলা সেটা আর করেনি। খুললে কী বেরোত কে জানে? ওই প্যাকেটের সঙ্গে যে এই খুনের সম্বন্ধ নেই তা কে বলতে পারে?'

লালমোহনবাবু গলা খাঁকরে মিনমিন করে বললেন, 'কিন্তু একটা বইয়ের প্যাকেটে আর...'

'বই মানেই যে বই তা ত নাও হতে পারে। আংটির মধ্যে বিষ রাখার ব্যবস্থা থাকত রাজাবাদশাদের আমলে সেটা জানেন? সে আংটিকে শুধু

আংটি বললে কি ঠিক হবে? আংটিও বটে, বিষধরও বটে।...যাক, আপনার কর্তব্য যখন নির্বিঘ্নে সারা হয়ে গেছে, তখন আপনার নিজের কোনো বিপদ নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

'বলছেন?' লালমোহনবাবুর মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।

'বলছি বৈকি', ফেলুদা বলল। 'আর আপনার বিপদ মানে ত আমাদেরও বিপদ। এক সুত্রে বাঁধা আছি মোরা তিনজনায়। সুতোয় টান পড়লে তিন-জনেই কাত।'

লালমোহনবাবু এক ঝটকায় খাট থেকে উঠে বাঁ পা-টাকে কুং-ফুর মতো করে শূন্যে একটা লাথি মেরে বললেন, 'থ্রী চিয়ারস ফর দ্য থ্রী মাসকেটিয়ারস!—হিপ হিপ—'

ফেলুদা আর আমি লালমোহনবাবুর সঙ্গে গলা মেলালাম—

'হুররে!'

॥ ৪ ॥

সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে হেঁটে ঘুরে না দেখলে নতুন শহর দেখা হয় না এটা আমরা তিনজনেই বিশ্বাস করি। যোধপুর, কাশী, দিল্লি, গ্যাংটক—সব জায়গাতেই আমরা এ জিনিসটা করেছি। বম্বেতেই বা করব না কেন?

হোটেল থেকে বেরিয়ে ডানদিকে কিছু দূরে গেলেই যাকে কেম্পস কর্নার বলে সেখানে একটা দুর্দান্ত ফ্লাই-ওভার পড়ে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাগড়াই থামের উপর দিয়ে ব্রিজের মতো রাস্তা, তার উপরেও ট্র্যাফিক, নিচেও ট্র্যাফিক। আমরা ব্রিজের তলা দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গিবস রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছি। ফেলুদা ডানদিকে দেখিয়ে দিল পাহাড়ের গা দিয়ে হ্যাঙ্গিং গার্ডেনস যাবার রাস্তা। এই পাহাড়ের নামই মলাবার হিলস।

মাইলখানেক এগিয়ে যেতে সামনে সমুদ্র পড়ল। আপিস ফেরত গাড়ির স্রোত এড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে এক কোমর উঁচু পাথরের পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাঁচিলের পিছন দিকে সমুদ্রের জল এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

রাস্তাটা বাঁদিক দিয়ে সোজা পুবে চলে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরে শেষ হয়েছে সেই একেবারে দক্ষিণে, যেখানের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো ঝাপসা হয়ে আছে বিকেলের পড়ন্ত রোদে। ওই ধনুকের মতো রাস্তাটা নাকি ম্যারিন ড্রাইভ।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনারাই বলুন আর যাই বলুন—পাহাড় আর সমুদ্র মিলিয়ে বম্বে একেবারে চ্যাম্পিয়ন শহর মশাই।'

পাঁচিলের ধার দিয়ে আমরা ম্যারিন ড্রাইভের দিকে এগোতে লাগলাম। বাঁ দিক দিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো গাড়ি চলেছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর লালমোহনবাবু আরেকটা মন্তব্য করলেন।

'এখানে বোধহয় সি এম ডি এ নেই; আছে কি?'

'রাস্তায় খানাখন্দ নেই বলে বলছেন ত?'

'এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময়ই লক্ষ করছিলুম যে গাড়িতে চলেছি, অথচ লাফাচ্ছি না। অবিশ্বাস্য!'

কিছুক্ষণ থেকেই সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায় ভিড় লক্ষ করছিলাম।

যেমন রবিবার আমাদের শহীদ মিনারের নিচে হয়, অনেকটা সেই রকম। আরো কাছে যেতে ফেলুদা বলল জায়গাটার নাম চৌপাট্টি। এখানে রোজই নাকি রথের মেলার মতো ভিড় হয়। সারবাঁধা দোকান, দেখেই মনে হয় ফুচকা বা ভেলপুরী বা আইসক্রীম বা ওই জাতীয় কিছু বিক্রী হচ্ছে।

ক্রমে কাছে এসে বুঝলাম আন্দাজে ভুল করিনি। মেলার মতো মেলা বটে। অর্ধেক বম্বে শহর ভেঙে পড়েছে এখানে। লালমোহনবাবু শিগ্গিরই রিচ ম্যান হচ্ছেন, তাই ও'র ঘাড় ভাঙতে দোষ নেই। তিনজনে হাতে ভেল-পুরীর ঠোঙা নিয়ে ভিড় আর হৈহুল্লোড় ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসলাম। ঘড়িতে পৌনে সাতটা, কিন্তু এখনো আকাশে গোলাপী রঙ। আমাদের মতো অনেকেই বালির উপর বসে আরাম করছে। লালমোহন-বাবু খাওয়া শেষ করে হাত নেড়ে একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন। বাঁ দিকে বসে থাকা লোকজনের মধ্যে কারুর হাত থেকে একটা খবরের কাগজ উড়ে এসে ভদ্রলোকের মুখের উপর লেপটে গিয়ে কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

কাগজটা হাতে নিয়ে নামটা দেখে লালমোহনবাবু সবে 'ইভনিং নিউজ' কথাটা বলেছেন, এমন সময় ফেলুদা তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল।

'নামটা পড়লেন, আর তার নিচে হেড-লাইনটা চোখে পড়ল না?'

আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়লাম। হেডলাইন হচ্ছে—'মার্ডার ইন অ্যাপার্টমেন্ট লিফ্‌ট', আর তার নিচেই যে খুন হয়েছে তার ছবি। যাক্--এ তাহলে আমাদের লালশার্ট নয়।

খবরে বলছে খুনটা হয়েছে দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে। খুনী এখনো ধরা পড়েনি, তবে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। যে খুন হয়েছে তার নাম মঙ্গলরাম শেঠী। চোরাকারবারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বেশ কিছুদিন থেকেই পুলিশ খুঁজছে। লিফ্‌টে বেশ ধস্তাধস্তি হয়েছিল তারও নাকি প্রমাণ পাওয়া গেছে। ক্রমের মধ্যে নাকি এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে মৃতদেহের পাশে। কাগজে একজনের নাম ছিল। নামটা হচ্ছে—

'ও আঁ আঁ আঁ আঁ...'

একটা অদ্ভুত গোঙানি-টাইপের শব্দ লালমোহনবাবুর গলা দিয়ে বেরোল। ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন মনে করে আমি তাড়াতাড়ি ওঁকে জাপটে ধরলাম। অবিশ্যি এরকম করার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইভনিং নিউজ লিখছে চিরকুটে লেখা ছিল—'মিস্টার গাঙ্গুলী, ডার্ক, শর্ট, বল্ড, মুসটাশ।'

খবরটা পড়া শেষ হওয়া মাত্র লালমোহনবাবু ফেলুদার হাত থেকে কাগজটা খামচে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে

দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'এমন পরিষ্কার সমুদ্রতটটিকে আবর্জনায় ভরিয়ে দিলেন?'

ভদ্রলোক এখনো ভালো করে কথা বলতে পারছেন না দেখে ফেলুদা এবার ধমকের সুরে বলল, 'আপনার কি ধারণা গোটা শহরের লোক আপনাকে দেখেই বুঝে ফেলবে যে আপনিই হচ্ছেন এই ব্যক্তি?'

লালমোহনবাবু এতেও সান্ত্বনা পেলেন না। কোনরকমে ঢোক গিলে বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু—এর মানেটা বুঝছেন ত? কে খুন করেছে বুঝছেন ত?'

ফেলুদা বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে একদৃষ্টে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, 'লালুদা, চার বছর আমার সংসর্গ-লাভ করেও মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে শিখলেন না।'

'কেন, কেন—লাল শার্ট—?'

'লাল শার্ট কী? কাগজটা লাল শার্টেরই হাত থেকে লিফ্‌টে পড়েছে সেটা ধরে নিলেও তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে? তার মানেই যে সে খুন করেছে তার কী প্রমাণ? আপনার কাছ থেকে প্যাকেট পাবার পর তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক শেষ—এটা ত ঠিক? তাহলে কাগজটারও তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। লিফ্‌টে ওঠার সময় সেটা পকেটে রয়ে গেছে দেখে সে সেটা লিফ্‌টেই ফেলে দিল—এমন ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি?'

লালমোহনবাবু তবুও ঠান্ডা হলেন না। 'আপনি যাই বলুন, লাশের পাশে যখন আমার নাম আর ডেসক্রিপশন লেখা কাগজ পেয়েছে, তখন আমার চরম ভোগান্তি আছে—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। রাস্তা একটাই। টাকে ত আর চুল গজাবে না, হাইটও বাড়বে না, আর কমপ্লেকশনও চেঞ্জ হবে না। আছে এক গোঁফ। আপনি যাই বলুন, এ গোঁফ আমি কালই হাওয়া করে দেব।'

'আর হোটেলের লোকেরা কী ভাববে? তারা কি আর ইভনিং নিউজ পড়েনি ভেবেছেন? খুনের খবর শতকরা নব্বই ভাগ লোকে পড়বে, মানুষের স্বভাবই ওই। আমার ধারণা আপনি গোঁফ ছাঁটলে দৃষ্টিটা, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটা, আরো বেশি করে আপনার উপর পড়বে।'

আকাশের লালটা যখন বেগুনী হয়ে শেষে পাঁশুটের দিকে যেতে শুরু করেছে, পশ্চিমের চেরা মেঘের ফাঁকে শুকতারাটা পুবের মেরিন ড্রাইভের হাজার আলোর মালার সঙ্গে একা পাল্লা দিতে গিয়ে ধুকপুক করছে, তখন আমরা উঠে পড়ে গা থেকে বালি ঝেড়ে আবার মানুষ আর দোকানের ভিড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে হোটেলমুখো হলাম।

রিসেপশন কাউন্টারে চাবি চাইবার সময় দেখলাম লালমোহনবাবু হাতটা যেদিকে বাড়ালেন, মুখটা তার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, উল্টোদিকে লবিতে বসা সাতজন দেশী-বিদেশী লোকের তিন-জনের হাতে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ডের সামনের পাতাতেও খুনের খবর আর মৃতদেহের ছবি। খবরের মধ্যে টেকো বেঁটে গুঁফো রক্ত-ময়লা মিস্টার গাঙ্গুলীর উল্লেখ নেই এ হতেই পারে না।

॥ ৫ ॥

লালমোহনবাবু শেষ পর্যন্ত আর গোঁফটা কামাননি। রাত্রে ঘুম হয়েছিল কিনা জিগ্যেস করাতে বললেন যতবারই চোখ ঢুলে এসেছে ততবারই মনে হয়েছে ওঁর ঘরটা লিফ্‌টের মতো ওঠানামা করছে, আর তার ফলে তন্দ্রা ছুটে গেছে।

পুলকবাবু কাল রাত্রেই ফোন করে বলেছিলেন আজ সকাল দশটায় এসে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে যাবেন। আমরা আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পেডার রোড দিয়ে খানিকদূরে হেঁটে একটা পানের দোকান থেকে দিব্যি মিঠে পান কিনে পৌনে নটায় হোটেলে ঢুকতেই কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম।

কারণ আর কিছুই না, পুলিশ এসেছে। একজন ইনস্পেক্টর গোছের লোক কাউনটারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, হোটেলের কর্মচারী একটা ইঙ্গিত করতেই তিনি ঘুরে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন। ইনস্পেক্টরের চাহনিতে যদিও কোনো হুমকির ভাব ছিল না, পাশে একটা খট্ শব্দ শুনে বুঝলাম লাল-মোহনবাবুর দুটো হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে।

ইনস্পেক্টর হাসিমুখে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা শান্তভাবে লালমোহনবাবুর পিঠে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল— নার্ভাস হবেন না, ঘাবড়াবার কিছু নেই।

'ইনস্পেক্টর পটবর্ধন। সি আই ডি থেকে আসছি। আপনি মিস্টার গাঙ্গুলী?'

'হাঁয়েস।'

এই রে, লালমোহনবাবু ইংরিজি-বাংলা গুলিয়ে ফেলেছেন।

পটবর্ধন ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'আপনারা—?'

ফেলুদা পকেট থেকে ওর প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লেখা কার্ডটা বার করে দিল। পটবর্ধন সেটা পড়ে ফেলুদার দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

'মিটার? আপনিই কি এলোরার সেই মূর্তি চুরির—?'

ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'গ্ল্যাড টু মীট ইউ স্যার', হাত বাড়িয়ে বললেন পটবর্ধন। 'ইউ ডিড

এ ভেরি গুড জব দেয়ার।'

ফেলুদার বন্ধু বলে লালমোহনবাবুর খাতির বেড়ে গেল ঠিকই, কিন্তু জেরার হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। কথা হল হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে বসে।

পটবর্ধন যা বললেন তাতে জানলাম, যে মৃতদেহের গায়ে নাকি অনেক আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তবে খুনী এখনো ধরা পড়েনি। কিন্তু একজন লাল শার্ট পরা লোক যে এয়ারপোর্ট থেকে শিবাজী কাস্‌ল-এ এসেছিল সেটা পুলিশ বার করেছে ট্যাক্সিওয়ালাটার সন্ধান বার করে। পুলিশের ধারণা এই লালশার্টই খুনী এবং তার পকেট থেকেই চিরকুটটা বেরিয়েছে। লালমোহন-বাবুর কথা শুনে অবিশ্যি পটবর্ধনের ধারণা আরো বদ্ধমূল হল। বললেন, 'এটা বুঝতেই পারছিলাম যে লোকটা গাঙ্গুলী নামে কাউকে মীট করতে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। আমরা গতকাল সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে যত প্লেন স্যান্টাক্রুজে নেমেছে তার প্রত্যেকটার প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে ক্যালকাটা ফ্লাইটে গাঙ্গুলী নামটা পাই। তারপর এখানের প্রত্যেক হোটেলে খোঁজ করি। দেখলাম শালিমার হোটেলে দুপুরে এসেছেন মিস্টার এল গাঙ্গুলী।'

পটবর্ধনের আসল যেটা জানার ছিল সেটা হচ্ছে এই ব্যাপারে লালমোহন-বাবুর ভূমিকাটা কী; অর্থাৎ ওই কাগজে তার নাম আর চেহারার বর্ণনা থাকবে কেন। লালমোহনবাবু মিস্টার সান্যালের ব্যাপারটা বলাতে পটবর্ধন বললেন, 'হু ইজ দিস সানিয়াল? হাউ ওয়েল ডু ইউ নো হিম?'

লালমোহনবাবু যা বলবার বললেন। সান্যালের ঠিকানা জিগ্যেস করাতে বাধ্য হয়েই বলতে হল উনি জানেন না।

সবশেষে ইনস্পেক্টর পটবর্ধন ঠিক ফেলুদার মতো করেই সাবধান করে দিলেন লালমোহনবাবুকে। বললেন, 'ঠিক এইভাবেই নিরীহ নির্দোষ লোকের হাত দিয়ে আজকাল চোরাই মাল পাচার হচ্ছে। কাঠমুণ্ডু থেকে কিছু দামী মণিমুক্তো এদেশে এসেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। শুনেছি তার মধ্যে নাকি নানাসাহেবের বিখ্যাত নওলাখা হারও আছে।'

সিপাহী বিদ্রোহের সময় একজন নানাসাহেব ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছিল বলে ইতিহাসে পড়েছি। পটবর্ধন সেই নানাসাহেবের কথা বলছেন কিনা জানি না।

'আমার বিশ্বাস এই প্যাকেটটাতেও কোনো চোরাই মাল ছিল,' বললেন পটবর্ধন। 'যে গ্যাঙ এটা কলকাতা থেকে পাঠিয়েছে, তারই বিরুদ্ধ গ্যাঙের কেউ খবর পেয়ে শিবাজী কাস্‌লের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। সেই লোকই লালশার্টকে আক্রমণ করে, ফলে লালশার্টের হাতে তার মৃত্যু হয়।'

লালমোহনবাবু ধরেই নিয়েছিলেন যে তাঁর নাম লেখা কাগজ পুলিশের হাতে পড়াতে ওঁর হয় ফাঁসি না-হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হবেই। কেবল কয়েকটা উপদেশ-বাক্য শুনে ছাড়া পেয়ে যাওয়াতে ভদ্রলোকের চেহারায় নতুন জেল্লা এসে গেল।

পুলকবাবু দশটা বলে এলেন প্রায় এগারোটায়। পুলিশের ব্যাপারটা শুনে বললেন, 'আর বলবেন না—কাল কাগজ দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। লালুদার সঙ্গে নাম ডেসক্রিপশন সব মিলে যাচ্ছে, অথচ পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্য।'

সান্যালের ঘটনাটা শুনে বললেন, 'কোন্ সান্যাল বলুন ত? অহী সান্যাল? মাঝারি হাইট, চোখদুটো একটু বসা, থুতনিতে খাঁজ কাটা?'

'থুতনি ত দেখিনি ভাই। দাড়ি আছে। বোধহয় আগে রাখতেন না।'

'আমি দু'বছর আগের কথা বলছি। একই লোক কিনা জানি না। বোম্বেতে ছিল কিছুদিন। ছবিও প্রোডিউস করেছিল খান দু'এক। মার খেয়েছিল—যদ্দুর মনে পড়ে।'

'লোক কিরকম?'

'সে খবর জানি না লালুদা, তবে বদনাম শুনিনি কখনো।'

'তাহলে বোধহয় কাগজের প্যাকেটে কোনো গোলমাল নেই।'

'দেখুন লালুদা, আজকাল নেহাৎ স্মাগলিং-টাগলিং হচ্ছে বলে, নইলে আমরাও ত এককালে অনেক অচেনা লোকের হাত থেকে জিনিস নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কই, কোনদিন ত কোনো গোলমাল হয়নি।'

যে গাড়িটা কাল ব্যবহার করেছিলাম, সেটাতেই আমরা চারজনে মহালক্ষ্মীর ফেমাস স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম। গাড়ি থেকে নামবার সময় পুলকবাবু বললেন, 'আগামী কালের শুটিং-এ ট্রেনের ব্যাপারটায় রেল কোম্পানির লোকেদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। খবরটা পেয়েই প্রোডিউসার গোরের প্লেন ধরে কলকাতা থেকে চলে এসেছেন। চলুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

'কালকের শুটিংটা হবে ত?' লালমোহনবাবুর গলায় আশঙ্কার সুর।

'শুটিং-এর বাবার হবে লালুদা, ঘাবড়াইয়ে মৎ।'

আমরা একটা টিনের ছাতওয়ালা কারখানার ঘরের মতো বিরাট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। এখানেই শুটিং হয়, আর আজ এখানেই চলেছে কুং-ফুর ট্রেনিং। একটা প্রকাণ্ড গদির উপর ভিকটর পেরুমলের নির্দেশে একদল লোক লাফাচ্ছে, পা ছুঁড়ছে, আছাড় খাচ্ছে। গদি থেকে হাত দশেক দূরে একটা বেতের চেয়ারে

বসে আছেন একজন বছর পঞ্চাশ্বেক বয়সের ভদ্রলোক।

'আলাপ করিয়ে দিই,' বললেন পুলকবাবু, 'ইনি হচ্ছেন আমাদের ছবির প্রযোজক মিঃ গোরে...মিস্টার গাঙ্গুলী, স্টোরি রাইটার—মিস্টার মিত্র, আর—তোমার নামটা কী ভাই?'

'তপেশরঞ্জন মিত্র।'

মিঃ গোরের গাল দুটো আপেলের মতো, মাথার ঠিক মাঝখানে একটা চকচকে টাক, আর চোখদুটো সামান্য কটা। ভুঁড়িটা নিশ্চয়ই ইদানীং হয়েছে, কারণ শখ করে এত টাইট জামা কেউ পরে না। পুলকবাবু আলাপ করিয়ে দিয়ে হাওয়া, কারণ কালকের শুটিং-এর নাকি অনেক তোড়জোড় আছে। বলে গেলেন, 'লেভুটায় ফিরছি লালুদা; আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছেন আপনারা।'

গোরে আমাদের খুব খাতিরটাতির করে চেয়ার আনিয়ে বসতে দিলেন। নিজে লালমোহনবাবুর পাশে বসে বললেন, 'আপনি এলেন বলে আমি খুব খুশি হলাম।'

'সেকি, আপনি ত দিব্যি বাঙলা বলেন!'

লালমোহনবাবু বোধহয় তাঁর দশ হাজার পাওনার কথাটা ভেবেই একটু বেশি খুলে তারিফ করলেন।

'আমার ফাদারের বিজনেস ছিল ক্যানিং স্ট্রীটে। থ্রি ইয়ারস আই ওয়জ এ স্টুডেন্ট ইন ডন বস্কো। দেন ফাদারের ডেথ হল, আমি আঙ্কেলের কাছে চলে এলাম বম্বই। সে তখন থেকেই আই অ্যাম হিয়ার। লেকিন ফিলিম লাইনে দিস ইজ মাই ফার্স্ট ভেনচার।'

গোরে বাঙলা জানেন দেখেই বোধহয় লালমোহনবাবু বেশ উৎসাহের সঙ্গে সান্যাল থেকে শুরু করে আজকের পুলিশের জেরা অবধি সব ঘটনা ভদ্রলোককে বলে ফেললেন। তাতে মিঃ গোরে চুকচুক শব্দ করে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, 'আজকাল কাউকে বিসোয়াস করা যায় না মিস্টার গাঙ্গুলী। আপনি এমিনেন্ট রাইটার, আপনার হাতে চোরাই মাল পাচার হবে ভাবতে শরম্ লাগে।'

এবার ফেলুদাও যোগ দিল কথায়।

'আপনি ত শিবাজী কাস্‌লে থাকেন বলে শুনলাম।'

'হাঁ। দুমাস হল আছি। হরিব্‌ল মার্ডার। ইভনিং ফ্লাইটে এসেছি আমি। বাড়ি ফিরেছি রাত ইগারটা। অ্যাট দ্যাট টাইম অলসো দেয়ার ওয়জ এ বিগ ক্রাউড ইন দ্য স্ট্রীট। হাই-রাইজ বিল্ডিংমে খুনখারাবি হোনেসে বহুৎ হুজ্জুৎ।'

'ইয়ে—সেভেনটিনথ্ ফ্লোরে কে থাকে জানেন?'

'সেভেনটিনথ...সেভেন্টিনথ...' ভদ্রলোক মনে করতে পারলেন না। 'আমার চিনা আর্দামি এক হ্যায় এইটথ মে—এন সি মেহতা; আউর দো মে ডক্টর ভাজিফদার। মাই ম্যাট ইজ অন টুয়েলফথ ফ্লোর।'

ফেলুদা আর কোনো প্রশ্ন করল না। মিঃ গোরেরও দেখলাম উঠি-উঠি ভাব। বললেন বহুৎ ঝামেলার প্রোডাকশন, সব সময় কিছু না কিছু কাজে লেগেই থাকে। তাছাড়া কালকের শুটিংটা সত্যিই এলাহি ব্যাপার। মাথেরান স্টেশন থেকে ভাড়া করা ট্রেন খান্ডালা আর লোনাউলির মাঝামাঝি লেভেল-ক্রসিং-এ আসবে। মিঃ গোরে মাথেরানেই থাকবেন, কারণ রেল কোম্পানিকে পয়সাকড়ি দেওয়ার ব্যাপার আছে। একটা পুরোনো আমলের ফার্স্ট-ক্লাস কামরা থাকবে ট্রেনে, মিঃ গোরে সেই কামরায় চেপেই শুটিং-এর জায়গায় আসবেন। 'আমি খুব খুশি হব যদি আপনারা আমার সঙ্গে এসে লাঞ্চ করেন। আপনারা ভেজিটেরিয়ান কি?'

'নো নো, নন নন', বললেন লালমোহনবাবু।

'হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ? চিকেন অর মটন?'

'চিকেন হ্যাড ইয়েসটারডে। মাটনই হোক টুমরো; কী বলেন ফেলুবাবু?'

'তথাস্তু', বলল ফেলুদা।

ফেলুদা মিস্টার গোরের সব কথাই শুনেছিল, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে ওর চোখটা যে বারবার কুং-ফুর দিকে চলে যাচ্ছিল সেটা আমি লক্ষ করছিলাম। ভিক্টর পেরুমলের ধৈর্য আর অধ্যবসায় দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটাকে নিখুঁত না করে সে ছাড়বে না। যারা শিখছে তাদের মধ্যে দু-একজন দেখলাম রীতিমত তৈরি হয়ে গেছে।

পেরুমলকেও দেখছিলাম কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফেলুদার দিকে দেখছে। ফেলুদার চাহনিতে তারিফের ভাবটা বোধহয় তাকে উৎসাহিত করছিল। গোরে চলে যাবার পর পেরুমল ফেলুদাকে ইশারা করে কাছে আসতে বলল। ফেলুদা হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে এগিয়ে গেল।

'আইয়ে মিস্টার মিত্র—ট্রাই কিজিয়ে—ইটস নট সো ডিফিকাল্ট।'

বাকি যারা ট্রেনিং নিচ্ছিল তারা গদি ছেড়ে সরে গেল। পেরুমল একটা ছোট্ট লাফের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে ডান পা-টা মাথা অবধি তুলে সোজা সামনের দিকে ছিটকে দিল। পায়ের সামনে কেউ থাকলে নির্ঘাৎ ধরাশায়ী হত। ফেলুদা গদির উপর উঠে পাঁচ-ছ বার ছোট্ট ছোট্ট লাফ দিয়ে শরীরটাকে তৈরি করে নিল। পেরুমল ফেলুদা থেকে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার দিকে ছোঁড় পা।'

পেরুমলের জানার কথা নয় যে এনটার দ্য ড্রাগন দেখার পর থেকে মাস

কয়েক ধরে প্রায়ই সকালে ফেলুদা আমাদের বৈঠকখানায় কুং-ফুর ঢঙে হাত পা ছোঁড়া অভ্যেস করেছে। ফুর্তি ছাড়া এর পিছনে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না ঠিকই, কিন্তু পা ছোঁড়ার কায়দাটা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ওয়ান-টু-থ্রী বলার সংগে সংগে ফেলুদার ডান পা-টা হোরাইজন্টালভাবে বিদ্যুদ্বেগে সামনের দিকে ছিটকে গেল, আর সংগে সংগে পেরুমলের শরীরটা পিছনে ছিটকে গিয়ে আছাড় খেলো গদির উপর—যদিও আমি জানি যে ফেলুদার পা তার গায়ে লাগেনি।

তারপর এইভাবে পাঁচ মিনিট ধরে চলল ভিক্টর পেরুমল আর প্রদোষ মিত্তিরের কুং-ফুর ডেমনস্ট্রেশন। আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল পেরুমলের সহকারীদের দিকে—দেড় মাস ধরে লাফ ঝাঁপ করে যাদের জিভ বেরিয়ে এসেছে। এটা দেখে ভালো লাগল যে হিংসার চেয়ে প্রশংসার ভাবটাই তাদের মধ্যে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে। পাঁচ মিনিটের শেষে যখন দুজনে হ্যান্ডশেক করে পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছে, তখন সকলে হাততালি দিয়ে উঠল।

॥ ৬ ॥

দুটো নাগাদ পুলকবাবু আর সংলাপ-লেখক ত্রিভুবন গুপ্তের সঙ্গে আমরা ওয়রলির কপার চিমনি রেস্টোর‍্যান্টে লাঞ্চ খেতে ঢুকলাম। দেখে মনে হয় তিলধরার জায়গা নেই, কিন্তু পুলকবাবু আমাদের জন্য একটা টেবিল আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখেছেন।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমাদের ছবির নামটা কী হচ্ছে ভাই পুলক?'

নামের কথাটা অবিশ্যি আমারও অনেকবার মনে হয়েছে, কিন্তু জিগ্যেস করার সুযোগটা আসেনি। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' নাম যে থাকবে না সেটা আমিও আন্দাজ করেছিলাম।

'আর বলবেন না লালুদা', বললেন পুলকবাবু। 'নাম নিয়ে কি কম হুজ্জত গেছে? যা ভাবি তাই দেখি হয় হয়ে গেছে, না হয় অন্য কোনো পার্টি রেজিস্ট্রি করে বসে আছে। গুপ্তেজিকে জিগ্যেস করুন না কত বিনিদ্র রজনী গেছে ওঁর নাম ভেবে বার করতে। শেষটায় এই তিনদিন আগে—যা হয় আর কি—হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক।'

'হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক? ছবির নাম হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক?' লো-ভোল্টেজ গলার স্বরে জিগ্যেস করলেন জটায়ু।

পুলকবাবু হো-হো করে হেসে চারিদিকের টেবিলের লোকদের মাথা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মাথা খারাপ লালুদা? ও নামে ছবি চলে? আমি ইনস্পিরেশনের কথা বলছি। জেট বাহাদুর।'

'অ্যাঁ?'

'জেট বাহাদুর। রাস্তায় হোর্ডিং পড়ে যাবে আপনারা থাকতে থাকতেই। ভেবে দেখুন—আপনার গল্পের এর চেয়ে ভালো নাম আর খুঁজে পাবেন না। অ্যাকশন, স্পীড, থ্রিল—জেট কথাটার মধ্যে আপনি সব পাবেন। প্লাস বাহাদুর! নাম আর কাস্টিং-এর জোরেই অল সার্কিটস সোল্ড।'

লালমোহনবাবুর হাসির ভোল্টেজটা যেন বাড়তে গিয়ে কমে গেল। বোধহয় ভাবছেন—শুধুই নাম আর কাস্টিং? গল্পের কি তাহলে কোনো দামই নেই?

'আমার কোনো ছবি কি আপনারা দেখেছেন লালুদা?' বললেন পুলকবাবু। 'তীরন্দাজটা হচ্ছে লোটাসে। আজ ইভনিং শো-এ দেখে আসুন। আমি

ম্যানেজারকে বলে দেব—তিনখানা সার্কেলের টিকিট রেখে দেবে। ভালো ছবি—জুবিলি করেছিল।'

আমরা পুলকবাবুর কোনো ছবি দেখিনি। লালমোহনবাবুর স্বাভাবিক কারণেই কৌতূহল ছিল, তাই যাব বলেই বলে দিলাম। বম্বেতে চেনাশোনা না থাকলে সন্ধ্যে কাটানো ভারি মুশকিল। গাড়িটা আমাদের কাছেই থাকবে—তাকে বললেই প্রোটাসে নিয়ে যাবে।

খাবার মাঝখানে রেস্টোর্যান্টের একজন লোক পুলকবাবুকে এসে কী জানি বলল। পুলকবাবুর যে এখানে যাতায়াত আছে সেটা ঢোকার সময় ওয়েটারদের মুখে হাসি দেখেই বুঝেছি। হিট ডিরেক্টারের এ শহরে খুব খাতির।

পুলকবাবু কথাটা শুনেই লালমোহনবাবুর দিকে ফিরলেন।

'আপনার টেলিফোন লালুদা।'

লালমোহনবাবু ভাগ্যিস পোলাওয়ের চামচটা মুখে পোরেন নি, তাহলে নির্ঘাৎ বিষম খেতেন। এ অবস্থায় চমকানোটা কেবল খানিকটা পোলাও চামচ থেকে ছিটকে টেবিলের চাদরে পড়ার উপর দিয়ে গেল।

'মিস্টার গোরে ডাকছেন', বললেন পুলকবাবু। 'হয়ত কিছু গুড নিউজ থাকতে পারে।'

মিনিট দুয়েকের মধ্যে টেলিফোন সেরে এসে লালমোহনবাবু আবার কাঁটা-চামচ হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'চারটের সময় ভদ্রলোকের বাড়িতে যেতে বললেন। কিছু অর্থপ্রাপ্তি আছে বলে মনে হচ্ছে—হে হে।'

তার মানে আজ বিকেলের মধ্যে লালমোহনবাবুর পকেটে দশ হাজার টাকা এসে যাবে। ফেলুদা বলল, 'এর পরের দিন লাঞ্চটা আপনার ঘাড়ে। আর কুপার-টুপার নয়, একেবারে গোল্ডেন চিমনি।'

রুমালি রুটি, পোলাও, নারগিসি কোফ্‌তা আর কুলপী খেয়ে যখন রেস্টোরান্ট থেকে বেরোলাম তখন প্রায় পৌনে তিনটে। পুলকবাবু আর মিস্টার গুপ্তে স্টুডিও চলে গেলেন। সংলাপ এখনো কিছু লিখতে বাকি আছে। প্রত্যেকটা সংলাপ শানিয়ে লিখতে হয় তো, তাই নাকি সময় লাগে, বললেন পুলকবাবু। গুপ্তেজী চুরুটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন। ভদ্রলোক সংলাপ লিখলেও নিজে সংলাপ খুবই কম বলেন সেটা লক্ষ্য করলাম।

আমরা পান কিনে গাড়িতে উঠলাম। 'শালিমার?' ড্রাইভার জিগ্যেস করল।

ফেলুদা বলল, 'বম্বে এসে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া না দেখে যাওয়া যায় না।—চলিয়ে তাজমহল হোটেলকা পাস।'

'বহুৎ আচ্ছা।'

ড্রাইভার বুঝেছিল আমাদের কোনো কাজ নেই, কেবল শহর দেখার ইচ্ছে,

তাই সে দিব্যি ঘুরিয়ে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, ফ্লোরা ফাউনটেন, টেলিভিশন স্টেশন, প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ম ইত্যাদি দেখিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে পৌঁছল। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

পিছনে আরব্য সাগর, তাতে গুণে দেখলাম এগারোটা ছোট বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে রাস্তাটা পেল্লায় চওড়া। বাঁদিকে গেটওয়ের দিকে মুখ করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ছত্রপতি শিবাজী। ডানপাশে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী-বিখ্যাত তাজমহল হোটেল, যার ভিতরটা একবার দেখে না যাওয়ার কোন মানে হয় না, কারণ বাইরেটা দেখেই আমাদের চক্ষু চড়কগাছ।

ঠাণ্ডা লবিতে ঢুকে চোখ একেবারে টেরিয়ে গেল। এ কোন দেশে এলাম রে বাবা! এত রকম জাতের এত লোক একসঙ্গে কখনো দেখিনি। সাহেবদের চেয়েও দেখলাম আরবদের সংখ্যা বেশি। এটা কেন হল? ফেলুদাকে জিগ্যেস করতে বলল, এবার বেরুট যাওয়া নিষেধ বলে আরবরা সব বোম্বাই এসেছে ছুটি ভোগ করতে। পেট্রোলের দৌলতে এদের ত আর পয়সার অভাব নেই।

মিনিট পাঁচেক পায়চারি করে আমরা আবার গাড়িতে এসে উঠলাম। যখন শিবাজী কাস্‌লের লিফ্‌টের বেল টিপছি তখন ঘড়িতে চারটে বেজে দু মিনিট।

টুয়েল্‌ফথ ফ্লোর বা তেরোতলায় পৌঁছে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে দেখি তিন দিকে তিনটে দরজা। মাঝেরটার উপর লেখা জি গোরে। বেল টিপতে উর্দি-পরা বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

'অন্দর আইয়ে।'

বুঝলাম গোরে সাহেব চাকরকে আগেই বলে রেখেছিলেন আমাদের কথা।

ভিতরে ঢুকে ভদ্রলোককে চোখে দেখার আগে তার গলা পেলাম—'আসুন, আসুন!'

এই বার দেখা গেল একটা সরু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে তিনি হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে।

'হাউ ওয়জ দি লাঞ্চ?'

'ভেরি ভেরি গুড' বললেন জটায়ু।

ভদ্রলোকের বৈঠকখানা দেখে তাক লেগে গেল। আমাদের কলকাতার বাড়ির প্রায় পুরো এক তলাটাই এই ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। পশ্চিম দিকটায় সারবাঁধা কাঁচের জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ঘরের আসবাবপত্রের এক-একটারই দাম হয়তো দু' তিন হাজার টাকা, তাছাড়া মেঝে-জোড়া কার্পেট, দেয়ালে পেন্টিং, সিলিং-এ ঝাড়-লণ্ঠন—এসব ত আছেই। একদিকে দেয়াল-জোড়া বুকশেলফে দামী দামী বইগুলো এত ঝকঝকে যে দেখলে মনে হয়

বুঝি এইমাত্র কেনা।

আমি আর ফেলুদা একটা পুরু গদিওয়ালা সোফাতে পাশাপাশি বসলাম, আর আমাদের ডানপাশে আরেকটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসলেন লালমোহনবাবু। বসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশাল কুকুর এসে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের তিনজনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। লালমোহনবাবু দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। ফেলুদা হাত বাড়িয়ে তুড়ি দিতে কুকুরটা ওর দিকে এগিয়ে এল। ও পরে বলেছিল যে কুকুরটা জাতে হল গ্রেট ডেন।

'ডিউক, ডিউক!'

কুকুরটা এবার ফেলুদাকে ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মিঃ গোরে

আমাদের বসিয়ে দিয়ে একটু ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, এবার হাতে একটা খাম নিয়ে ঢুকে লালমোহনবাবুর অন্য পাশের চেয়ারে বসলেন।

'আমি আপনার রিপোর্টটা রেডি করে রাখব ভেবেছিলাম,' বললেন মিঃ গোরে, 'কিন্তু তিনটা ট্রাংক কল এসে গেল।'

ভদ্রলোক খামটা লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। মনের জোরে হাত কাঁপা বন্ধ করে লালমোহনবাবু সেটা নিয়ে তার ভিতর থেকে টেনে বার করলেন একতাড়া একশো টাকার নোট।

'গিন্‌তি করিয়ে লিন,' বললেন মিঃ গোরে।

'গিনব?'

আবার ভাষার গণ্ডগোল।

'গিনবেন আলবৎ। দেয়ার শুড বি ওয়ান হান্ড্রেড নোটস দেয়ার।'

যে সময়ে লালমোহনবাবু গোনা শেষ করলেন, তার মধ্যে রুপোর টি-সেটে আমাদের জন্য চা এসে গেছে। খেয়ে বুঝলাম একেবারে সেরা দার্জিলিং টি।

'আপনার পরিচয় আভিতক মিলল না', গোরে বললেন ফেলুদার দিকে চেয়ে।

ফেলুদা বলল, 'মিস্টার গাঙ্গুলীর ফ্রেন্ড—এই আমার পরিচয়।'

'নো স্যার', বললেন গোরে, 'দ্যাট ইজ নট এনাফ। ইউ আর নো অর্ডিনারি পারসন—আপনার চোখ, আপনার ভয়েস, আপনার হাইট, ওয়ক, বডি---নাথিং ইজ অর্ডিনারি। আপনি হামাকে যদি নাই বলবেন তো ঠিক আছে। লেকিন স্রিফ মিস্টার গাঙ্গুলীর দোস্ত যদি বলেন, উতো হামি বিসোয়াস করব না।'

ফেলুদা অল্প হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে প্রসঙ্গটা চেঞ্জ করে ফেলল।

'আপনার অনেক বই আছে দেখছি।'

'হাঁ—বাট আই ডোন্ট রীড দেম! উসব কিতাব এনলি ফর শো। তারাপোরে-ওয়ালা দুকানে রেগুলার অর্ডার—এনি গুড বুক দ্যাট কামস আউট—এক কপি হামাকে পাঠিয়ে দেয়।'

'একটা বাংলা বইও চলে এসেছে দেখছি।'

ফেলুদার চোখ বটে। ওই সারি সারি বিলিতি বইয়ের মধ্যে পনের হাত দূর থেকে ধরে ফেলেছে যে, একটা বই বাংলা।

মিঃ গোরে হেসে উঠলেন। 'শুধু বাংলা কেন মিঃ মিটার, হিন্দি, মারাঠী, গুজরাটি, সব আছে। আমার এক আদমি আছে—বাংলা হিন্দি গুজরাটি তিন ভাষা জানে; ওই তিন ভাষায় নভেল পড়ে হামাকে সিনপসিস করে দেয়। মিঃ গাঙ্গুলীর কিতাব কে-ভি আউটলাইন পড়িয়েছি আমি। ইউ সি, মিস্টার মিটার, ফিল্ম বানানেকে লিয়ে তো—'

ঘরে টেলিফোন বেজে উঠেছে। মিঃ গোরে উঠে গেলেন। দরজার পাশে একটা তেপায়া টেবিলে রাখা সাদা টেলিফোন।

'হ্যালো...হাঁ...হোল্ড অন।—আপনার টেলিফোন, মিস্টার গাঙ্গুলী।'

লালমোহনবাবুকে বার বার এভাবে চমকাতে হচ্ছে—আশা করি তাতে ওঁর

হার্ট-টার্টের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

'পুলকবাবু কি?' টেলিফোনের দিকে যাবার পথে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

'নো স্যার', বললেন মিঃ গোরে। 'আই ডোন্ট নো দিস পারসন।'

'হ্যালো।'

ফেলুদা আড়চোখে দেখছে লালমোহনবাবুর দিকে।

'হ্যালো...হ্যালো...'

লালমোহনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা ভাব করে আমাদের দিকে চাইলেন।

'কেউ বলছে না কিছু।'

'লাইন কাট গিয়া হোগা,' বললেন মিস্টার গোরে।

লালমোহনবাবু মাথা নাড়লেন। 'অন্য সব শব্দ পাচ্ছি টেলিফোনে।'

এবার ফেলুদা উঠে গিয়ে লালমোহনবাবুর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে নিল।

'হ্যালো, হ্যালো...'

ফেলুদা মাথা নেড়ে ফোন রেখে বলল, 'ছেড়ে দিয়েছে।'

'আশ্চর্য', বললেন লালমোহনবাবু, 'কে হতে পারে বলুন ত?'

'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না, মিস্টার গাংগুলী', বললেন মিঃ গোরে। 'বোম্বাই শহরে এইরকম হামেশা হয়।'

ফেলুদার দেখাদেখি আমরাও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। লালমোহন-বাবুর পকেটে এত টাকা বলেই বোধ হয় রহস্যজনক ফোনের ব্যাপারটা ওঁকে ততটা ভাবাল না। বেশ নিশ্চিন্তভাবেই ভদ্রলোক পরের কথাটা বললেন মিঃ গোরেকে।

'আমরা আজ পুলকবাবুর ফিলিম দেখতে যাচ্ছি লোটাসে।'

'হাঁ, হাঁ যাবেন বৈকি। ভেরি গুড ডিরেকটার পুলকবাবু। জেট বাহাদুর ভি বকস অফিস হিট হোগা জরুর।'

দরজার মুখ পর্যন্ত এলেন মিঃ গোরে। 'ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট নাও টুমরো। ট্রানসপোর্ট আছে ত আপনাদের সঙ্গে?'

আমরা আশ্বাস দিলাম যে সকাল থেকে রাত অবধি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পুলকবাবু।

বাইরে বেরিয়ে এসে লিফটের বোতাম টিপে ফেলুদা বলল, 'মানি কাকে বলে দেখলেন ত লালমোহনবাবু?'

'দেখলাম কি মশাই, তার খানিকটা ত আমার পকেটেই রয়েছে।'

'নাসা, নাসা। লাখ টাকাও এদের কাছে নস্যি। টাকাটা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিল না সেটা দেখলেন ত? তার মানে আপনার পকেটটা কালো হয়ে গেছে

কিন্তু। অর্থাৎ এই আপনার অন্ধকারে পদার্পণ শুরু।'

ঘড়াং শব্দে লিফ্‌টটা উপরের কোনো ফ্লোর থেকে নেমে এসে আমাদের সামনে থামল।

'সে আপনি যাই বলুন ফেলুবাবু, পকেটে টাকা এলে তা সে কালোই হোক, আর—'

ফেলুদা লিফ্‌টে ঢোকার জন্য দরজা খুলেছিল, আর তার ফলেই জটায়ুর কথা বন্ধ।

লিফ্‌টের ভিতর থেকে এক ঝলক উগ্র গন্ধ। গুলবাহার সেন্ট। এ গন্ধ আমরা তিনজনেই চিনি; বিশেষ করে লালমোহনবাবু।

টিপ্ টিপ্ বুকে ফেলুদার পিছন পিছন লিফটে ঢুকে গেলাম।

আমি একটা কথা না বলে পারলাম না।

'গুলবাহার সেন্ট মিঃ সান্যাল ছাড়াও ভারতবর্ষের অনেকেই নিশ্চয়ই ব্যবহার করে।'

ফেলুদা কথাটার জবাবের বদলে গম্ভীরভাবে সতের নম্বর বোতাম টিপল। আমরা আরো পাঁচতলা ওপরে উঠে গেলাম।

অন্যান্য তলার মতোই সতেরো নম্বরেও তিনখানা ঘর। বাঁ দিকের দরজায় লেখা এইচ হেক্‌রথ। ফেলুদা বলল, জার্মান নাম। ডান দিকের দরজায় লেখা এন সি মানসুখানি। নির্ঘাৎ সিন্ধি নাম। মাঝখানের দরজায় কোনো নাম নেই।

'ফ্ল্যাট খালি', বললেন লালমোহনবাবু।

'নাও হতে পারে,' বলল ফেলুদা। 'সবাই দরজায় নাম লাগায় না। ইন ফ্যাক্ট, আমার বিশ্বাস এ ফ্ল্যাটে লোক রয়েছে।'

আমরা দুজনেই ফেলুদার দিকে চাইলাম।

'যে কলিং বেলের বোতাম ব্যবহার হয় না, তাতে ধুলো জমে থাকা উচিত। অথচ এটা ভালো করে কাছ থেকে দেখুন, আর অন্য দুটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।'

কাছে গিয়ে দেখেই বুঝলাম, ফেলুদা ঠিক বলেছে। দিব্যি চকচক করছে বোতাম, ধুলোর লেশমাত্র নেই।

'টিপবেন নাকি?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা অবিশ্যি বোতাম টিপল না। তার বদলে যেটা করল, সেটা আরো অনেক বেশি তাজ্জব ব্যাপার।—মাটিতে উপুড় হয়ে সটান শুয়ে নাকটা লাগিয়ে দিল দরজার নিচে আধ ইঞ্চি ফাঁকটাতে। তারপর বার দুয়েক জোরে নিশ্বাস টেনে উঠে পড়ে বলল, 'কড়া কফির গন্ধ।'

তারপর যেটা করল, সেটাও অদ্ভুত। লিফট ব্যবহার না করে আঠারো তলা

থেকে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল। প্রত্যেক তলাতেই থেমে প্রায় আধ মিনিট ধরে ঘুরে ঘুরে কী যে দেখল তা ওই জানে।

সব সেরে নিচে যখন নামলাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ।

বেশ বুঝতে পারছি যে বম্বে এসে আমরা একটা প্যাঁচালো রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি।

॥ ৭ ॥

'আপনাকে একটু জেরা করলে আপনার আপত্তি হবে না আশা করি।'

কথাটা বলল ফেলুদা, লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ্য করে। মিনিট দশেক হলো শিবাজী কাস্‌ল থেকে ফিরেছি—রিসেপশনে খবর পেয়েছি যে এই আধ ঘন্টা আগে—তার মানে যখন আমরা শিবাজী কাস্‌লের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন—লালমোহনবাবুর একটা ফোন এসেছিল; কে করেছিল তা জানা নেই।

'আসলে পুলকই বারবার করছে,' বললেন লালমোহনবাবু। 'পুলক ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।'

এখন আমাদের ঘরে বসে ফেলুদার প্রশ্নটা শুনে লালমোহনবাবু বললেন, 'পুলিশের জেরাতেই যখন ফ্লাইং কালারসে বেরিয়ে এলুম, তখন আর আপনার জেরায় কী আপত্তি থাকতে পারে?'

'আচ্ছা, মিঃ সান্যালের প্রথম নামটা ত আপনার জানা নেই।'

'না মশাই, ওটা জিগ্যেস করা হয়নি।'

'লোকটার একটা পরিষ্কার বর্ণনা দিন ত। আপনার বইয়ে যেরকম আধা-খ্যাঁচড়া বর্ণনা থাকে সেরকম নয়।'

লালমোহনবাবু গলা খাকরিয়ে ভুরু কুঁচকোলেন।

'হাইট...এই ধরুন গিয়ে—'

'আপনি কি একটা মানুষের হাইটটাই প্রথম দেখেন?'

'তা তেমন তেমন লম্বা বা বেঁটে হলে—'

'ইনি কি খুব লম্বা?'

'তা অবিশ্যি না।'

'খুব বেঁটে?'

'না, তাও অবিশ্যি না।'

'তাহলে হাইট পরে। আগে মুখ বলুন।'

'সন্ধ্যাবেলায় দেখেছি; আমার বাইরের ঘরের বাল্‌বটা আবার চল্লিশ পাওয়ারের।'

'তাও বলুন।'

'চওড়া মুখ। চোখ, আপনার—ইয়ে, চোখে চশমা; দাড়ি আছে, চাপ দাড়ি, গোঁফ আছে—দাড়ির সঙ্গে জোড়া—'

'ফ্রেঞ্চকাট?'

'এই সেরেছে। না, তা বোধ হয় না। ঝুলোপির সঙ্গেও জোড়া।'

'তারপর?'

'কাঁচাপাকা মেশানো চুল। ডান দিকে—না না, বাঁ দিকে সিঁথি।'

'দাঁত?'

'পরিষ্কার। ফল্‌স-টীথ বলে ত মনে হল না।'

'গলার স্বর?'

'মাঝারি। মানে, মোটাও না সরুও না।'

'হাইট?'

'মাঝারি।'

'ভদ্রলোক আপনাকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন না? বম্বের? বলেছিলেন অসুবিধা হলে একে ফোন করবেন—বেশ হেল্‌পফুল?'

'দেখেছেন! বেমালুম ভুলে গেসলুম! আজ যখন পুলিশ জেরা করল তখনও বলতে ভুলে গেলুম।'

'আমাকে বললেই চলবে।'

'দাঁড়ান, দেখি।'

লালমোহনবাবু মানিব্যাগ থেকে একটা ভাঁজকরা নীল কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা সেটা খুব মন দিয়ে দেখল, কারণ লেখাটা মিঃ সান্যালের নিজের। তারপর কাগজটা আবার ভাঁজ করে নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে বলল।

'তোপ্‌সে, নম্বরটা চা তো—টু ফাইভ থ্রি ফোর ওয়ান এইট।'

আমি অপারেটরকে নম্বর দিয়ে দিলাম। ফেলুদা ইংরাজিতেই কথা বলল।

'হ্যালো, মিস্টার দেশাই আছেন?'

আচ্ছা ফ্যাসাদ। এই নম্বরে মিঃ দেশাই বলে কেউ নাকি থাকেই না। যিনি থাকেন তাঁর পদবী পারেখ, আর গত দশ বছর তিনি এই নম্বরেই আছেন।

'লালমোহনবাবু', ফেলুদা ফোনটা রেখে বলল, 'স্যানালকে আপনার নেকস্‌ট গল্প বিক্রী করার আশা ছাড়ুন। লোকটি অত্যন্ত গোলমেলে এবং আমার বিশ্বাস আপনি যে প্যাকেটটি বয়ে আনলেন সেটিও অত্যন্ত গোলমেলে।'

লালমোহনবাবু মাথা চুলকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সত্যি বলতে কি মশাই, লোকটিকে আমারও কেন জানি বিশেষ সুবিধের বলে মনে হয়নি।'

ফেলুদা হুমকি দিয়ে উঠল।

'আপনার ওই কেন জানি কথাটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। কেন সেটা জানতে হবে, বলতে হবে। চেষ্টা করে দেখুন ত পারেন কিনা।'

লালমোহনবাবুর অবিশ্যি ফেলুদার কাছে ধমক খাওয়ার অভ্যেস আছে। এটাও জানি যে উনি সেটা মাইন্ড করেন না, কারণ ধমক খেয়ে খেয়ে ওঁর লেখা যে অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে, সেটা উনি নিজেই স্বীকার করেন।

লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসলেন। 'এক নম্বর, লোকটা সোজাসুজি মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। দুই নম্বর, সব কথা অত গলা নামিয়ে বলার কী দরকার তাও জানি না। যেন কোনো গোপন পরামর্শ করতে এসেছেন। তিন নম্বর...'

দুঃখের বিষয়, তিন নম্বরটা যে কী সেটা লালমোহনবাবু অনেক ভেবেও মনে করতে পারলেন না।

সাড়ে ছটায় লোটাসে ইভনিং শো, তাই আমরা ছটা নাগাত উঠে পড়লাম। আমরা মানে আমি আর লালমোহনবাবু। ফেলুদা বলল যাবে না, কাজ আছে। ব্যাগের ভিতর থেকে ওর সবুজ নোটবইটা বেরিয়ে এসেছে, তাই কাজটা যে কী সেটা বুঝতে বাকি রইল না।

ওয়রলিতে ফিরে যেতে হল আমাদের, কেননা সেখানেই লোটাস সিনেমা। লালমোহনবাবুর বেশ নার্ভাস অবস্থা; পুলকবাবু কেমন পরিচালক সেটা 'তীরন্দাজ' ছবি দেখেই মালুম হবে। বললেন, 'তিনটে ছবি যখন পর পর হিট করেছে, তখন একেবারে কি আর ওয়্যাক-থু হবে? কী বল তপেশ?'

আমি আর কী বলব? আমি নিজেও ত ঠিক ওই কথাটা ভেবেই মনে জোর আনছি।

পুলকবাবু ম্যানেজারকে বলতে ভোলেন নি; রয়েল সার্কলে তিনটে সীট আমাদের জন্য রাখা ছিল। এটা ছবির রিপিট শো, তাই হলে এমনিতেই অনেক সীট খালি ছিল।

ইন্টারভ্যালের আগেই বুঝতে পারলাম যে 'তীরন্দাজ' হচ্ছে একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট কোডোপাইরিন-মার্কা ছবি। এর মধ্যেই অন্ধকারে বেশ কয়েকবার আমরা দুজনে পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি। হাসি পাচ্ছিল, আবার সেই সঙ্গে জেট বাহাদুরের কী অবস্থা হবে, আর তার ফলে জটায়ুর কী অবস্থা হবে সেটা ভেবে কষ্টও হচ্ছিল। ইন্টারভ্যালে বাতি জ্বললে পর লালমোহনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'গড়পারের ছেলে তুই অ্যাদ্দিন এই করে চুল পাকালি?' তারপর একটা গ্যাপ দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কি পুজোয় পাড়ায় একটা করে থিয়েটার করত; যদ্দুর মনে পড়ছে বি কম ফেল;—তার কাছ থেকে আর কী আশা করা যায় বল ত?'

ইন্টারভ্যালের শেষে বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ভয় ছিল, পুলকবাবু বা তার দলের কেউ যদি বাইরে থাকে; কিন্তু সে-

রকম কাউকে দেখলাম না।

'যদি জিগ্যেস করে ত বলে দেব ফার্স্ট ক্লাস। পকেটে করকরে নোটগুলো না থাকলে মনটা সত্যিই ভেঙে যেত তপেশ।'

গাড়িটা হাউসের সামনেই উল্টোদিকের ফুটপাথে পার্ক করা ছিল। লালমোহনবাবু সেদিকে না গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে এক ঠোঙা ডালমুট, দু' প্যাকেট মাখ্খনমের বিস্কুট, ছটা কমলালেবু আর এক প্যাকেট প্যারির লজঞ্চুস কিনে নিলেন। বললেন, হোটেলের ঘরে বসে বসে হঠাৎ হঠাৎ খিদে পায়, তখন এগুলো কাজে দেবে।

দুজনে দুহাত বোঝাই প্যাকেট নিয়ে গাড়িতে উঠলাম, আর উঠেই বাঁই করে মাথাটা ঘুরে গেল।

গাড়ির ভিতরে গুলবাহার সেন্টের গন্ধ।

আসার সময় ছিল না; এই দেড় ঘন্টার মধ্যে হয়েছে।

'মাথা ঝিম ঝিম করছে তপেশ,' বললেন লালমোহনবাবু। 'এ ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই না। সান্যাল খুন হয়েছে, আর তার সেন্টমাখা ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপেছে।'

আমার মনে হল—ঘাড়ে নয়, গাড়িতে চেপেছে; কিন্তু সেটা আর বললাম না।

ড্রাইভারকে জিগ্যেস করাতে সে বলল, সে বেশিরভাগ সময় গাড়িতেই ছিল, কেবল মিনিট পাঁচেকের জন্য কাছেই একটা রেডিও-টেলিভিশনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল খিলে হায় গুলশন গুলশন দেখেছে। হ্যাঁ, গন্ধ সেও পাচ্ছে বৈকি, কিন্তু গাড়ির ভিতরে কী করে এমন গন্ধ হয় সেটা কিছুতেই তার মগজে ঢুকছে না। ব্যাপারটা তার কাছেও একেবারেই অজব।

হোটেলে ফিরে এসে কথাটা ফেলুদাকে বলতে ও বলল, 'রহস্য যখন জাল বিস্তার করে, তখন এইভাবেই করে লালমোহনবাবু। এ না হলে জাত-রহস্য হয় না, আর তা না হলে ফেলু মিত্তিরের মস্তিষ্কপুষ্টি হয় না।'

'কিন্তু—'

'আমি জানি আপনি কী প্রশ্ন করবেন লালমোহনবাবু। না, কিনারা এখনো হয়নি। এখন শুধু জালের ক্যারেক্টারটা বোঝার চেষ্টা করছি।'

'তুমি বেরিয়েছিলে বলে মনে হচ্ছে?'—আমি ধাঁ করে একটা গোয়েন্দা-মার্কা প্রশ্ন করে বসলাম।

'সাবাস তোপ্‌সে। তবে হোটেল থেকে বেরোইনি। এটা নিচে রিসেপশনেই ছিল।'

ফেলুদার পাশে একটা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের টাইমটেবল ছিল, সেটা

দেখেই আমি প্রশ্নটা করেছিলাম।

'দেখছিলাম কাঠমণ্ডু থেকে ক'টা ফ্লাইট কলকাতায় আসে, আর কখন আসে।'

কাঠমণ্ডু বলতেই একটা জিনিস ফেলুদাকে জিগ্যেস করার কথা মনে পড়ে গেল।

'আচ্ছা, ইনস্পেক্টর পটবর্ধন যে নানা-সাহেবের কথা বলেছিলেন, সেটা কোন নানাসাহেব?'

'ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নানাসাহেবই বিখ্যাত।'

'যিনি সিপাহী বিদ্রোহে বৃটিশদের সঙ্গে লড়েছিলেন?'

'লড়েওছিলেন, আবার তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়েওছিলেন। হাজির হয়েছিলেন গিয়ে একেবারে কাঠমণ্ডু। সঙ্গে ছিল মহামূল্য ধনরত্ন—ইনক্লুডিং হীরে আর মুক্তোয় গাঁথা একটি হার—যার নাম নওলাখা। সেই হার শেষ পর্যন্ত চলে যায় নেপালের জং বাহাদুরের কাছে। তার পরিবর্তে জং বাহাদুর দুটি গ্রাম দিয়েছিলেন নানা সাহেবের স্ত্রী কাশী-বাঈকে।'

'এই হার কি নেপাল থেকে চুরি হয়ে গেছে নাকি?'

'পটবর্ধনের কথা শুনে ত তাই মনে হয়।'

'আমি কি ওই হারই পাচার করে বসলুম নাকি মশাই?' লালমোহনবাবু তারস্বরে চেঁচিয়ে প্রশ্নটা করলেন। ফেলুদা বলল, 'ভেবে দেখুন। ইতিহাসে হীরের অক্ষরে লেখা থাকবে আপনার নাম।'

'কিন্তু...কিন্তু...সে তো তাহলে যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। সে জিনিস দেশ থেকে বাইরে যায় কি না যায় সে ত দেখবে পুলিশ। আপনি কী নিয়ে এত ভাবছেন? আপনি নিজেই কি এই স্মাগলারদের—'

ঠিক এই সময়ই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আর লালমোহনবাবুর দিকেই ওটা ছিল বলে উনি তুলে নিলেন।

'হ্যালো—হ্যাঁ, মানে ইয়েস—স্পীকিং।'

লালমোহনবাবুরই ফোন। বোধ হয় পুলকবাবু। না, পুলকবাবু না। পুলকবাবু এমন কিছু বলতে পারেন না যাতে লালমোহনবাবুর মুখ অতটা হাঁ হয়ে যাবে, আর টেলিফোনটা কাঁপতে কাঁপতে কান থেকে পিছিয়ে আসবে।

ফেলুদা ভদ্রলোকের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে একবার কানে দিয়ে বোধহয় কিছু না শুনতে পেয়েই সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'সান্যাল কি?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেও যেন কষ্ট হল ভদ্রলোকের। বুঝলাম মাসলগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে না।

'কী বলল?' আবার ফেলুদা।

'বলল--' লালমোহনবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে মনে সাহস আনার চেষ্টা করলেন। বলল—'মুখ-মুখ খুললে পেপ্‌-পেট ফাঁক করে দেবে।'

'যাক্‌—ভালো কথা।'

'আঁ!'—বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন লাল-মোহনবাবু। আমার কাছেও এই অবস্থায় ফেলুদার হাঁপ ছাড়াটা বেয়াড়া বলে মনে হচ্ছিল। ফেলুদা বলল, 'শুধু গুলবাহারের গন্ধে হচ্ছিল না। ক্লু হিসেবে ওটা বড্ড পলকা। এমনকি লোকটা সত্যি করে বম্বে এসেছে না অন্য কেউ সেন্টটা ব্যবহার করছে, সেটাও বোঝা যাচ্ছিল না। এখন অন্তত শিওর হওয়া গেল।'

'কিন্তু আমার পেছনে লাগা কেন?'

মরিয়া হয়ে প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

'সেটা জানলে ত বাজিমাত হয়ে যেত লালমোহনবাবু। সেটা জানার জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'

লালমোহনবাবু ডিনারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না, কারণ ওঁর নাকি একদম খিদে নেই। ফেলুদা বলল তাতে কিছু এসে যাবে না, কারণ দুপুরে কপার চিমনিতে পেট পুজোটা ভালোই হয়েছে। সত্যি বলতে কি, আমাদের মধ্যে লালমোহনবাবুই সবচেয়ে বেশি খেয়েছিলেন।

খাওয়ার পর গতকাল তিনজনেই বেরিয়ে গিয়ে পান কিনেছিলাম। আজ লালমোহনবাবু কিছুতেই বেরোতে চাইলেন না। বললেন, 'ওই ভিড়ের মধ্যে কে যাচ্ছে মশাই? সান্যালের লোক নির্ঘাৎ হোটেল ওয়াচ করছে, বেরোলেই চাক্কু।'

শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই বেরোল, লালমোহনবাবু আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে বসে রইলেন, আর বারবার খালি বলতে লাগলেন, 'কী কুক্ষণেই বইয়ের প্যাকেটটা নিয়েছিলাম।' ক্রমে বর্তমান সংকটের মূল কারণ খুঁজতে খুঁজতে 'কী কুক্ষণেই হিন্দি ছবির জন্য গল্প লিখেছিলাম', আর সব শেষে 'কী কুক্ষণেই রহস্য উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম' পর্যন্ত চলে গেলেন।

'আপনার একা শুতে ভয় করবে না ত?' ফেলুদা পান বিলি করে জিজ্ঞেস করল। লালমোহনবাবু কোনো উচ্চবাচ্য করছেন না দেখে ফেলুদা আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমাদের ঘর থেকে বেরিয়েই প্যাসেজের ধারে একটা ছোট্ট ঘর আছে দেখেছেন ত? ওখানে সব সময় বেয়ারা থাকে। হোটেলে সারারাত কেউ না কেউ জেগে থাকে। এ তো আর শিবাজী কাস্‌ল না।'

শিবাজী কাস্‌ল নামটা শুনে লালমোহনবাবু আরেকবার শিউরে উঠলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে সাহস এনে দশটা নাগাত গুডনাইট করে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সারাদিন বম্বে চষে বেড়ানোর চেয়েও পুলকবাবুর ছবির অর্ধেক দেখে অনেক বেশি কাহিল লাগছিল, তাই জটায়ু চলে যাবার মিনিট দশেকের মধ্যেই শুয়ে পড়লাম। ফেলুদা যে এখন শোবে না সেটা জানি। ওর নোটবুকটা খাটের পাশেই টেবিলের উপর রাখা রয়েছে, সারাদিন খেপে খেপে তাতে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, হয়তো আরো কিছু লেখা হবে।

আমি অনেকদিন চেষ্টা করেছি রাত্রে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে খেয়াল রাখতে ঠিক কোন সময় ঘুমটা আসে, কিন্তু প্রতিবারই পরদিন সকালে উঠে

হয়েছি ঘুমটা কখন জানি আমার অজানতেই এসে গেছে। আজও কখন ঘুমিয়েছি সেটা টের পাইনি। ঘুমটা ভাঙল দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা, আর সেই সঙ্গে খোতায় টেপরে চা! শব্দে। উঠে দেখি ফেলুদার ল্যাম্প তখনো জ্বলছে আর বালিশের পাশে রাখা আমার ঘড়িতে বলছে পৌনে একটা। ফেলুদা দরজা খুলতেই হুমড়ি দিয়ে প্রবেশ করলেন জটায়ু।

লালমোহনবাবু হাঁপালেও তিনি যে খুব ভয় পেয়েছেন সেটা কিন্তু মনে হল না, আর যে-কথাটা বললেন ঘরে ঢুকেই, সেটাও ভয়ের কথা নয়।

'কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার মশাই!'

'আগে খাটে এসে বসুন', বলল ফেলুদা।

'দূর মশাই, বসব কি—এই দেখুন—কাটমুন্ডুর কী মহামূল্য ধনরত্ন আমার হাত দিয়ে পাচার করা হচ্ছিল।'

লালমোহনবাবু ফেলুদার সামনে যেটা এগিয়ে ধরলেন সেটা একটা বই। ইংরিজি বই, আর নামকরা বই; লান্সডাউনের মোড়ের দোকানে একটা রাখা ছিল সেদিনও দেখেছি। বইটা হল শ্রীঅরবিন্দের লেখা দ্য লাইফ ডিভাইন।

ফেলুদারও চোখ কপালে উঠে গেছে।

'তার উপর আবার বাঁধাইয়ের গণ্ডগোল', বললেন লালমোহনবাবু। 'প্রথম তিরিশ পাতার পর কয়েকটা পাতা পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে আছে। এ বই না দেখে কিনলে ত পুরো টাকাটা ডেড লস্ মশাই। পণ্ডিচেরীর বাইন্ডার এরকম কাঁচা কাজ করবে ভাবতে পারেন?'

'তাহলে সেদিন কী দিলেন মালসার্টের হাতে?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'জানেন কী দিলুম, ভাবতে পারেন? আমার নিজের বই মশাই, নিজের বই!—বোম্বাইয়ের বোম্বেটে! পুলককে ত পাণ্ডুলিপির কপি পাঠিয়েছিলুম, তাই এবার ভাবলুম এক কপি ছাপা বই দেব—উইথ মাই বেস্টিংস অ্যান্ড মাই অটোগ্রাফ। আরো তিন কপি রয়েছে এখনো আমার ব্যাগে, প্রত্যেকটি ব্রাউন কাগজে মোড়া। আমার ভক্ত ত সারা ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে রয়েছে—তাই ভাবলুম, বম্বে যাচ্ছি, যদি এক-আধজনের সঙ্গে আলাপটালাপ হয়ে যায়, তাই সঙ্গে এনেছিলুম, আর তারই একটা কপি—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!'

এত হালকা লালমোহনবাবুকে অনেকদিন দেখিনি।

বইটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ফেলুদা বলল, 'কিন্তু সান্যালকে যে টেলিফোনে হুমকি দিল সেটা কী ব্যাপার? এর সঙ্গে লাইফ ডিভাইন-খাপ খাচ্ছে কি?'

লালমোহনবাবু এতেও দমলেন না।

'কে বলল সান্যাল? টেলিফোনে অত গলা চেনা যায় নাকি? কোনো উটকো বদমাস রসিকতা করছে হয়ত। বোম্বাইতে যদি তীরন্দাজ ছবি হিট

হতে পারে ত সবই হতে পারে।'

'আর গাড়িতে পুলবাহারে সেন্ট?'

'ওটা ওই ড্রাইভারই মাখে। কিরকম টেরির বাহার দেখেছেন? শৌখীন লোক। ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে স্বীকার করলে না।'

'তাহলে আর কী, নিশ্চিন্তে ঘুমোন গিয়ে।'

'সে আর বলতে। মাথাটা ধরেছিল বলে ব্যাগটা খুলেছিলুম কোডো-পাইরিনের জন্য, আর তাতেই এই হাইভোলটেজ আবিষ্কার। যাক্, রহস্য যখন মিটেই গেল, তখন আপনিও বরং একটু আধ্যাত্মিক বিষয় অধ্যয়নে মনো-নিবেশ করুন। বইটা রেখে গেলুম। গুড নাইট।'

লালমোহনবাবু চলে গেলেন, আর আমিও আবার জায়গায় এসে শুলাম।

'যে লোক অরবিন্দের বইয়ের বদলে জটায়ুর বই পেল তার মনের অবস্থা কী হবে ফেলুদা?'

'খেপচুরিয়াস', বালিশে মাথা দিয়ে বলল ফেলুদা। মাথার পিছনের বাতিটা ও জ্বালিয়েই রাখল। দেখে হাসি পেল ফেলুদা তার সবুজ নোটবই সরিয়ে রেখে অরবিন্দের লাইফ ডিভাইনের পাতা ওলটাল।

আমার বিশ্বাস ঠিক ওই সময়টাতেই আমার চোখ ঘুমে বন্ধ হল।

॥ ৯ ॥

বম্বে থেকে পুণা যাবার পথে খাণ্ডালা আর লোনাভলির মাঝামাঝি একটা লেভেল ক্রসিং-এর কাছে আমাদের যেতে হবে শুটিং দেখতে। ছবির এগারোটা ক্লাইম্যাক্সের শেষ ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য তোলা হবে আজ। একদিনে কাজ শেষ হবে না, পর পর আরো চারদিন যেতে হবে সবাইকে। আমরা ঠিক করেছি আজ যদি ভালো লাগে তাহলে বাকি ক'দিনও যাব। ট্রেনটা এই পাঁচদিনই পাওয়া যাবে, প্রতিদিনই ঠিক একটা থেকে দুটো—অর্থাৎ এক ঘণ্টার জন্য। ডাকাত-দলের ঘোড়া আর হিরোর লিংকন কনভার্টিব্‌ল থাকবে সারাদিনের জন্য। ভিলেন ইঞ্জিন ড্রাইভারের জায়গা দখল করে ট্রেন চালিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই ট্রেনেরই একটা কামরায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে হিরোইন আর তার কাকা। মোটরে করে হিরো ট্রেনের উদ্দেশে ধাওয়া করছে। এদিকে হিরোর যে যমজ ভাই—যাকে ছেলেবেলায় ডাকাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আর যে, এখন নিজেই ডাকাত—সে আসছে ঘোড়া করে দলবল নিয়ে ট্রেনটাকে অ্যাটাক করবে বলে। মোটরে হিরো এসে পৌঁছানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাকাত ভাই ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে পড়ে। এঞ্জিনের ভিতর ফাইট হয়, ভিলেন-ড্রাইভার খতম হয়। সেই সময় মোটরে করে হিরো এসে পড়ে, আর তারপর... বাকি অংশ রুপালী পর্দায় দেখিবেন। আসলে শেষটা নাকি তিনরকম ভাবে তোলা হবে, তারপর পর্দায় দেখে যেটা বেশি ভালো লাগে সেটা রাখা হবে।

পুলকবাবু সকালে তিন মিনিটের জন্য ঢুঁ মেরে গেছেন। আমাদের ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক জেনে বললেন, 'লালুদা, আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি তীরন্দাজ আপনার খুব ভালো লেগেছে।'

আসলে লালমোহনবাবু সকাল থেকেই রাত্তিরের ঘটনাটা ভেবে ক্ষণে ক্ষণে আপন মনে হেসে ফেলছিলেন; পুলকবাবুর সামনে সেই হাসিটাই বেরিয়ে পড়েছিল। এখন পুলকবাবুর কথা শুনে আরো জোরে হেসে বললেন, 'ওঃ—গড়পারের ছেলে—তুমি দ্যাখালে ভাই—হাঃ!'

ফিরতে রাত হবে, তাই ফেলুদা বলল হাত-ব্যাগগুলো সঙ্গে নিয়ে নিতে। কালকের কেনা কমলালেবু, বিস্কুট, লজেঞ্চুস ইত্যাদি তিন ব্যাগে ভাগ করে নেওয়া হল, আর লালমোহনবাবুর ক্যাশ দশ হাজার টাকা ম্যানেজারের জিম্মায় সিন্দুকে রেখে রসিদ নিয়ে নেওয়া হল। 'কী জানি বাবা,' ভদ্রলোক বললেন,

ফিল্মের ডাকাতের দলে আসল ডাকাতও যে ঢুকে পড়বে না এক-আধটা তার কী গ্যারান্টি?

ফেলুদা সকালে একবার বেরিয়েছিল, বলল ওর সিগারেটের স্টক নাকি ফুরিয়েছে, যেখানে যাচ্ছি সেখানে কাছাকাছির মধ্যে নাও পাওয়া যেতে পারে। ও ফেরার দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। আজও দেখলাম গাড়িতে গুলবাহারের গন্ধ কিছুটা রয়ে গেছে।

বম্বে থেকে থানা স্টেশন প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার। সেখান থেকে রাস্তা ডাইনে ঘুরে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে পুণের দিকে চলে গেছে। এই রাস্তায় আশি কিলোমিটার গেলেই খাণ্ডালা। আজ দিনটা ভালো, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ হাওয়ার তেজে তরতর করে ভেসে চলেছে, তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে রোদ বেরিয়ে বোম্বাই শহরটাকে বার বার ধুয়ে দিচ্ছে। পুলকবাবু বলে গেছেন শুটিং-এর জন্য এটা নাকি আইডিয়াল ওয়েদার। লালমোহনবাবুর অবিশ্যি আজকে সব কিছুই ভালো লাগছে। খালি খালি বললেন, 'বিলেত যাবার আশ মিটে গেল মশাই। বাসে লোক ঝুলছে না সেটা লক্ষ করেছেন? ওঃ—কী সিভিক সেন্স এঁদের!'

থানা পৌঁছতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। এখন সোয়া নটা। হাতে সময় আছে, তাই আমরা তিনজন আর ড্রাইভার স্বরূপলাল একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এলাচ দেওয়া চা খেয়ে নিলাম।

থানা ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আমরা ওয়েস্টার্ন ঘাটস-এর পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি। ট্রেনলাইন আর এখন আমাদের পাশে নেই; সেটা থানার পরেই উত্তরে ঘুরে চলে গেছে কল্যাণ। কল্যাণ থেকে আবার দক্ষিণে ঘুরে সেটা যাথেরান হয়ে যাবে পুণা, মাঝপথে পড়বে আমাদের লেভেল ক্রসিং।

পথে লালমোহনবাবুর গলায় কমলালেবুর বিচি আটকে গিয়ে বিষম লাগা ছাড়া আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফেলুদার মনের অবস্থা কী সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। ও গম্ভীর মানেই যে চিন্তিত, সেটা ফেলুদার বেলায় খাটে না এ আমি আগেও দেখেছি।

সাড়ে বারোটা নাগাদ খাণ্ডালা ছাড়িয়ে মাইলখানেক যেতেই সামনে দূরে রাস্তার ধারে একটা জায়গায় মনে হল যেন মেলা বসেছে। তারপর মনে হল, মেলায় এত গাড়ি থাকবে কেন? আরো কাছে যেতে গাড়ি আর মানুষ ছাড়া আরেকটা জিনিস চোখে পড়ল, সে হচ্ছে ঘোড়া। এবারে বুঝলাম ভিড়টা আসলে হচ্ছে জেট বাহাদুরের শুটিং-এর দল। সব মিলিয়ে অন্তত শ'খানেক লোক, বাক্সপ্যাঁটরা ক্যামেরা আলো রিফ্লেক্টর সতরঞ্চি—সে এক এলাহি ব্যাপার।

আমাদের গাড়িটা একটা অ্যাম্বাসাডর আর একটা বাসের মাঝখানে একটা

ফাঁক পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে থেমে গেল। আমরা নামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলক-বাবু এগিয়ে এলেন—তাঁর মাথায় একটা সাদা ক্যাপ আর গলায় ঝোলানো একটা দূরবীনের মতো যন্ত্র।

'গুড মর্নিং। সব ঠিক হ্যায়?'

আমরা তিনজনেই মাথা নেড়ে ইয়েস জানিয়ে দিলাম।

'শুনুন—মিস্টার গোরের ইনস্ট্রাকশন—উনি মাথেরানে আছেন যেখান থেকে ট্রেন আসছে। রেল কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা আছে; কিছু পেমেন্টও আছে বোধহয়। উনি ট্রেনের সঙ্গেই চলে আসবেন, অথবা মোটরে করে আসবেন। আপনারা ট্রেনটা এলেই খবর পেয়ে যাবেন। মোট কথা, উনি আসুন বা না আসুন, আপনারা ফার্স্ট ক্লাসে উঠে পড়বেন। অল ক্লিয়ার?'

'অল ক্লিয়ার,' বলল ফেলুদা।

বোম্বাইয়ের ফিল্ম লাইনে যে এত বাঙালী কাজ করে এটা আমার ধারণা ছিল না। তার মধ্যে কেউ কেউ যে ফেলুদাকে চিনে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য কী? ক্যামেরাম্যান দাশু ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হতেই তার চোখ কুঁচকে গেল।

'মিত্তির? আপনি কি ডিটেক—?'

'ধরেছেন ঠিক, কিন্তু চেপে রাখুন,' বলল ফেলুদা।

'কেন মশাই? আপনি ত আমাদের প্রাইড। সেবারে এলোরার মূর্তি চুরির ব্যাপারটা—'

ফেলুদা আবার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ভদ্রলোককে থামাল।

দাশুবাবু এবার গলা নামিয়ে বললেন, 'আবার কোনো তদন্ত-টদন্ত করছেন নাকি এখানে?'

'আজ্ঞে না', ফেলুদা বলল, 'স্রেফ বেড়াতে এসেছি আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে।'

দাশু ঘোষ একুশ বছর বম্বেতে থেকেও নিয়মিত বাঙলা উপন্যাস পড়েন, এমন কি জটায়ুর বইও পড়েছেন দুতিনটে। এ দৃশ্যে অবিশ্যি উনি ছাড়া আরো দুজন ক্যামেরাম্যান কাজ করছেন; তাঁরা অবাঙালী। পুলকবাবুর চারজন অ্যাসিসটান্টের দুজন বাঙালী। যাঁরা অ্যাকটিং করবেন তাঁদের মধ্যে অবিশ্যি কেউই বাঙালী নেই। অর্জুন মেরহোত্রা ছাড়া আজ আছেন ভিলেনবেশী মিকি। শুধু মিকি; পদবী ব্যবহার করেন না। বোম্বাইয়ের উঠতি ভিলেনের মধ্যে টপ, একসঙ্গে সাঁইত্রিশটা ছবি সই করেছেন, যদিও তার মধ্যে ঊনত্রিশটার গপ্পো চেঞ্জ করে ফাইটের সংখ্যা কমাতে হচ্ছে। ভাগ্যে জেট বাহাদুর-এ মাত্র চারটে ফাইট, না হলে পুলকবাবু আর মিস্টার গোরেকেও মাথা চুলকোতে হত।

এসব খবর আমাদের দিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার সুদর্শন দাস। ইনি

উড়িষ্যার লোক, অনেকদিন বম্বেতে রয়েছেন, তবে এ ছবিটা হয়ে গেলেই নাকি কটক ফিরে গিয়ে নিজে ওড়িয়া ছবি পরিচালনা করবেন।

ফেলুদা ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে আরেকটা জটলার দিকে। সেখানে ডাকাতের দলকে মেক-আপ করে পোশাক পরানো হচ্ছে। একজন ডাকাতের সঙ্গে ফেলুদাকে দিব্যি বাৎচিৎ করতে দেখে একটু অবাক হয়েই এগিয়ে গেলাম। তারপর ডাকাতের গলা শুনে বুঝলাম—ওমা, এ যে কুং-ফু এক্সপার্ট ভিকটর পেরুমল। হিরোর যমজ ভাইয়ের মেক-আপ করা হয়েছে তাকে। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে চলন্ত ট্রেনের ছাতে পড়তে হবে, তারপর ছ'টা কামরার ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে একেবারে এঞ্জিনে পৌঁছে ভিলেন-বেশী মিকিকে ঘায়েল করতে হবে। তারপর হিরো আর তার বিশ-বছর-না-দেখা ডাকাত-বনে-যাওয়া ভাইয়ের মধ্যে হাই-ভোল্টেজ সংঘর্ষ।

লালমোহনবাবু এই এলাহি ব্যাপার দেখে কেমন জানি চুপ মেরে গেছেন, যদিও ভেবে দেখলে তাঁর ফুর্তি হবার কথা, কারণ তাঁর গল্পকে ঘিরেই এত

হৈ-হল্লা। বললেন, 'একটা গপ্প লিখে এতগুলো লোককে এত হ্যাঙ্গাম এত পরিশ্রম এত খরচের মধ্যে ফেলেছি এটা ভাবতে একটা পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছে তপেশ। এক এক সময় নিজেকে রীতিমত শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার গিলটি মনে হচ্ছে; আবার সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে যে এরা লেখককে কোনো সম্মান দেয় না। ক'টা লোক এখানে জটায়ুর নাম জানে সেটা বলতে পার?'

আমি সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, 'ছবি যদি হিট হয় তাহলে নিশ্চয়ই জানবে।'

'আশা করি!'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লালমোহনবাবু।

যেসব ডাকাতের মেক-আপ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলো একটা বিশাল বট-গাছের তলায় জড়ো হয়ে ছিল। গুণে দেখলাম সব শুদ্ধ ন'টা।

মিনিট খানেকের মধ্যেই নীল কাচ তোলা একটা প্রকাণ্ড সাদা লিংকন কনভারটিবল গাড়িতে হিরো আর ভিলেন এসে হাজির হল। হিরোইনের দরকার লাগবে না, কারণ ট্রেনের কামরায় বন্দী অবস্থায় তার শটগুলো নাকি স্টুডিওতে তোলা হবে। সেটা এক হিসেবে ভালো। এই দুই পুরুষ তারকা গাড়ি থেকে নামতেই চারিদিকে যা শোরগোল পড়ে গেল, হিরোইন থাকলে না জানি কী হত।

সুদর্শনবাবু চা এনে দিয়েছিলেন, আমরা খাওয়া শেষ করে পেয়ালা ফেরত দিচ্ছি এমন সময় বাজখাই গলায় লাউডস্পীকারের হাঁক শোনা গেল—'ট্রেন কামিং! ট্রেন আতি হ্যায়! এভরিবডি রেডি!'

॥ ১০ ॥

ঝক্‌ঝক্ শব্দের সঙ্গে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আটটা বোগি সমেত পুরোন টাইপের এঞ্জিনটা যখন লেভেল ক্রসিং-এর কাছে এসে দাঁড়াল তখন ঘড়িতে ঠিক একটা বাজতে পাঁচ মিনিট। ফার্স্ট ক্লাস কামরা যে মাত্র একটাই, আর সেটাও যে পুরোন ধাঁচের, সেটা দূর থেকেই বুঝতে পারছি। অন্য কামরাগুলোতে মাথেরান থেকেই প্যাসেঞ্জার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী সবরকমই আছে। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলকবাবুর ব্যস্ততা একেবারে সপ্তমে চড়ে গেছে। তিনি একবার এ কামেরা থেকে ও কামেরায় ছুটে যাচ্ছেন, একবার হিরো থেকে ভিলেন, একবার এ-অ্যাসিসট্যান্ট থেকে ও-অ্যাসিসট্যান্ট। লালমোহনবাবু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, 'না মশাই, শুধু টাকা দিয়ে ছবি হয় না এটা বোঝা যাচ্ছে।'

হিরোর গাড়ি রেডি, কালো চশমা পরে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে অর্জুন মেরহোত্রা, পাশে তার নিজের মেক-আপম্যান আর দুজন ছোকরা টাইপের লোক, বোধহয় চামচা-টামচা হবে। অর্জুনের সামনে একটা হুডখোলা জীপে তেপায়া স্ট্যাণ্ডের উপর কামেরাও রেডি। ভিকটর সমেত ডাকাতের দল ঘোড়ার পিঠে আগেই এগিয়ে গেছে। তারা চলন্ত ট্রেন থেকে সিগন্যাল পেলে একটা বিশেষ পাহাড়ের বিশেষ জায়গা থেকে নেমে এসে ট্রেনের পাশে পাশে দৌড় আরম্ভ করবে। ভিলেন মিকিকে দেখলাম পুলকবাবুর একজন সহকারীর সঙ্গে এঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গেল।

আমাদের কী করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ মিঃ গোরের দেখা নেই। তিনি ট্রেনেই এসেছেন কিনা সেটাও বুঝতে পারছি না।

ভিড় পাতলা হয়ে গেছে অথচ আমাদের দিকে কেউ আসছে না দেখে লালমোহনবাবুর উসখুসুনি আরম্ভ হয়ে গেল। বললেন, 'ও ফেলুবাবু, এরা কি ভুলে গেল নাকি আমাদের?'

ফেলুদা বলল, 'একটিই মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা; কথা মতো সেটাতে গিয়েই ওঠা উচিত আমাদের। দেখি আরো দু মিনিট।'

দু মিনিটের আগেই, এঞ্জিন থেকে দুটো হুইসল শোনা গেল, আর সেই মুহূর্তেই সুদর্শন দাশের হাঁক।

'এই যে, আপনারা চলে আসুন, চলে আসুন!'

আমরা হাতে ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিলাম। সুদর্শনবাবু আমাদের ফার্স্ট ক্লাশের দরজা অবধি পেঁছে দিলেন। বললেন, 'আমি ত কিছুই জানতাম না। এইমাত্র একজন লোক এসে খবর দিলে—বললে গোরে সাহেব আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন। প্রথম শটের পর ট্রেন আবার এইখানেই ফিরে আসবে।'

কামরায় উঠে দেখি একটা বেঞ্চির উপর একটা বড় জলের ফ্লাস্ক, আর সাফারি রেস্টোর‍্যাণ্টের নাম লেখা চারটে সাদা কাগজের বাক্স। অর্থাৎ আমাদের লাঞ্চ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও ভদ্রলোকের যে আশ্চর্য খেয়াল সেটা স্বীকার করতেই হবে।

আরেকটা হুইসেলের সংগে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা তিনজনে জানালা দিয়ে বাইরের কাণ্ডকারখানা দেখবার জন্য তৈরি হলাম। একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা, তাই মনে একটা বেশ রোমাঞ্চ ভাব হচ্ছিল।

গাড়ি ক্রমশ স্পীড নিচ্ছে। ডান পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে, সেদিকের বেঞ্চিতেই বসেছি আমরা তিনজন। বাঁদিকে পাহাড় পড়বে, অর্থাৎ সেটা হল ডাকাতের দিক। ডান দিকটা হিরোর দিক।

আরো একটু স্পীড বাড়ার পর ডান দিকের রাস্তা দিয়ে প্রথমে ক্যামেরা সমেত জীপ, তারপর হিরোর গাড়ি আসতে দেখা গেল। এখন অবিশ্যি হিরো ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই। ক্যামেরার মুখটাও যে তার দিকেই ঘোরানো সেটা বুঝতে পারলাম। যিনি ছবি তুলছেন তিনি ছাড়া আরো তিনজন লোক রয়েছেন, তার মধ্যে একজন হল পুলকবাবুর অ্যাসিসট্যাণ্ট। সে হাতে একটা চোঙা নিয়ে তার ভিতর দিয়ে হিরোকে 'ডাইনে তাকাও' 'বাঁয়ে তাকাও' ইত্যাদি নির্দেশ দিচ্ছে।

আর দুটো ক্যামেরার একটার সংগে পুলকবাবু রয়েছেন—সেটা রয়েছে ট্রেনেরই একটা কামরার ভিতর। তৃতীয় ক্যামেরাটা রয়েছে ট্রেনের পিছন দিকের শেষ কামরার ছাতে।

হিরো তেমন জোরে গাড়ি চালাচ্ছে না দেখে আমার মনটা দমে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুদা বলল ওটা ছবিতে নাকি জোরেই মনে হবে, কারণ ক্যামেরার স্পীড কমিয়ে শটটা নেওয়া হচ্ছে।

'তাছাড়া যতটা আস্তে ভাবছিস ততটা আস্তে কিন্তু যাচ্ছে না গাড়িটা, কারণ আমাদের ট্রেনটাও ত চলেছে সংগে সংগে, আর চলেছে বেশ জোরেই।'

ঠিক কথা। এটা আমার খেয়াল হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যামেরা আর হিরোর গাড়ি আমাদের কামরা ছাড়িয়ে চলে গেল। পুরোন কামরা, তাই জানালায় গরাদ নেই; গলা বাড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'জেট বাহাদুর হবি

দেখতে গিয়ে যদি পর্দায় দেখিস তুই গলা বাড়িয়ে শুটিং দেখছিস, সেটা কি খুব ভালো হবে।'

লোভ সংবরণ করে উলটো দিকের জানালার ধারে বসব বলে সীট ছেড়ে দাঁড়িয়েছি, ঠিক সেই সময় নাকে গন্ধটা এল।

ফেলুদা দেখি আর আমার পাশে নেই। তার দৃষ্টি বাথরুমের দরজার দিকে, সে এক লাফে উল্টোদিকে চলে গেছে, তার ডান হাত কোটের পকেটে।

'বন্দুক বার করে লাভ নেই মিস্টার মিত্তির। অলরেডি একটি রিভলবার আপনার দিকে পয়েন্ট করা রয়েছে।'

এবার দেখলাম পাহাড়ের দিকের দরজাটা খুলে গেল। একজন লোক হাতে একটা রিভলভার নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইল। একে কি দেখেছি আগে? হ্যাঁ--এইত সেই লালসার্ট! কিন্তু আজ এর পোষাক অন্য, আর চেহারায় যে হিংস্র ভাব দেখছি সেটা সেদিন এয়ার পোর্টে দেখিনি। আজ এই অবস্থায় দেখে বুঝেছি লোকটা একেবারে নিখাদ খুনে। তার হাতের রিভলভারটা তাগ করা রয়েছে সোজা ফেলুদার দিকে।

এবার বাথরুমের দরজাটা অল্প ফাঁক অবস্থা থেকে পুরো খুলে গেল, আর সেই সঙ্গে কামরাটা গুলবাহারের গন্ধে ভরে গেল।

'সান...সান...'

লালমোহনবাবুর শরীর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে।

'সান্যালই বটে।' বললেন আগন্তুক, 'আর আপনার সঙ্গেই আমার আসল দরকার, মিঃ গাঙ্গুলী। বইয়ের প্যাকেটটা নিশ্চয়ই ফেলে রেখে আসেননি। ব্যাগটা খুলুন, খুলে বার করে দিন। না-দিলে কী ফল হবে সেটা আর নাই বললাম।'

'প্যা-পু-প্যাকেট...'

'কী প্যাকেটের কথা বলছি বুঝেছেন নিশ্চয়ই। আপনারই বই আপনার হাতে নিশ্চয়ই তুলে দিয়ে আসিনি সেদিন এয়ারপোর্টে। বার করুন, বার করুন!'

'আপনি ভুল করছেন। প্যাকেট ও'র কাছে নেই, আমার কাছে।'

ট্রেনের শব্দের জন্য সকলকেই চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, কিন্তু ফেলুদার গম্ভীর গলা চাপা অবস্থাতেই ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে সান্যালের কানে পৌঁছেছে, কারণ চশমার পিছনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'লাইফ ডিভাইনের এতগুলো পাতা নষ্ট করে আপনার ঐশ্বর্য কিছু বাড়ল কি?—ফেলুদার গলার স্বর এখনো ধীর, কথাগুলো মাপা।

'নিকুচি', গুণ্ডাটার দিকে আড় দৃষ্টি দিয়ে খসখসে গলায় বললেন সান্যাল,

'ইয়ে আদমি কোই ভি গড়বড় করনেসে ইনকো খতম কর না...হাত তুলে রাখুন, মিস্টার মিত্তির।'

'আপনার ফুর্তিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি?' ফেলুদা বলল। 'আপনি যে জিনিসটা চাইছেন সেটা পেলেই ত আর আমাদের ছেড়ে দেবেন না। খতম আমাদের এমনিতেই করবেন। কিন্তু ট্রেন থামলে পর আপনার কী দশা হবে সেটা ভেবে দেখেছেন?'

'ভেরি ইজি,' দাঁত বের করে বিশ্রী হেসে বললেন মিঃ সান্যাল, 'আমাকে আর কে চেনে বলুন! এত প্যাসেঞ্জার রয়েছে ট্রেনে, তার মধ্যে মিশে যেতে পারব না? আপনাদের লাশ পড়ে থাকবে, আমি বাইরে বেরিয়ে অন্য কামরায় চলে যাব। ভেরি ইজি, ইজন্‌ট ইট?'

ফেলুদার সঙ্গে অনেক রকম সংকটের মধ্যে পড়ে আমার সাহস বেড়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একটা কারণে এই মুহূর্তে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বার বার আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কারণ আর কিছুই না—ওই নিষ্পেষ। এরকম একটা নিষ্ঠুর খুনে চেহারা গল্পেই পড়া যায়। কামরার বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ের ফিনফিনে ফুলকারি করা শার্টটা খোলা জানলা দিয়ে আসা হাওয়াতে ফুরফুর করছে, ডান হাতটা ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুললেও রিভলভারটা ঠিকই ফেলুদার দিকে তাগ করা রয়েছে।

সান্যাল এক পা এক পা করে এগিয়ে এলেন। নাক জ্বলে যাচ্ছে সেন্টের গন্ধে। সান্যালের দৃষ্টি ফেলুদার ব্যাগের দিকে। এয়ার ইণ্ডিয়ার ব্যাগ, ফেলুদার সামনেই সিটের উপর রাখা। লালমোহনবাবুর কী অবস্থা জানি না, কারণ তিনি এখন আমার পিছনে। ট্রেনের আওয়াজের মধ্যেও ওঁর হাঁপানির টানের মতো নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ট্রেন ছুটে চলেছে। তার মানে শুটিংও হয়ে চলেছে নিশ্চয়ই। মিঃ গোরে কী সাংঘাতিকভাবে আমাদের ডোবালেন সেটা উনি জানেন কি?

সান্যাল সীটে বসে বাক্সটার ক্যাচ টিপলেন। ঢাকনা খুলল না। বাক্সে চাবি লাগানো।

'চাবি কোথায়? এটার চাবি কোথায়?'

মিঃ সান্যালের সমস্ত মুখ অসহিষ্ণু রাগে কুঁচকে গেল।—'কোথায় চাবি!'

'পকেটে,' শান্তভাবে জবাব দিল ফেলুদা।

'কোন্‌ পকেটে?'

'ডান।'

আমি জানি ওই পকেটেই ফেলুদার রিভলভার।

সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন। রাগে ফুলছেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত যেন

কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপর—

'তুমি এসো!'—আমার দিকে ফিরে গর্জিয়ে উঠলেন মিঃ সান্যাল।

ফেলুদাও আমার দিকে চাইল। ইঙ্গিতে বুঝলাম সে আমাকে সান্যালের আদেশ পালন করতে বলছে।

যখন ফেলুদার দিকে এগোচ্ছি, তখন ট্রেনের শব্দ ছাড়া আরেকটা শব্দ কানে এল। ঘোড়ার খুরের শব্দ। এর মধ্যে কখন যে বাঁদিকে পাহাড় এসে গেছে তা খেয়ালই করিনি। ফেলুদার পকেটে যখন হাত ঢোকাচ্ছি তখন দেখলাম

পাহাড়ের গা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ডাকাতের দল নামছে।

রিভলভারের পাশে হাতড়াতেই চাবি ঠেকল হাতে।

'দিয়ে দে।'

আমি চাবি দিয়ে দিলাম মিঃ সান্যালকে। ফেলুদার হাত দুটো এখনো মাথার উপর।

সান্যাল বাক্সের তালায় চাবি লাগিয়ে ঘোরালেন। বাক্স খুলে গেল। নাইফ

ডিভাইন উপরেই রাখা। বাক্স থেকে বই বেরিয়ে এল।

জানালার ঠিক বাইরেই ঘোড়ার খুর। একটা নয়—অনেকগুলো—তীরবেগে নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ছুটে চলেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

সান্যাল বইটা হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা উলটিয়ে যেখানে পৌঁছালেন তার পরে আর উলটোন যায় না। কারণ সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সাঁটা। এবার উলটোনোর বদলে সান্যাল একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। পাতার মাঝখানটা খামচিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে ফেললেন, আর ফেলতেই তার তলায় একটা চৌকো খোপ বেরিয়ে পড়ল। পাতাগুলোর মাঝখানটা একসঙ্গে কেটে ফেলে খোপটা তৈরি করা হয়েছে।

খোপের ভিতর দৃষ্টি দিতেই সান্যালের মুখের অবস্থা দেখবার মতো হল। উনি ভিতরে কী আশা করেছিলেন জানি না, এখন বেরোল খান আষ্টেক সিগারেটের পোড়া টুকরো, ডজন খানেক পোড়া দেশলাই আর বেশ খানিকটা সিগারেটের ছাই।

'কিছু মনে করবেন না,' বলল ফেলুদা, 'ওটাকে ছাইদান হিসাবে ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারলাম না।'

এবারে সান্যাল এত জোরে চাঁচালেন যে মনে হল সমস্ত ট্রেন ওর কথা শুনে ফেলবে।

'বেয়াদবির আর জায়গা পাওনি? ভেতরের আসল জিনিস কোথায়?'

'কী জিনিসের কথা বলছেন আপনি?'

'স্কাউন্ড্রেল!—তুমি জান না কিসের কথা বলছি?'

'নিশ্চয়ই জানি, তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই!'

'কোথায় সে জিনিস?—আবার গর্জিয়ে উঠলেন মিঃ সান্যাল।

'পকেটে।'

'কোন্ পকেটে?'

'বাঁ পকেটে।'

ডাকাতের দল এখন জানালার ঠিক বাইরে, কারণ পাহাড় আরো কাছে চলে এসেছে। ধুলো এসে ঢুকছে আমাদের কামরায়।

ইউ দেয়ার!'

আমি জানি আমার উপর আবার হুকুম হবে।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কি—যাও, হাত ঢোকাও।'

আবার আদেশ মানতে হল।

এবার পকেট থেকে যে জিনিস বেরোল তেমন জিনিস আমি কোনোদিন হাতে ধরিনি। হীরে আর মুক্তো দিয়ে গাঁথা এই আশ্চর্য হার রাজা-বাদশাদের

হাতেই মানায়।

'দাও ওটা আমাকে।'

মিঃ সান্যালের চোখ জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু এবার রাগে নয়, উল্লাসে, লোভে।

আমার হাত সান্যালের দিকে এগিয়ে গেল। ফেলুদার হাত মাথার উপর তোলা। লালমোহনবাবুর মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ বেরোচ্ছে। ডাকাতের দল—

দড়াম্‌!

একটা ভারি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামরাটা যেন একটু কেঁপে উঠল, আর তার পরেই দেখলাম নিম্বো কামরার মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কারণ একজোড়া পা জানালা দিয়ে ঢুকে সটান সজোরে লাথি মেরেছে তার গায়ে! ফলে নিম্বোর হাতের রিভলভার ছুটে গিয়ে সিলিং-এর বাতির কাচ চুরমার করে দিল, আর সেই সঙ্গে ফেলুদারও হাতে বিদ্যুদ্বেগে চলে এল তার নিজের রিভলভার।

এবারে পাহাড়ের দিকের দরজাটা আবার খুলে গেল, আর সেই দরজা দিয়ে ডাকাতের বেশে যিনি ঢুকলেন তাকে আমরা তিনজনেই খুব ভালো করে চিনি।

'থ্যাঙ্ক ইউ, ভিকটর,' বলল ফেলুদা।

॥ ১১ ॥

মগনলাল সীটের উপর বসে পড়েছেন। এবার কাঁপুনিটা রাগের নয়, ভয়ের, কারণ তিনি জানেন তিনি জব্দ, তাঁর আর পালাবার পথ নেই।

এদিকে শুটিং-এ গণ্ডগোল বুঝে কেউ নিশ্চয়ই চেন টেনে দিয়েছে, কারণ ট্রেনটা যেভাবে থামল সেটা চেন টানলেই হয়।

থামার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শোরগোল শুনতে পেলাম। একই লোকের নাম ধরে অনেক চীৎকার করছে।

'ভিকটর! ভিকটর! কোথায় গেল, ভিকটর?'

পুলকবাবুর গলা। যত গণ্ডগোল ও ভিকটরকে নিয়েই, কারণ তার লাফিয়ে পড়ার কথা ছাতে, আর সে কিনা সোজা এসে ঢুকেছে আমাদের কামরায়।

ফেলুদা দরজা খুলে মুখ বার করে পুলকবাবুকে ডাকলেন।

'এই যে মশাই, এদিকে।'

ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কামরায় উঠে এলেন। দেখে মনে হল তাঁর শেষ অবস্থা, কারণ শুনেছি এই ধরনের একটা শটে গণ্ডগোল হওয়া মানে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা জলে যাওয়া।

'ব্যাপার কী, ভিকটর? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'আপনার ছবিতে জেট বাহাদুর আখ্যা একমাত্র ভিকটর পেরুমলই পেতে পারে পুলকবাবু।'

'তার মানে?' পুলকবাবু অবাক হয়ে দেখলেন ফেলুদার দিকে। তার ফ্যালফ্যালে ভাবটার মধ্যে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্তি মেশানো রয়েছে।

'আর স্মাগলারের পার্টটা পরমেশ কাপুরকে না দিয়ে আপনার এঁকে দেওয়া উচিত ছিল।'

'কী সব উলটোপালটা বকছেন? ইনি কে?' পুলকবাবু মিঃ সান্যালের দিকে চেয়ে জিগেস করলেন।

ইতিমধ্যে ডানদিকের রাস্তায় দুটো নতুন গাড়ির আবির্ভাব হয়েছে—একটা পুলিশ জীপ আর একটা পুলিশ ভ্যান। জীপটা আমাদের কামরার পাশেই এসে থামল। তার থেকে নামলেন ইনস্পেকটর পটবর্ধন।

এইবার পুলকবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা মিঃ সান্যালের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই টানে তাঁর দাড়ি আর গোঁফ, আর আরো দুই টানে তাঁর পরচুলা আর

চশমাটা খুলে ফেলে দিয়ে বলল—

'আপনার গা থেকে গুলবাহারের গন্ধটাও টেনে খুলে ফেলতে পারলে খুশি হতাম মিস্টার গোরে, কিন্তু ওই একটি ব্যাপারে ফেলু মিত্তিরও অপারগ।'

* * *

'প্রোডিউসার মিসায় ধরা পড়লে ছবি বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা আপনাকে কে বললে লালুদা?'

প্রশ্নটা করলেন পুলকবাবু। লালমোহনবাবু কিছুই বলেননি, কেবল ঘাড় গোঁজ করে গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন; যদিও এটা ঠিক যে গম্ভীর হবার একটা কারণ হল জেট বাহাদুরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা।

'জেট বাহাদুরকে কেউ রুখতে পারবে না লালুদা,' বললেন পুলকবাবু। 'গোরে চুলোয় যাক, গোল্লায় যাক, হাজতে যাক, যেখানে খুশি যাক্—প্রোডিউসার ত আর বম্বেতে একটা নয়। চুনি পাণ্ড্যালি ত এক বছর থেকে আমার পেছনে লেগে আছে—দেখবেন আপনারা থাকতে থাকতেই নতুন ব্যানারে আবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।'

আজকের শুটিং অবিশ্যি সেই দেড়টায় বন্ধ হয়ে গেছে। গোরে আর নিম্বোর হাতে হাতকড়া পড়েছে, নানাসাহেবের নওলাখা হার পুলিশের জিম্মায় চলে গেছে। আজ যে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা ফেলুদা আগেই বুঝেছিল, আর তাই ও সকালে সিগারেট কিনতে যাবার নাম করে ইনস্পেক্টর পটবর্ধনের সঙ্গে দেখা করে পুলিশের ব্যবস্থা করে এসেছিল। গোরে নাকি এককালে একটানা বারো বছর কলকাতায় ছিল, শুধু ডন বস্কো নয়, সেন্ট জেভিয়ার্সেও পড়েছে—তাই বাংলাটা সে ভালোই জানে—যদিও বম্বেতে সে সচরাচর হিন্দি, মারাঠী আর ইংরেজিটাই ব্যবহার করে।

আমরা বসে আছি খাণ্ডালা ডাকবাংলোর বারান্দায়। চমৎকার পাহাড়ে জায়গা, বাতাসে রীতিমত ঠাণ্ডার আমেজ। বম্বের অনেকেই নাকি খণ্ডালায় চেঞ্জে আসে। সাফারির মাটন দো পেঁয়াজি আর নান খাওয়া হয়ে গেছে আগেই, এখন বিকেল সাড়ে চারটে, তাই চা আর পকৌড়া খাচ্ছে সকলে।

আমাদের টেবিলে আমরা তিনজনই বসেছি। পুলকবাবু ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, এইমাত্র উঠে মেরহোত্রার টেবিলে চলে গেলেন। অর্জুন মেরহোত্রার একটু যেন মনমরা ভাব; তার একটা কারণ হয়ত এই যে, আজকের হিরো হচ্ছে নিঃসন্দেহে প্রদোষ মিত্তির। ইতিমধ্যে অনেকেই ফেলুদার সই নিয়ে গেছে, এমনকি ভিলেন মিকি পর্যন্ত।

সেকেন্ড হিরো যে ভিকটর পেরুমল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ফেলুদা ভিকটরকে আগে থেকেই তালিম দিয়ে রেখেছিল। বলেছিল—ঘোড়া নিয়ে যখন ট্রেনের ধারে পৌঁছাবে, তখন ফার্স্ট ক্লাস কামরার দিকে একটু চোখ রেখো। গোলমাল দেখলে সোজা দরজা দিয়ে ঢুকে এসো, ফেলুদার দু'হাত মাথার উপর তোলা দেখেই ভিকটর ধরে ফেলেছে গণ্ডগোলের ব্যাপার। আশ্চর্য, এত বড় একটা কাজ করেও তার কোন তাপ-উত্তাপ নেই। সে এরই মধ্যে আবার বাংলোর সামনের মাঠে তার লোকজন নিয়ে ওয়ান-টু-থ্রী করে কুং-ফু অভ্যাস শুরু করে দিয়েছে।

'কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি—'

লালমোহনবাবু এই এতক্ষণে প্রথম মুখ খুললেন। ফেলুদা ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আপনি এখনও সেই তিমিরে সেই তিমিরে—তাই ত?'

জটায়ু একটা গোবেচারা হাসি হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোঝালেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনার মনের অন্ধকার দূর করা খুব কঠিন নয়। তবে তার আগে গোরে লোকটাকে একটু বুঝতে হবে, তাহলেই তার কার্যকলাপটা বোধগম্য হবে।

'প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে সে আসল স্মাগলার, কিন্তু ভেক ধরেছে সম্ভ্রান্ত ফিল্ম প্রোডিউসারের। আপনার গল্প থেকে সে ছবি করছে। গল্পে আপনি শিবাজী কাস্‌লে স্মাগলাররা থাকে বলে লিখেছেন। স্বভাবতই গোরে তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মনে প্রশ্ন জাগে—আপনি শিবাজী কাস্‌ল সম্বন্ধে কদ্দুর কী জানেন, কারণ সে নিজে স্মাগলার আর তার বাস-স্থানও শিবাজী কাস্‌ল। এইটে জানার জন্য সে সান্যাল সেজে আপনার বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করে সে বোঝে যে ভয়ের কোনো কারণ নেই. আপনি অত্যন্ত নিরীহ নির্লিপ্ত মানুষ এবং শিবাজী কাস্‌ল-এর ব্যাপারটা আপনার কাছে একেবারেই কাল্পনিক। সেই সময় তার মাথায় আসে আপনার হাত দিয়ে বইয়ের প্যাকেটে নওলাখা হার পাচার করার আই-ডিয়া। মালটা গোরে পাঠাচ্ছিল তারই এক গ্যাঙের লোককে—যে খুব সম্ভবত থাকে শিবাজী কাস্‌লেরই সতের নম্বর তলার দু'নম্বর ফ্ল্যাটে। আপনি যদি ধরা পড়েন, তাহলে দোষ দেবেন সান্যালকে, গোরেকে নয়—তাই ত? অর্থাৎ সান্যালকে খাড়া করে গোরে নিজে থাকছে সেফসাইডে।

এদিকে হয়ে গেল গণ্ডগোল। আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকার হারের বদলে চালান করে বসলেন আপনারই পাঁচটাকা দামের বই। সেই বইয়ের প্যাকেট নিয়ে লালসার্ট অর্থাৎ নিম্বো শিবাজী কাস্‌লের লিফ্‌ট দিয়ে উঠছিল সতের

তলায় ; সেই সময় গোরেরই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাঙের লোক নিম্লোকে আক্রমণ করে প্যাকেট আদায় করার জন্য। নিম্লো তাকে খুন করে প্যাকেট যথাস্থানে চালান দিয়ে গা ঢাকা দেয়। এদিকে প্যাকেটে যে হার নেই সে খবর পেতেই গোরেকে চলে আসতে হল। সে ত বুঝেছে কী হয়েছে। তার এখন দুটো কাজ করতে হবে। এক, হার ফিরে পেতে হবে ; দুই, আমাদের খতম করতে হবে। তার একমাত্র ভরসা যে আমরা লাইফ ডিভাইনের রহস্য ভেদ করে হারটা পুলিশের হাতে জমা দিইনি। গোরে এসেই বুঝল যে সান্যালের পুনরাবির্ভাবের প্রয়োজন হবে। সান্যালই যখন মালটা পাঠিয়েছিল, তখন সান্যালকেই সেটা পুনরুদ্ধার করতে হবে, তাহলে গোরের নিজের উপর কোন সন্দেহ পড়বে না।'

'কিন্তু গুলবাহার--'

'বলছি, বলছি—সব বলছি। গুলবাহার সেন্টের ব্যবহারটা গোরের শয়তানি বুদ্ধির আশ্চর্য উদাহরণ। এটার জন্য সে কলকাতা থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। সান্যাল মানেই গুলবাহার, আর গুলবাহার মানেই সান্যাল—এ ধারণাটা অন্তত আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল—তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ—তা একরকম হয়েছিল বৈকি।'

'বেশ। এবার মনে করে দেখুন—সেদিন গোরে আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—ভাবটা যেন আপনার জন্যে টাকা আনতে গিয়েছে—কেমন?'

'ঠিক।'

'সেই ফাঁকে লিফ্‌টে ঢুকে দু'ফোঁটা গুলবাহার সেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া কি খুব কঠিন ব্যাপার? উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সব ক'টা তলা শুঁকেও যখন কোনো সেন্টের গন্ধ পেলাম না, তখনই বুঝলাম যে গন্ধটা রয়েছে শুধু লিফ্‌টের ভিতর। অর্থাৎ সেটা হচ্ছে মানুষের গা থেকে নয়, এসেছে সেন্টের শিশি থেকে। ঠিক সেইভাবেই লোক লাগিয়ে লোটাস সিনেমার সামনে গাড়ির জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কয়েক ফোঁটা সেন্ট গাড়ির সিটে ছিটিয়ে দেওয়াও অতি সহজ ব্যাপার।'

ফেলুদা বুঝিয়ে দিলে সত্যিই সহজ। লালমোহনবাবুও যে ব্যাপারটা বুঝেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু তাঁর মুখে হাসি ফুটছে না দেখে বেশ অবাক লাগল। সেটা যে শেষ পর্যন্ত শুক্লবাবুর একটা কথায় ফুটবে সেটা কী করে জানব?

চা শেষ করে যখন শহরে ফেরার তোড়জোড় চলছে, সূর্যটা পাহাড়ের পিছনে নেমে যাওয়ায় হঠাৎ ঠান্ডা বেড়ে মাঝে মাঝে বেশ কাঁপুনি লাগিয়ে

দিচ্ছে, তখন দেখি পুলকবাবু আমাদের দিকে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছেন।

'লালুদা, জেট বাহাদুরের বিজ্ঞাপন পড়ছে শুক্রবার—কিন্তু তার আগে একটা ব্যাপার জেনে নেওয়া দরকার।'

'কী ব্যাপার ভাই?'

'আপনার কোন নামটা যাবে—আসল না নকল?'

'নকলটাই আসল ভাই,' একগাল হেসে বললেন লালমোহনবাবু, 'বানান হবে জে এ টি এ ওয়াই ইউ।'

॥ শেষ ॥

সত্যজিৎ রায়
এণ্ড কোং
গোঁসাইপুর সরগরম

গোসাঁইপুর সরগরম

॥ ১ ॥

'গোসাঁইপুরে আপনার চেনা একজন কে থাকেন না?' রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলীকে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

আমরা, থ্রী মাস্কেটিয়ারস্, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে গঙ্গার ধারে পৌঁছে গেছি। প্রিনসেপ ঘাটের কাছে যে গোম্বুজ-ওয়ালা ঘরটা আছে সেটার মধ্যে বসে চানাচুর আর গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি। সময় হচ্ছে বিকেল পাঁচটা, তারিখ অক্টোবরের তেরই। আমাদের সামনেই জলের মধ্যে একটা বয়া ভাসছে, সেটার ব্যবহার কী সেটা লালমোহনবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে ফেলুদা প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক বললেন, 'আছে বৈ কি। তুলসীবাবু। তুলসীচরণ দাশগুপ্ত। এথিনিয়ামে অঙ্ক আর জিয়োগ্রাফি পড়াতেন। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে থাকতেন, এখন রিটায়ার করে চলে গেছেন গোসাঁইপুরে। ওখানে পৈতৃক বাড়ি আছে। ভদ্রলোক ত কতবার আমাকে যাবার জন্য লিখেছেন। আমার বিশেষ ভক্ত, জানেন ত? নিজেও গল্প-টল্প লেখেন, ছোটদের জন্য। সন্দেশে গোটা দুই বেরিয়েছে।—কিন্তু হঠাৎ গোসাঁইপুর কেন?'

'ওখান থেকে একটা চিঠি এসেছে। লিখেছেন জীবনলাল মল্লিক। শ্যামলাল মল্লিক, তস্য পুত্র জীবনলাল। বংশ-পরিচয় তৃতীয় খণ্ড খুলে দেখলাম গোসাঁইপুরের জমিদার ছিলেন এই মল্লিকরা।'

ফেলুদা থামল। কারণ একটা জাহাজ প্রচণ্ড জোরে ভোঁ দিয়ে উঠেছে। আজই সকালে গোসাঁইপুরের চিঠিটা এসেছে সেটা জানি। যদিও তাতে কী লেখা ছিল জানি না। চিঠিটা পড়ে ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল সেটা লক্ষ্য করেছিলাম।

'কী লিখেছেন ভদ্রলোক?' লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন।

'লিখেছেন তাঁর পিতাকে নাকি কেহ বা কাহারা হত্যা করার সংকল্প করেছে। আমি গিয়ে যদি ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে পারি তাহলে উনি বিশেষ কৃতজ্ঞ বোধ করবেন, এবং আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করবেন।'

'চলুন না মশাই', বললেন লালমোহনবাবু। 'বেশ ত ঝাড়াঝাপটা এখন; আমার নতুন বই বেরিয়ে গেছে। আপনার হাতেও ইমিডিয়েট কিছু নেই, তাছাড়া দিল্লি-দিল্লি ত অনেক হল, এবার স্বাদবদলের জন্য পল্লীগ্রামটা মন্দ

কী? কাছেই সেপাইপুরটিতে শুনেছি বিরাট মেলা হয় এই সময়টাতেই। চলুন স্যার, বেরিয়ে পড়ি।'

'ওঁদের বাড়িতে নাকি থাকার অসুবিধে আছে, তাই মাইল তিনেক দূরে শ্রীপুরে কোন্ এক চেনা বাড়িতে আমার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। সাইকেল রিকশাতে যাতায়াত। আমার মনে হচ্ছিল গোসাঁইপুরেই থাকতে পারলে সুবিধে হত। তাই আপনার বন্ধুটির কথা জিজ্ঞেস করলাম।'

'আমার বন্ধু উইল বি ভ্যাম গ্ল্যাড। আর আপনি যাচ্ছেন শুনলে ত কথাই নেই। উনি আপনার দারুণ ভক্ত।'

'আর কার কার ভক্ত সেটা জেনে নিই।'

লালমোহনবাবু এই খোঁচা-দেওয়া প্রশ্নটাকেও সিরিয়াসলি নিয়ে বললেন, 'জগদীশ বোসের নাম করতে শুনেছি এককালে, বলতেন অত বড় মনীষী পৃথিবীতে নেই; আর গোবরবাবুর কাছে বোধহয় ছেলেবেলা কুস্তী শিখেছে; আর—'

'আর, এই যথেষ্ট।'

* * *

গোসাঁইপুর যেতে গেলে কাটোয়া জংশনে নেমে বাস ধরতে হয়। কাটোয়া থেকে সাত মাইল; তার মানে বড় জোর আধ ঘণ্টা। শ্যামলাল তসার পুত্র জীবনলালকে ফেলুদা লিখে দিয়েছিল আমরা আসছি বলে, আর বলেছিল গোসাঁইপুরেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। এদিকে তুলসীবাবু জটায়ুর চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দেন। শুধু যে খুশি হয়েছেন তা নয়, লিখেছেন 'গোসাঁইপুর সাহিত্য সংঘ' ফেলুদা আর লালমোহনবাবুকে একটা জয়েন্ট সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করতে চায়। লালমোহনবাবুর একেবারেই আপত্তি ছিল না, কিন্তু ফেলুদা কথাটা শুনেই চোখ রাঙিয়ে বলল, 'দেশে ক্রাইম বন্ধ হয়ে গেলে গোয়েন্দার হাঁড়ি চড়ে না। কী অবস্থায় কাজ করছি সেটা বুঝতে পারছেন? এতে আমার সংবর্ধনার কী আছে মশাই? আর বলে দিন যে আমার পরিচয়টা দয়া করে যেন গোপন রাখেন, নইলে তদন্তের বারোটা বেজে যাবে।'

লালমোহনবাবুকে বাধ্য হয়েই আদেশ পালন করতে হল। তবে এটাও লিখলেন যে সংবর্ধনা নিতে ওঁর নিজের কোনো বাধা নেই। এই অনুষ্ঠানের কথা ভেবেই বোধহয় উনি নীল সুতোর চিকনের কাজ করা একটা মলমলের পাঞ্জাবী সঙ্গে নিলেন।

তুলসীবাবু জানিয়ে রেখেছিলেন যে গোসাঁইপুর গ্রামে ঢোকবার মুখে যোগেশের মুদির দোকানে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। সেখান থেকে তাঁর বাড়ি দশ মিনিটের হাঁটা পথ।

কাটোয়া থেকে বাস ধরে গোসাঁইপুরে যাবার পথে একটা পালকি দেখে বেশ অবাক লাগল। ফেলুদা আর লালমোহনবাবুও দেখলাম ঘাড় ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখল পালকিটাকে। 'কোন্ সেঞ্চুরিতে এসে পড়লাম মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু, 'গোসাঁইপুরে বিজলি পৌঁছেচে ত? এতটা অজ পাড়াগাঁ বলে ত আমার ধারণা ছিল না।'

বাসের কন্ডাকটার যোগেশের দোকানের নাম জানে, তাকে বলা ছিল। ঠিক জায়গায় চেরা গলায় 'গোসাঁইপুর, গোসাঁইপুর!' বলে দুটো চীৎকার দিয়ে বাস থামিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। যে ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে হাসি মুখে এগিয়ে এলেন তিনি যে এককালে ইস্কুলমাস্টার ছিলেন সেটা আর বলে দিতে হয় না। ভদ্রলোকের হাতে তাপ্পি-মারা ছাতা, পায়ে ব্রাউন কেড্‌স জুতো, চোখে চশমা, পরনে হাফ পাঞ্জাবী আর খাটো করে পরা ধুতি, আর বগলে একটা মান্ধাতার আমলের পুরোন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন! ফেলুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভদ্রলোক হেসে চোখ টিপে বললেন, 'আপনার আদেশ পালন করিচি—কোনো চিন্তা নেই। আপনি হলেন টুরিস্ট, হোল লাইফ ক্যানাডায় কাটিয়েছেন, দেশে ফিরে পাড়াগাঁ দেখার শখ হয়েছে। ভাবলুম আপনি যদি তদন্তের ব্যাপারেই এসে থাকেন, তাহলে তল্লাসীর জন্য এখেনে-সেখেনে ঘাপটি মারতে হতে পারে, কাজেই সেফ সাইডে থাকা ভালো। টুরিস্টদের উগ্র কৌতূহল থাকে সেটা সকলেই জানে।'

'আপনার বাড়িতে ক্যানাডা সম্বন্ধে তথ্যওয়ালা বই আছে আশা করি?' ফেলুদা হেসে বলল।

'কোনো চিন্তা নেই,' আবার বললেন তুলসীবাবু। তারপর লালমোহন-বাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আর গাঙ্গুলী ভায়া, তোমাকে কিন্তু একটু ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে, তরশু অর্থাৎ শুক্রুরবার, আমাদের নিউ প্রাইমারি স্কুলে একটা ফাংশন অ্যারেঞ্জ করিচি। সুরেশ চাকলাদার উকীল পৌরোহিত্য করবেন। কিছু না—একটু নাচ গান, দুটো আবৃত্তি, দুটো ভাষণ এই আর কি। আমাদের পোস্টমাস্টার হরিহরের ছেলে বলদেব ভালো ছবি আঁকে, সে একটা মানচিত্র লিখছে। ভায়াটা অবিশ্যি, হে হে, আমার!'

'অলংকারের আবার বেশি বাড়াবাড়ি—' কাঁচা রাস্তায় কিসে জানি ঠোক্কর খাওয়াতে লালমোহনবাবুর কথা শেষ হল না। কিন্তু বাকিটা বুঝে নিয়েই তুলসীবাবু বললেন, 'তা এসব ব্যাপারে একটু ত বাড়াবাড়ি হবেই। আর

তোমার মতো সাকসেসফুল অথর আর কটা এসেছে বল এখেনে। লাস্ট এসিচিল পরীক্ষিত চ্যাটুজ্যে—তাও সিকস্টি সেভেনে।'

ফেলুদা বলল, 'আসবার পথে একটা পালকি দেখলাম। এদিকে এখনো পালকি ব্যবহার হয় নাকি?'

'শুধু পালকি?' তুলসীবাবু ছাতার বাঁটতে একটা বাছুরকে পথ থেকে সরিয়ে বললেন, 'আপনি বিগত যুগের কোন্ জিনিসটা চান বলুন। পাইক-

বরকন্দাজ? পাবেন। হুঁকোবরদার? পাবেন। টানা-পাখা? পাবেন। লম্প-পিদিম-পিলসুজ? পাবেন।—'

'কিন্তু এখানে ত ইলেকট্রিসিটি আছে দেখছি।'

'সব জায়গাতেই আছে, কেবল যেখানে সব চাইতে বেশি থাকার কথা সেই-খেনেই নেই।'

'কোথায় মশাই?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'মল্লিকদের বাড়ি।'

আমরা তিনজনেই অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম।

'মল্লিক মানে শ্যামলাল মল্লিক?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'ওই একটিই ত মল্লিক গোসাঁইপুরে। এখেনকার জমিদার ছিলেন ওঁরা। দুর্লভ মল্লিকের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। শ্যামলাল তাঁর ছেলে। জমিদারি উচ্ছেদ হবার পর কলকাতায় গিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবসা করে বিস্তর টাকা করেছিল। একদিন অন্ধকারে হাতড়ে ঘরের সুইচ জ্বালতে গেসল, সুইচ বোর্ডে একটা খোলা তার ছিল, তাতে হাত লেগে যায়। এ সি কারেন্ট মশাই, হাত আটকে গিয়ে হুলুস্থুলু ব্যাপার। হাসপাতালে ছিল বেশ কিছুদিন। বেরিয়ে এসে ব্যবসা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে গোসাঁইপুরে চলে আসে। এসেই ইলিকট্রিক কানেকশন কেটে দেয়। শুধু সে হলে না হয় তবু বোঝা যেত। সেই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সব কিছু বাতিল করে দিয়েছে। চুরুট ছেড়ে গড়গড়া ধরেছে; ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করে না; টুথব্রাসের বদলে দাঁতন। ইংরিজি বই যা ছিল বাড়িতে সব বেচে দিয়েছে, নিজের গাড়িটা বেচে দিয়েছে, তার জায়গায় পালকি হয়েছে। একটা পুরনো ভাঙ্গা পালকি বাড়িতেই ছিল, সেটাকে সারিয়ে নিয়েছে, তার জন্য চারটে বেহারা বহাল হয়েছে। বিলিতি ওষুধ যা ছিল সব নর্দমায় ফেলে দিয়েছে; এখন ওনলি কবরেজি। ফাঁকতালে তারিক কবরেজের কপাল ফিরে গেছে। আরো কত কী যে করেছে তার হিসেব নেই। এখেনে যখন এসেছেন তখন আলাপ হবে নিশ্চয়ই; তখন সব জানতে পারবেন।'

'আলাপ না হয়ে উপায় নেই,' বলল ফেলুদা। 'আমি এসেছি ওঁর ছেলের কাছ থেকে তলব পেয়ে।'

'হ্যাঁ, তা ছেলে ক'দিন হল এসেছে বটে। কিন্তু রহস্যটা কী?'

'শ্যামলাল মল্লিককে খুন করার চেষ্টা চলেছে বলে কোনো খবর আপনার কানে এসেছে কি?'

তুলসীবাবু কথাটা শুনে বেশ অবাক হলেন। 'কই তেমন কিছু শুনিনি। তা খুন করার কথাই যদি বলেন, তার জন্যে বাইরের লোকের দরকার কী? ঘরেই ত রয়েছে।'

'কিরকম?'

'ওই যিনি আপনাকে তলব দিয়েছেন, তার সঙ্গে বাপের ত বনিবনা নেই একদম। এখেনে এলেই ত ঝগড়াঝাটি হয়। অবিশ্যি আমি জীবনলালকে দোষ দিই না। ওরকম উদ্ভট খেয়াল যে বাপের, তাকে কোন্ ছেলে মানবে বলুন। জীবনলালকে ত এসে ওই বাড়িতেই থাকতে হয়। ওই ভূতের বাড়িতে মাথা ঠিক রাখা খুব মুশকিল।'

এক বিঘে জমির ওপর তুলসীবাবুর কোঠাবাড়ি, বড় জোর বয়স নাকি প্রায় একশো। বাপ-ঠাকুর্দা দুজনেই মোক্তারি করতেন, বাড়িটা ঠাকুর্দাই বানিয়েছেন। তুলসীবাবুর স্ত্রী কলকাতাতেই মারা গেছেন। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তার স্বামী লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করে আজিমগঞ্জে। দুই ছেলের একজনের সাইন পেণ্টিং-এর ব্যবসা আছে কলকাতায়, আরেকজন ওষুধের সেলসম্যান। এখানে তুলসীবাবু একাই থাকেন।—'তবে কী জানেন, পাড়া গাঁয়ে একা মনে হয় না। এখানে সবাই পরস্পরের খোঁজখবর রাখে, রোজই দেখা হয়, মেলামেশাটা অনেক বেশি।'

বিকেল চারটে নাগাত তুলসীবাবুর বাড়িতে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে প্রথমেই চায়ের আয়োজন হল। ফেলুদা সঙ্গে ভালো চা এনেছিল, কারণ ওই একটা ব্যাপারে ও সত্যিই খুঁতখুঁতে। অবিশ্যি সে চা সকলেই খেলো, আর তার সঙ্গে চিঁড়ে-নারকেল। জোগাড়-যন্ত্র করল তুলসীবাবুর চাকর গঙ্গা।

একতলার দুটো ঘরের একটাতে তুলসীবাবু নিজে থাকেন, দোতলার ছাতে একটা বড় ঘর, তাতে তিনটে তক্তপোষ পেতে আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ ঘর নাকি তুলসীবাবুর মেয়ে-জামাই তাদের ছেলেপুলে নিয়ে বছরে একবার করে এসে থেকে যায়।

চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, 'আমাকে কিন্তু একবার ওই বিজলীহীন বাড়িতে যেতে হবে জীবনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ওঁকে লিখে জানিয়েছি যে সাড়ে পাঁচটা নাগাত যাব।'

তুলসীবাবু বললেন, 'তা বেশ ত, আমি পৌঁছে দেবখন। মল্লিকবাড়ি পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। তবে গাঙ্গুলীভায়াকে আমি ছাড়ছি নে। আজ সন্ধেবেলা কিছু লোক আসবে আমার এখেনে। একটু সদালাপ করতে চান সাহিত্যিকের সঙ্গে। মিত্তির মশাই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন ত?'

'কেন বলুন ত?'

'একবার আত্মারামবাবুর ওখানে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই। উনি গোসাঁইপুরের একটি অ্যাট্রাকশন।'

'আত্মারামবাবু?'

'আসল নাম অবিশ্যি মৃগেন ভটচায। আত্মা-টাত্মা নিয়ে চর্চা করেন তাই এখানকার কয়েকজন নাম দিয়েছে আত্মারাম। আমি দিইনি কিন্তু! আমার ধারণা ভদ্রলোকের মধ্যে সত্যিই ইয়ে আছে।'

আত্মা নিয়ে চর্চাটা যে কী সেটা আর জিগ্যেস করা হল না। কারণ ঠিক তখনই আবার দেখতে পেলাম পাগলাটাকে। আমরা বাইরের দাওয়ায়

বসে চা-চিঁড়ে খাচ্ছিলাম, সামনেই রাস্তা, আর সেই রাস্তা দিয়েই পালকিটা আসছে। এবার দেখতে পেলাম যে ভিতরে একজন লোক বসে আছে।

'আরে, পালকিতে জীবনবাবু বলেই মনে হচ্ছে!' বললেন তুলসীবাবু। ভিতরের ভদ্রলোক পালকির দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি মারছিলেন। বেহারা-গুলো ঠিক গল্পে যেরকম পড়া যায় সেইভাবে হুম্‌হাম শব্দ করতে করতে এগোচ্ছিল, এমন সময় শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পালকিটাও থেমে গেল।

পালকি মাটিতে নামতেই তার ভিতর থেকে একজন বছর পঁয়ত্রিশের ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে বাইরে বেরিয়ে আরো খানিকটা কষ্ট করে উঠে

দাঁড়ালেন। সমস্ত ব্যাপারটা বেমানান, কারণ ভদ্রলোকের স্মার্ট কলকাতিয়া চেহারা, গায়ে বুশ শার্ট আর টেরিলিনের প্যান্ট।

'মিস্টার মিত্তির?' ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার নাম জীবনলাল মল্লিক।'

'বুঝেছি। ইনি আমার বন্ধু মিস্টার গাঙ্গুলী, আর এ হল আমার খুড়তুতো ভাই তাপস। তুলসীবাবুর সঙ্গে বোধহয় আপনার পরিচয় আছে!'

জীবনবাবু পালকিটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বাড়ি মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। আসবেন একবারটি? আপনাদের চা খাওয়া হয়েছে? একটু কথা ছিল।'

লালমোহনবাবু রয়ে গেলেন, আমি আর ফেলুদা ভদ্রলোকের সঙ্গে মল্লিক-বাড়ি রওনা দিলাম। রাস্তা ছেড়ে একটা বাঁশ-বনে ঢুকে বুঝলাম এটা শর্টকাট। জীবনবাবু বললেন, 'কলকাতায় একটা টেলিফোন করার দরকার ছিল, তাই স্টেশনে যেতে হল।'

'পালকি ছাড়া গতি নেই বুঝি?'

জীবনবাবু ফেলুদার দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'আপনাকে তুলসী-বাবু বলেছেন বুঝতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ, বলছিলেন ইলেকট্রিক শকের পরিণাম।'

'পরিণামটা গোড়ায় এত ভয়াবহ ছিল না, আক্রোশটা ছিল শুধু ইলেকট্রি-সিটির বিরুদ্ধে। এখন কী দাঁড়িয়েছে সেটা আমাদের বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবেন।'

'আপনি এখানে প্রায়ই আসেন?'

'দুমাসে একবার। আমাদের একটা ব্যবসা আছে, সেটা এখন আমাকেই দেখতে হয়। সেই নিয়ে কথা বলতেই আসি।'

'তাহলে ব্যবসায় এখনো ইনটারেস্ট আছে আপনার বাবার?'

'মোটেই না। কিন্তু আমি সেটা চাই না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি যাতে উনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।'

'কোনো আশা দেখছেন কি?'

'এখনো না।'

॥ ২ ॥

মল্লিক বাড়িও যে অনেকদিনের পুরোনো সেটা বলে দিতে হয় না, তবে মেরামতের দরুন বাড়িটাকে আর পোড়ো বলা চলে না। প্রাসাদ না হলেও, অট্টালিকা নিশ্চয়ই বলা চলে এ বাড়িকে। ফটক দিয়ে ঢুকে ডাইনে একটা বাঁধানো পুকুর, বাড়ির দুপাশের ফাঁক দিয়ে পিছনে গাছপালা দেখে মনে হয় ওদিকে একটা বাগান রয়েছে। পাঁচিলটা মেরামত হয়নি, তাই এখানে ওখানে ফাটল ধরেছে, কয়েক জায়গায় আবার দেয়াল ভেঙেও পড়েছে।

ফটকে একজন দারোয়ান দেখলাম যার হাতে সড়কি আর ঢাল দেখে মনে হল কোনো ঐতিহাসিক নাটকে নামার জন্য তৈরি হয়েছে। সদর দরজার পাশেই ঠিক ওই রকমই হাস্যকর পোষাক-পরা একজন বরকন্দাজ জীবন-বাবুকে দেখে এক পেল্লায় সেলাম ঠুকল। এই থমথমে পরিবেশেও এই ধরনের সব অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে হাসি পাচ্ছিল।

আমরা একতলাতেই বৈঠকখানায় ফরাসের উপর বসলাম। ঘরে চেয়ার নেই। দেয়ালে যা ছবি আছে সবই হয় দেবদেবীর, না হয় পৌরাণিক ঘটনার। দেয়ালের আলমারির একটা তাকে গোটা দশেক বাংলা বই দেখলাম, বাকি তাকগুলো মনে হল খালি।

'আপনাদের পাখা লাগবে কি? তাহলে দাসুকে লাগিয়ে দিই।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম মাথার উপর ঝালরওয়ালা ডবল-গাদির একটা কাঠের ডান্ডা থেকে ঝুলছে, আর ডান্ডাটা ঝুলছে সিলিং-এ দুটো আংটা থেকে। ডান্ডা থেকে দড়ি বেরিয়ে বাঁ দিকের একটা দরজার উপর দেয়াল ফুঁড়ে বারান্দায় চলে গেছে। এই হল টানা-পাখা, যেটা টানা হয় বারান্দা থেকে, আর হাওয়া হয় ঘরে। অক্টোবর মাস, সবেধ হয়ে এসেছে, তাই গরম নেই; পাখার আর দরকার হল না।

'এটা কী জানেন?'

জীবনবাবু আলমারিটা খুলে তার থেকে একটা গামছা টাইপের চারকোণা কাপড় বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। সেটার বিশেষত্ব এই যে তার এক-কোণে গেরো দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা পাথরের টুকরো।

গামছাটা হাতে নিয়ে ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল। সে পাথরের উল্টো দিকের কোণটা হাতে নিয়ে গামছাটাকে বার কয়েক শূন্যে ঘুরিয়ে বলল,

'তোপসে, উঠে দাঁড়া ত।'

আমি দাঁড়ালাম আর সেই সঙ্গে ফেলুদাও দাঁড়াল আমার থেকে হাত তিনেক দূরে। তারপর গামছা হাওয়ায় ঘুরিয়ে হাতে ধরা অবস্থাতেই জাল ফেলার মতো করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দিকটা আমার গলায় পেঁচিয়ে গেল।

'ঠগী!' আমি বলে উঠলাম।

ফেলুদাই বলেছিল একথা কালে আমাদের দেশে ঠগীদের দস্যুগিরির কথা। তারা ঠিক এইভাবে পথচারীদের গলায় ফাঁস দিয়ে হ্যাঁচকা টানে তাদের খুন করে সর্বস্ব লুট করে নিত।

ফেলুদা অবিশ্যি গামছা ধরে টান দেয়নি। সে তক্ষুনি প্যাঁচ খুলে নিয়ে ফরাসে বসে বলল, 'এ জিনিস আপনি কোথায় পেলেন?'

'মাঝ রাত্তিরে বাবার ঘরের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল কেউ।'

'কবে?'

'আমি আসার কয়েকদিন আগে।'

'এত পাহারা সত্ত্বেও এটা হয় কি করে?'

'পাহারা?' জীবনবাবু হেসে উঠলেন। 'পাহারা ত শুধু পোষাকের বাহারে মশাই, মানুষগুলো ত সব গেঁয়ো ভূত, কুঁড়ের হদ্দ। আর তারাও ত বুঝতে পারে বাবুর ভীমরতি ধরেছে। কাজ যা করে সে ত শুধু নাম কা ওয়াস্তে। নেহাৎ বাড়িতে ডাকাত পড়েনি তাই, নইলে বোঝা যেত কার দৌড় কতদূর।'

'এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন জানতে পারি কি?'

'বাবা ছাড়া আর আছেন আমার বিধবা ঠাকুমা। তিনি প্রাচীন আমলের লোক তাই দিব্যি আছেন। তাছাড়া আছেন ভোলানাথবাবু। এঁকে বাজার সরকার বলতে পারেন, ম্যানেজার বলতে পারেন—বাবার ফাইফরমাস খাটা, দেখাশোনা করা, সবই ইনি করেন। বাবার অসুখ-বিসুখ হলে কবিরাজ ডাকতে হয়, সেটিও ইনিই করেন। কোনো কাজে শহরে যাবার দরকার হলেও ইনিই যান। বাস—এছাড়া আর কেউ নেই। অবিশ্যি চাকর আছে; একটি রান্নার লোক, দুটি দারোয়ান, একটি এমনি চাকর—এরা বাড়িতেই থাকে। পাল্কির লোক আর পাঙ্খাওয়ালা কাছেই গ্রাম থেকে আসে।'

'এই ভোলানাথবাবু কোথাকার লোক? ক'দিন আছেন?'

'উনি এই গ্রামেরই লোক। আমাদের প্রজা ছিলেন। বাপ-ঠাকুর্দা চাষ-বাস করত। ভোলাবাবু নিজে ইস্কুলে পড়েছেন, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে ছিলেন। এখন বয়স ষাটের কাছাকাছি।'

'উনি কি আপনার পিতামহ?'

ফেলুদা দেয়ালে একটা ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করল। বিরাট এক জোড়া পাকানো গোঁফ নিয়ে এক জমিদার বাঁ হাত শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর রেখে ডান হাতে একটা রুপোয় বাঁধানো লাঠি ধরে চেয়ারে বসে আছেন। দেখলেই মনে হয় যাকে বলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

'হ্যাঁ, উনিই দুর্লভ সিংহ।'

'যাঁর নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত?'

জীবনবাবু হেসে উঠলেন।

'বাঘ অবিশ্যি এককালে থাকলেও, ঠাকুরদার আমলে ছিল না; তবে হ্যাঁ, ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন ঠিকই। এবং শুনেছি অত্যাচারী।'

একজন চাকর একটা ট্রেতে করে একটা পেয়ালা আর দুটো গেলাসে কী যেন নিয়ে এল।

'তাহলে চায়ের পাট উঠিয়ে দেন নি আপনার বাবা?'

'আলবৎ দিয়েছেন। এটা অবিশ্যি চা না, কফি। আমার নিজের একটি কাপ এবং একটিন নেসকাফে আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসি। সকাল সন্ধে এক তলায় বসে খাই। তাই আপনাদের জন্য গেলাস; কিছু মনে করবেন না।'

'মনে করব কেন? এ তো খাঁটি মাদ্রাজি সিসটেম। কোমলা বিলাসে এই-ভাবে কাঁসার পাত্রে খেয়েছি কফি।'

দোতলা থেকে মাঝে মাঝেই একটা খটাস্ খটাস্ শব্দ পাচ্ছিলাম; সেটা যে কিসের শব্দ সেটা ফেলুদার প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারলাম।

'আপনার বাবা বুঝি খড়ম ব্যবহার করেন?'

জীবনবাবু একটু হেসে বললেন, 'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?'

'এই ঠগীর গামছা ছাড়া আর কী থেকে আপনার ধারণা হল যে আপনার বাবার জীবন বিপন্ন?'

জীবনবাবু এবার তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিলেন। তাতে গোটা গোটা পেনসিলের অক্ষরে লেখা—

'তোমার পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অতএব প্রস্তুত থাক!'

'এটা এসেছে ৫ই অক্টোবর, আমি আসার আগের দিন। পোস্ট করা হয়েছিল কাটোয়া থেকে। এখান থেকে যে-কেউ গিয়ে ডাকে ফেলে আসতে পারে।'

'কিছু মনে করবেন না—পূর্বপুরুষের পাপটা কী সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারলে সুবিধে হত।'

'বুঝতেই তো পারছেন,' বললেন জীবনবাবু, 'একটা জমিদার বংশের ইতিহাসে অন্যায়ের ত কতরকম দৃষ্টান্ত থাকতে পারে। কোন পাপের কথা বলছে সেটা কী করে বলি বলুন। আমার ঠাকুরদাদা দুর্লভ মল্লিকই ত কতরকম অত্যাচার করেছেন প্রজাদের উপর।'

'এটা পেয়ে পুলিশে খবর দিলেন না কেন?'

'দুটো কারণে', একটু ভেবে বললেন জীবনবাবু। 'এক, এখানে আপনাকে কেউ চিনবে না, তাই যে-লোক হুমকি দিচ্ছে সে সাবধানতা অবলম্বন করার অতটা তাগিদ অনুভব করবে না। দুই, পুলিশ এলে প্রথমে আমাকে সন্দেহ করবে।'

আমরা দুজনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম ভদ্রলোকের দিকে। জীবনবাবু বলে চললেন, 'বাবার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের পর থেকে আমার সঙ্গে তাঁর আর বনিবনা নেই। আমরা শহুরে মানুষ, বিজ্ঞানের অবদানগুলো অত সহজে বর্জন করা আমাদের চলে না মশাই। এটা ঠিক যে ইলেকট্রিক শকের ফলে বাবা মানসিক শকও পেয়েছিলেন সাংঘাতিক। ঘটনাটা ঘটে পাঁচ বছর আগে। আমি আর বাবা আপিস থেকে ফিরে একসঙ্গে বৈঠকখানায় ঢুকি। অন্ধকারে বাতি জ্বালাতে গিয়ে সুইচবোর্ডে একটা খোলা তারে বাবার হাত আটকে যায়। বাইরেই ছিল মেইন সুইচ, আমি দৌড়ে গিয়ে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে অফ করি। তবু কেন জানি বাবার ধারণা হয় যে আমি ব্যাপারটা আরো তাড়াতাড়ি করতে পারতাম। সেই তখন থেকেই। যাই হোক, এখানে এলেই কথা কাটাকাটি হয়। একবার ত রেগে গিয়ে একটা জ্বলন্ত কেরোসিনের ল্যাম্প ছুঁড়ে ফেলে দিই। তার ফলে ফরাসে আগুন-টাগুন ধরে হুলুস্থুল ব্যাপার। পাড়াগাঁতে খবরটা রটে যায়। তারপর থেকে সবাই জানে শ্যাম মল্লিকের সঙ্গে তাঁর ছেলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। কাজেই বুঝতেই পারছেন কেন পুলিশ ডাকিনি। অবিশ্যি আপনাকে ডাকার আরেকটা কারণ হল আপনার খ্যাতি। আর আমার বিশ্বাস একজন আধুনিক শহুরে লোক সমস্যাটা আরো ভালো বুঝতে পারবে।'

নেসকাফে শেষ হবার আগেই ঘরে ল্যাম্প চলে এসেছে। ওপরে পাঁচালিও বন্ধ হয়েছে। জীবনবাবু বললেন, 'আপনি বাবার সঙ্গে কি একবার দেখা করতে চান?'

'সেটা হলে মন্দ হত না।'

আমরা ফরাস ছেড়ে উঠে পড়লাম।

সামান্য কটা ল্যাম্প-লণ্ঠনের আলোয় এত বড় বাড়ির অনেকখানি যে অন্ধকার থেকে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জীবনবাবু পকেট থেকে ছোট্ট একটা টর্চ বার করে জেলে বললেন, 'এটাও লুকিয়ে আনা।'

শ্যামলাল মল্লিক তাঁর নিজের ঘরে ফরাসে বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে বসে আছেন। জীবনবাবু আর নিচের ছবির দুর্লভবাবু, এই দুজনের সঙ্গেই ভদ্রলোকের চেহারার মিল আছে। হয়ত

এই চেহারায় দুর্লভ মল্লিকের গোঁফ জুড়ে দিলে এঁকেও ডাকসাইটে বলে মনে হয়। এই অবস্থায় দেখে ভয় করে না, যদিও কথা বললে গলার গম্ভীর স্বরে মনে হয় রাগলে ভয়ংকর হতে পারে।

'আপনি এবার আসুন', গম্ভীর গলায় বললেন শ্যামলালবাবু। যাকে কথাটা বলা হল তিনি ফরাসের এক কোণে বসে ছিলেন। জীবনবাবু তাকে কবিরাজ তারক চক্রবর্তী বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রোগা ডিগ্‌ডিগে চেহারা, ঘন ভুরুর নিচে নাকের উপর পুরু কাচের চশমা, নাকের নিচে এক-জোড়া পুরু গোঁফ। তারক চক্রবর্তী নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

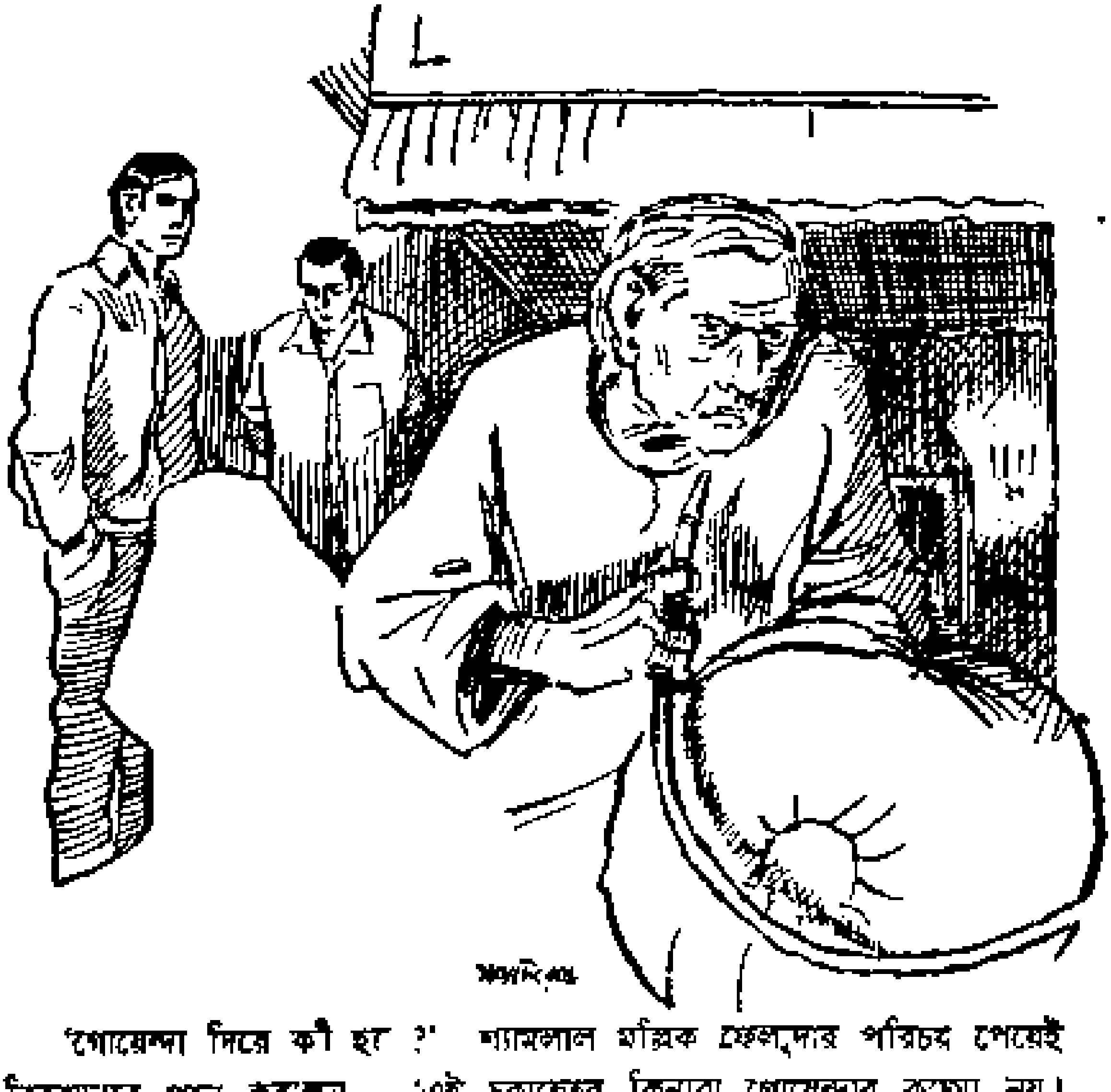

'গোয়েন্দা দিয়ে কী হবে ?' শ্যামলাল মল্লিক ফেলুদার পরিচয় পেয়েই বিরক্তভাবে প্রশ্ন করলেন 'এই চক্রান্তের কিনারা গোয়েন্দার কম্মো নয়। আমার শত্রু আমার ঘরেই আছে একথা দুর্লভ মল্লিকের আত্মা বলে দিয়েছেন। সে কথা কাগজে লেখা আছে আমার কাছে। আত্মা ত্রিকালজ্ঞ। জ্যান্ত মানুষ সাহেবী কেতাব পড়ে তার চেয়ে বেশি জানবে কী করে ?'

জীবনবাবু দেখলাম কথাটা শুনে কেমন জানি থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলাম তিনি ঘটনাটা জানেন না।

'আপনি কি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়েছিলেন?'

'আমি যাব কেন? সে এসেছিল। আমি তাকে ডেকেছিলাম। আমাকে এইভাবে বিব্রত করছে কে সেটা আমার জানার ছিল। এখন জেনেছি।'

জীবনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'কবে এসেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু?'

'তুমি আসার আগের দিন।'

'কই, তুমি ত আমাকে বলনি।'

শ্যামলালবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে সমানে গড়গড়া টেনে চলেছেন। ফেলুদা বলল, 'দুর্লভ মল্লিকের আত্মা কী লিখে গেছেন সেটা দেখা যায় কি?'

ভদ্রলোক মুখ থেকে গড়গড়ার নল সরিয়ে লাল চোখ করে ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'তোমার বয়স কত হল?'

ফেলুদা বয়স বলল।

'এই বয়সে এত আস্পর্ধা হয় কি করে? সে লেখার আধ্যাত্মিক মূল্য জান তুমি? সেটা কি যাকে-তাকে দেখাবার জিনিস?'

'আমায় মাপ করবেন,' ফেলুদা খুব শান্তভাবেই বলল, 'আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম আপনার সংকট থেকে কোনো মুক্তির উপায় আপনার পরলোকগত পিতা বলেছেন কিনা।'

'সেটার জন্য কাগজটা দেখার কী দরকার? আমাকে জিগ্যেস করলেই ত হয়। মুক্তির উপায় একটাই—শত্রুকে বিদায় কর।'

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। তারপর ধীরকণ্ঠে জীবনলাল বললেন, 'তুমি তাহলে আমায় চলে যেতে বলছ?'

'আমি কি তোমাকে আসতে বলেছি কোনোদিন?'

জীবনবাবু দেখলাম ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, 'বাবা, তুমি আমার চেয়ে ভোলানাথবাবুর উপর বেশি আস্থা রাখছ, বোধহয় তার পারিবারিক ইতিহাসটা ভুলে যাচ্ছ। ভোলানাথবাবুর বাবা খাজনা দিতে দেরি করায় দুর্লভ মল্লিকের লোক গিয়ে তাঁর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আর—

'মূর্খ!' মল্লিকমশাই দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন। 'ভোলানাথ তখন ছিল শিশু। ঘটনার ষাট বছরে সে প্রতিশোধ নেবে আমাকে হত্যা করে? এমন কথা শুনলে লোকে হাসবে সেটা বুঝতে পারছ না?'

আমরা আর বসলাম না। 'চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি,' বাইরে

এসে বললেন জীবনবাবু। 'আপনারা শর্টকাট চিনে ফিরতে পারবেন না।'

ফটক থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাকে ডেকে এনে আমি ঝামেলার মধ্যে ফেলতে চাইনি। আপনাকে যে-ভাবে অপমানিত হতে হল তার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত।'

'গোয়েন্দাদের এসব ব্যাপারে লজ্জাবোধ থাকে না জীবনবাবু,' বলল ফেলুদা। 'এখানে এসে আমার আদৌ আপশোষ হচ্ছে না। এ নিয়ে আপনি চিন্তাই করবেন না। আমার কেবল আপনার সম্বন্ধেই ভাবনা হচ্ছে। একটা কথা আপনার বোঝা উচিত। হুমকি চিঠি পড়ে ভোলানাথবাবুর কথা মনে হচ্ছে বলেই কিন্তু সন্দেহটা আরো বেশি করে আপনার উপর পড়ছে।'

'কিন্তু গামছা আর চিঠি যখন আসে তখন ত আমি কলকাতায়, মিস্টার মিত্তির।'

ফেলুদা একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে বলল, 'আপনার যে কোনো অনুচর নেই গোসাইপুরে সেটা কী করে জানব জীবনবাবু?'

'আপনিও আমাকে সন্দেহ করছেন?' শুকনো ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন জীবনবাবু।

'আমি এখনো কাউকেই সন্দেহ করছি না, কাউকেই নির্দোষ ভাবছি না। তবে একটা কথা আমি আপনাকে জিগ্যেস করতে চাই। ভোলানাথবাবু কিরকম লোক?'

জীবনবাবু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'অত্যন্ত বিশ্বস্ত। এটা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু তাই বলেই কি আমার উপর সন্দেহ পড়বে?' শেষ প্রশ্নটা মরিয়া হয়ে করলেন জীবনবাবু। ফেলুদা বলল, 'জীবন-বাবু, এখন আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। এবং আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। এ ছাড়া আপনারও উপায় নেই। অপরাধীকে রক্ষা করার রাস্তা আমার জানা নেই। কিন্তু যে নির্দোষ তাকে আমি বাঁচাবই।'

এতে জীবনবাবু আশ্বস্ত হলেন কিনা সেটা অন্ধকারে তাঁর মুখ না দেখে বোঝা গেল না।

বাঁশবনটা ফুরিয়ে আসার মুখে ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল জীবনবাবুকে।

'আপনার বাবা ত খড়ম ব্যবহার করেন; খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করেন কি কখনো—বাড়ির বাইরে?'

'বাড়ির ভিতরেই করেন না কখনো, ত বাড়ির বাইরে! এটা অবিশ্যি নতুন কিছু নয়। চিরকালের ব্যাপার।'

'পায়ের তলায় যেন মাটি দেখলাম। তাই জিগ্যেস করছি। আরেকটা

কথা—উনি মশারি ব্যবহার করেন না?'

'নিশ্চয়ই। এখানে সবাই করে। করতেই হয়। কেন বলুন ত?'

'আপনি বোধহয় ল্যাম্পের আলোয় ঠিক বুঝতে পারেন নি ; ওঁর সর্বাঙ্গে অসংখ্য মশার কামড়ের চিহ্ন।'

'তাই বুঝি?' বুঝলাম জীবনবাবু খেয়াল করেননি। সত্যি বলতে কি আমিও করিনি। 'কিন্তু বাবা ত মশারি ব্যবহার করেন। মশারি ত সাহেবদের জিনিস না, ওতে আপত্তির কী আছে?'

'তাহলে বোধহয় ফুটো আছে। একটু দেখবেন ত।'

॥ ৩ ॥

তুলসীবাবু আর জটায়ু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন; এতক্ষণে ইলেকট্রিক লাইটে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। লালমোহনবাবু বললেন, 'ভাবতে পারেন, এই গণ্ডগ্রামে প্রায় বিশ জনের মতো লোক পাওয়া গেল যারা আমার ফিফ্‌টি পারসেণ্টের বেশি বই পড়েচে? অবিশ্যি সবাই যে কিনে পড়েচে তা নয়; সিক্সটি ফাইভ পারসেণ্ট ইস্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়েচে। যারা কিনেচে তারা এসে বাইরে সই নিয়ে গেল।'

তুলসীবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি। একবার আত্মারামের দর্শনটা করে নিন। বাদুড়েকালী না হয় কাল দেখা যাবে।'

'সেটা আবার কী?'

'গোসাঁইপুরের আরেকটি অ্যাট্রাকশন। আপনারা যে বাঁশবন দিয়ে এলেন, তারই ভেতরে একটি দুশো বছরের পুরোন পোড়ো মন্দির। বিগ্রহ নেই। বহুদিন থেকেই বাদুড়ের বাসা হয়ে পড়ে আছে। এককালে খুব জাঁকের মন্দির ছিল।'

'ভালো কথা, আপনার এই আত্মারামবাবুটি এ-গাঁয়েরই লোক?'

'না, তবে রয়েছেন এখানে অনেকদিন। বছর দুয়েক হল ভদ্রলোকের এই ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তাছাড়া জ্যোতিষও জানেন। খুব নাম-ডাক। কলকাতা থেকে লোক এসে হাত-টাত দেখিয়ে যায়।'

'পয়সা নেন?'

'তা হয়ত নেন। কিন্তু এখানের কারুর কাছ থেকে কোনোদিন কিছু নিয়েছেন বলে শুনিনি। আত্মা নামান সোমে আর শুক্কুরে: আজ শুধু দর্শনটা করিয়ে আনব।'

ফেলুদা দর্শনের ব্যাপারে দেখলুম কোনো আপত্তি করল না। কারণ পরিষ্কার: সে বুঝেছে মৃগেন ভটচায এখন তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ির বিজলী-আলো দেখা গেলেও অন্ধকারটা বেশ জমজমাট। চাঁদ এখনো ওঠেনি। ঝিঁঝি প্যাঁচা শেয়াল সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল এখানে শ্যাম মল্লিকের পালকি আর কেরোসিন ল্যাম্পই

মানায় বেশি। লালমোহনবাবু বললেন এর চেয়ে রহস্যময় আর রোমাঞ্চকর পরিবেশ তিনি আর দেখেন নি। বললেন, 'যে-উপন্যাসটার ছক কেটেছি সেটা গোয়াটেমালায় ফেলব ভাবছিলুম, এখন দেখছি গোসাঁইপুর প্রেফারেবল।'

'তাও ত ঠগীর ফাঁসটা দেখেন নি, তাহলে বুঝতেন রোমাঞ্চ কাকে বলে।'

'সে কী ব্যাপার মশাই?'

ফেলুদা সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল। হুমকি চিঠির কথাটাও বলল। তুলসীবাবু মন্তব্য করলেন, 'মৃগেন ভটচায যদি আত্মা আনিয়ে ওই কথাই বলে থাকে যে মল্লিক বাড়িতেই রয়েছেন শ্যাম মল্লিকের শত্রু তাহলে সেটা মানতেই হবে। আপনার সাত্যা গাঁ চষে বেড়ানোর দরকার নেই।'

আমি মনে মনে বললাম—তুলসীবাবুর ভক্তির পাত্রের মধ্যে আরেকজন লোক পাওয়া গেল—আত্মারাম মৃগেন ভট্টাচার্য।

মৃগেনবাবুর বাড়িতেও দেখলাম ইলেকট্রিসিটি নেই। বোধহয় আবছা আলোয় আত্মা সহজে নামে তাই। ভদ্রলোকের চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো। দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। পাতলা চুলে পাক ধরেনি, যদিও চোখের কোলে আর থুতনির নিচে চামড়া কুঁচকে গেছে। নাক, চোখ, কপাল, পাতলা ঠোঁট, গায়ের রং সবই একেবারে কাশির টোলের পণ্ডিতের মতো। মানে যাকে বলে মার্কা মারা বামুন। পায়ের গুলি দেখে মনে হল ভদ্রলোক এখন না হলেও এককালে প্রচুর হেঁটেছেন।

বিজলি না থাকলেও এখানে চেয়ার টেবিলের অভাব নেই। ভটচায মশাই নিজে তক্তপোষে বসে আছেন, সামনে তিনটে টিনের আর একটা কাঠের চেয়ার ছাড়া দুপাশে দুটো বেঞ্চ রয়েছে। ডান দিকের বেঞ্চিতে একজন বছর পঁচিশের ছেলে বসে একটা পুরোনো পাঁজির পাতা উলটোচ্ছে। পরে জেনেছিলাম ও মৃগেনবাবুর ভাগনে নিত্যানন্দ, আত্মা নামানোর ব্যাপারে মামাকে সাহায্য করে।

তুলসীবাবু ভটচায মশাইকে ঢিপ্ করে একটা প্রণাম করে আমাদের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'কলকাতা থেকে এলেন এঁরা। আমার বন্ধু। নিয়ে এলাম আপনার কাছে। গোসাঁইপুর কাকে নিয়ে গর্ব করে সেটা এঁদের জানা উচিত নয় কি?'

মৃগাঙ্কবাবু ঘাড় তুলে আমাদের দেখে চেয়ারের দিকে দেখিয়ে দিলেন। আমরা তিনজনে বসলাম, তুলসীবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

মৃগাঙ্কবাবু হঠাৎ টান হয়ে পদ্মাসন করে বসে মিনিট খানেক চোখ বুজে চুপ করে রইলেন। তারপর সেই অবস্থাতেই বললেন, 'সন্ধানী বন্ধুটি কোন জন?'

আমরা সবাই চুপ। ফেলুদার চোখ কুঁচকে গেছে। লালমোহনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে ওই নামে ত কেউ—'

তুলসীবাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

'প্রদোষচন্দ্র মিত্র আমার নাম,' হঠাৎ বলে উঠল ফেলুদা। সত্যিই ত!—প্রদোষ মানে সন্ধ্যা, চন্দ্র হল শশী, আর মিত্র হল বন্ধু!

ভটচায মশাই চোখ খুলে ফেলুদার দিকে মুখ ঘোরালেন। তুলসীবাবু দেখি বেশ গর্ব-গর্ব ভাব করে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছেন।

'বুঝলে তুলসীচরণ,' বললেন ভটচায মশাই। 'কিছুদিন পরে আর আমার প্রয়োজন হবে না। আমার নিজের মধ্যেই ক্রমে ত্রিকাল দর্শনের শক্তি জাগছে বলে অনুভব হচ্ছে। অবিশ্যি আরো কয়েক বছর লাগবে।'

'ওঁর পেশাটা কী বলুন ত!' তুলসীবাবু ফেলুদার দিকে দেখিয়ে প্রশ্নটা করলেন। ইতিমধ্যে একজন বাইরের লোক এসে ঢুকেছে, তার সামনে ফেলুদা যে গোয়েন্দা এই খবরটা বেরিয়ে পড়লে মোটেই ভাল হবে না।

'সেটা আর বলার দরকার নেই,' বলল ফেলুদা। তুলসীবাবুও নিজের অসাবধানতার ব্যাপারটা বুঝে ফেলে জিভ কেটে কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'শুক্কুরবার আরেকবার আপনার এখানে নিয়ে আসব ওঁদের। আজ কেবল দর্শনটা করিয়ে গেলাম।'

মৃগাঙ্কবাবুর চোখ এখনো ফেলুদার দিকে। একটু হেসে বললেন, 'সূক্ষ্ম সাল শস্যের কাজে এসেছেন আপনি, এ কথা বললে আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝবে কি? আপনি অকারণে বিচলিত হচ্ছেন।'

ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে ফেলুদা বলল, 'চতুর লোক। এঁর পসার জমবে না ত কার জমবে?'

'সূক্ষ্ম সাল শস্য কী মশাই?' লালমোহনবাবু জিগেস করলেন। 'সন্ধ্যা শশী বন্ধু ত তাও অনেক কষ্টে বুঝলাম—তাও আপনি নিজের নামটা বললেন বলে!'

'সূক্ষ্ম হল অণু, সাল—দন্ত্য স—হল সন, আর শস্য হল ধান। তিনে মিলে—'

'অনুসন্ধান!' লালমোহনবাবু ক্ল্যাপ দিয়ে বলে উঠলেন, 'লোকটা শুধু গণনা জানে না, হেঁয়ালিও জানে। আশ্চর্য!'

কে যেন এদিকেই আসছে—হাতের লণ্ঠনটা দোলার ফলে তার নিজের ছায়াটা সারা রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে এগিয়ে আসছে! তুলসীবাবু হাতের টর্চ তুলে তার মুখে ফেলে বললেন, 'ভটচাযের ওখানে বুঝি? কী ব্যাপার, ঘন ঘন দর্শন?'

ভদ্রলোক একটু হেঁ হেঁ ভাব করে কিছু না বলে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।

'ভোলানাথবাবু,' বললেন তুলসীবাবু, 'ভটচায মশাইয়ের পেটেন্ট ভক্ত। মাঝে একদিন ও'র বাড়িতে গিয়ে কার জানি আত্মা নামিয়েছেন।'

রাত্রে তুলসীবাবুর দাওয়ায় বসে তিনরকম তরকারি, মুগের ডাল আর ডিমের ডালনা দিয়ে দিব্যি ভোজ হল। তুলসীবাবু বললেন যে এখানকার টিউবওয়েলের জলটায় নাকি খুব খিদে হয়।

খাওয়া-দাওয়া করে বাইরের দাওয়ায় বসে তুলসীবাবুর কাছে ও'র মাস্টারি জীবনের গল্প শুনে যখন দোতলায় শুতে এলাম তখন ঘড়ি বলছে সাড়ে নটা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মাঝরাত্তির। আমরা মশারি সমেত বিছানাপত্র সব নিয়ে এসেছিলাম ; ফেলুদা বলল ওডোমস মেখে শোবে, মশারির দরকার নেই। আমি লক্ষ করেছি গত দেড় ঘণ্টায় ও একবার কেবল গঙ্গার রান্নার প্রশংসা ছাড়া আর কোনো কথা বলেনি। এত চট করে ওকে চিন্তায় ডুবে যেতে এর আগে কখনো দেখিনি। লালমোহনবাবু বললেন ও'র সংবর্ধনার স্পীচটা তৈরি করে রাখতে হবে, তাই উনি একটা লণ্ঠন চেয়েছেন, কারণ ঘরে বাতি জ্বালিয়ে রাখলে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে।

আমি বিছানায় শুয়ে ফেলুদাকে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'তোমার নাম আর পেশা কী করে বলে দিল বল ত?'

'আমার মনের অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে ওটাও একটা রে তোপসে। তবে অনেক লোকের অনেক পিকিউলিয়ার ক্ষমতা থাকে যার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমাকে এভাবে স্রেফ ইগনোর করল কেন বলুন ত।'

'সারা গাঁয়ের লোক আপনাকে অভ্যর্থনা দিতে চলেছে, আর একটি লোক আপনার নামে হেঁয়ালি বাঁধল না বলে আপনি মুষড়ে পড়লেন?'

'তাহলে বোধহয় আমার নাম থেকে হেঁয়ালি হয় না তাই।'

ফেলুদা দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, রক্তবরণ মুগ্ধকরণ নদীপাশে যাহা বিঁধিলে মরণ—কেমন হ'ল?'

'কিরকম, কিরকম?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা এত ফস্ করে ছড়াটা বলেছে যে দুজনের কেউই ঠিকমত ধরতে পারিনি। ফেলুদা আবার বলল—'রক্তবরণ মুগ্ধকরণ নদীপাশে যাহা বিঁধিলে মরণ।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান.........রক্তবরণ লাল, আর মুগ্ধকরণ—'

'মোহন!' আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম।

'ইয়েস, লালমোহন—কিন্তু গাঙ্গুলী?—ওহো, নদী হল গাঙ আর গুলি বিঁধলে মরণ—ওঃ, ব্রিলিয়ান্ট মশাই! কী করে যে আপনার মাথায় এত আসে জানি না। আপনি থাকতে সংবর্ধনাটা আমাকে দেওয়ার কোন মানেই হয় না। ভালো কথা, স্পীচটা তৈরী হলে একটু দেখে দেবেন ত?'

॥ ৪ ॥

পরদিন সকালে গ্রামটা ঘুরে দেখে আমরা জাগরণী ক্লাবের বাড়িতে সিরাজদ্দৌলা নাটকের রিহার্শাল দেখতে গেলাম। ফেলুদা অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের ক্যানেডিয়ান থিয়েটার সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। সেখানেই আলাপ হল গোসাঁইপুরের একমাত্র মূকাভিনেতা বেণীমাধবের সঙ্গে। বললেন শুক্রবার বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর আর্ট দেখিয়ে যাবেন। 'দেখবেন স্যার, ফ্লাট ছাতের উপর সিঁড়ি বেয়ে ওঠা দেখিয়ে দেব, ঝড়ের মধ্যে মানুষের অভিব্যক্তি কিরকম হয়, স্যাড থেকে ছ'রকম চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে হ্যাপিতে নিয়ে যাওয়া সব দেখিয়ে দেব।'

বিকেলে সেগুনহাটির মেলা দেখতে গেলাম। সেখানে নাগরদোলায় চড়ে, চা চিকেন কাটলেট আর রাজভোগ খেয়ে, স্পাইডার লেডির বীভৎস ভেলকি দেখে, সাড়ে তেরো টাকার খুচরো জিনিস কিনে গোসাঁইপুর যখন ফিরলাম তখন ছ'টা বাজে। আকাশে আলো আছে দেখেই বোধহয় ফেলুদা বলল একবার মল্লিকবাড়িতে জীবনবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবে। তুলসীবাবু বললেন বাড়ি গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

সদর দরজায় পৌঁছানোর আগেই জীবনবাবু বেরিয়ে এলেন ; বললেন ওঁর ঘরের জানালা দিয়েই অনেক আগেই আমাদের দেখতে পেয়েছেন। তারপর ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে নতুন কোনো খবর নেই। 'আপনাদের বাগানটা একটু দেখতে পারি?' 'নিশ্চয়ই,' বললেন জীবনবাবু, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বাগানটা অবিশ্যি ফুলের বাগান নয়, এখানে বেশীর ভাগই বড় বড় গাছ আর ফলের গাছ। ফেলুদা ঘুরে ঘুরে কী দেখছে তা ওই জানে! একবার এক জায়গায় থেমে মাটিটার দিকে যেন একটু বেশিক্ষণ ধরে দেখল। এরই ফাঁকে আবার মল্লিক বাড়ির দোতলার পিছনের বারান্দা থেকে 'কে রে...কে ওখানে?' বলে জীবনবাবুর ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন। তাতে জীবনবাবুকে আবার উলটে চেঁচিয়ে বলতে হল, 'কেউ না ঠাকুমা—আমরা।' 'ও, তোরা,' উত্তর দিলেন ঠাকুমা, 'আমি রোজই যেন দেখি কারা ঘুর ঘুর করে ওখানে!'

'আপনার ঠাকুমার দৃষ্টিশক্তি কেমন?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'খুবই কম,' বললেন জীবনবাবু, 'এবং তার সঙ্গে মানানসই শ্রবণশক্তি!'

'বাগান এমনিতে বোধহয় তেমন দেখাশোনা হয় না?'

'ওই ভোলানাথবাবুই যা দেখেন।'

'রাত্রে লোক থাকে এদিকে?'

'রাত্রে? মাথা খারাপ! রাত জেগে বাগানে টহল দেবে এরা?'

'সদর দরজায় তালা দেওয়া থাকে আশা করি?'

'ওটা ভোলানাথবাবুর ডিউটি। তবে আমি থাকলে আমিই চাবি বন্ধ করি, চাবি আমার কাছেই থাকে।'

'ভোলানাথবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়নি; তাঁকে একবার ডাকতে পারেন!'

ভোলানাথবাবুকে দিনের আলোয় দেখে মনে হল তিনি শহুরে লোকের মতো ধুতি সার্ট পরলেও তাঁর চেহারায় এখনো অনেকখানি তাঁর পূর্বপুরুষের ছাপ রয়ে গেছে। খালি গা করে মাঠে নিয়ে হাতে লাঙল ধরিয়ে দিলে খুব বেমানান হবে না। আমরা বাড়ির সামনে বাঁধানো পুকুরের ঘাটে বসে কথা বললাম। বর্ষার জলে পুকুর প্রায় কানায় কানায় ভরে আছে আর সারা পুকুর ছেয়ে আছে শালুকে। নবীন বলে একটি চাকরকে লেবুর সরবত আনতে বললেন জীবনবাবু। চারিদিক অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ, কেবল দূরে কোত্থেকে জানি চিঁ চিঁ করে শোনা যাচ্ছে ট্রানজিস্টারে গান। ওটা না হলে সত্যিই যেন মনে হত আমরা কোন আদ্যিকালে ফিরে গেছি।

'মৃগাঙ্কবাবু আপনাদের বাড়িতে একবারই এসেছেন?' ভোলানাথবাবুকে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'সম্প্রতি একবারই এসেছেন।'

'আর আগে?'

'আগেও এসেছেন কয়েকবার। কাটোয়া থেকে আষাঢ় মাসে মদন গোসাঁইর দল এলো, তখন মৃগাঙ্কবাবুই তাদের নিয়ে এসে কর্তাকে কেত্তন শুনিয়ে যান। এমনিতেও বার কয়েক একা আসতে দেখেছি; মনে হয় কর্তা একটা কুষ্ঠি ছকে দেবার কথা বলেছিলেন।'

'সে কুষ্ঠি হয়েছে?'

'আজ্ঞে তা বলতে পারব না।'

'এবার যে এলেন, তার ব্যবস্থা কে করল?'

'আজ্ঞে কর্তার নিজেরও ইচ্ছা ছিল, আর কবিরেজ মশাইও বলেন, আর—আজ্ঞে, আমিও বলেছিলাম।'

'আপনার ত যাতায়াত আছে ভটচায বাড়িতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভক্তি হয়?'

ভোলানাথবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেল।

'আজ্ঞে কী আর বলব বলুন। আমার মেয়ের নাম ছিল লক্ষ্মী, যেমন নাম তেমনি মেয়ে, এগারোয় পড়তে না পড়তে ওলাউঠোয় চলে গেল। মৃগাঙ্কবাবু শুনে বললেন, সে কেমন আছে জানতে চাও তার নিজের কথায়?

ভোলানাথবাবু অন্ধকারে ধুতির খুঁটে চোখ মুছছেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'সেই মেয়েকে নামিয়ে আনলেন ভটচায মশাই। মেয়ে বললে ভগবানের কোলে সে সুখে আছে, তার কোনো কষ্ট নাই। মুখে বললে না অবিশ্যি, কাগজে লেখা হল। সেই থেকে......'

ভোলানাথবাবুর গলা আবার ধরে গেল। ফেলুদা ব্যাপারটাকে আর না বাড়িয়ে বলল, 'এ বাড়িতে আত্মা নামানোর সময় আপনি ছিলেন?'

'ছিলাম, তবে ঘরের মধ্যে ছিলাম না, দরজার বাইরে। ভেতরে কেবল কর্তামশাই আর ভটচায মশাই আর নিত্যানন্দ ছাড়া কেউ ছিলেন না। মা ঠাকরুন যেন জানতে না পারেন এইটে বলে দিয়েছিলেন কর্তামশাই, তাই দরজায় পাহারা থাকতে হল।'

'তাহলে আপনি কিছুই শোনেন নি?'

'আজ্ঞে দশ মিনিট খানেক চুপচাপের পর মধু সরকারের বাঁশ বনের দিক থেকে যখন শেয়াল ডেকে উঠল সেই সময় যেন কর্তামশাইয়ের গলায় শুনলাম— কেউ এলেন, কেউ এলেন? তারপর আর কিছু শুনিনি। সব হয়ে যাবার পর ভটচায মশাইকে নিয়ে তাঁর বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসি।'

সরবত খাওয়া শেষ করে একটা চারমিনার ধরিয়ে ফেলুদা বলল, 'দুর্লভ মল্লিকের লোক আপনাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সে কথা মনে পড়ে?'

ভোলানাথবাবুর উত্তর এলো ছোট্ট দুটো কথায়।

'তা পড়ে।'

'আপনার মনে আক্রোশ নেই?'

ফেলুদাকে এধরনের ধাক্কা-মারা প্রশ্ন করতে আগেও দেখেছি। ও বলে এই ধরনের প্রশ্নের রিঅ্যাকশন থেকে নাকি অনেক কিছু জানা যায়। ভোলানাথবাবু জিভ কেটে মাথা হেঁট করলেন। তারপর কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে বললেন, 'এখন মাথাটা ঠিক নেই তাই, নইলে কর্তামশাইয়ের মতো মনুষ্যি কজন হয়?'

ফেলুদা আর কোন প্রশ্ন করল না। ভোলানাথবাবু একটুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, 'যদি অনুমতি দেন—আমি একটু ভটচায মশাইয়ের বাড়ি যাব।'

ফেলুদা বা জীবনবাবুর কোন আপত্তি নেই জেনে ভদ্রলোক চলে গেলেন। জীবনবাবু একটু উসখুস করছেন দেখে ফেলুদা বলল, 'কিছু বলবেন কি?'

'আপনি কিছুটা অগ্রসর হলেন কিনা জানার আগ্রহ হচ্ছে।'

বুঝলাম ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত।

ফেলুদা বলল, 'ভোলানাথবাবুকে বেশ ভালো লাগল।'

জীবনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। 'তার মানে আপনি বলতে চান—'

'আমি নিশ্চয়ই বলতে চাই না আপনাকে আমার ভালো লাগে না। আমি বলতে চাই শুধু দু-একটা খটকার উপর নির্ভর করে ত বেশী দূর এগোনো যায় না—বিশেষ করে সেই খটকাগুলোর সঙ্গে যখন মূল ব্যাপারটার কোনো সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। এখন যেটা দরকার সেটা হল কোনো একটা ঘটনা, যেটা—'

'কে রে, কে ওখানে?'

ফেলুদার কথা থেমে গেল, কারণ ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠেছেন। আওয়াজটা এসেছে বাড়ির পিছন দিক থেকে। চারদিক নিস্তব্ধ বলে গলা এত পরিষ্কার শোনা গেল।

ফেলুদা দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে সোজা বাগানের দিকে ছুটছে। আমরাও তার পিছু নিলাম। লালমোহনবাবু এতক্ষণ পুকুরের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান গাইছিলেন। তিনিও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে দিলেন ছুট।

তিনটে টর্চের আলোর সাহায্যে আমরা বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। ফেলুদা এগিয়ে গেছে, সে পশ্চিমের পাঁচিলের গায়ে একটা ধসে যাওয়া অংশের পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে টর্চ ফেলে রয়েছে। 'কাউকে দেখলেন?' জীবনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'দেখলাম, কিন্তু চেনার মতো স্পষ্ট নয়।'

আধঘণ্টা ধরে মশার বিনবিনুনি আর কামড় আর ঝিঁঝির কান ফাটানো শব্দের মধ্যে সারা বাগান চষে যেটা পাওয়া গেল সেটা একটা চরম রহস্য। সেটা হল বাগানের উত্তর দিকের শেষ মাথায় একটা গাছের গুঁড়ির পাশে একটা সদ্য-খোঁড়া গর্ত। তার মধ্যে যে কী ছিল বা কী থাকতে পারে সে ব্যাপারে জীবন-বাবু কোনরকম আলোকপাত করতে পারলেন না। লালমোহনবাবু অবিশ্যি সোজাসুজি বললেন গুপ্তধন, কিন্তু জীবনবাবু বললেন তাঁদের বংশে কস্মিন-কালেও গুপ্তধন সম্বন্ধে কোন কিংবদন্তী ছিল না। ফেলুদা যে কথাটা বলল সেটাও আমার কাছে পুরোপুরি রহস্য।

'জীবনবাবু, আমার মনে হচ্ছে আমরা এই ঘটনাটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

আমরা কিছুক্ষণ হল খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের ঘরে এসে বসেছি। আজ বেশ কাহিল লাগছে: বুঝতে পারছি অন্ধকারে বনবাদাড়ে ঘোরাটা সহজ কাজ নয়। আমার আর লালমোহনবাবুর পায়ে বেশ কয়েক জায়গায় ডেটল দিতে হয়েছে। কারণ আগাছার মধ্যে কাঁটা-ঝোপও ছিল বেশ কয়েকটা।

শুয়ে কী যেন হিজিবিজি লিখছে। লালমোহনবাবু একটা হাই অর্ধেক তুলে থেমে গেলেন, কারণ ফেলুদা একটা প্রশ্ন করেছে—লালমোহনবাবুকে নয়, তুলসীবাবুকে। তুলসীবাবু আমাদের জন্য পান নিয়ে ঢুকেছেন।

'তুলসীবাবু, আপনি যদি একজন মহৎ লোককে একটা লোক ঠকানো ফন্দি বাতলে দেন, সে-লোক যদি সে ফন্দি কাজে লাগায়, তাহলে তাকে কি আর মহৎ বলা চলে?'

তুলসীবাবু ভ্যাবাচ্যাকা ভাব করে বললেন, 'ওরে বাবা, আমি মশাই এসব হেঁয়ালি-টেঁয়ালিতে একেবারেই অপটু। তবে হ্যাঁ, মহৎ লোক অত নিচে নামবেন কেন? নিশ্চই নামবেন না।'

'যাক্,' বলল ফেলুদা, 'আমি খুশি হলাম জেনে যে আপনি আমার সঙ্গে এক মত।'

একেই ত প্যাঁচালো রহস্য, সেটাকে ধোঁয়াটে কথা বলে ফেলুদা আরো পেঁচিয়ে দিচ্ছে, আমি তাই ও নিয়ে আর একদম চিন্তা না করে মশারির ভিতর ঢুকলাম। কিন্তু চিন্তা করব না ভাবলেই কি আর মন থেকে চিন্তা পালিয়ে যায়? আমার নিজের মনেই যে প্রশ্ন জমা হয়েছে একগাদা। শ্যামলালবাবুর পায়ে কাদা কেন? কে পাঠিয়েছে ঠগীর ফাঁস আর হুমকি চিঠি? ঠাকুমা কাকে দেখে চেঁচালেন আজকে? বাগানের গর্তে কী ছিল? আমার উত্তর লেখা কাগজ দেখালেন না কেন মল্লিকমশাই?......গতকালের মতো আজও বিছানায় পড়তে না পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কেবল তফাৎটা এই যে গতকাল এক ঘুমে রাত কাবার, আর আজ চোখ খুলে দেখি তখনও অন্ধকার।

আসলে ঘুমটা ভেঙেছে একটা চীৎকারে। সেটার জন্য দায়ী বোধহয় লাল-মোহনবাবু, কারণ তিনি খাটের উপর বসে আছেন মশারির বাইরে, সামনের খোলা জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখের উপর, আর স্পষ্ট দেখছি তাঁর চোখ গোল হয়ে গেছে।

'বাপ্‌রে বাপ্, কী স্বপ্ন, কী স্বপ্ন!' বললেন লালমোহনবাবু।

'কী দেখলেন আবার?' আমি জিগেস করলাম।

'দেখলুম আমার ঠাকুরদা হরিমোহন গাঙ্গুলীকে......একটা সংবর্ধনা সভা, তাতে ঠাকুরদা স্পীচ দিলেন, তারপর আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, এই দ্যাখ্, কেমন রোমাঞ্চকর মালা দিলাম তোকে—আর আমি দেখছি সেটা ফুলের মালা নয় তপেশ, সেটা—ওরেব্বাবারে বাস্—সেটা খুদে খুদে রক্তবর্ণ নরমুণ্ড দিয়ে গাঁথা!'

'এমন চমৎকার ব্রাহ্ম মুহূর্তে আপনি এই সব উদ্ভট স্বপ্ন দেখছেন?'

আশ্চর্য! ফেলুদা যে তার খাটে নেই সেটা এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। সে ছাতের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল; বুঝলাম সে যোগব্যায়াম করছিল। যাক, তাহলে সকাল হয়ে গেছে।

'বৃথা কষ্ট বলুন,' বললেন লালমোহনবাবু, 'আপনার ওই রক্তবরণ আর আশ্রম আর সংবর্ধনা মিলে এমন জগাখিচুড়ি হয়ে গেছে আমার মধ্যে!'

আমরা উঠে পড়লাম। তুলসীবাবু কি এখনো ঘুমোচ্ছেন? ছাতে এসে দেখি পুব দিকটা সবে ফরসা হয়েছে, তার ফলে চাঁদের আলোটা ফিকে লাগছে। দু'তিনটে তারা এখনো পিট্-পিট্ করছে, কিন্তু তাদের মেয়াদও আর বেশিক্ষণ নয়। দাঁতন দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করব বলে কিছু নিমের ডাল ভেঙে রেখেছিলাম —ফেলুদা বলে দোকানের যে কোনো টুথব্রাশ আর পেস্টের চেয়ে দশ গুণ বেশী ভাল—তারই একটা চিবিয়ে রেডি করছি, এমন সময় শুনলাম পরিত্রাহি চীৎকার।

'মিত্তির মশাই! মিত্তির মশাই!'

ভোলানাথবাবুর গলা। আমরা দুদ্দাড় করে নিচে গিয়ে হাজির হলাম। 'সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

ভোরের আকাশে ভদ্রলোকের ফ্যাকাশে মুখ আরো ফ্যাকাশে লাগছিল। 'কি হয়েছে?' ফেলুদা দৌড়ে গিয়ে জিগ্যেস করল।

'কাল রাত্তিরে বাড়িতে ডাকাত পড়ে সব লণ্ডভণ্ড। সিন্দুক খালি। কর্তামশাইয়ের হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখেছিল। আমাকেও বেঁধেছিল, সকালে ছোটবাবু এসে খুলে দিলেন। আপনি শিগ্গির আসুন!'

॥ ৫ ॥

শ্যামলাল মল্লিক জখম হননি বটে, কিন্তু তাকে যেভাবে দু'ঘণ্টা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়েছিল তাতে তিনি বেশ টস্‌কে গেছেন। ফ্যালফ্যাল করে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছেন ফরাসের উপর, কেবল একবার মাত্র বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, 'বাঁধলি যদি ত মেরে ফেললি না কেন?' এদিকে তাঁর সিন্দুকে যে ফাঁক সেটা কি তিনি খেয়াল করেছেন?

ফেলুদা প্রথমে শ্যামলালবাবুর ঘরটা তন্ন তন্ন করে দেখল। শুধু সিন্দুকটাই খোলা হয়েছে, আর যার যেমন তেমনিই আছে। চাবি থাকত নাকি ভদ্রলোকের বালিশের নিচে। ভোলানাথবাবু দোতলাতেই শোন, তাঁকে ঘুমের মধ্যে অ্যাটাক করে হাত-পা চোখ-মুখ বেঁধে ফেলেছে ডাকাত। ওঁর ধারণা যে অন্তত দুজন লোক ছিল। চাকর নবীন নাকি সারারাত নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছে। দুজন পাইকের মধ্যে একজন চলে গিয়েছিল সেগুনহাটি যাত্রা দেখতে, আরেকজন তার ডিউটি ঠিকই করছিল, দুঃখের বিষয় ডাকাতে মাথায় লাঠি মেরে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে অকেজো করে দিয়েছিল। সামনের দরজা বন্ধই ছিল, কাজেই মনে হয় খিড়কির পাঁচিল টপ্‌কে পিছনের বারান্দা দিয়ে ঢুকেছিল। ঠাকুমাকে কিছু জিগ্যেস করে লাভ নেই, কারণ তিনি থাকেন বারান্দার উত্তর প্রান্তে তিনটে অকেজো ঘরের পরে শেষ ঘরে।

পনের মিনিট হল এসেছি, কিন্তু এখনো জীবনবাবুর দেখা নেই। ভোলানাথবাবু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, ফেলুদা তাঁকে বলল, 'জীবনবাবু কি আমাদের সঙ্গে কথা না বলেই পুলিশে খবর দিতে গেলেন নাকি?'

ভোলানাথবাবু আমতা আমতা করে মাথা নেড়ে বললেন, 'আজ্ঞে আমাকে বলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তার পরে ত......'

ফেলুদা এবার ছুটল সিঁড়ির দিকে, পিছনে আমি আর লালমোহনবাবু। উঠোন পেরিয়ে সোজা খিড়কি দিয়ে বাইরে বাগানে হাজির হলাম। এখনো ভাল করে সূর্য ওঠেনি। অল্প কুয়াশাও যেন রয়েছে, কিম্বা জমে থাকা উনুনের ধোঁয়া। গাছের পাতাগুলো শিশিরে ভেজা, পায়ের নিচে ঘাস ভেজা। পাখি ডাকছে—কাক, শালিক, আর আরেকটার নাম জানি না।

আমরা বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে থমকে থেমে গেলাম।

দশ হাত দূরে একটা কাঁঠাল গাছের গুঁড়ির ধারে নীল পাঞ্জাবী আর

পায়জামা পরা একজন লোক পড়ে আছে। ওই পোশাক আমি চিনি ; ওই চটিটাও চিনি।

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে কাছ থেকে দেখেই একটা আতঙ্ক আর আক্ষেপ মেশানো শব্দ করে পিছিয়ে এল।

'ও মশাই!'

লালমোহনবাবু আঙুল দিয়ে কিছু দূরে মাটিতে একটা জায়গায় পয়েন্ট করে কথাটা বললেন।

'জানি। দেখেছি,' বলল ফেলুদা, 'ওটা ছোঁবেন না। ওটা দিয়েই জীবনবাবুকে খুন করা হয়েছে।' ঝোপের ধারে পড়ে রয়েছে কোণে পাথর বাঁধা একটা গামছা।

ভোলানাথবাবুও বেরিয়ে এসেছেন, আর দেখেই বুঝেছেন কী হয়েছে। 'সর্বনাশ' বলে মাথায় হাত দিয়ে প্রায় যেন ভিরমি লাগার ভাব করে তিন হাত পেছিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

'এখন বিচলিত হলে চলবে না ভোলানাথবাবু, আপনি চলে যান ভদ্রলোকের সঙ্গে। এখানে পুলিশের ঘাঁটিতে গিয়ে খবর দিন। দরকার হলে শহর থেকে দারোগা আসবে। কেউ যেন লাশ বা গামছা না ধরে। কিছুক্ষণ আগেই এ কীর্তিটা হয়েছে। সে লোক হয়ত এখনো এ তল্লাটেই আছে। আর—ভালো কথা—মল্লিকমশাই যেন খুনের কথাটা না জানেন।'

ফেলুদা দৌড় দিল পশ্চিম দিকের পাঁচিল লক্ষ্য করে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

এ দিকের পাঁচিলের একটা জায়গা ধসে গিয়ে দিব্যি বাইরে যাবার পথ হয়ে গেছে। আমরা দুজনে টপকে বাইরে গিয়ে পড়লাম। ফেলুদার চোখ চারিদিকে ঘুরছে, এমনকি জমির দিকেও। আমরা এগিয়ে গেলাম। একশো গজের মধ্যে অন্য কোনো বাড়ি নেই, কারণ এটা সেই শর্টকাটের বাঁশবন। কিন্তু ওটা কী? একটা ভাঙা মন্দির। নিশ্চয়ই সেই বাদুড়ে কালী মন্দির।

মন্দিরের পাশে একজন লোক, আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। কবিরাজ রসিক চক্রবর্তী। 'কী ব্যাপার? এত সকালে?' ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন।

'আপনি খবর পান নি বোধহয়?'

'কী খবর?'

'মল্লিক মশাই—'

'অ্যাঁ!' কবিরাজের চোখ কপালে উঠে গেছে।

'আপনি যা ভয় পাচ্ছেন তা নয়। মল্লিক মশাই সুস্থই আছেন, তবে তাঁর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। আর জীবনবাবু খুন হয়েছেন—তবে এ খবরটা আর মল্লিক মশাইকে দেবেন না।'

রসিকবাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন। আমরাও ফেরার রাস্তা ধরলাম ; খুনী পালিয়ে গেছে।

পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে এগিয়ে যেতেই তিন নম্বর বিস্ফোরণ। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। একি স্বপ্ন না সত্যি? কাঁঠাল গাছের নিচটা এখন খালি।

জীবনবাবুর লাশ উধাও।

ঝোপের পাশ থেকে ঠগীর ফাঁসটাও উধাও।

লালমোহনবাবু একটা গোলঞ্চ গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। কোনোরকমে ভদ্রলোক মুখ খুললেন।

'ভোলানাথবাবু পু-পু—পুলিশে খবর দিতে গেলেন, আমি আপনাদের খুঁজতে এসে দেখি...'

'এসে দেখলেন লাশ নেই?' ফেলুদা চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল। 'না!'

ফেলুদা আবার দৌড় দিল। এবার পশ্চিমে নয়, পুবে।

পুবের দেয়ালে ফাঁক নেই, কিন্তু উত্তরে আছে। কালকের সেই গর্ত—আজ দেখলাম সেটা একটা আম গাছের নিচে—আর পিছনেই ফাঁক। বড় ফাঁক, প্রায় একটা ফটক বললেই চলে। আমি আর ফেলুদা বাইরে বেরোলাম।

দশ হাতের মধ্যেই একটা পুকুর, জলে টৈটম্বুর। এই পুকুরেই যে ফেলা হয়েছে লাশ তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা ফিরে গিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠলাম দোতলায়।

'ও জীবন, ও বাবা জীবন!—ঠাকুমা চেঁচাচ্ছেন—'এই যেন দেখলাম জীবনকে, গেল কোথায় ছেলেটা?'

গাল তোবড়ানো, চুল ছোট করে ছাঁটা, থান পরা আশি বছরের বুড়ি, ঘোলাটে চশমা পরে নিজের ঘর ছেড়ে বারান্দার এদিকে চলে এসেছেন। অ্যাদ্দিন গলা শুনেছি, আজ প্রথম দেখলাম ঠাকুমাকে। ফেলুদা এগিয়ে গেল। 'জীবনবাবু একটু বেরিয়েছেন। আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আপনার কী দরকার আমাকে বলতে পারেন।'

'তুমি কে বাবা?'

'আমি জীবনবাবুর বন্ধু।'

'তোমাকে ত দেখিনি।'

'আমি দুদিন আগে এসেছি কলকাতা থেকে।'

'তুমিও কলকাতায় থাক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু বলার ছিল আপনার?'

বুড়ি হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে ফেললেন। ঘাড় উঁচু করে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, 'কী বলার ছিল সে আর মনে নেই বাবা, আমার বড্ড ভোলা মন যে!'

আমরা ঠাকুমাকে আর সময় দিলাম না। তিনজনে গিয়ে ঢুকলাম শ্যাম-লালবাবুর ঘরে।

রসিকবাবু ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছেন; তিনি শ্যামলালবাবুর নাড়ী

ধরে বসে আছেন।

'জীবন কোথায় গেল?' এখনো কেমন জানি অসহায় ভাব করে কথা বলছেন ভদ্রলোক। বুঝলাম রসিকবাবু জীবনবাবুর মৃত্যু সংবাদটা শ্যামলাল-বাবুকে দেননি।

'আপনি ত চাইছিলেন তিনি কলকাতায় ফিরে যান,' বলল ফেলুদা।

'ও চলে গেল! কিসে গেল? পালকিতে?'

'পালকিতে ত আর সবটুকু যাওয়া যায় না। কাটোয়া থেকে ট্রেন ছাড়া গতি নেই। গরুর গাড়ি বা ডাক গাড়িতে যাওয়া আজকের দিনে যে সম্ভব নয় সেটা নিশ্চয়ই বোঝেন।'

'তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছ?' শ্যামলালবাবুর গলায় যেন একটু অভি-মানের সুর।

'শুধু আমি কেন?' ফেলুদা বলল, 'গ্রামের সবাই করে। আপনি যা করছেন তাতে আপনার ত নয়ই, কারুরই লাভ বা মঙ্গল হচ্ছে না। আপনার নিজের কী হল সেটা ত দেখলেন। সড়কীর বদলে বন্দুকধারী একজন ভালো পাহারাদার থাকলে আর এ কাণ্ডটা হত না। বৈদ্যুতিক শক্-এর চেয়ে এ শক্টা কি কিছু কম হল? যে-যুগ চলে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না মল্লিকমশাই।'

আশ্চর্য, আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন, কিন্তু সেটা হল না। ফেলুদার কথার উত্তরে একটি কথাও বললেন না তিনি, কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

॥ ৬ ॥

মুখের চেহারা কী হয়েছে দেখেছেন?'

লালমোহনবাবু তক্তপোষে বসে হাতে তাঁর দাড়ি কামানোর আয়নাটা নিয়ে তাতে নিজের মুখ দেখে মন্তব্যটা করলেন। ওঁর মুখের যা অবস্থা, আমাদের সকলেরই তাই।

'গোসাঁইপুরের ওই একটা ড্রব্যাক্', বললেন তুলসীবাবু। 'এটার বিষয় আপনাদের আগে থেকেই ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত ছিল।'

'আপনি গোসাঁইপুর বলছেন, আমি বলব মল্লিক বাড়ির বাগানে,' বললেন লালমোহনবাবু। 'ওইটেই হল মশার ডিপো।'

দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমরা দোতলায় আমাদের ঘরে এসে বসেছি। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। ফেলুদা এভাবে গুম্ মেরে গেছে কেন বুঝতে পারছি না। আমার বিশ্বাস জীবনবাবুর খুনটা ওর কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে ওর ক্যালকুলেশনে সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। আর ডাকাতই যদি খুনটা করে থাকে, তাহলে তদন্তের মজাটা কোথায়? ডাকাত ধরার রাস্তা ত পুলিশের ঢের বেশি ভালো জানা আছে ; সেখানে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা আর কী করতে পারে?

দারোগা সুধাকর প্রামাণিক ইতিমধ্যে ফেলুদার সঙ্গে এসে কথা বলে গেছেন। তিনি ফেলুদার নাম শুনেছেন, তবে ফেলুদার উপর খুব একটা ভক্তি ভাব আছে বলে মনে হল না। বিশেষ করে জীবনবাবুর লাশ লোপাট হয়ে যাওয়াতে তিনি রীতিমতো বিরক্ত।

'আপনারা যাঁরা শখের ডিটেকটিভ,' বললেন সুধাকর দারোগা. 'তাদের দেখেছি কাজের মধ্যে সিসটেমের কোনো বালাই নেই। আরেকজন দেখেছি আপনার মতো গণেশ দত্তগুপ্ত—তার সঙ্গে একটা কেসে ঠোকাঠুকি লাগে। যেখানে দরকার অ্যাকশনের, সেখানে চোখ কুঁচকে বসে ভাবছে। কী যে ভাবছে তা মা গঙ্গাই জানে। অবার যেখানে কাজ করছে, তার পেছনে কোনো চিন্তা নেই। লাশটা যখন দেখলেন পড়ে আছে, আর সেটাকে ছেড়ে যদি যেতেই হয় ত একটা লোককে পাহারায় বসিয়ে যেতে পারলেন না? এখন আমাদের ওই পেছনের পুকুরের জলে জাল ফেলতে হবে। আর তাতে যদি বডি না ওঠে ত ভেবে দেখুন—এই গাঁয়ে এগারটা পুকুর, তার মধ্যে একটাকে দীঘি বলা চলে!

আর তাতেও যদি না হয় তাহলে... এ সবই কিন্তু আপনার নেগলিজেন্সের জন্য।'

ফেলুদা পুরো ঝালটা হজম করে উল্টে একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে সুধাকর দারোগাকে আরো উসকে দিল।

'আপনি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন?'

দারোগা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনার সিরিয়াস বলে খ্যাতি আছে শুনেছিলুম, এখন দেখছি সেটাও ভুল।'

ফেলুদা বলল, 'কথাটা জিগেস করলাম কারণ আপনারা যদি খুনী ধরতে না পারেন তাহলে আমাকে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হতে হবে। তিনি প্রেতাত্মা নামাতে পারেন। আমার মনে হচ্ছে জীবনলালের আত্মাই জীবনলালের খুনীর সঠিক সন্ধান দিতে পারেন।'

'আপনি নিজে তাহলে হোপ্‌লেস ফীল করছেন বলুন।'

'খুনের তদন্ত আমার সাধ্যের বাইরে সেটা স্বীকার করছি,' বলল ফেলুদা, 'কিন্তু ডাকাতের হাতে হাতকড়া পরাতে পারব বলে আমার বিশ্বাস আছে।'

সুধাকরবাবুর যে ফেলুদার উপর আস্থা কত কম সেটা তাঁর পরের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম।

'আপনি ডেড বডি আর জ্যান্ত বডি তফাৎ করতে পারেন আশা করি? গলায় ফাঁস দিয়ে টান মারলে মুখের কী কী পরিবর্তন হয় সেটা জানা আছে আপনার?'

ফেলুদা ঠাণ্ডা ভাবেই উত্তরটা দিল।

'সুধাকরবাবু, আমার যখন পুলিশে চাকরি নেবার কোনো বাসনা নেই, তখন আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা আমার মর্জির ব্যাপার। পুলিশের উপর নির্ভর না করে যখন আমি প্রেতাত্মার কথা বলছি তখন বুঝতেই পারছেন আমার তদন্তের রাস্তাটা একটু স্বতন্ত্র।'

'ভোলানাথবাবু সম্পর্কে আপনার মনে কোনো সন্দেহের ভাব নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে। আমার সন্দেহ হয় আপনারা দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা না করেই ভদ্রলোকের হাতে হাতকড়া পরাবেন, কারণ তাঁর পূর্বপুরুষ যে জীবনবাবুর পূর্বপুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন সে খবর হয়ত আপনাদের কানে পৌঁছেছে। কিন্তু সেটা করলে আপনারা মারাত্মক ভুল করবেন।'

সুধাকর দারোগা সশব্দে হেসে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ফেলুদার দিকে চেয়ে চুক্ চুক্ করে আক্ষেপের শব্দ করে বললেন, 'মুশকিল হচ্ছে কি জানেন, আপনারা বেশি ভেবে সহজ জিনিসটাকে জটিল করে ফেলেন।

কেসটা জলের মতো পরিষ্কার।'

'আপনাদের জাল ফেলা পুকুরের জলের মতো?'

ফেলুদার খোঁচা অগ্রাহ্য করে দারোগা বলে চললেন, 'আপনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতেন কেন ভোলানাথবাবুর কথা বলছি। ডাকাতি এবং খুন দুটোর জন্যই সে দায়ী। এ ডাকাতি ঘরের লোকের কাজ সে তো বোঝাই যাচ্ছে। আসল ডাকাত হলে সিন্দুক ভাঙত—চাবি দিয়ে খুলত না। ভোলানাথ টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল, পিছনের বাগান দিয়ে, খুন করবার কোনো অভিপ্রায় ছিল না তার। জীবনবাবু ঘুম ভেঙে টের পেয়ে তাকে ধাওয়া করেন ; ভোলানাথ খুন করতে বাধ্য হয়। তারপর সন্দেহ যাতে না পড়ে তাই আপনাদের খবর দিতে আসে। ভোলানাথ বলেছে ডাকাত তাকেও বেঁধে রেখেছিল, জীবনবাবু এসে তার বাঁধন খোলে। এ কথা যে সত্যি তার প্রমাণ কই? এর ত কোনো সাক্ষী নেই!'

'সিন্দুকের টাকা তাহলে কোথায় গেল সুধাকরবাবু?' ফেলুদা গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল।

'সে-টাকাও খুঁজতে হবে,' বললেন সুধাকরবাবু। 'লাশ পেলে পর আমরা ভোলানাথবাবুকে জেরা করব। তখন সব সুরসুর করে বেরিয়ে পড়বে।'

আমার কিন্তু সুধাকরবাবুর কথাগুলো বেশ মনে ধরল ; কিন্তু ফেলুদা কেন আমল দিচ্ছে না? দারোগা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখনই কেন সে বলতে গেল, 'আজ সন্ধ্যায় জীবনলালের আত্মা নামানো হবে মৃগাঙ্কবাবুর বাড়িতে। এলে ঠকবেন না!'

তুলসীবাবুর দেখলাম একমাত্র চিন্তা কালকের সংবর্ধনা হবে কিনা সেই নিয়ে। রহস্যের কিনারা না হলে, খুনীর হাতে হাতকড়া না পড়লে, নিশ্চয়ই হবে না, কারণ গ্রামের লোকের সংবর্ধনা সভায় যোগ দেবার উৎসাহই হবে না। লালমোহনবাবু অবিশ্যি মেনেই নিয়েছেন যে মালা আর মানপত্র ফসকে গেল, আর স্পীচটা মাঠে মারা গেল। হয়ত নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললেন, 'আমরা মশাই রহস্য বেচে খাই ; বাস্তবিক একটা খাঁটি রহস্যের সামনে পড়লে সেইটেই আমাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

মুখে এটা বলা সত্ত্বেও লক্ষ্য করছি উনি বার বার নিজের অজান্তে বিড় বিড় করে স্পীচের লাইন বলছেন, আর বলেই নিজেকে সামলে নিচ্ছেন।

'মৃগাঙ্ক ভটচায্যি কোন্ বাড়িতে থাকেন বলতে পারেন?'

প্রশ্নটা এলো তুলসীবাবুর বাড়ির দরজার বাইরে থেকে।

'এই শুরু হল,' বললেন তুলসীবাবু। 'সোম আর শুক্কুরে এ উপদ্রব লেগেই আছে, আর রাস্তায় প্রথম বাড়ি বলে আমাকেই এ ঝক্কি পোয়াতে

হয়।'

ভদ্রলোক জানালা দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে বললেন, 'আরো তিনটে বাড়ি পরে ডান দিকে।'

ফেলুদা বলল, 'আমরা আসছি বলে খবরটা পাঠিয়ে দিতে পারলে ভালো হত। আর বলবেন কিউয়ে দাঁড়াতে পারব না। আমাদের আত্মাকে প্রাইয়রিটি দিতে হবে।'

তুলসীবাবু বোধহয় এই প্রথম বুঝলেন যে ফেলুদা ব্যাপারটা সম্বন্ধে সত্যিই সিরিয়াস। তাঁর মুখের ভাব দেখে ফেলুদা বলল, 'আমার একার কাজ ফুরিয়ে গেছে তুলসীবাবু। এখন ভটচায্যি মশাইয়ের সাহায্য ছাড়া এগোতে পারব না।'

ফেলুদা অনেক সময়ই বলে যে মনের দরজা খোলা রাখা উচিত, বিশেষ করে আজকের দিনে; কারণ রোজই প্রমাণ হচ্ছে যে এমন অনেক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে যার কারণ বৈজ্ঞানিকেরা জানে না, অথচ জানে না বলে সেটাকে উড়িয়েও দিতে পারছে না। এই যেমন সেদিন কাগজে বেরোল যে ইউরি গেলর বলে এক ইহুদী যুবক চোখের চাহনির জোরে পাঁচ হাত দূরে থেকে বৈজ্ঞানিকের হাতে ধরা কাঁটা চামচ বেঁকিয়ে ফেলছে। এ ঘটনা চোখের সামনে দেখছে আরো একজন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক, আর দেখে তারা না পারে কারণ বলতে, না পারে উড়িয়ে দিতে। মৃগাঙ্কবাবুর ক্ষমতাও কি এই ধরনের?

তুলসীবাবু বললেন, 'সাড়ে পাঁচটা বাজে; চলুন আমি আপনি একসঙ্গে গিয়ে ওঁকে রিকোয়েস্টটা করি, তাহলে জোরটা বেশি হবে।'

ফেলুদা উঠে পড়ে বলল, 'তোরা বরং একটু বেড়িয়ে আয় না।'

আমার নিজেরও এক ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকতে ভালো লাগছিল না, লালমোহনবাবুও বলছিলেন গোসাইপুরের শরৎকালের বিকেলের তুলনা নেই, তাই ফেলুদার বেরোনর সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও দুজন বেরিয়ে পড়লাম।

॥ ৭ ॥

দুদিন আগে যখন এসেছিলাম, তখন একরকম মনে হয়েছিল গ্রামটাকে; আজ আমার মনে হচ্ছে আরেক রকম। তার কারণ মন বলছে এই সুন্দর গ্রামের কোনো একটা গোপন জায়গায় গলায়-ফাঁস-দিয়ে-মরা মানুষের লাশ লুকিয়ে আছে। হঠাৎ যদি দেখি—

নাঃ—ওসব ভাবব না। তাহলে বেড়ানো মাটি হয়ে যাবে।

কিন্তু বাঁশ বনের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাহসটা আবার কমে গিয়েছিল। সেটাকে বাড়িয়ে দিল মূকাভিনেতা বেণীমাধব।

'আরে, আমি যে আপনাদের বাড়িই যাচ্ছিলাম। বললুম না শুক্রুরবার বিকেলে এসে অভিনয় দেখিয়ে যাব!'

'কী করি বল ভাই,' বললেন লালমোহনবাবু। 'এমন একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে সে কী জানতাম? এর পরে আর অ্যাকটিং দেখার মুড থাকে? তুমিই বল।'

'তা যা বলেছেন স্যার। তা আপনারা ক'দিন আছেন ত?'

'হ্যাঁ, তা দিন তিনেক ত আছিই।'

'এ দিকে চল্লেন কোথায়?'

'কোনদিকে যাওয়া যায় তুমিই বল না।'

'বাদুড়ে-কালী দেখেছেন স্যার? সপ্তদশ শতাব্দীর টেম্পল। এখনো কিছু হাতের কাজ রয়ে গেছে দেয়ালে। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।'

আমি যে সকালে দেখেছি মন্দিরটা সেটা আর বললাম না। সত্যি বলতে কি, তখন যা মনের অবস্থা ছিল তাতে হাতের কাজটাজ চোখে পড়েনি।

মিনিট তিনেক যেতেই মন্দিরটায় পৌঁছে গেলাম। এখানে সকালেই আসা উচিত। সন্ধেবেলা গা-টা একটু বেশি ছমছম করে। পাশেই আবার একটা বটগাছ। তার একটা ঝুরি মন্দিরের চুড়োটাকে আঁকড়ে ধরে ফাটিয়ে দিয়েছে।

'এইখেনটায় বলি হত স্যার', বটগাছের গুঁড়ির পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল বেণীমাধব।

'বলি?' লালমোহনবাবু কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলেন।

'নরবলি, স্যার। গোসাঁইপুরের ডাকাত ওয়ার্লড ফেমাস নেদো ডাকাতের ইতিহাস পড়েননি? ওই নিয়েই ত আপনার একটা রহস্য-রোমাঞ্চের বই হয়ে যায়। ভেতরটা দেখবেন? টর্চ আছে?'

ভেতরটা এর মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে।

'ভেতর?' ধরা গলায় বললেন লালমোহনবাবু। 'টর্চ ত আনিনি ভাই। শুনিচি বাদুড়-টাদুড়...'

'বাদুড়ের ত এখন ইভিনিং এক্সকারশন স্যার। এইত সবে চরতে বেরিয়েছে। বাদুড় দেখতে চাইলে—'

'না ভাই, চাই না। বরং না দেখাটাই বাঞ্ছনীয়।'

'চলে আসুন স্যার। মাচিস জেবলেছি। একটা বিড়ি ধরালুম স্যার। কিছু মাইন্ড করবেন না ত?'

'নো নো ভাই, মাইন্ড কী, তুমি পাঁচটা বিড়ি একসঙ্গে ধরাও না।'

বেণীমাধব বিড়ি ধরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইটা মন্দিরের দরজার জায়গায় ধরল, আর অমনি এক লাফে আমার হৃৎপিন্ডটা গলার কাছে চলে এল। লাল-মোহনবাবু চারবার 'জী-জী-জী-জী' বলে থেমে গেলেন।

জীবনবাবুর মৃতদেহ! মন্দিরের ভিতরে থামের আড়ালে নীল পাঞ্জাবী আর সাদা পায়জামার খানিকটা উঁকি মারছে। সকালে হাতে ঘড়ি ছিল, এখন নেই।

'এই দেখুন, কে কাপড় ফেলে গেছে।'

বেণীমাধব দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বোধহয় কাপড়গুলো উদ্ধার করে তার মালিককে ফেরত দিতে, লালমোহনবাবু তার সার্টের কোনা খামচে ধরে বললেন, 'ওটা ল-লাশ! পুলিশ-পুলিশ্ পুলিশ্ পুলিশের ব্যাপার!'

মূকাভিনেতা লাশ শুনেই মূক মেরে গিয়েছিলেন—এইবার দেখলাম তার অভিনয়। অবাক থেকে শুরু করে এক ধাপে আতঙ্কে পৌঁছে তিনি দেখিয়ে দিলেন কথা না বলে কী করে পিট্টান দেওয়ার অভিনয় করতে হয়। আমরাও আর অপেক্ষা না করে এই বিভীষিকাময় পরিবেশ থেকে যথাসম্ভব জোরে হেঁটে বাড়িমুখে রওনা দিলাম।

ফেলুদা দেখলাম ফিরে এসেছে। বলল, 'অমন ফ্যাকাশে মেরে গেছিস কেন? চটপট রেডি হয়ে নে। পনের মিনিটের মধ্যে আঁধার নামবে।'

লালমোহনবাবু ফেলুদাকে দেখেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বললেন, 'একটা ইম্পরটান্ট ডিসকভারি করে এলুম। অবিশ্যি একা নয়, দুজনে। জীবনবাবুর লাশ পড়ে রয়েছে বাদুড়ে কালীর মন্দিরে। পুলিশকে জানাবেন, না খুঁজতে দেবেন?'

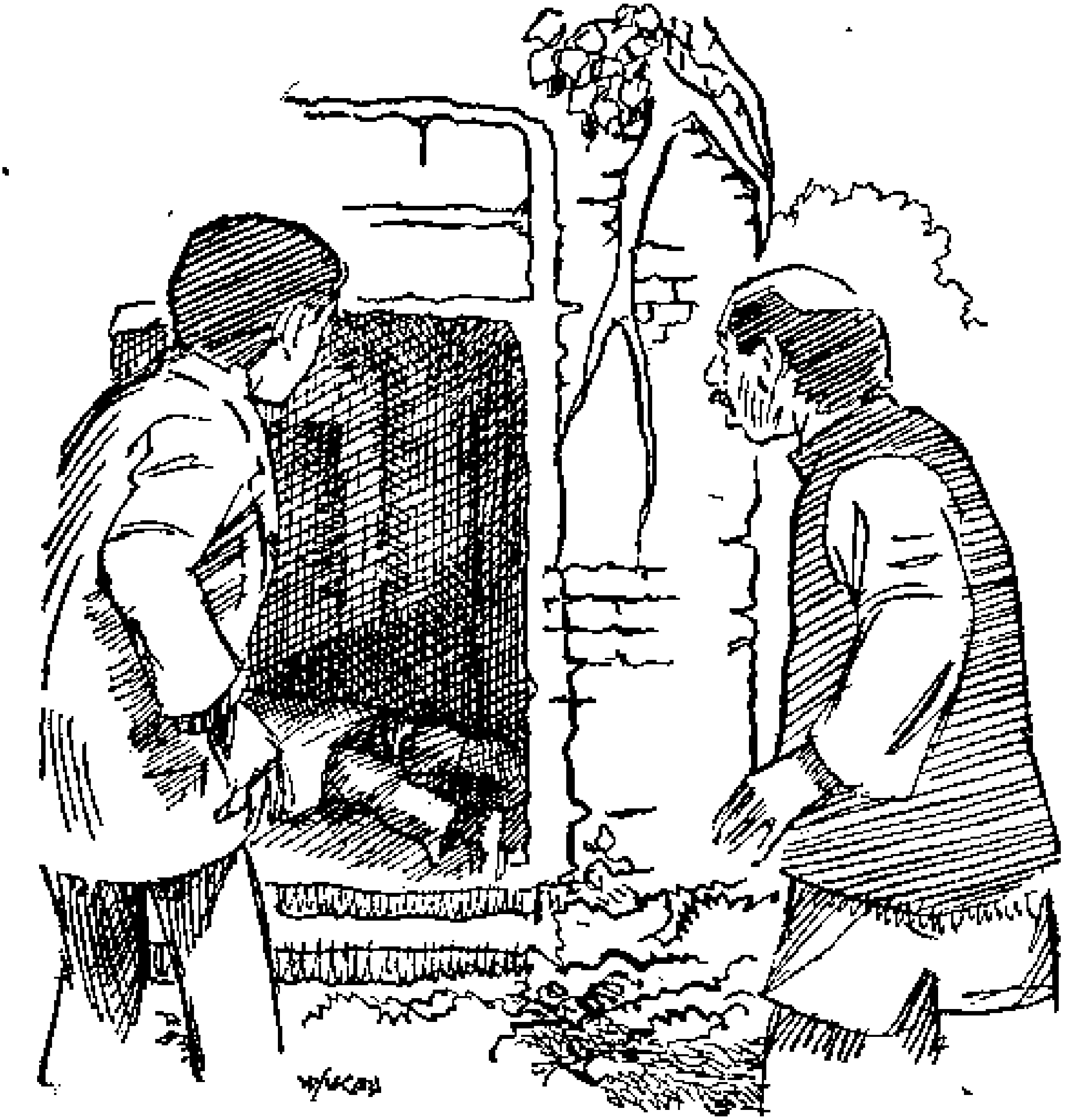

আমি জানতাম সুধাকর দারোগাকে লালমোহনবাবুর মোটেই পছন্দ হয়নি, তাই খুঁজতে দেবেন। ফেলুদা বলল, 'মন্দিরের ভেতরে গেসলেন?'

'নো স্যার। লাশ ত হ্যান্ডল করা বারণ, তাই আর যাইনি। তবে বিয়ন্ড ডাউট জীবন মল্লিক।'

'ঠিক আছে। সুধাকরবাবু এসেছিলেন একটু আগে। বোধহয় ভটচায মশায়ের ওখানে আসছেন। তখন খবরটা দিয়ে দিলেই হবে।'

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। তুলসীবাবু বললেন যে একবার উকীলবাবুর বাড়ি থেকে চট করে ঘুরে আসতে হবে। কালকের অনুষ্ঠানটা যে ভেস্তে যেতে পারে সেটা ওঁকে জানানো দরকার।

যাবার পথে ফেলুদা বলল যে মৃগাঙ্কবাবু নাকি জীবনলালের আত্মা নামানোর ব্যাপারে আপত্তি দূরের কথা, রীতিমতো আগ্রহ দেখিয়েছেন। বাইরে থেকে আরো জন তিনেক লোক এসেছেন, তাদের বাইরে বসিয়ে রেখে আগে আমাদের কাজটা করে দেবেন।

মৃগাঙ্কবাবুর ঘরে আজ তক্তপোষের বদলে রয়েছে একটা কাঠের টেবিল, আর সেটাকে ঘিরে টিন আর কাঠে মেশানো পাঁচটা চেয়ার। এরই একটাতে বসে আছেন মৃগাঙ্ক ভটচায। টেবিলের মাঝখানে রয়েছে একটা পিদিম, আর তার পাশেই একটা কাগজ আর পেনসিল। এ ছাড়া ঘরে রয়েছে দুটোর বদলে একটা বেঞ্চি, আর দুটো মোড়া। বেঞ্চিতে বসে আছে ভাগনে নিত্যানন্দ।

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসলাম, একটা খালি রইল তুলসীবাবুর জন্য।

'তুলসীচরণের জন্য অপেক্ষা করব কি?' প্রশ্ন করলেন মৃগাঙ্কবাবু।

'পাঁচ মিনিট দেখা যেতে পারে,' বলল ফেলুদা।

'আমি জানতাম। সেদিন আপনাকে দেখেই উপলব্ধি হয়েছিল যে আমার কাছে আবার আসতে হবে।' ভদ্রলোকের গলাটা এই অন্ধকার ঘরে গমগম করছে। মৃগাঙ্কবাবু বলে চললেন, 'বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান। পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন হল এই বিশেষ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সুতরাং যারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তারা এই বিশেষ জ্ঞানকে হেয় জ্ঞান করে না।'

জ্ঞান জ্ঞান করে এই ঘ্যানঘ্যানানি আর ভালো লাগছিল না। ভদ্রলোক এবার আরম্ভ করলেই পারেন।

'আপনারা সকলেই পরলোকগত জীবনলালকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং তিনি সদ্য মৃত। এই দুই কারণে আজকের অধিবেশনের চূড়ান্ত সাফল্য আমি আশা করি। আত্মা এখনো নরলোক হতে পরলোকে উত্তীর্ণ হবার অবকাশ লাভ করেনি। অনেক পার্থিব বন্ধন মুক্ত করে তবে আত্মার উত্তরণ। জীবনলালের আত্মা এখনো আমাদের পরিপার্শ্বে বিদ্যমান। সে আমার আবাহনের অপেক্ষায় আছে। সে জানে আমি তাকে ডাকলে পাব, আমি জানি তাকে ডাকলে সে আসবে। জীবনলালের আত্মা ত্রিকালজ্ঞ, অবিনশ্বর। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার অবাধ গতি। আমার এই কক্ষে তার অবাধ গতি। আমার এই লেখনী হবে তারই লেখনী। তারই জ্ঞান, তারই উপলব্ধি, তারই বিশ্বাস, ব্যক্ত হবে তারই ভাষায় আমার এই লেখনীর সাহায্যে।'

এবার ফেলুদার মুখ খুলল। এ অবস্থায় কথা বলা ওর পক্ষেই সম্ভব, কেননা আমার গলা শুকিয়ে গেছে, আর আমার বিশ্বাস লালমোহনবাবুরও।

'আপনি কী লিখছেন সেটা জানার জন্য সকলেরই কৌতূহল হবে, অথচ

আমি ছাড়া আর সকলেই টেবিলের উল্টো দিকে বসেছে, লেখা পড়া সম্ভব নয়। আমি যদি সকলের সুবিধের জন্য পড়ে দিই তাতে আপনার আপত্তি আছে কি?'

'কোনো আপত্তি নেই,' বললেন মৃগাঙ্কবাবু, 'আপনি স্বচ্ছন্দেই লেখা পড়ে শুনিয়ে দিতে পারেন। আপনার জিজ্ঞাসা ত একটাই, নয় কি?'

'তিনটে—ডাকাতের পরিচয়, খুনীর পরিচয় এবং কখন কী ভাবে খুনটা হয়।'

'উত্তম,' বললেন মৃগাঙ্কবাবু।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেও তুলসীবাবু এলেন না দেখে মৃগাঙ্কবাবু কাজ আরম্ভ করে দেওয়া স্থির করলেন। মনে মনে বললাম—তুলসীবাবু এ জিনিস অনেক দেখেছেন, তাঁর পুরোটা না দেখলেও চলবে।

'অনুগ্রহ করে আপনাদিগের প্রত্যেকের হস্তদ্বয় অঙ্গুলি প্রসারিত করে এই টেবিলের উপর স্থাপন করুন।'

কাঠের টেবিলে হাতগুলো রাখার সংগে সঙ্গে যে একটা টক্ টক্ শব্দ শুরু হল সেটা আর কিছুই না, লালমোহনবাবুর কাঁপা আঙুলে টেবিলের উপর তবলার বোল তুলে ফেলছে। ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত চেপে হাত স্টেডি করলেন।

মৃগাঙ্কবাবুর চোখ বন্ধ, ঠোঁট নড়ছে। চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ বলেই বুঝলাম উনি ফিস্ ফিস্ করে একটা শ্লোক আওড়াচ্ছেন।

এক মিনিট পরে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এবারে যাকে ইংরিজিতে বলে ডেথলি সাইলেন্স। পিদিমের শিখা কাঁপছে, আর তার চার পাশে ঘুর ঘুর করছে তিনটে ফড়িং। ঘরের চারিদিকের দেয়ালে চারটে মানুষের ছায়া থর থর করে কাঁপছে। আড়চোখে ফেলুদার দিকে চেয়ে তার মনের অবস্থা কিছু বুঝতে পারলাম না। চোয়াল শক্ত, চোখের পাতা প্রায় পড়ছেই না, দৃষ্টি সটান মৃগাঙ্কবাবুর দিকে। মৃগাঙ্কবাবু নিজে যেন পাথরের মূর্তি। এর মধ্যে কখন যে পেনসিলটা তার হাতে চলে গেছে জানি না। সেটা এখন খাতার সাদা পাতার উপর ধরা, শিসের ডগাটা ঠেকে রয়েছে কাগজের সঙ্গে।

এবার মৃগাঙ্কবাবুর ঠোঁটে কাঁপুনি আরম্ভ হল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আমার পাশে আবার তবলার বোল শুরু হয়েছে, এখন আওয়াজটা রীতিমত ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। অনেকেরই এ অবস্থায় এভাবে হাত কাঁপতে পারে, যদিও আমার কাঁপছে শুধু বুক।

'জীবনলাল, জীবনলাল, জীবনলাল......'

তিনবার পর পর অতি আস্তে উচ্চারণ হল নামটা। মৃগাঙ্কবাবুর ঠোঁটটা নড়ল কি না তাও ভালো করে বুঝতে পারলাম না। 'এসেছেন? আপনি এসেছেন?'

প্রশ্ন এল আমাদের চমকে দিয়ে আমাদের পিছন থেকে। এইবারে বুঝলাম

নিত্যানন্দের ভূমিকাটা কী। মৃগাঙ্কবাবু নিজে এই অবস্থায় কথা বলেন না। হয়ত বলা সম্ভবই না। ‘এসেছি।’

ফেলুদার প্রশ্নও খাতায় লেখা হয়েছে, ফেলুদা সেটাই পড়ে বলেছে।

আমার চোখ মৃগাঙ্কবাবুর হাতের দিকে গেল। পিছন থেকে প্রশ্ন এল, ‘তুমি কেমন আছ?’

‘ভালই’—পড়ে বলল ফেলুদা।

‘কতগুলি প্রশ্ন তোমাকে করা হবে, সেগুলোর জবাব দিতে পারবে? পেনসিল নড়ল।

‘পারব’—পড়ে বলল ফেলুদা।

‘সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে?’ ‘আমি।’

‘তোমাকে যে হত্যা করল, তাকে দেখেছিলে?’ ‘হ্যাঁ।’

‘চিনেছিলে?’ ‘হ্যাঁ।’

‘কে সে?’ ‘বাবা।’

কিন্তু কী ভাবে খুনটা করা হল সেটা আর জানা হল না, কারণ প্রশ্নটা হবার সঙ্গে সঙ্গে ‘এতেই হবে’ বলে ফেলুদা উঠে দাঁড়াল! তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ‘তোপ্‌সে, ওই লণ্ঠনটা আন ত—দরজার বাইরে রাখা রয়েছে। আলো বড্ড কম।’

আমি ভ্যাবাচ্যাকা, লণ্ঠনটা এনে টেবিলের উপরে রাখলাম।

ফেলুদা মৃগাঙ্কবাবুর সামনে থেকে কাগজটা তুলে নিল। তারপর উত্তরগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ‘মৃগাঙ্কবাবু, আমার মনে হচ্ছে আপনার এই আত্মাটি এখনো ঠিক ত্রিকালজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ প্রশ্নোত্তরে কতগুলো গোলমাল পাচ্ছি।’

মৃগাঙ্কবাবু কটমট করে ফেলুদার দিকে চাইলেন, যেন এক চাহনিতে ফেলুদাকে ভস্ম করবেন। ফেলুদা তাঁকে অগ্রাহ্য করে বলে চলল, ‘যেমন, তাকে জিগেস করা হচ্ছে সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে, উত্তর হচ্ছে—‘আমি’। কিন্তু সিন্দুকে ত টাকা ছিল না মৃগাঙ্কবাবু!’

ম্যাজিকের মতো মৃগাঙ্কবাবুর মুখ থেকে ক্রোধের ভাবটা চলে গিয়ে সেখানে দেখা দিল সংশয়। ফেলুদা বলল, ‘টাকা ছিল না বলছি এই কারণে যে সিন্দুক খুলেছিল জীবনলাল নয়, খুলেছিল প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। অবিশ্যি জীবনবাবু এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনিই মাঝরাত্তিরে দরজা খুলে আমাকে ঢুকতে দেন, তিনিই বলে দেন যে তাঁর বাবার বালিশের তলায় থাকে সিন্দুকের চাবি; ভোলানাথবাবু আর শ্যামলালবাবুকে বাঁধার ব্যাপারেও অবিশ্যি তিনি আমাকে সাহায্য করেন। যাই হোক্, সিন্দুকে টাকার বদলে

যেটা ছিল সেটা হল—'

ফেলুদা পকেট থেকে আরেকটা কাগজ বের করল। এটাও খাতার কাগজ, এটাতেও পেন্সিল দিয়ে লেখা।

'এই কাগজটাই,' বলল ফেলুদা, 'শ্যামলালবাবুর কাছ থেকে চেয়ে আমি পাইনি। এটার প্রয়োজন হয়েছিল এই কারণেই যে মৃগাঙ্কবাবুর সততা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল, আর সেটা হয়েছিল একেবারে প্রথম দিনের সাক্ষাতের পরেই। আমার সঙ্গে আলাপ হবার পরমুহূর্তেই তিনি ভান করলেন যে আমার নাম এবং পেশা তিনি অলৌকিক উপায়ে জেনে ফেলেছেন। আসলে এগুলো কিন্তু তাঁকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন তুলসীবাবু। তাই নয়, তুলসীবাবু?'

তুলসীবাবু এর মধ্যে কখন যে অন্ধকারে ঘরে ঢুকে মোড়ায় বসেছেন তা দেখিইনি। ভদ্রলোক ফেলুদার কথায় ভারি অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে বললেন, 'মানে আপনার মনে, ইয়ে, যদি একটু ভক্তিভাব জাগে...'

ফেলুদা তাঁকে থামিয়ে বলল, 'দোষ আমি আপনাকে দিচ্ছি না তুলসীবাবু। আপনি ত আর নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন না। কিন্তু ইনি করেন। যাই হোক, এই ভণ্ডামীর গন্ধ পেয়েই আমি কাগজটা পেতে বদ্ধ-পরিকর। আমার আশা ছিল শ্যামলালবাবু সম্পর্কে কয়েকটা খট্‌কার উত্তর আমি এই কাগজে পাব।'

পিদিমের আলোতেও বুঝতে পারলাম মৃগাঙ্কবাবুর কপাল ঘেমে গেছে। ফেলুদা কাগজটা আলোয় ধরে বলল, 'দুর্লভ মল্লিকের আত্মা এই কাগজে তাঁর ছেলের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নগুলো মুখে করা হয়েছিল, তাই এতে লেখা নেই; কিন্তু উত্তরগুলো থেকে প্রশ্নগুলো অনুমান করা যায়। আমি উত্তরের পাশে পাশে সেগুলো লিখেছি, এবং সেই ভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি; আমার ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন মৃগাঙ্কবাবু।'

মৃগাঙ্কবাবুর দ্রুত নিশ্বাসে প্রদীপের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফেলুদা পড়া আরম্ভ করল—

'এক নম্বর প্রশ্ন—আমার শত্রু কে? উত্তর—ঘরেই আছে।

সে কি আমার মৃত্যু কামনা করে—না। তবে কী চায়?—টাকা। টাকা রক্ষার উপায় কি?—সিন্দুকে রেখো না। কোথায় রাখব?—মাটির নিচে। কোনখানে?—বাগানে। বাগানের কোথায়?—উত্তরে। উত্তরে কোথায়?—আম গাছের নিচে। কোন্ আম গাছ?—দেয়ালের ফাটলের ধারে।'

ফেলুদা এবার হাতের কাগজটা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'শ্যামলালবাবুর পায়ের তলায় মাটি এবং গায়ে মশার কামড় দেখে মনে হয়েছিল তিনি কোনো

কারণে বাগানে গিয়ে সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন। আজ জানি তিনি এই কাগজের—অর্থাৎ মৃগাঙ্কবাবুর—নির্দেশ অনুযায়ী সিন্দুক থেকে টাকার বাক্স বার করে মাটিতে পুঁততে গিয়েছিলেন। টাকা লুকিয়ে রাখার এই প্রাচীন পন্থা শ্যামলালবাবুর মনঃপূত হবে এটা মৃগাঙ্কবাবু বুঝেছিলেন। এই টাকার উপর মৃগাঙ্কবাবুর লোভ অনেক দিনের, কিন্তু বিশ্বস্ত ভোলানাথ যদ্দিন আছেন তদ্দিন সিন্দুকের নাগাল পাওয়া অসম্ভব। প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন ভোলানাথবাবুর উপর শ্যামলালের সন্দেহ ফেলে তাকে হটানোর। সেটা সফল হয়নি। কিন্তু সেই সময় আশ্চর্য সুযোগ এসে যায়। শ্যামলালবাবু নিজেই মৃগাঙ্কবাবুকে ডেকে পাঠান আত্মা নামানোর জন্য। মৃগাঙ্কবাবু তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধি বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারেন ; শ্যামলালের ঘরের লোককেই শ্যামলালের শত্রু করে দেন, এবং টাকার বাক্স সিন্দুক থেকে বার করিয়ে বাগানে আনান। সেই বাক্স কাল সন্ধ্যাবেলা—'

একটা শব্দ শুনে পিছন ফেরে দেখি ভাগ্নে বেঞ্চি ছেড়ে দরজার দিকে একটা লাফ মেরেছে। কিন্তু ঘর থেকে বেরোন আর হল না কারণ দুটো শক্ত হাত তাকে বাধা দিয়েছে। এবার হাতের মালিক ভাগ্নে সমেত ভিতরে ঢুকলেন। আরেব্বাস—এ যে সুধাকর দারোগা! দারোগা বললেন, 'বাক্সটা পেয়েছি মিস্টার মিত্তির ; একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে কাপড়ের নীচে রাখা ছিল। মনীশ—দাও ত!'

একজন কনস্টেবল একটা স্টীলের বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকে সেটাকে টেবিলের উপর রাখল।

'এর ডালা ত ভেঙেই ফেলা হয়েছে দেখছি,' বলল ফেলুদা।

বাক্স খুলতে লণ্ঠন আর পিদিমের আলোয় তাড়া তাড়া একশো টাকার নোট দেখেই বুঝলাম এত টাকা আমি একসঙ্গে কখনো দেখিনি।

'কিন্তু খুন?' হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন মৃগাঙ্কবাবু। 'খুন করল কে? খুন ত আমি করিনি!'

'খুন একজনই করেছে মৃগাঙ্কবাবু!'—ফেলুদার গলা যেন খাপখোলা তলোয়ার—'এবং তারও নাম প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। খুন হয়েছে আপনার ভণ্ডামী, আপনার শয়তানী, আপনার লোভ। এর কোনোটাই আর কোনোদিনও মাথা তুলতে পারবে না, কারণ সকলেই জানবে যে আপনি আজ অপূর্ব ক্ষমতাবলে একটি জীবন্ত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোক থেকে ডেকে এনেছেন আপনার এই ঘরে—আসুন, জীবনবাবু!'

এবার পিছন নয়, সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন জীবনলাল মল্লিক। এঁকে দেখেই মৃগাঙ্কবাবু যে কথাটা বলে আর্তনাদ করলেন, সেটা লালমোহনবাবুর

বিশ্বাস 'হা হতোঽস্মি', কিন্তু আমি যেন শুনলাম 'হায়! হাতে হাতকড়া!'

* * *

অবিশ্যি হাতে হাতকড়া পড়েছিল ঠিকই। সুধাকরবাবু শুধু একটা অভি-যোগ করলেন ফেলুদাকে—'মিছিমিছি দুটো পুকুরে জাল ফেলালেন আমাদের দিয়ে!'

'কী বলছেন সুধাকরবাবু,' বলল ফেলুদা, 'জীবনবাবু খুন হয়েছে এ ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল না হলে মৃগাঙ্কবাবুর ভণ্ডামী হাতেনাতে ধরব কী করে?'

জীবনবাবু খুনের ব্যাপারটা শুধুই মৃগাঙ্কবাবুকে সায়েস্তা করার জন্য। একেবারে প্ল্যান করে ভাঁওতা। এদিকে আমি আর ফেলুদা, আর ওদিকে লালমোহনবাবু ও ভোলানাথবাবু চলে যাওয়া মাত্র ভদ্রলোক বাগান থেকে উঠে বাড়িতে ফিরে গিয়ে দোতলার পিছন দিকের একটা গুদোম ঘরে গা ঢাকা দেন। যাবার পথে ঠাকুমা দেখে ফেলেছিলেন, কিন্তু সেটা ফেলুদা ম্যানেজ করে। আজ সন্ধ্যায় তিনি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন মৃগাঙ্কবাবুর বৈঠকের শেষে আত্মপ্রকাশ করবেন বলে। সেই সময় বাঁশ বনে দূর থেকে আমাদের দেখে বাদুড়ে কালীমন্দিরে ঢুকে মড়া সেজে পড়ে থাকতে হয়।

রাত্রে খাবার সময় তুলসীবাবু কাঁচুমাচু ভাব করে ফেলুদাকে বললেন, 'আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হন নি ত?'

'অসন্তুষ্ট?' বলল ফেলুদা, 'আপনি আমাকে কতটা হেল্‌প করেছেন জানেন? লোকটা সেদিন আমার নাম নিয়ে হেঁয়ালি না করলে ত ওর ওপর আমার সন্দেহই পড়ত না! আমার ত আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

আজ জীবনবাবু আমাদের বাড়িতে খাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমি বেরোবার আগে বাবাকে প্রণাম করে এলাম।'

'কী মনে হল?' জিগোস করল ফেলুদা।

'তাজ্জব বনে গেলাম,' বললেন জীবনবাবু। 'আমার মাথায় হাত বুলিয়ে জিগোস করলেন ব্যবসা কেমন চলছে।'

লালমোহনবাবু এতক্ষণ মাছের মুড়ো চিবোচ্ছিলেন বলে কিছু বলেন নি। এবার তুলসীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে কালকের ইয়েটা—?'

'হচ্ছে বৈকি। এখন ত আর কোনো বাধা নেই!'

'ভেরি গুড। আমার ইয়েটাও রেডি আছে।'

॥ শেষ ॥

গোরস্থানে সাবধান

সত্যজিৎ রায়

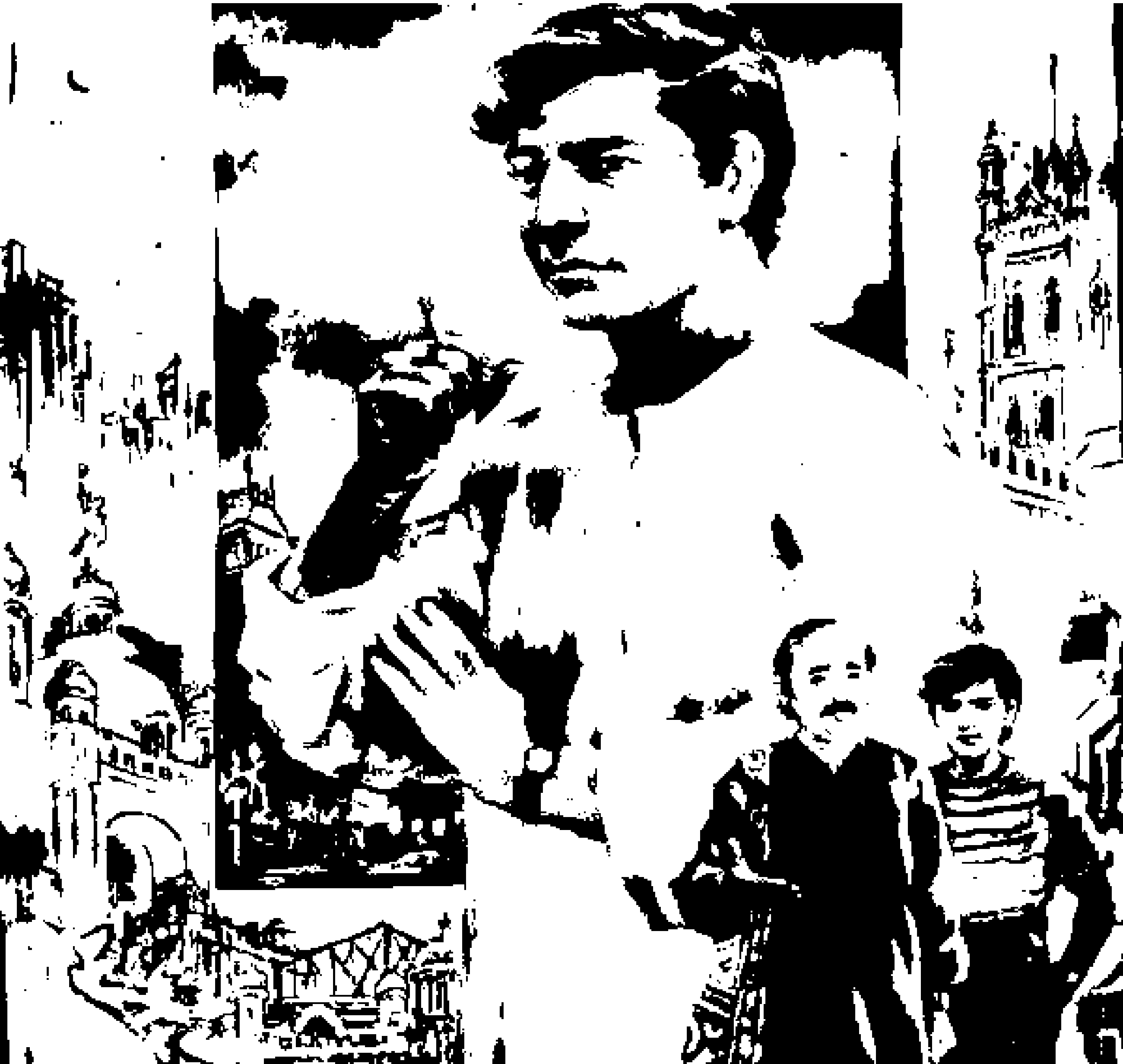

গোরস্থানে সাবধান

॥ ১ ॥

রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলীর লেখা গল্প থেকে বম্বের ফিল্ম পরিচালক পুলক ঘোষালের তৈরি ছবি কলকাতার প্যারাডাইস সিনেমায় জুবিলি করার ঠিক তিন দিন পরে বিকেল বেলা উৎকট সারেগামা হর্ন বাজিয়ে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মার্ক টু অ্যাম্বাসাডর গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা জানতাম যে লালমোহনবাবু একটা গাড়ি কেনার তাল করছেন, কিন্তু ঘটনাটা যে এত চট করে ঘটে যাবে সেটা ভাবিনি। অবিশ্যি শুধু যে গাড়িই কেনা হয়েছে তা নয়; তার সঙ্গে একটি ড্রাইভারও রাখা হয়েছে, কারণ লালমোহনবাবু গাড়ি চালাতে জানেন না। এমনকী শেখার ইচ্ছেটাও নেই। একথাটা তিনি এতবার আমাদের বলেছেন যে, শেষটায় একদিন ফেলুদাকে বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে হল, 'কেন মশাই, শিখবেন না কেন?' তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে, বছর পাঁচেক আগে নাকি এক বন্ধুর গাড়িতে শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। দু দিন শিখে থার্ড দিনে একটা চমৎকার গল্পের প্লট মাথায় নিয়ে ফার্স্ট গিয়ার থেকে সেকেন্ড গিয়ারে যেতে গাড়িটা এমন হ্যাঁচকা মারল যে প্লটের সেই বেমালুম হাওয়া। 'সে-আপশোস আমার আজও যায়নি মশাই।'

সাদা শার্ট আর খাকি প্যান্ট-পরা ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে দিতে লালমোহনবাবু একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে রাস্তায় নামতে গিয়ে ধুতির কোঁচায় পা আটকে খানিকটা বেসামাল হলেও তাঁর মুখ থেকে হাসিটা গেল না। ফেলুদা কিন্তু গম্ভীর। তিনজনে ঘরে এসে বসার পর

সে মৃদু বলল।

'আপনার ওই বিটকেল হর্নটা পালটিয়ে সাধারণ, সভ্য হর্ন না-লাগানো পর্যন্ত রজনী সেন রোডে ও-গাড়ির প্রবেশ নিষেধ।'

জটায়ু জিভ কাটলেন। 'আমি জানতুম ব্যাপারটা একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে; যখন ডিমনস্ট্রেট করলে না?—তখন লোভ সামলাতে পারলুম না।—জাপানি, জানেন তো?'

'কান-কাটানি হাড়-জ্বালানি', বলল ফেলুদা। 'আপনার উপর হিন্দি ফিল্মের প্রভাব এতটা ঝটিতি পড়বে সেটা ভাবতে পারিনি। আর রংটাও ইকুয়্যালি পীড়াদায়ক। মাদ্রাজি ফিল্ম-মার্কা।'

লালমোহনবাবু কাতরভাবে হাত জোড় করলেন। 'দোহাই মিস্টার মিত্তির! হর্ন আমি কালই চেঞ্জ করছি, কিন্তু রংটা রাখতে দিন। গ্রিনটা বড় সুদিং।'

ফেলুদা হাল ছেড়ে দিয়ে চায়ের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল, লালমোহনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটা এখন বাদ দিন; আগে চলুন একবারটি চক্কর মেরে আসি। আপনাকে আর তপেশবাবুকে না-চড়ানো অবধি আমার ঠিক স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে না। বলুন কোথায় যাবেন।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। একটু ভেবে বলল, 'তোপ্‌সেকে একবার চার্নকের সমাধিটা দেখিয়ে আনব ভাবছিলাম।'

'চার্নক? জব চার্নক?'

'না।'

'তবে? চার্নক আরও আছে নাকি?'

'আরও নিশ্চয়ই আছে, তবে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা চার্নক একজনই।'

'তাই তো—মানে...'

'তার নাম জব নয়, জোব। জব হল কাজ, চাকরি; আর জোব হল নাম। যে ভুলটা আর পাঁচজনে করে সেটা আপনি করবেন কেন?'

এখানে বলে রাখি ফেলুদার লেটেস্ট নেশা হল পুরনো কলকাতা। ফ্যান্সি লেনে একটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ও যখন জানল যে ফ্যান্সি হচ্ছে আসলে ফাঁসি, আর এই অঞ্চলেই দুশো বছর আগে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল, তখন থেকেই নেশাটা ধরে। গত তিন মাসে ও এই

নিয়ে যে কত বই পড়েছে, ম্যাপ দেখেছে, ছবি দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। অবিশ্যি এই সুযোগে আমারও অনেক কিছু জানা হয়ে যাচ্ছে, আর তার বেশির ভাগটা হয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দুটো দুপুর কাটিয়ে।

ফেলুদা বলে দিল্লি-আগ্রার তুলনায় কলকাতা খোকা-শহর হলেও এটাকে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। এখানে তাজমহল নেই, কুতুবমিনার নেই, যোধপুর-জয়সলমীরের মতো কেল্লা নেই, বিশ্বনাথের গলি নেই—এ সবই ঠিক—'কিন্তু ভেবে দ্যাখ তোপ্‌সে—একটা সাহেব মশা মাছি সাপ ব্যাঙ বন-বাদাড়ে ভরা মাঠের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে বসে ভাবল এখানে সে কুঠির পত্তন করবে, আর দেখতে দেখতে বন-বাদাড় সাফ হয়ে গিয়ে সেখানে দালান উঠল, রাস্তা হল, রাস্তার ধারে লাইন করে গ্যাসের বাতি বসল, সেই রাস্তায় ঘোড়া ছুটল, পাল্কি ছুটল, আর একশো বছর যেতে না যেতে গড়ে উঠল এমন একটা শহর যার নাম হয়ে গেল সিটি অফ প্যালেসেস। এখন সে শহরের কী ছিরি হয়েছে সেটা কথা নয়; আমি বলছি ইতিহাসের কথা। শহরের রাস্তার নাম পালটে এরা সেই ইতিহাস মুছে ফেলতে চাইছে—কিন্তু সেটা কি উচিত? বা সেটা কি সম্ভব? অবিশ্যি সাহেবেরা তাদের সুবিধের জন্যই এত সব করেছিল, কিন্তু যদি না করত, তাহলে ফেলু মিত্তির এখন কী করত ভেবে দ্যাখ। ছবিটা একবার কল্পনা করে দ্যাখ—তোর ফেলুদা—প্রদোষচন্দ্র মিত্র, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর—ঘাড় গুঁজে কলম পিশছে কোনও জমিদারি সেরেস্তায়, যেখানে ফিংগার প্রিন্ট বললে বুঝবে টিপসই!'

বিবিডি বাগ—যার নাম ছিল ডালহৌসি স্কোয়ার—যে ডালহৌসি আমাদের দেশে লাটসাহেব হয়ে এসে গপাগপ্ রাজ্য গিলেছে, আর সেই সঙ্গে প্রথম রেলগাড়ি আর প্রথম টেলিগ্রাফ চালু করেছে—সেই বিবিডি বাগে দুশো বছরের পুরনো সেন্ট জন্স চার্চের কম্পাউন্ডে কলকাতার প্রথম ইটের বাড়ি জোব চার্নকের সমাধি দেখে লালমোহনবাবু যদিও বললেন 'থ্রিলিং', আমার কিন্তু মনে হল সেটা আকাশে মেঘের ঘনঘটা আর সেই সঙ্গে একটা গুরু-গম্ভীর গর্জনের জন্য। সমাধির গায়ে একটা মার্বেলের ফলকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে

থেকে ভদ্রলোক বললেন, 'এ তো দেখছি জোনও নয় মশাই — জোনস্। ব্যাপার কী বলুন তো?'

'জোনস্ হল জোনের ল্যাটিন সংস্করণ', বলল ফেলুদা। 'পুরো লেখাটাই ল্যাটিনে সেটা বুঝতে পারছেন না?'

'ল্যাটিন-স্যাটিন জানি না মশাই; ইংরিজি নয় এটা বুঝতেই পারছি। নামের উপর ডি ও-এম লেখা কেন?'

'ডি-ও-এম হচ্ছে ডমিনুস অমনিউম ম্যাজিস্টের। অর্থাৎ ঈশ্বর সকলের কর্তা। আর তার নীচে যে কথাগুলো রয়েছে তার একটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। Marmore। মর্মর-সৌধ জানেন তো? সেই মর্মর আর এই মারমোরে একই জিনিস—মার্বল। আর আরও মজা হচ্ছে এই যে, মর্মর কথাটা সংস্কৃত নয়, ফারসি। অথচ সৌধ হল সংস্কৃত। এইভাবে সংস্কৃত-ফারসি সংস্কৃত-আরবি আমরা দিব্যি জোড়া লাগিয়ে চালিয়ে দিই। যেমন, শলাপরামর্শ। শলা হল সলাহ্—অর্থাৎ পরামর্শ, ফারসি কথা; পরামর্শ সংস্কৃত। বা কাগজপত্র—কাগজ আরবি, পত্র সংস্কৃত। তারপর আবার—'

ফেলুদার লেকচার শেষ হল না, কারণ কথা নেই বার্তা নেই উঠল এমন এক ধুলোর ঝড় (জটায়ু বললেন 'প্রলয়ঙ্কর') যেমন আমি আর কোনওদিন দেখিনি। আমরা পড়ি-কি-মরি করে লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যামবাসাডরে গিয়ে উঠলাম, আর ড্রাইভার হরিপদবাবু গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন এসপ্ল্যানেডের দিকে। এই প্রথম দেখলাম ধুলোর জন্য অক্টার—থুড়ি—শহিদ মিনারটা আর দেখা যাচ্ছে না। হাওয়ার তেজ কত বুঝতে পারছি না। কারণ গাড়ির কাচ তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে এটা দেখলাম যে, চানাচুরওয়ালারা যে সরু লম্বা বেতের মোড়ার মতো স্ট্যান্ডের উপর তাদের জিনিসপত্র রাখে, তারই একটা গড়ের মাঠের দিক থেকে শূন্য দিয়ে পাক খেতে খেতে উড়ে এসে আমাদের ঠিক সামনে একটা চলন্ত ডবল ডেকারের দোতলায় আছড়ে পড়ে পরক্ষণেই আবার ছাড়া পেয়ে কার্জন পার্কের দিকে উড়ে গেল।

পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে দেখি ট্রাম বন্ধ, কারণ একটা দেবদারু গাছ ভেঙে লাইনের উপর পড়েছে; ফেলুদার ইচ্ছে ছিল আমাদের পার্ক স্ট্রিটের পুরনো গোরস্থানটা দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু সেটা আর এই

ঝড়ের জন্য হল না। যদি যেতাম, তা হলে হয়তো একটা ঘটনা চোখের সামনে দেখতে পেতাম—যেটার বিষয় পরদিন সকালে কাগজে বেরোল। চল্লিশ বছরের এই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে ('উইন্ড ভেলসিটি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টিফাইভ কিলোমিটার্স পার আওয়ার') সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে একটা গাছ ভেঙে পড়ে নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে গুরুতরভাবে জখম করে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিশ্যি তিনি সন্ধ্যাবেলা এই আদ্যিকালের গোরস্থানে কী করছিলেন সে খবর কাগজে লেখেনি।

॥ ২ ॥

পরদিন সকাল আর দুপুরের অর্ধেকটা বাদলার উপর দিয়েই গেল। ফেলুদা কোত্থেকে জানি একটা ১৯৩২ সালের ক্যালকাটা অ্যান্ড হাওড়ার ম্যাপ জোগাড় করেছে; দুপুরে খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খেয়ে পান মুখে পুরে একটা চারমিনার ধরিয়ে ও ম্যাপটার ভাঁজ খুলল। সেটাকে মাটিতে বিছনোর জন্য টেবিল চেয়ার সব ঠেলে দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে মেঝের মাঝখানে ছ-ফুট বাই ছ-ফুট জায়গা করতে হল। ম্যাপের উপর হামাগুড়ি দিয়ে আমরা কলকাতার রাস্তাঘাট দেখছি, ফেলুদা বলছে 'রজনী সেন খুঁজিস না, এ অঞ্চলটা তখন জঙ্গল,' এমন সময় জটায়ু এলেন। আজ আর ধুতি-পাঞ্জাবি নয়, গাঢ় নীল টেরিকটের প্যান্ট আর হলদে বুশ শার্ট। 'ছিয়াত্তরটা গাছ পড়েছে কালকের ঝড়ে' ঢুকেই ঘোষণা করলেন ভদ্রলোক। 'আর আপনার কথা রেখেছি মশাই, এখন আর হর্ন শুনলে হিন্দি ফিল্মের কথা মনে পড়বে না।'

আজ তাড়া নেই, তাই চা খেয়ে বেরোনো হল। ছিয়াত্তরটা গাছ পড়ার খবর কাগজে পড়ে বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু পার্ক স্ট্রিট থেকে নিজের চোখে উনিশটা গাছ বা গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখলাম, তার মধ্যে সাদার্ন অ্যাভিনিউতেই তিনটে। তাও তো এর মধ্যে কত ডালপালা সরিয়ে ফেলা হয়েছে কে জানে।

গোরস্থানের গেটের সামনে যখন পৌঁছলাম (এখনে আসছি সেটা

ক্যামাক স্ট্রিটের আগে (ফেলুদা আমাদের বলেনি) তখন জটায়ুর দিকে চেয়ে দেখি তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্তি ভাবটা যেন একটু কম। ফেলুদা তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতে ভদ্রলোক বললেন, 'একবার এক সাহেবকে কবর দিতে দেখেছিলুম—কাটিহারে— রাঁচিতে। কাঠের বাক্সটা গর্তে নামিয়ে যখন তার উপর চাবড়া চাবড়া মাটি ফেলে না, সে এক বীভৎস শব্দ মশাই।'

'সে শব্দ এখানে শোনার কোনও সম্ভাবনা নেই,' বলল ফেলুদা। 'এই গোরস্থানে গত দেড়শো বছরে কোনও মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হয়নি।'

গেট দিয়ে ঢুকতেই ডাইনে দারোয়ানের ঘর। দিনের বেলা যে-কেউ এ গোরস্থানে ঢুকতে পারে, তাই দারোয়ানের বোধহয় বিশেষ কোনও কাজ নেই। 'তবে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা। 'একটা ব্যাপারে একটু নজর রাখতে হয়—যাতে সমাধির গা থেকে কেউ মার্বেলের ফলক খুলে না নেয়। ভালো ইটালিয়ান মার্বেল বাজারে বিক্রি করলে বেশ দু পয়সা আসে।—দারোয়ান!'

দারোয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখে বলে দিতে হয় না সে বিহারের লোক; খৈনিটা সবে হয় সবেমাত্র পুরেছে মুখে।

'কাল এখানে একজন বাঙালিবাবু জখম হয়েছেন—মাথায় গাছ পড়ে?'

'হাঁ বাবু।'

'সে জায়গাটা দেখা যায়?'

'উয়ো রাস্তাসে সিধা চলিয়ে যান—একদম এন্ড তক্। বাঁয়ে ঘুমনেই দেখতে পাবেন। অভিতক্ পড়া হুয়া হ্যায় পেড়।'

আমরা তিনজন ঘাস-গজিয়ে-যাওয়া বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দু দিকে সমাধির সারি—তার এক একটা বারো-চোদ্দ হাত উঁচু। ডাইনে কিছু দূরে একটা সমাধি প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। ফেলুদা বলল, ওটা খুব সম্ভবত পণ্ডিত উইলিয়াম জোন্স-এর সমাধি, ওর চেয়ে উঁচু সমাধি নাকি কলকাতায় আর নেই।'

প্রত্যেকটা সমাধির গায়ে সাদা কিংবা কালো মার্বেলের ফলকে মৃতব্যক্তির নাম, জন্মের তারিখ, আর মৃত্যুর তারিখ, আর সেই সঙ্গে

আরও কিছু লেখা। কয়েকটা বড় ফলকে দেখলাম অনেক কথায় জীবনী পর্যন্ত লেখা রয়েছে। বেশির ভাগ সমাধিই চারকোনা থামের মতো, নীচে চওড়া থেকে উপরে সরু হয়ে উঠেছে। লালমোহনবাবু সেগুলোকে বললেন বোতাম-পরা ভূত। কথাটা খুব খারাপ বলেননি, যদিও এ ভূতের নড়াচড়ার উপায় নেই। এ ভূত প্রহরী ভূত; মাটির নীচে কফিনবন্দি হয়ে যিনি শুয়ে আছেন তাঁকেই যেন গার্ড করছেন এই ভূত। 'এই স্তম্ভগুলোর ইংরিজি নামটা জেনে রাখ তোপ্‌সে। একে বলে ওবেলিস্ক।' লালমোহনবাবু বার পাঁচেক কথাটা আউড়ে নিলেন। আমি বাঁ-দিক ডান-দিক চোখ ঘোরাচ্ছি আর ফলকের নামগুলো বিড়বিড় করছি—জ্যাকসন, ওয়াট্‌স, ওয়েলস, লারকিন্‌স, গিবন্‌স, ওল্ডহ্যাম...। মাঝে মাঝে দেখছি পাশাপাশি একই নামের বেশ কয়েকটি সমাধি রয়েছে—বোঝা যাচ্ছে সবাই একই পরিবারের লোক। সবচেয়ে আগের তারিখ যা এখন পর্যন্ত চোখে পড়েছে তা হল ২৮শে জুলাই ১৭৭৭। তার মানে ফরাসি বিপ্লবেরও বারো বছর আগে।

রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে বুঝতে পারলাম গোরস্থানটা কত বড়। পার্ক স্ট্রিটের ট্রাফিকের শব্দ এখানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ফেলুদা পরে বলেছিল, এখানে নাকি দু হাজারের বেশি সমাধি আছে। লালমোহনবাবু গোরার সার্কুলার রোডের দিকটায় গোরস্থানের গায়ে-লাগা একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে দেখিয়ে বললেন, ওঁকে লাখ টাকা দিলেও নাকি উনি ওখানে থাকবেন না।

গাছ যেটা ভেঙেছে বলে কাগজে বেরিয়েছে, সেটা আসলে শাখা-প্রশাখা সমেত একটা প্রকাণ্ড আম গাছের ডাল। সেটা পড়েছে একটা সমাধির বেশ খানিকটা ধ্বংস করে। এ ছাড়াও আরও অনেক ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

আমরা সমাধিটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

এটা অন্যগুলোর তুলনায় বেঁটে, লালমোহনবাবুর কাঁধ অবধি আসবে বড় জোর। বোঝা যায় এমনিতেই সেটার অবস্থা বেশ কাহিল ছিল। যেদিকে ডালের ঘা লাগেনি সেদিকটাও ফাটল ধরে চৌচির হয়ে আছে, পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে আছে। ঘা লাগার দরুন শ্বেত পাথরের ফলকটাও ভেঙেছে; তার খানিকটা সমাধির গায়ে এখনও

ভেঙে আছে, বাকিটা আট-দশ টুকরো হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে। বৃষ্টি হয়ে চারদিকটা এমনিতেই জলকাদায় ভরা, কিন্তু এখানে যেন কাদাটা অন্য জায়গার চেয়ে একটু বেশি। 'আশ্চর্য', বললেন লালমোহনবাবু, 'গড কথাটা কিন্তু এখনও সমাধির গায়ে লেগে আছে।'

'শুধু গড নয়,' বলল ফেলুদা, 'তার নীচে সালের অংশ দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই।'

'ইয়েস। ওয়ান এইট-ফাইভ—তারপর ভাঙা। বোঝাই যাচ্ছে এই গড হল আপনার সেই ঈশ্বর সকলের কর্তা র গড।'

'তাই কি?'

ফেলুদার প্রশ্ন শুনে তার দিকে চাইলাম। তার ভুরু কুঁচকোনো। বলল, 'আপনি অন্য সমাধিগুলো বিশেষ মন দিয়ে দেখেননি দেখছি। দেখুন না ওই পাশেরটার দিকে।'

পাশেই আরেকটা বড় সমাধি রয়েছে। তার ফলকে লেখা —

To the Memory of

Capt. P. O'reilly, H. M. 44th Regt.

who died 25th May, 1823 aged 38 years

'লক্ষ করুন, নামের নীচেই আসছে সাল-তারিখ। বেশির ভাগ ফলকেই তাই। আর, গড কথাটা অন্য কোনও ফলকে দেখেছেন কি?'

ফেলুদা ঠিকই বলেছে। এই পর্যন্ত আসার মধ্যে আমি নিজেই অন্তত ত্রিশটা ফলকের লেখা পড়েছি, কিন্তু কোনওটাতেই গড দেখিনি।

'তার মানে বলছেন, গড হল মৃতব্যক্তির নাম?'

'গড কারুর নাম হয় বলে আমার মনে হয় না, যদিও ঈশ্বর বা ভগবান নামটা হিন্দুদের মধ্যে আছে। লক্ষ করুন, গড-এর জি-এর বাঁ দিকে ইঞ্চি-খানেক ফাঁক দেখা যাচ্ছে—অর্থাৎ বাঁ-দিকে ওর গায়ে গায়ে কোনও অক্ষর ছিল না। কিন্তু ডি-এর ডান দিকটায় ফাঁক আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ সে জায়গার পাথরটা ভেঙে পড়ে গেছে। আমার ধারণা এটা যার কবর তার পদবির প্রথম তিনটে অক্ষর হল জি ও ডি; যেমন গডফ্রি বা গডার্ড।'

'সে তো পাথরের টুকরোগুলো জড়ো করে পাশাপাশি—'

লালমোহনবাবু কথাটা বলতে বলতে ভাঙা ডালপালার উপর দিয়ে সমাধিটার দিকে এগিয়ে তার ধারে পৌঁছোতেই হঠাৎ সড়াৎ করে খানিকটা নীচের দিকে নেমে গেলেন। গর্তে পা পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনি। কিন্তু ফেলুদা ঠিক সময়ে তার লম্বা হাত দুটি বাড়িয়ে তাঁকে খপ্ করে ধরে টেনে তুলে শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে দিল। ব্যাপারটা কী? ওখানে গর্ত হল কী করে? 'কেমন যেন খটকা লাগছিল,' বলল ফেলুদা, 'ভাঙল আমগাছ, অথচ আমপাতার সঙ্গে জাম-কাঁঠাল কী করছে তাই ভাবছিলাম।'

লালমোহনবাবু এমনিতেই গোরস্থানে এসে একটু গুম্ মেরে গিয়েছিলেন, তার উপর এই ব্যাপার। প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে 'এ একটু বাড়াবাড়ি মশাই' বলে ভদ্রলোক একপাশে সরে গিয়ে আমাদের দিকে পেছন করে বোধহয় নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন।

'তোপ্‌সে—খুব সাবধানে ডালপালাগুলো সরা তো।'

আমি আর ফেলুদা গর্ত বাঁচিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতেই বেশ বোঝা গেল কবরের পাশটায় হাত খানেক গভীর খাদের মতো রয়েছে। সেটা আগেই ছিল, না সম্প্রতি কেউ খুঁড়ে করেছে সেটা ফেলুদা বুঝে থাকলেও, আমি বুঝলাম না।

ফেলুদা এবার মার্বেলের টুকরোগুলোয় মন দিল। দু জনে মিলে এগারোটা টুকরো জড়ো করে মিনিট দশেক ঘাসের উপর জিগ-স পাজ্‌ল খেলে সেগুলোকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলাম। তার ফলে জিনিসটা এইরকম দাঁড়াল—

Sacred to the Memory of

THOMAS—WIN

Obt. 24th April—8, AET. 180—

'গডউইন', বলল ফেলুদা, 'টমাস গডউইনের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে। ও বি টি হল "ওবিটুস" অর্থাৎ মৃত্যু, আর এ ই টি হল "এইটাটিস" অর্থাৎ বয়স। এখন কথা হচ্ছে—'

'ও মশাই!'

জটায়ু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে আমাকে বেশ চমকে দিলেন। ঘুরে

দেখতেই ভদ্রলোক একটা চৌকো চ্যাপটা কালো জিনিস আমাদের দিকে তুলে ধরে বললেন, 'সাঁইত্রিশ টাকায় ব্লু-ফক্সে তিনজনের ডিনার হবে কি?'

'কী পেলেন ওটা?'

আমরা দু জনেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেলুম।

লালমোহনবাবুর বাঁ হাতে একটা কালো মানিব্যাগ, আর ডান হাতে তিনটে দশ, একটা পাঁচ, আর একটা দু টাকার নোট। টাকা আর ব্যাগ দুটোরই অবস্থা বেশ শোচনীয়। ভদ্রলোকের ভয় কেটে গিয়ে এখন একটা বেশ মারলিস্ ভাব; বেশ বুঝতে পারছেন যে, ফেলুদার জন্য একটা ভাল ক্লু জোগাড় করে দিয়েছেন।

ফেলুদা ব্যাগটা খুলে খাপগুলোর ভিতর যা ছিল সব বার করল। চার রকম জিনিস বেরোল খাপ থেকে। এক নম্বর—এক গোছা ভিজিটিং কার্ড, যাতে ইংরিজিতে লেখা এন এম বিশ্বাস। ঠিকানা টেলিফোন নেই। ফেলুদা বলল, 'দেখছেন খবরের কাগজের কাণ্ড—নরেন্দ্রমোহনকে নরেন্দ্রনাথ করে দিয়েছে।'

দুই নম্বর হচ্ছে দুটো খবরের কাগজের কাটিং। একটাতে এই সাউথ পার্ক স্ট্রিটে গোরস্থান প্রথম যখন খুলল তার খবর, আর অন্যটাতে আজকাল যাকে শহিদ মিনার বলি, সেই অকটারলোনি মনুমেন্ট তৈরি হবার খবর। তার মানে দুটো কাগজের টুকরোই দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো। 'বিশ্বেস মশাই এত প্রাচীন কাগজের কাটিং কোত্থেকে জোগাড় করলেন জানতে ভারী কৌতূহল হচ্ছে—' মন্তব্য করল ফেলুদা।

তিন নম্বর হচ্ছে পার্ক স্ট্রিটের অক্সফোর্ড বুক কোম্পানির একটা বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সার ক্যাশমেমো; আর চার হল এক টুকরো সাদা কাগজ, যাতে ডট পেনে ইংরিজিতে কয়েকটা লাইন লেখা। লেখার মাথামুণ্ডু বুঝলাম না, যদিও ভিক্টোরিয়া নামটা পড়তে পেরেছিলাম।

'অকটারলোনি মনুমেন্ট নিয়ে যে একটা লেখা দেখলুম সেদিন কাগজে', হঠাৎ বলে উঠলেন লালমোহনবাবু, 'আর যদ্দুর মনে পড়ছে লেখকের পদবি ছিল বিশ্বাস। হ্যাঁ—বিশ্বাস। কারেক্ট।'

'কোন্ কাগজ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'হয় "দেশনী" না হয় "বিচিত্রপত্র"। ঠিক মনে পড়ছে না। আমি বাড়ি গিয়ে চেক্ করব।'

জটায়ুর স্মরণশক্তি তেমন নির্ভরযোগ্য নয় বলেই বোধ হয় ফেলুদা এ ব্যাপারে আর কিছু না বলে সাদা কাগজের লেখাটা তার নিজের নোটবুকে কপি করে নিয়ে আসল কাগজ আর অন্য জিনিসগুলো মানিব্যাগে ভরে সেটা পকেটে নিয়ে নিল। তারপর মিনিট পাঁচেক ধরে কবরের আশপাশটা ভাল করে দেখে আরও দুটো জিনিস পেয়ে সেগুলোও পকেটে পুরল। সে-দুটো হচ্ছে একটা ব্রাউন রঙের কোটের বোতাম আর একটা নেতিয়ে যাওয়া প্রেসের বই।—'চল, দারোয়ানের সঙ্গে একবার কথা বলে বেরিয়ে পড়ি। আবার মেঘ করল।'

'ব্যাগটা কি ফেরত দেবেন?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'অবিশ্যি। কোন্ হাসপাতালে আছে খোঁজ করে কাল একবার যাব।'

'আর সে-লোক যদি মরে গিয়ে থাকে?'

'সেই অনুমান করে তো আর তার প্রপার্টি আত্মসাৎ করা যায় না। সেটা নীতিবিরুদ্ধ।—আর সাঁইত্রিশ টাকায় ব্লু-ফক্সে তিনজনের চা স্যান্ডউইচের বেশি কিছু হবে না, সুতরাং আপনি ডিনারের আশা ত্যাগ করতে পারেন।'

আমরা আবার উলটোমুখে ঘুরে কবরের সারির মাঝখানের পথ দিয়ে গেটের দিকে এগোতে লাগলাম। ফেলুদা গম্ভীর। এরই ফাঁকে একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়েছে। এমনিতে ও সিগারেট অনেক কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রহস্যের গন্ধ পেলে নিজের অজান্তেই মাঝে মাঝে সাদা কাঠি মুখে চলে যায়।

অর্ধেক পথ যাবার পর সে হঠাৎ থামল কেন সেটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারিনি। তারপর তার চাহনি অনুসরণ করে একটা জিনিস দেখে আমার হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে হার্টবিটটাও এক পলকের জন্য থেমে গেল।

একটা গম্বুজওয়ালা সমাধি—যার ফলকে মৃতব্যক্তির নাম রয়েছে মিস মারগারেট টেম্পলটন—তার ঠিক সামনে ঘাসে পড়ে থাকা একটা পুরনো ইটের উপর একটা সিকিখাওয়া জ্বলন্ত সিগারেট থেকে সরু ফিতের মতো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। বৃষ্টি হবে

বলেই বোধ হয় বাতাসটা বন্ধ হয়েছে, না হলে ধোঁয়া দেখা যেত না।

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে দু ইঞ্চি লম্বা সিগারেটটা তুলে নিয়ে মন্তব্য করল, 'গোল্ড ফ্লেক।' জটায়ু বলল, 'বাড়ি চলুন।' আমি বললাম, 'একবার খুঁজে দেখব লোকটা এখনও আছে কিনা?'

'সে যদি থাকত', বলল ফেলুদা, 'তাহলে সিগারেট হাতে নিয়েই থাকত; কিংবা হাত থেকে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে দিত। আধখাওয়া অবস্থায় এভাবে ফেলে যেত না। সে লোক পালিয়েছে, এবং বেশ ব্যস্তভাবেই পালিয়েছে।'

দারোয়ান ঘরে ছিল না। মিনিট তিনেক অপেক্ষা করার পর সে পশ্চিম দিকের একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে হেলতে দুলতে এগিয়ে এসে বলল, 'আভি এক চুহাকো খতম্ কর দিয়া।'

বুঝলাম, ওই ঝোপের পিছনে চুহার সৎকার সেরে তিনি ফিরছেন, ফেলুদা কাজের কথায় চলে গেল।

'যার উপর গাছ পড়েছিল তাকে জখম অবস্থায় প্রথম দেখল কে?'

দারোয়ান বলল যে সেই দেখেছিল। গাছ পড়ার সময়টা সে গোরস্থানে ছিল না, তার নিজের একটা শার্ট উড়ে গিয়েছিল পার্ক স্ট্রিটে, সেটা উদ্ধার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে ব্যাপারটা দেখে। দারোয়ান ভদ্রলোকের মুখ চিনত, কারণ উনি নাকি সম্প্রতি আরও কয়েকবার এসেছেন গোরস্থানে।

'আর কেউ এসেছিল কালকে?'

'মালুম নেহি বাবু। হাম্ তব দৌড়কে গিয়া, উস টাইমমে তো আউর কোই নেহি থা।'

'এইসব সমাধির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে তো?'

এটা দারোয়ান অস্বীকার করল না। আমারও মনে হচ্ছিল যে এই গোরস্থানের চেয়ে ভাল লুকোচুরির জায়গা বোধ হয় সারা কলকাতায় আর একটিও নেই।

নরেন বিশ্বাসের অবস্থা দেখে দারোয়ান রাস্তায় বেরিয়ে এসে এক পথচারী সাহেবকে খবরটা দেয়। বর্ণনা থেকে মনে হল সেন্ট জেভিয়ার্সের ফাদার-টাদার হতে পারে। তিনিই নাকি ট্যাক্সি ডাকিয়ে নরেন বিশ্বাসকে হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন।

'আজ একটু আগে কাউকে আসতে দেখেছিলে?'

'আভি?'

'হাঁ?'

না, দারোয়ান কাউকে আসতে দেখেনি। সে গেটের কাছে ছিল না। সে গিয়েছিল চুহার কাম নিয়ে ওই খোপড়াটির পিছনে। ওটা সেরে দিয়েই ওর কাজ শেষ হয়নি, কারণ একটু পিপাসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

'রাত্রে তুমি এখানে থাকো?'

'হাঁ বাবু। লেকিন রাতকো তো পহারেকা কোই জরুরৎ নেহি হোতা। ডর কে মারে কোই আতাহি নেহি। পহলে লোয়ার সারকুলার রোড সাইডমে দিওয়াল টুটা থা, লেকিন আজকাল রাতকো কোই নেহি আতা সমেটরিমে।'

'তোমার নাম কী?'

'বরমদেও।'

'এই নাও।'

'সালাম বাবু।'

দারোয়ানের হাতে দু টাকার নোটটা গুঁজে দেবার ফল অবিশ্যি আমরা পরে পেয়েছিলাম।

॥ ৩ ॥

'গডউইন...? টমাস গডউইন...?'

সিধু জ্যাঠার কপালে দু-টা খাঁজ পড়ে গেল।

সিধু জ্যাঠাকে আমি বলি বিশ্বকোষ, ফেলুদা বলে শ্রুতিধর। দুটোই ঠিক। একবার যা পড়েন, একবার যা শোনেন—মনে ধরলে ভোলেন না। ফেলুদাকে মাঝে মাঝে ওঁর কাছে আসতেই হয়। যেমন আজকে। ভোরে উঠে হাঁটতে বেরোন সিধু জ্যাঠা লেকের ধারে। মাইল দু-এক হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন সাড়ে ছ-টার মধ্যে। বৃষ্টি হলেও বাদ নেই, ছাতা নিয়ে বেরোবেন। বাড়ি ফিরে সেই যে তক্তপোশের উপর বসেন, এক স্নান-খাওয়া ছাড়া ওঠা নেই। সামনে একটা ডেস্ক, তার উপর বই,

ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ। দেখেন না। চিঠিও না, খেলার হিসেবও না, কিচ্ছু না। খালি পড়েন। টেলিফোন নেই। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার হলে চাকর জনার্দনকে দিয়ে বলে পাঠান; দশ মিনিটে সে খবর পৌঁছে যায়। বিয়ে করেননি; বউ-এর বদলে বই নিয়ে ঘর করেন। বলেন, আমার সংসার, আমার স্ত্রী-পুত্র পরিবার, আমার ডাক্তার মাস্টার সিস্টার ব্রাদার ফাদার, সবই আমার বই। পুরনো কলকাতা সম্বন্ধে ফেলুদার উৎসাহের জন্য সিধু জ্যাঠাই কতকটা দায়ী। তবে সিধু জ্যাঠা শুধু কলকাতা না, সারা বিশ্বের ইতিহাস জানেন।

দুধ-ছাড়া চায়ে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে সিধু জ্যাঠা গডউইন কথাটা আরও দু বার আওড়ালেন। তারপর বললেন, 'গডউইন নামটা ধস্ করে বললে প্রথমটা শেলির শ্বশুরের কথাই মনে হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এসেছে এমন একটা গডউইনও ছিল বটে; কোন বছরে মারা গেছে বললে?'

'আঠারো শো আটান্ন।'

'আর জন্ম?'

'সতেরো শো আটাশি।'

'হুঁ, তা হলে এই গডউইন হতে পারে বটে। আটচল্লিশেই বোধ হয়, কিংবা উনপঞ্চাশে, ক্যালকাটা রিভিউতে একটা লেখা বেরিয়েছিল। টমাসের মেয়ে। নাম শার্লি। না না—শার্লট। শার্লট গডউইন। তার বাপ সম্বন্ধে লিখেছিল। হুঁ, মনে পড়েছে।... ওরেব্বাস্! সে তো এক তাজ্জব কাহিনী হে ফেলু!—অবিশ্যি শেষ জীবনের কথা লেখেনি শার্লট। আর সেটা আমি জানিও না; কিন্তু গোড়ায় ভারতবর্ষে এসে তার কীর্তিকলাপ—সে তো একেবারে গল্পের মতো। তুমি তো লখনৌ গেছ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বাদশাহি আংটির ব্যাপারে প্রথম তার গোয়েন্দাগিরির তারাবাজি লখনৌতেই দেখিয়েছিল ফেলুদা।

'সাদত আলির কথা জান তো?'

'জানি।'

'সেই সাদত আলি তখন লখনৌ-এর নবাব। দিল্লির পিদিম তখন

মিথু-নিন্, যত রোশনাই সব লখনৌ-এ। সাদত ইয়াং বয়সে কলকাতায় ছিল, সাহেবদের সঙ্গে মিশে ইংরিজি ভাষাটা একটু ভাসাভাসা শিখেছিল, আর শিখেছিল ষোলো আনা সাহেবিয়ানা। আসাফ-উদ-দৌল্লা মারা যাবার পর ওয়জীর আলি হল নবাব। সাদত আলি তখন কাশীতে। মন খারাপ, কারণ আশা ছিল আসাফের পর সেই গদিতে বসবে। এদিকে ওয়জীর ছিল অকর্মার ঢেঁকি। ব্রিটিশরা তাকে বরদাস্ত করতে পারলে না; চার মাসে তার নবাবি দিলে বরবাদ করে। মনে রেখো। অযোধ্যায় তখন কোম্পানির প্রতিপত্তি খুব; নবাবরা কোম্পানির কথায় ওঠে বসে। ওয়জীরকে হটিয়ে ওরা সাদতকে সিংহাসনে বসাল। সাদত খুশি হয়ে ব্রিটিশকে অর্ধেক অযোধ্যা দিয়ে দিলে।

'সে সময়ে লখনৌ-এর অলিতে-গলিতে সাহেব। নবাবের ফৌজে সাহেব অফিসার, সাহেব গোলন্দাজ; তা ছাড়া সাহেব ব্যবসায়ী, সাহেব ডাক্তার, সাহেব পেন্টার, সাহেব নাপিত, সাহেব ইস্কুল মাস্টার; আবার কেউ কেউ আছে যারা এসেছে শুধু টাকার লোভে; নবাবের নেক নজরে পড়ে দু পয়সা যদি কামাতে পারে। এই শেষ দলের মধ্যে পড়ে টমাস গডউইন। ইংলন্ডের ছোকরা— সাসেক্স না সাফোক না সারি কোথায় তার বাড়ি ঠিক মনে নেই—সে দেশে বসে নবাবির গল্প শুনে এসে হাজির হল লখনৌতে। সুপুরুষ চেহারা, কথাবার্তা ভাল, রেসিডেন্ট চেরি সাহেবের মন ভিজিয়ে তার কাছ থেকে সুপারিশপত্র নিয়ে গিয়ে হাজির হল নবাবের দরবারে। সাদত জিগ্যেস করলে, তোমার গুণপনা কী। টমাস শুনেছে নবাব বিলিতি খানা পছন্দ করে—রান্নার হাত ভাল ছিল ছোকরার—বললে আমি ভাল শেফ, তোমাকে রেঁধে খাওয়াতে চাই। নবাব বললে খাওয়াও। ব্যস—গডউইন এমন রান্না রাঁধলে যে সাদত তক্ষুনি তাকে বাবুর্চিখানায় বহাল করে নিলে। তারপর থেকে নবাব যেখানে যায় সেখানেই মুসলমান বাবুর্চির পাশে পাশে যায় টমাস গডউইন। লাটসাহেব শহরে এলে সাদত তাকে ব্রেকফাস্টে ডাকে— সাহেব খুশি হলে সাদতের মঙ্গল—ভরসা টমাস গডউইন। আর নতুন কোনও ডিশ পছন্দ হলেই আসে বকশিশ। নবাবি বকশিশ জানো তো? দু-দশ টাকা কি দু-চারটে মোহর ওঁজে দেওয়া

তো নয়—লখনৌ-এর নবাব। হাত ঝাড়লেই পর্বত। বুঝে দেখো, গডউইনের পকেট কীভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠল। আর তাই যদি না হবে তো সে বাবুর্চিখানায় পড়ে থাকবে কেন? সে রকম লোকই সে নয়।

'বেরিয়ে এল নবাবের আওতা থেকে। চলে এল আমাদের এই কলকাতায়। এসেই বিয়ে করলে জেন ম্যাডক বলে এক মেমসাহেবকে—কোম্পানির ফৌজের এক ক্যাপ্টেনের মেয়ে। তার তিন মাসের মধ্যে এক রেস্টোরান্ট খুললে খাস চৌরঙ্গীতে। তারপর যা হয় আর কী। সুদিন তো আর কারুর চিরটাকাল থাকে না। গডউইনের ছিল জুয়োর নেশা। লখনৌ থাকতে মুরগীর লড়াই আর তিতিরের লড়াইয়ে বাজি ফেলে যেমন কামিয়েছে তেমনি খুইয়েছে। কলকাতায় এসে সে রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।... এর বেশি আর তার মেয়ে কিছু লেখেনি। যদ্দূর মনে হয়, টমাস গডউইন মারা যাবার কয়েক মাস পরেই এ-লেখাটা বেরোয়। সেক্ষেত্রে তার নিজের মেয়ের পক্ষে তার বাপের মন্দ দিকটা কি আর খুব ফলাও করে লেখা চলে? অন্তত সে যুগে যেত না নিশ্চয়ই। যাই হোক, এশিয়াটিক সোসাইটিতে গিয়ে তুমি লেখাটি পড়ে দেখতে পারো। আমি যা বললাম তার চেয়ে ন্যাচারেলি আরও বেশি ডিটেল পাবে।'

আমার অবিশ্যি মনে হল, সিধু জ্যাঠা পুরো লেখাটাই বাংলা করে বলে ফেলেছেন।

ফেলুদা আর আমি দু জনেই টমাস গডউইনের এই আশ্চর্য কাহিনী শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। আমাদের আগে সিধু জ্যাঠাই আবার মুখ খুললেন।

'কিন্তু টমাস গডউইনের বিষয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করছ কেন? কী ব্যাপার?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা বলছি। তার আগে আর একটা জিনিস জানার আছে। নরেন্দ্র বিশ্বাস বলে কারুর নাম শুনেছেন—যিনি পুরনো কলকাতা নিয়ে প্রবন্ধ-টবন্ধ লেখেন?'

'কিসে লেখেন?'

'তা জানি না।'

'কোনও অখ্যাত কাগজে লিখলে সে লেখা আমার চোখে পড়বে

না। আজকাল আর ধরাবাঁধা কাগজের বাইরে আর কিছু পড়ি না। কিন্তু এ প্রশ্নই বা কেন?'

ফেলুদা সংক্ষেপে কালকের ঘটনাটা বলে বলল, 'গাছ পড়ে যদি একটা লোক জখম হয়ে অজ্ঞান হয়, তাহলে তার মানিব্যাগটা দশ হাত দূরে ছিটকে পড়বে কেন, এইখানেই খটকা।'

'হুঁ'...

সিধু জ্যাঠা একটু গম্ভীর থেকে বললেন, 'কাল ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় নব্বুই মাইল। যদি ধরো যে ভদ্রলোকের মানিব্যাগ তার শার্ট বা পাঞ্জাবির বুকপকেটে ছিল, তাহলে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পকেট থেকে সে ব্যাগ ছিটকে পড়া কিছুই আশ্চর্য নয়। আর দৌড়ানোর অবস্থাতেই তার মাথায় গাছ পড়ে থাকতে পারে। তা হলে আর রহস্য কোথায়?'

'ভদ্রলোক পড়েছিলেন গডউইনের সমাধির পাশে।'

'তাতে কী এসে গেল?'

'সেই সমাধির পাশে খাদের মতো গর্ত। মনে হয় কেউ খোঁড়ার কাজ শুরু করেছিল।'

সিধু জ্যাঠার চোখ ছানাবড়া।

'বল কী হে। গ্রেভ ডিগিং? এ তো ভারী শ্রেষ্ঠ সংবাদ দিলে হে তুমি। এ তো অবিশ্বাস্য। টাটকা লাশ হলে খুঁড়ে বার করে শব ব্যবচ্ছেদের জন্য বিক্রি করে পয়সা আসে জানি। কিন্তু দুশো বছরের পুরনো লাশের কয়েকটা হাড়গোড় ছাড়া আর কী পাওয়া যাবে বলো। তার না আছে প্রত্নতাত্ত্বিক ভ্যালু, না আছে রিসেল ভ্যালু। খুঁড়েছে সে ব্যাপারে তুমি শিওর?'

'পুরোপুরি নয়—কারণ বৃষ্টির জন্য কোদালের কোপের চিহ্ন মুছে গেছে—কিন্তু তবু...'

সিধু জ্যাঠা আবার একটু ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, 'না হে ফেলু, আমার মনে হচ্ছে তুমি বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করছ। হাতে কোনও কেস-টেস নেই বুঝি? তাই কল্পনায় একটা রহস্য খাড়া করছ—অ্যাঁ?'

ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা হেসে চুপ করে রইল। সিধু জ্যাঠা

বললেন, 'গডউইনের বংশের কেউ যদি এখানে থাকত তা হলে না হয় তাদের জিগ্যেস করে কিছু জানা যেত। কিন্তু সেও তো বোধহয় নেই। সব সাহেব পরিবারই তো আর বারওয়েল বা টাইটলার পরিবার নয়—যাদের কেউ না কেউ সেই ক্লাইভের আমল থেকে এই সেদিন অবধি ইন্ডিয়াতে কাটিয়ে গেছে।'

এইবার ফেলুদা তার এতক্ষণের চাপা খবরটা দিয়ে দিল।

'টমাস গডউইনের তিন পুরুষ পর অবধি তাদের কেউ না কেউ এ-দেশেই মারা গেছে সে খবর আমি জানি।'

'সে কী?' সিধু জ্যাঠা অবাক। আসলে আজই সকালে এখানে আসার আগে আমরা লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্থানটা দেড় ঘণ্টা ধরে দেখে এসেছি। এটা পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানের পরে তৈরি আর এখনও ব্যবহার হয়।

'শার্লট গডউইনের সমাধি দেখেছি', বলল ফেলুদা। '১৮৮৬ সালে সাতষট্টি বছর বয়সে মারা যান।'

'গডউইন পদবি দেখলে? তার মানে বিবাহ করেননি। আহা, বড় সুলেখিকা ছিলেন।'

'শার্লটের পাশে তার বড় ভাই ডেভিডের সমাধি। মৃত্যু ১৮৭৪'—ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে নোট দেখে দেখে বলে চলেছে—'ইনি খিদিরপুরের কিড কোম্পানির হেড অ্যাসিসট্যান্ট ছিলেন। ডেভিডের পাশে তার ছেলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যান্ড্রু গডউইন ও তার স্ত্রী এমা গডউইন। অ্যান্ড্রু মারা যান ১৮৮২-তে। অ্যান্ড্রু-এমার পাশে তাদের ছেলে চার্লস। ইনি ডাক্তার ছিলেন, মৃত্যু ১৯২০।'

'সাবাস! ধন্যি তোমার অনুসন্ধিৎসা আর অধ্যবসায়।' সিধু জ্যাঠা সত্যিই খুশি হয়েছেন। 'এখন তোমায় জানতে হবে বর্তমানে এঁদের কেউ জীবিত কিনা এবং কলকাতায় আছেন কিনা। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে গডউইন নাম পেলে?'

'মাত্র একটি। ফোন করেছিলাম। এই পরিবারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

'দেখো খোঁজ করে। হয়তো থাকতে পারে। অবিশ্যি তার হদিস কী

করে পারে ও জানি না। পেলে, আর কিছু না হোক—প্রেত ডিলিং-এর ব্যাপারটা আমার কাছে ভুয়ো বলেই মনে হয়—অন্তত টমাস গডউইনের মতো একটা কালারফুল চরিত্র সম্বন্ধে হয়তো আরও কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারো। গুড লাক।'

॥ ৪ ॥

বাড়ি এসে দুপুর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তারপর ফেলুদাকে আর না জিগ্যেস করে পারলাম না।—

'কাল যে নরেন বিশ্বাসের ব্যাগ থেকে একটা সাদা কাগজ বেরোল, তাতে কী লেখা ছিল?'

নরেন বিশ্বাসের খাতাটা ফেলুদা বিকেলে ফেরত দিতে যাবে। সে খবর নিয়ে জেনেছে যে, ভদ্রলোক পার্ক হসপিটালে আছেন।

ফেলুদা তার খাতাটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'যদি এর মানে বার করতে পারিস তা হলে বুঝব নোবেল প্রাইজ তোর হাতের মুঠোয়।'

খাতার রুল টানা পাতায় লেখা রয়েছে—

B/S 141 SNB for WO Victoria & P.C. (44?)

Re Victoria's letters try MN, OU, GAA, SJ, WN

আমি মনে মনে বললাম, নোবেল প্রাইজটা ফসকে গেল। তাও মুখে বললাম, 'ভদ্রলোক কুইন ভিক্টোরিয়া সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড পি সি টা কী ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'পি সি বোধ হয় প্রিন্স কনসর্ট; তার মানে ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট।'

'আর কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কেন, কর মানে জন্য আর ট্রাই মানে চেষ্টা বুঝলি না?'

ফেলুদার মেজাজ দেখে বুঝলাম সেও বিশেষ কিছু বোঝেনি। সিধু জ্যাঠার কথাটা যে আমারও মনে ধরেনি তা নয়। ফেলুদা সত্যিই হয়তো যেখানে রহস্য নেই সেখানে জোর করে রহস্য ঢোকাচ্ছে। কিন্তু তার পরেই মনে পড়ে যাচ্ছে কালকের সেই জ্বলন্ত সিগারেটটা, আর

সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভিতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরা আছি জেনে কে পালাল গোরস্থান থেকে? আর [illegible] দিনে সঙ্গে করে সে সেখানে গিয়েছিলই বা কেন?

আগে থেকেই ঠিক ছিল যে চারটের সময় আমরা নরেন বিশ্বাসের ব্যাগ ফেরত দিতে যাব, আর লালমোহনবাবুই আমাদের এসে নিয়ে যাবেন। টাইমমাফিক বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ পেলাম। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন হাতে একটা পত্রিকা নিয়ে। 'কী বলেছিলুম মশাই? এই দেখুন বিচিত্রপত্র, আর এই দেখুন নরেন বিশ্বাসের লেখা। সঙ্গে একটা ছবিও আছে মনুমেন্টের, যদিও ছাপেনি ভাল।'

'কিন্তু এও তো দেখছি নরেন্দ্রনাথ বলছে; নরেন্দ্রমোহন তো নয়। তা হলে কি অন্য লোক নাকি?'

'আমার মনে হয় ভিজিটিং কার্ডেই গণ্ডগোল। বাজে প্রেসে ছাপানো। আর ভদ্রলোক হয়তো এখনও দেখেননি। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে ওই কাটিং আর তারপর এই লেখা—ব্যাপারটা স্রেফ কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?'

ফেলুদা লেখাটায় চোখ বুলিয়ে পত্রিকাটা পাশের টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বলল, 'ভাষা মন্দ না, তবে নতুন কিছু নেই। এখন জানা দরকার এই লোকই গাছ পড়ে জখম হওয়া নরেন বিশ্বাস কি না।'

পার্ক হসপিটালের ডা. শিকদারকে বাবা বেশ ভাল করে চেনেন। আমাদের বাড়িতেও এসেছেন দু-একবার, তাই ফেলুদার সঙ্গেও আলাপ। ফেলুদা কার্ড পাঠানোর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমাদের ডাক পড়ল।

'কী ব্যাপার? কোনও নতুন কেস-টেস নাকি?'

ফেলুদা যেখানেই যে-কারণেই যাক না কেন, চেনা লোক থাকলে তাকে এ প্রশ্নটা শুনতেই হয়।

ও হেসে বলল, 'আমি এসেছি এখানের এক পেশেন্টকে একটা জিনিস ফেরত দিতে।'

'কোন পেশেন্ট?'

'মিস্টার বিশ্বাস। নরেন বিশ্বাস। [illegible]—'

'সে তো চলে গেছে! এই ঘণ্টা দু-এক আগে। তার ভাই এসেছিল

গাড়ি নিয়ে, নিয়ে গেছে।'

'কিন্তু কাগজে যে লিখল—'

'কী লিখেছে? সিরিয়াস বলে লিখেছে তো? কাগজে ও রকম অনেক লেখে। আস্ত একটা গাছ মাথায় পড়লে কি আর সে লোক বাঁচে? একটা ছোট ডাল, যাকে বলে প্রশাখা, তাই পড়েছে। জখমের চেয়ে শকটাই বেশি। ডান কবজিটায় চোট পেয়েছে, মাথায় কটা স্টিচ—ব্যস এই তো।'

'আপনি কি বলতে পারেন ইনিই পুরনো কলকাতা নিয়ে—'

'ইয়েস। ইনিই। একটা লোক সন্ধেবেলা গোরস্থানে ঘোরাঘুরি করছে, ন্যাচারেলি কৌতূহল হয়। জিজ্ঞেস করতে বললেন পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করছেন। তা আমি বললুম ভাল লাইন বেছেছেন; নতুন কলকাতাকে যতটা দূরে সরিয়ে রাখা যায় ততই ভাল।'

'জখমটা স্বাভাবিক বলেই মনে হল?'

'অ্যাই!... পথে আসুন বাবা। এতক্ষণে একটা গোয়েন্দা মার্কা প্রশ্ন হয়েছে!'

ফেলুদা অপ্রস্তুত ভাবটা চাপতে পারল না।

'মানে, উনি নিজেই বললেন যে গাছ পড়ে...?'

'আরে মশাই, গাছটা যে পড়েছে তাতে তো আর ভুল নেই? আর উনি সেখানেই ছিলেন। সন্দেহ করার কোনও কারণ আছে কি?'

'উনি নিজে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু বলেননি তো?'

'মোটেই না। বললেন, চোখের সামনে দেখলাম গাছটা ভাঙল—তার ডালপালা যে কতখানি ছড়িয়ে আছে সেটা তো আর আঁচ করা সম্ভব হয়নি। তবে হ্যাঁ—ইয়েস—জ্ঞান হবার পরে 'উইল' কথাটা দু-তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন। এতে যদি কোনও রহস্য থাকে তো জানি না। মনে তো হয় না, কারণ উইলের উল্লেখ ওই একবারই, আর করেননি।'

'ভদ্রলোকের পুরো নামটা আপনার জানা আছে?'

'কেন, কাগজেই তো বেরিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।'

'আরেকটা প্রশ্ন—বিরক্ত করছি, কিছু মনে করবেন না—ওনার পোশাকটা মনে আছে?'

ফিটফাট। শার্ট আর প্যান্ট। রংও মনে আছে—সাদা শার্ট আর বিস্কিটের রঙের প্যান্ট। প্যাকেট না, ক্রিম ক্র্যাকার—হেঃ হেঃ!'

ফেলুদা ডা. শিকদারের কাছে নরেন বিশ্বাসের ঠিকানা নিয়ে নিয়েছিল। আমরা নার্সিংহোম থেকে সটান চলে গেলাম নিউ আলিপুরে। ভারী ঝামেলা নিউ আলিপুরে ঠিকানা খুঁজে বার করা, কিন্তু জটায়ুর ড্রাইভার মশাইটি দেখলাম কলকাতার রাস্তাঘাট ভালই চেনেন। বাড়ি বার করতে তিন মিনিটের বেশি ঘুরতে হয়নি।

দোতলা বাড়ি, দেখে মনে হয় পনের থেকে বিশ বছরের মধ্যে বয়স। গেটের সামনে রাস্তার উপর একটা কালো অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে আছে, আর গেটের গায়ে দুটো নাম—এন বিশ্বাস ও জি বিশ্বাস। বেল টিপতে একজন চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

'নরেনবাবু আছেন কি?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'তাঁর তো অসুখ।'

'দেখা করতে পারবেন না? একটু দরকার ছিল।'

'কাকে চাই?'

প্রশ্নটা এল চাকরের পিছন দিক দিয়ে। একজন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছেন। ফরসা রং, চোখ সামান্য কটা, দাড়ি-গোঁফ কামানো। পাজামার উপর বুশ শার্ট, তার উপর একটা মটকার চাদর জড়ানো। ফেলুদা বলল, 'নরেন বিশ্বাস মশাই-এর একটা জিনিস তাঁকে ফেরত দিতে চাই। ওঁর মানিব্যাগ, পকেট থেকে পড়ে গেছল পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে।'

'তাই বুঝি? আমি ওঁর ভাই। আপনারা ভিতরে আসুন। দাদা বিছানায়। এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা। কথা বলছেন, তবে এ রকম অ্যাক্সিডেন্ট...একটা বড় রকম ইয়ে তো!...'

দোতলায় যাবার সিঁড়ির পিছন দিকে একটা বেডরুম, তাতেই নরেনবাবু শুয়ে আছেন। ভাই-এর চেয়ে রং প্রায় দু-পোঁচ কালো, ঠোঁটের উপর বেশ একটা পুরু গোঁফ, আর মাথার ব্যান্ডেজটার নীচে যে টাক আছে সেটা বলে দিতে হয় না।

বাঁ হাতে ধরা স্টেটসম্যান কাগজটা নামিয়ে ভদ্রলোক ঘাড় হেঁট করে আমাদের নমস্কার জানালেন। ডান কবজিতে ব্যান্ডেজ, তাই হাত

জোড় করে নমস্কারে অসুবিধা আছে। ভাইটি আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। শুনলাম চাকরকে হাঁক দিয়ে আরও দুটো চেয়ারের কথা বলে দিলেন। এ ঘরে রয়েছে একটিমাত্র চেয়ার, খাটের পাশে টেবিলের সামনে।

ফেলুদা মানিব্যাগটা বার করে এগিয়ে দিল।

'ও হো হো—অনেক ধন্যবাদ। আপনি আবার কষ্ট করে...'

'কষ্ট আর কী'—ফেলুদা বিনয়ভূষণ—'ঘটনাচক্রে ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম, আমার এই বন্ধুটি কুড়িয়ে পেলেন, তাই...'

নরেনবাবু এক হাতেই মানিব্যাগের খাপগুলো ফাঁক করে তার ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। 'গোরস্থানে...?'

'আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্নই করতে যাচ্ছিলাম,' ফেলুদা হেসে বলল, 'আপনি বোধ হয় প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করছেন?'

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'করছিলাম তো বটেই—কিন্তু যা ঘা খেলাম। মনে হয় পরমেশ্বর চাইছেন না আমি এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করি।'

'বিচিত্রপত্র কাগজে যে লেখাটা—'

'ওটা আমারই। মনুমেন্ট তো? আমারই। আরও লিখেছি দু-একটা এখানে সেখানে। চাকরি করতাম, গত বছর রিটায়ার করেছি। কিছু তো একটা করতে হবে। ছাত্র ছিলাম ইতিহাসের। ছেলেবেলা থেকেই ওদিকটায় ঝোঁক। কলেজে থাকতে বাগবাজার থেকে হেঁটে দমদম যাই ক্লাইভ সাহেবের বাড়ি দেখতে। দেখেছেন? এই সেদিন অবধি ছিল—একতলা বাংলো টাইপের বাড়ি, সামনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোট-অফ-আর্মস।'

'আপনি প্রেসিডেন্সিতে পড়েছেন?'

খাটের ডান পাশেই টেবিল, আর তার দু হাত উপরেই দেয়ালে একটা বাঁধানো গ্রুপ ছবিতে লেখা—

'Presidency College Alumni Association 1953.'

'শুধু আমি কেন,' বললেন নরেন বিশ্বাস, 'আমার ছেলে, ভাই, বাপ,

ঠাকুর্দা সবাই প্রেসিডেন্সির ছাত্র। ওটা একটা ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন। এখন বলতে লজ্জা করে—আমরা সোনার মেডেল পাওয়া ছাত্র—গিরিন, আমি, দু জনেই!'

'কেন, লজ্জা কেন!'

'কী আর করলুম বলুন জীবনে? আমি গেলাম চাকরিতে, গিরিন গেল ব্যবসায়। কে আর চিনল আমাদের বলুন?'

ফেলুদা এগিয়ে গিয়েছিল ছবিটা দেখতে। এবার তার দৃষ্টি নামল নীচের দিকে। টেবিলের উপর একটা নীল খাতা। সেটার প্রথম পাতাটা খোলা রয়েছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে একটা লেখা শুরু হয়ে আট-দশ লাইনের বেশি এগোয়নি।

'আপনার নাম কি নরেন্দ্রনাথ না নরেন্দ্রমোহন?'

'আজ্ঞে?'

ভদ্রলোক বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ফেলুদা আবার প্রশ্নটা করল। ভদ্রলোক একটু হেসে একটু যেন অবাক হয়ে বললেন, 'নরেন্দ্রনাথ বলেই তো জানি। কেন, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'আপনার ভিজিটিং কার্ডে দেখলাম এন এম বিশ্বাস রয়েছে।'

'ও হো। ওটা তো ছাপার ভুল। কাউকে কার্ড দেবার আগে ওটা কলম দিয়ে শুধরে দিই। অবশ্য নতুন কার্ড ছাপিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু গাফিলতি করে আর করিনি। আর সত্যি বলতে কী, আমাদের আর ভিজিটিং কার্ডের কী প্রয়োজন বলুন। ইদানীং মিউজিয়াম-টিউজিয়ামের কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে একটু দেখা-টেখা করতে হচ্ছিল তাই ব্যাগে কয়েকটা ভরে নিয়েছিলাম। ভাল কথা—আপনিও কি ওই গোরস্থান নিয়ে লিখবেন-টিখবেন নাকি? আশা করি না! আপনার মতো ইয়ং রাইভ্যালের সঙ্গে কিন্তু পেরে উঠব না।'

ফেলুদা যাবার জন্য উঠে পড়ে বলল, 'আমি লিখি-টিখি না—শুধু জেনেই আনন্দ। ভাল কথা—একটা অনুরোধ আছে। পুরনো কলকাতা নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে যদি গডউইন পরিবারের কোনও উল্লেখ পান তা হলে অনুগ্রহ করে জানালে উপকার হবে।'

'গডউইন পরিবার?'

'টমাস গডউইনের সমাধি পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে রয়েছে। ইন ফ্যাক্ট, একই গাছ একসঙ্গে আপনাকে এবং গডউইনের সমাধিকে ছায়া করেছে।'

'তাই বুঝি?'

'আর সার্কুলার রোড গোরস্থানে গডউইন পরিবারের আরও পাঁচটা সমাধি রয়েছে।'

'অবিশ্যি জানাব। কিন্তু কোথায় জানাব? আপনার ঠিকানাটা?'

ফেলুদা তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লেখা কার্ডটা নরেনবাবুর হাতে তুলে দিল।

'এই আপনার পেশা নাকি? গোয়েন্দাগিরি?' ভদ্রলোক বেশ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কলকাতায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছে বলে শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখলাম এই প্রথম!'

॥ ৫ ॥

'তুমি ভিক্টোরিয়ার কথাটা জিজ্ঞেস করলে না কেন?' আমি ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম গাড়িতে চৌরঙ্গীর দিকে যেতে যেতে। আজ লালমোহনবাবু ধরেছেন ব্লু-ফক্সে গিয়েই চা-স্যান্ডউইচ খাওয়াবেন। কে জানত যে এই ব্লু-ফক্সে গিয়েই ঘটনার মোড় ঘুরে যাবে।

ফেলুদা বলল, 'তার ব্যাগের কাগজপত্র আমি ঘাঁটাঘাটি করেছি সেটা জানলে কি ভদ্রলোক খুব খুশি হতেন? আর লেখাটা সাংকেতিক না হোক, সংক্ষিপ্ত ভাষায় তো বটেই। যদি কোনও গোপনীয় ব্যাপার হয়ে থাকে?'

'তা বটে।'

লালমোহনবাবুকে একটু ভাবুক বলে মনে হচ্ছিল। ফেলুদাও সেটা লক্ষ করেছে। বলল, 'আপনার চোখে উদাস দৃষ্টি কেন?'

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'পুলক ছোকরার জন্য

একটা ভাল প্লট কেঁদেছিলুম। নির্ঘাৎ আবার হিট হত—তা সে আজ লিখেছে হিন্দি ছবিতে নাকি থ্রিল আর ফাইটিং-এর বাজারে মন্দা। সবাই নাকি ভক্তিমূলক ছবি চায়। জয় সন্তোষী মা সুপারহিট হবার ফলে নাকি এই হাল। ভেবে দেখুন!'

'তা আপনার মুশকিলটা কোথায়। ভক্তিভাব জাগছে না মনে?'

লালমোহনবাবু কথাটার উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। কেবল ভীষণ একটা হুডক্তির ভান করে দুবার 'হেল' 'হেল' বলে চুপ করে গেলেন। হেল বলার কারণ অবিশ্যি পুলক ঘোষালের চিঠি নয়। আমরা বিড়লা প্লানেটেরিয়াম ছাড়িয়ে চৌরঙ্গীতে পড়েছি; বাঁয়ে মাটির পাহাড় ময়দানটাকে আড়াল করে দিয়েছে। লালমোহনবাবু কিছুদিন থেকে পাতাল রেল না বলে হেল রেল বলছেন।

গাড়ি ক্রমাগত গাড্ডায় পড়ছে আর লালমোহনবাবু শিউরে শিউরে উঠছেন। বললেন, 'স্প্রিং যতটা খারাপ ভাবছেন ততটা নয়। চলুন রেড রোড দিয়ে, দেখবেন গাড়ির কোনও দোষ নেই।'

'তাও তো এখন রাস্তা পাকা,' বলল ফেলুদা, 'দুশো বছর আগে এ রাস্তা ছিল গেঁয়ো কাঁচা। কল্পনা করে দেখুন।'

'তখন তো আর আম্বাসাডর চলত না। আর এত ভিড়ও ছিল না।'

'ভিড় ছিল, তবে সে মানুষের নয়, হাড়গিলের।'

'হাড়গিলে?'

'সাড়ে চার ফুট লম্বা পাখি। রাস্তায় ময়লা খুঁটে খুঁটে খেত। এখন যেমন দেখছেন কাক চড়ুই, তখন ছিল হাড়গিলে। গঙ্গার জলে মড়া ভেসে যেত, তার উপর চেপে দিব্যি নৌসফর করত।'

'জংলী জায়গা ছিল বলুন! বীভৎস। ভয়াবহ।'

'তারই মধ্যে ছিল লাটের বাড়ি, সেন্ট জনস চার্চ, পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থান, থিয়েটার রোডের থিয়েটার, আর আরও কত সাহেব-সুবোদের বাড়ি। এ অঞ্চলটাকে বলত হোয়াইট টাউন—এদিকে নেটিভদের নো-পাত্তা, আর উত্তর কলকাতা ছিল ব্ল্যাক টাউন।'

'গায়ের রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে মশাই।'

পার্ক স্ট্রিটে এসে মোড় ঘুরে ফ্রি-স্কুলের আগেই ফেলুদা গাড়ি থামাতে বলল।—'একবার বইয়ের দোকানে ঢুঁ মারতে হবে।'

অক্সফোর্ড বুক কোম্পানি সম্পর্কে লালমোহনবাবুর কোনও উৎসাহ নেই, কারণ এখানে রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বই বিক্রি হয় না। বলেছেন, 'আমাদের কলেজ স্ট্রিট আর শ্যামবাজারের ক্যাকফুকশপ বেঁচে থাকুক।'

ফেলুদা দোকানে ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরে একটা কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে থরে থরে সাজানো রয়েছে নীল আর লাল খাতা, ফাইল, ডাইরি, এনগেজমেন্ট প্যাড। একটা নীল খাতা হাতে তুলে দামটা দেখে নিল। বারো-পঞ্চাশ। ঠিক এ-রকম খাতা ছিল নরেন বিশ্বাসের টেবিলে।

'ইয়েস?'

দোকানের একজন লোক এগিয়ে এসেছে ফেলুদার দিকে।

'কুইন ভিক্টোরিয়ার কোনও চিঠির কালেকশন আছে আপনাদের এখানে?'

'কুইন ভিক্টোরিয়া? নো স্যার। তবে আপনি প্রকাশকের নাম বলতে পারলে আমরা আনিয়ে দিতে পারি। যদি ম্যাকমিলন বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হয় তা হলে ওদের কলকাতার আপিসে খোঁজ করে দেখতে পারি।'

ফেলুদা কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আমি খোঁজ করে আপনাদের জানাব।'

আমরা পার্ক স্ট্রিটে বেরিয়ে এলাম। গাড়িটা এগিয়ে ব্লু-ফক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা হেঁটে এগোতে লাগলাম।

'একটু দাঁড়া!'—ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করেছে।—'ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে পড়া যায় না।'

কয়েক সেকেন্ড খাতায় চোখ বুলিয়েই ফেলুদা আবার হাঁটতে শুরু করল। 'কিছু পেলে?' আমি জিগ্যেস করলাম। জবাব এল: 'আগে ব্লু-ফক্সে গিয়ে বসি।'

রেস্টোরান্টে বসে জানা গেল ব্লু-ফক্স নামটা ভাল লাগে বলেই লালমোহনবাবু আমাদের এখানে এনেছেন। নিজে এর আগে কখনও আসেননি। এমনকী পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্টোরান্টেই আসেননি।—'থাকি সেই গড়পারে। পাবলিশার কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়, এ তল্লাটে

খেতে আসার মতলবই বা কোথায় আর দরকারই বা কী?'

চা আর স্যান্ডউইচ অর্ডার দেবার পর ফেলুদা খাতাটা আবার বার করে টেবিলের উপর রাখল। তারপর সেই পাতাটা খুলে বলল, 'প্রথম লাইনটা এখনও রহস্যাবৃত। দ্বিতীয়টা কবজা করে ফেলেছি। এগুলো সব বিদেশি প্রকাশকের নাম।'

'কোনগুলো?' জিগ্যেস করলাম আমি।

'MM, OU, GAA, SJ আর WN হল যথাক্রমে ম্যাকমিলন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, সিজিক অ্যান্ড জ্যাকসন, ওয়াইডেনফেল্ড অ্যান্ড নিকলসন।'

'বাপরে বাপ', বললেন জটায়ু, 'আপনার জিহ্বার জয় হোক। এতগুলো ইংরিজি নাম হোঁচট না খেয়ে একনিশ্বাসে আউড়ে গেলেন কী করে মশাই?'

'বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক এইসব পাবলিশারদের চিঠি লিখতেন বা লিখছেন, ভিক্টোরিয়ার চিঠির সংকলন সম্বন্ধে খোঁজ করে। অথচ মজা এই যে, এত না করে ব্রিটিশ কাউন্সিল বা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ভিক্টোরিয়ার চিঠি পড়ে আসা ঢের সহজ ছিল।'

'এ যেন মাথার পিছন দিক দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নাক দেখানো', মন্তব্য করলেন জটায়ু।

ফেলুদা খাতটা পকেটে পুরে স্যান্ডউইচের জায়গা করে দিয়ে একটা চারমিনার ধরাল। লালমোহনবাবু টেবিলের উপর তাল ঠুকে একটা বিলিতি ধাঁচের সুরের এক লাইন গুন গুন করে বললেন, 'চলুন কোথাও বেরিয়ে পড়ি শহরের বাইরে। বাইরে গেলেই দেখিছি আপনার কেসও জোটে, আমার প্লটও জোটে। কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো? বেশ রুক্ষ জায়গা হওয়া চাই। সবুজ শস্যশ্যামলা আমেশি ভেতো মিনমিনে পরিবেশ হলে চলবে না। বেশ একটা—'

স্যান্ডউইচের প্লেট এসে পড়ায় আর কথা এগোল না। আমাদের তিনজনেরই খিদে পেয়েছিল বেশ জবর। একসঙ্গে দু জোড়া স্যান্ডউইচে একটা বিশাল কামড় দিয়ে তিনবার চোয়াল খেলিয়েই লালমোহনবাবু কেন জানি থমকে গেলেন। তারপর গোল গোল চোখ করে দু বার পর পর 'ঈশ্বরের জয়...ঈশ্বরের জয়' বললেন, যার ফলে

মুখ থেকে কয়েকটা রুটির টুকরো ছিটকে বেরিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল।

ব্যাপারটা হল এই : আমি আর ফেলুদা রাস্তার দিকে মুখ করে বসেছিলাম, আর লালমোহনবাবুর মুখ ছিল রেস্টোরান্টের পিছন দিকটায়। ঘরের শেষ মাথায় একটা নিচু প্ল্যাটফর্ম, দেখেই বোঝা যায় সেখানে রাত্রে বাজনা বাজে। সেখানে একটা সাইনবোর্ড দেখেই জটায়ুর এই দশা। তাতে রয়েছে এই বাজনার দলের নাম, আর নামের ঠিক তলায় লেখা—'লিডার—ক্রিস গডউইন।'

ফেলুদা হাত থেকে স্যান্ডউইচ নামিয়ে একটা বেয়ারাকে তুড়ি দিয়ে কাছে ডাকল।

'এখানে ডিনারের সময় বাজনা বাজে?'

'হাঁ বাবু, বাজতা হ্যায়।'

'তোমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

ক্রিস গডউইনের ঠিকানা জোগাড় করাই ফেলুদার উদ্দেশ্য, আর তার জন্য একটা জুতসই অজুহাতও রেডি করে রেখেছিল। ম্যানেজার আসতে বলল, 'বালিগঞ্জ পার্কের মিস্টার মানসুখানির বাড়িতে বিয়ের জন্য একটা ভাল বাজিয়ে গ্রুপ চাই। আপনাদের এখানের দলটার খুব নাম শুনেছি—তারা কি বিয়েতে ভাড়া খাটবে?'

'হোয়াই নট? এটাই তো তাদের পেশা।'

'ওই যে গডউইন নামটা দেখছি, ওই বোধ হয় লিডার? ওর ঠিকানাটা যদি...'

ম্যানেজার একটা স্লিপে ঠিকানাটা লিখে ফেলুদাকে এনে দিলেন। দেখলাম লেখা আছে—১৪/১ রিপন লেন।

অন্য দিন হলে গল্প-টল্প করে চা-স্যান্ডউইচ খেতে যতটা সময় লাগত, আজ অবিশ্যি তার চেয়ে অনেক কম লাগল। ফেলুদার খিদে মিটে গেছে; সে একটার বেশি খেল না। লালমোহনবাবু অসম্ভব স্পিডে আর এনার্জির সঙ্গে ফেলুদার দুটো আর নিজের তিনটে খেয়ে ফেলে বললেন, 'পয়সা যখন পুরো দেব তখন খাবার ফেলা যায় কেন মশাই?'

ফোর্টিন বাই ওয়ান রিপন লেনের বাড়িটো দেখে মনটা দমে যাওয়া

স্বাভাবিক— কারণ সাদত আলির নবাবির কথা এখনও ভুলতে পারিনি। কিন্তু ফেলুদা বলল, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চার-পাঁচ পুরুষের ব্যবধানে একটা পরিবার যে কোথা থেকে কোথায় নামতে পারে তার কোনও লিমিট নেই। অবিশ্যি বাড়িগুলো যে খুব ছোট তা নয়, সবই তিনতলা চারতলা, কিন্তু কোনওটারই বাইরেটা দেখে ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। লালমোহনবাবু বললেন যে, বোঝাই যাচ্ছে এর প্রত্যেকটাই হানাবাড়ি। যাই হোক, ঢোকার আগে পাশেই একটা পান-বিড়িওয়ালাকে ফেলুদা জিজ্ঞেস করে নিল।

'ইস্‌মে কোঠিমে গডউইন সাহাব নামকে কোই রহতা হ্যায়?'

'গুডিন সাহাব? জো বাজা বাজাতা হ্যায়?'

'সে ছাড়া আরও আছে নাকি?'

'বুঢ্‌ঢা সাহাব ভি হ্যায়। মার্কিস সাহাব। মার্কিস গুডিন।'

'কোন তলায় থাকেন সাহেব?'

'দো তল্লা। তিন তল্লামে আর্কিস সাহাব।'

'আর্কিস-মার্কিস দুই ভাই নাকি বাবা?' প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'নেহি বাবু। আর্কিস সাহাব আর্কিস সাহাব, মার্কিস সাহাব গুডিন সাহাব—দো তল্লামে মার্কিস সাহাব, তিন তল্লামে...'

ফেলুদা আর্কিস-মার্কিসের ঝামেলা ছেড়ে ইতিমধ্যে চোদ্দ বাই এতে ঢুকে পড়েছে। আমরাও দুর্গা বলে তার পিছন পিছন ঢুকলাম।

যা ভেবেছিলাম তাই। ভিতরে বাইরে কোনও তফাত নেই। জুন মাসের দিন বড় বলে এই সাড়ে ছ-টার সময়ও বাইরে আলো রয়েছে, কিন্তু ভিতরে সিঁড়ির কাছটায় একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। ফেলুদার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—হয়তো ওর চোখটাই ওইভাবে তৈরি—অন্ধকারে সাধারণ লোকের চেয়ে ও অনেক বেশি দেখতে পায়। ওর তরতরিয়ে সিঁড়ি ওঠা দেখে লালমোহনবাবু রেলিংটাকে খামচে ধরে কোনওরকমে উঠতে উঠতে বললেন, 'ক্যাট-বার্গলার হয় জানতুম মশাই, ক্যাট-গোয়েন্দা এই প্রথম দেখলুম।'

দোতলা থমথমে। একটা ক্ষীণ বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোধহয় কোনও রেডিও থেকে আসছে। সিঁড়ির মুখে একটা দরজা, তার পিছনে

বারান্দা, তাতে আলো না জ্বললেও বাইরেটা খোলা বলে খানিকটা দিনের আলো এসে পড়ে বারান্দার ভাঙা-কাচের টুকরো বসানো মেঝেটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাঁয়ের দরজা দিয়ে যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে তাতে কেউ নেই, কারণ বাতি জ্বলছে না। ভিতরে বারান্দার বাঁ দিকে একটা ঘর আছে বুঝতে পারছি, কারণ সেই ঘর থেকেই এক চিলতে আলো এসে বারান্দার একটা কোণে পড়েছে। একটা কালো বেড়াল সেই আলোয় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে একদৃষ্টে আমাদের দেখছে। তিনতলা থেকে পুরুষের গলার শব্দ পাচ্ছি মাঝে মাঝে। একবার যেন একটা খংখণে কাশির শব্দও পেলাম।

'বাড়ি চলুন', বললেন জটায়ু। 'এ হল রিপন লেনের গোরস্থান।'

ফেলুদা বারান্দার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'কোই হ্যায়?'

কয়েক সেকেন্ড কোনও শব্দ নেই, তারপর উত্তর এল—'কৌন হ্যায়?'

ফেলুদা ইতস্তত করছে, এমন সময় আবার কথা এল, এবার বেশ কড়া স্বরে।

'অন্দর আইয়ে!—হাই কান্ট কাম আউট।'

'ভেতরে যাবেন, না বাড়ি যাবেন?'

ফেলুদা লালমোহনবাবুর প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে চৌকাঠ পেরিয়ে এগিয়ে গেল। ও দুটি, আমরা ম্যাজ; এঁকেবেঁকে এগোলাম দু জনে পিছন পিছন।

'কাম ইন,' হুকুম এলো বাঁয়ে ঘরের ভিতর থেকে।

॥ ৬ ॥

তিনজনে ঢুকলাম ভিতরে। একটা মাঝারি সাইজের বৈঠকখানা। দরজার উলটো দিকে একটা সোফা, তার কাপড়ের ঢাকনির তিন জায়গায় ফুটো দিয়ে নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে আছে। সোফার সামনে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল;—এখন শ্বেত বললে ভুল হবে, কিন্তু এককালে তাই ছিল। বাঁয়ে একটা কালো প্রাচীন বুক কেস, তাতে

গোটা পনেরো প্রাচীন বই। বুক কেসের মাথায় একটা পিতলের ফুলদানিতে ধুলো জমা প্লাস্টিকের ফুল, সে ফুলের রং বোঝে কার সাধ্যি। দেয়ালে একটা বাঁধানো ছবি, সেটা ঘোড়াও হতে পারে, রেলগাড়িও হতে পারে, এত ধুলো জমেছে তার কাচে। যে ফিলিপস রেডিওটা সোফার পাশের টেবিলের উপর রাখা রয়েছে সেটার মডেল নির্ঘাৎ ফেলুদার জন্মেরও আগের। আশ্চর্য এই যে সেটা এখনও চলে, কারণ সেটা থেকেই গানের শব্দ আসছিল। এখন একটা শিরা-বার-করা ফ্যাকাসে হাত নব ঘুরিয়ে গানটা বন্ধ করে দিল। যার হাত, তিনি সোফার এক কোণে একটা কুশন কোলে নিয়ে বাঁ পা-টা একটা মোড়ার উপর তুলে দিয়ে বসে মিটমিট করে আমাদের দিকে চাইছেন। এঁর শরীরে যে সাহেবের রক্ত আছে সেটা চামড়ার রং থেকে বোঝা যায়, আর চুলের যেটুকু পাকা নয় তার রং কটা। চোখটা যে কীরকম সেটা বুঝতে পারছি না, কারণ ছাত থেকে ঝোলানো যে বাতিটা জ্বলছে সেটার পাওয়ার পঁচিশের বেশি নয়।

'আমি গাউটে ভুগছি, তাই চলাফেরা করতে পারি না', ইংরিজিতে বললেন সাহেব। 'আই হ্যাভ টু টেক দ্য হেল্প অফ মাই সারভেন্ট। সে শুয়োরটা আবার ফাঁক পেলেই সটকায়।'

ফেলুদা এবার পরিচয়ের ব্যাপারটা সেরে নিল। ভদ্রলোক আমরা আসাতে বিরক্ত হলেও সেটা এখনও প্রকাশ করেননি। ফেলুদা কাজের কথায় চলে গেল।

'আমি শুধু একটা খবর জানতে এসেছি। আপনি কি টমাস গডউইনের বংশধর—যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন?'

সাহেব মাথাটা আর একটু তুললেন। এবারে বুঝলাম তাঁর চোখের রং ঘোলাটে নীল। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'নাউ হাও দ্য হেল ডিড ইউ নো আবাউট মাই গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার?'

'তাহলে আমার অনুমান ঠিক?'

'শুধু তাই নয়; আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যেটা খোদ টমাস গডউইনের সম্পত্তি। অন্তত আমার ঠাকুমা তাই বলতেন।

দেড়শো বছরের—ও হেল!'

'কী হল?'

'দ্যাট স্কাউন্ড্রেল অ্যারাকিস—ঠক, জোচ্চোর! কালই রাত্রে ওটা চেয়ে নিয়ে গেছে। বলেছে আজ ফেরত দেবে। আজই ওদের মিটিং বসবে। আজ বিষ্যুদবার তো? একটু পরেই শুনতে পাবে মাথার উপরে সব উদ্ভট আওয়াজ।'

মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে বলেই বোধহয় ঘরটা আরও অন্ধকার লাগছে। কিংবা হয়তো সত্যি করেই রাত হয়ে আসছে। না, মেঘ ডাকল। আকাশে মেঘ করেছে, তাই অন্ধকার।

ফেলুদা মি. গডউইনের সামনে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসেছে। তার ডান পাশে আরামকেদারায় জটায়ু। আরাম খুব হচ্ছে না, কারণ উশখুশে ভাব দেখে মনে হয় ছারপোকার কামড় খাচ্ছেন। আমি বসেছি বাঁয়ে একটা চেয়ারে। ফেলুদা চেয়ে আছে একদৃষ্টে সাহেবের দিকে, ভাবটা—তুমি যা বলতে চাও বলো, আমি শুনতে এসেছি।

'ইটস অ্যান আইভরি কাসকেট,' বললেন মি. গডউইন। 'ভেতরেও জিনিস আছে। দুটো পুরনো পাইপ, একটা রুপোর নস্যির কৌটো, একটা চশমা, আর সিল্কে মোড়া একটা প্যাকেট। ভেতরে বইটই আছে বলে মনে হয়; কোনওদিন খুলিনি। আরও সব ছিল বাড়িতে পুরনো জিনিস; আমার বাউন্ডুলে ছেলেটা সব বেচে দিয়েছে। পড়াশুনোয় জলাঞ্জলি দিয়ে গাঁজা ধরল, আর তারপরেই ঘর থেকে এটা ওটা সরিয়ে বেচতে শুরু করল। বাক্সটা যে কেন নেয়নি জানি না। হয়তো নিত; কপাল ফিরে গেল তাই নেবার দরকার হয়নি। বাজনার দল করেছে একটা। তার রোজগারেই চলছে এখন—যদি চলা বলো এটাকে। ছেলেকে আর দোষ দিই কী করে? আমারই কি কম দোষ? শুনেছি টম গডউইন জুয়ো খেলে সর্বস্ব খুইয়েছিলেন। আমারও তাই।...'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। হাঁপাচ্ছেন। বোধহয় একটানা এত কথা বলে। বাতের যন্ত্রণাতেই বোধ হয় একবার মুখটা বেঁকে গেল। তারপর আবার কথা।...

'একবার বিলেত গিয়েছিলাম ইয়ং বয়সে। ছোট কাকা ছিল লন্ডনে,

মিডল্যান্ড ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ারি করত। তিন মাসের বেশি থাকতে পারেনি। শীত সহ্য হয়নি। খানা সহ্য হয়নি। ডাল-ভাতের অভ্যেস। ফিরে এলাম ক্যালকাটা। বিয়ে করলাম। বউ মরেছে দশ বছর আগে। এখন আছে ক্রিস্টোফার। মুখ দেখি দিনে একটিবার হয়তো; কী তাও না। পাশের ঘরে বসে গিটারে টাং ট্যাং করে। হাত ভাল।'

মাথার উপরে সত্যিই একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুরু হয়েছে। খট খট—খট খট। হচ্ছে আবার থামছে, ঘরের ছায়াগুলো দুলছে, কারণ খট খটের সঙ্গে সঙ্গে সিলিং-এর বাতিটা দুলতে আরম্ভ করেছে। এখন আর শুধু লালমোহনবাবু না; আমারও ভয় করছে। এ রকম বাড়িতে, এ রকম ঘরে কখনও আসিনি; এরকম মানুষের মুখে এ রকম কথা কখনও শুনিনি। কী ব্যাপার হচ্ছে ওপরের ঘরে?

গডউইন সাহেব ওপরে না তাকিয়েই বললেন, 'টেবিলটা লাফাচ্ছে। চার ব্যাটা ভণ্ড টেবিলটাকে ঘিরে বসেছে। বলে মরা লোকের আত্মা নামায় ওরা, আর যেই সে আত্মা আসে অমনি টেবিলটা ছটফট করতে শুরু করে।'

'ওরা কারা?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'অ্যারাকিসের দল। প্রেতচর্চা সমিতি। দুটো ইহুদি, একটা পার্শি, আর অ্যারাকিস। আমাকে দলে টানতে চেয়েছিল, আমি যাইনি। একদিন অ্যারাকিসের কাছে টমাস গডউইনের কথা বলেছিলাম। বললে, তোমাকে তার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব। আমি বললাম—নো, সার্টেনলি নট। আজ বাদে কাল এমনিতেই তার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর কাল এসে বললে—'

ভদ্রলোক থামলেন। খট খট খট। আবার টেবিল লাফাচ্ছে।

'কিন্তু বাক্সটা কেন নিল আপনার কাছ থেকে?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'সেটাই তো বলছি। বললে, আমরা তোমাকে ছাড়াই গডউইনের আত্মা নামাব। তার নিজের জিনিস কিছু থাকলে দাও, সেটা টেবিলের উপর রাখলে আত্মা সহজে নামবে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে তিনি নেমেছেন।'

খট খট খট...আবার টেবিল লাফাল।

'ব্যাপারটা কি অন্ধকারে হয়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'সব কুকর্মকিই তো অন্ধকারে হয়।'—গডউইনের গলার স্বরে বিদ্রূপ।

'একবার উপরে যাওয়া যায়?'

লালমোহনবাবু প্রশ্নটা শুনেই চেয়ারের হাতল খামচে তাঁর আপত্তি জানিয়ে দিয়েছিলেন। গডউইন সাহেবের উত্তরে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

'ও ঘরে তোমায় ঢুকতে দেবে না,' বললেন মি. গডউইন। 'অর মেমবারস্ ওনলি। ওর চাকর পাহারা দেয়। তবে কেউ যদি কারুর আত্মা নামাতে চায় ওদের সাহায্যে, তো সে আলাদা কথা। আগাম বিশ টাকা, আত্মা নামলে আরও একশো।'

'আই সি...'

ফেলুদা উঠে পড়ল। 'আচ্ছা, মিস্টার গডউইন। অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।'

'গুড নাইট।'

গডউইন সাহেবের শীর্ণ হাত আবার রেডিওর দিকে চলে গেল।

ল্যান্ডিং-এ এসে ফেলুদা যেটা করল সেটা আমাকে হকচকিয়ে দিল, লালমোহনবাবুর যে কী দশা হল সেটা অন্ধকারে বুঝতে পারলাম না। ফেলুদা নীচে না গিয়ে সটান তিনতলায় রওনা দিল।

'আপ-ডাউন গুলিয়ে ফেললেন নাকি?' ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন জটায়ু। উত্তর এল, 'চলে আসুন, ঘাবড়াবেন না।'

উপরে উঠেই সামনে লুঙ্গি পরা দারোয়ান।

'আপ কিসকো মাংতে হ্যায়?'

'আমি শুধু তোমার প্রয়োজন মেটাতে এসেছি ভাই!'

ফেলুদা আরাকিন সাহেবের দারোয়ানের দিকে একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছে। লোকটা থতমত। ফেলুদা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'তোমার মনিব যে ঘরে বসেছেন সেটা এখন চারদিক থেকে বন্ধ কিনা সেটা আগে বলো।'

ওষুধ ধরেছে বোধহয়। চাকর বলল বারান্দার দিক থেকে বন্ধ, কিন্তু শোবার ঘর দিয়ে দরজা আছে ঢোকার; সেটা খোলা।

'তোমার কোনও চিন্তা নেই—কিচ্ছু করতে হবে না—শুধু

একজ্যারতি শোবার ঘরটা দেখিয়ে দাও। নইলে বিপদ হবে। আমরা পুলিশের লোক; ইনি দারোগা।'

লালমোহনবাবু পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁড়িয়ে হাইটটা হঠাৎ করে দু ইঞ্চি বাড়িয়ে নিলেন। এ অ্যাক্টিং-এ দাম আছে। ফেলুদা নোটটা আর একটু এগিয়ে একেবারে দারোয়ানের হাতের তেলোতে ঠেকিয়ে দিল। তেলোটা আপনা থেকেই নোটের উপর মুঠো হয়ে গেল।

'আইয়ে— লেকিন...'

'লেকিন-টেকিন ছাড়ো ভাই! তোমার মনিবের বন্ধুদের একজনের ওপর পুলিশের সন্দেহ, তাই যাওয়া দরকার। তোমার সাহেবের বা তোমার কিছু হবে না।'

'আইয়ে।'

শোবার ঘর অন্ধকার, আর তার একটা খোলা দরজার ওদিকে যে ঘর, সেও অন্ধকার। আমরা তিনজনে সেই দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্ল্যানচেটের ঘর থেকে এখন কোনও শব্দ নেই। তবে একটু আগে পর পর তিনবার টেবিলের পায়ের শব্দ পেয়েছি। বুঝতে পারছি ভূত নামানোর ক্লাবের সদস্যরা সব দম বন্ধ করে টমাস গডউইনের আত্মার জন্য অপেক্ষা করছেন। লালমোহনবাবু এত জোরে আর এত দ্রুত নিশ্বাস ফেলছেন যে ভয় হচ্ছে তাতেই পাশের ঘরের সবাই আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে। ফেলুদা ইতিমধ্যে বোধহয় দরজার আরও কাছে এগিয়ে গেছে। কোত্থেকে যেন কেরোসিন তেলের গন্ধ আসছে। একবার শুনলাম একটা বেড়াল ম্যাও করল। বোধহয় দোতলার সেই কালো হুলোটা।

'ট—মাস গডউইন। ট—মাস গডউইন।'

গোঙানির মতো স্বরে নামটা দু বার উচ্চারিত হল। বুঝলাম এইভাবেই এরা আত্মাকে ডাকে।

'আর ইউ উইথ আস? আর ইউ উইথ আস?'

কোনও সাড়া নেই, কোনও শব্দ নেই। প্রায় আধ মিনিট হয়ে গেল। তারপর আবার সেই কাতর প্রশ্ন—

'টমাস গডউইন...আর ইউ উইথ আস?'

Diary

'ইয়ে—স। ইয়ো—স!'

আমার ডান পাশেও পায়া ঠক ঠক করে কাঁপছে। টেবিলের নয়, মানুষের। লালমোহনবাবুর হাঁটু।

'ইয়েস! আই হ্যাভ কাম: আই অ্যাম হিয়ার!'

'হিয়ার' বললেও মনে হয় বহু দূর থেকে আসছে গলার স্বরটা।

প্ল্যানচেটের দল আবার প্রশ্ন করল।

'তুমি কি সুখে আছ? শান্তিতে আছ?'

উত্তর এলো—'নো—ও!'

'কী দুঃখ তোমার?'

প্রায় আধ মিনিট সব চুপ। তারপর আবার প্রশ্ন করল ম্যারাকিসের দল।

'কী দুঃখ তোমার?'

'আই...আই...আই...ওয়ান্ট মাই...আই ওয়ান্ট মাই...কাসকেট!'

এর পরেই একসঙ্গে কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার। পাশের ঘর থেকে এক ভয়াবহ চিৎকার, আতঙ্কের শেষ অবস্থায় যেটা হয়—আর পর মুহূর্তেই আমার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান আর কানের কাছে ফিসফিস—'চলে আয়, তোপ্‌সে!'

ম্যারাকিসের চাকর আমাদের তিনজনকে ছুটে বেরোতে দেখে যেন আরও হতভম্ব হয়ে কিছুই করল না। এক মিনিটের মধ্যে তিনজনে বিপন লেন পেরিয়ে রয়েড স্ট্রিটে রাখা আমাদের গাড়িটার দিকে এগোতে লাগলাম। 'এ এক খেল দেখালেন মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু। 'এ জিনিস ফিল্মে দেখালে সুপারহিট।'

লালমোহনবাবুর তারিফের কারণ আর কিছুই না; ফেলুদার হাতে এসে গেছে সাদত আলির দেওয়া টমাস গডউইনের আইভরি কাসকেট।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকাল। ফেলুদা নিজেই আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছে। কাল রাত্রে লালমোহনবাবু আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবার

পর আধ ঘণ্টার মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে ফেলুদা তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সত্যি বলতে কী, রাত্রে আমার ভাল করে ঘুমই হয়নি। বেশ বুঝতে পারছি যে আমরা একটা অদ্ভুত রকম প্যাঁচালো রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি। এ গোলকধাঁধার কাছে লখনৌ-এর ভুলভুলাইয়া হার মেনে যায়। কোন দিকে কোন রাস্তায় যেতে হবে জানি না, সব ভরসা ফেলুদার উপর। অথচ ফেলুদা নিজেই কি ভুলভুলাইয়া থেকে বেরনোর পথ জানে?

ফেলুদা তার ঘরে খাটের উপর বসে, অর সামনে টমাস গডউইনের বাক্স, তার ভিতরের জিনিস খাটের উপর ছড়ানো। দুটো তামাক খাবার সাদা পাইপ—এমন পাইপ আমি কখনও চোখেই দেখিনি; একটা রুপোর নস্যির কৌটো; একটা সোনার চশমা, আর চারটে লাল চামড়ায় বাঁধানো খাতা—তার প্রত্যেকটার মলাটে সোনার জল দিয়ে লেখা 'ডায়রি'। খাতাটা যে সিল্কের কাপড়ে বাঁধা ছিল সেটা বিছানার উপরেই পড়ে আছে, আর তার পাশে পড়ে আছে নীল ফিতেটা। ফেলুদা একটা খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব সাবধানে প্রথম পাতাটা উল্টে দ্যাখ।'

'এ কী। এ যে শার্লট গডউইনের খাতা।'

'১৮৫৮ থেকে '৬২ পর্যন্ত। যেমন মুক্তোর মতো হাতের লেখা, তেমনি স্বচ্ছন্দ ভাষা। কাল সারা রাত ধরে পড়ে শেষ করেছি। কী অমূল্য জিনিস যে রিপন লেনের অন্ধকূপের মধ্যে এতকাল পড়েছিল, তা ভাবা যায় না।'

আমি অবাক হয়ে প্রথম পাতাটার দিকে চেয়ে আছি। আর উলটোতে সাহস পাচ্ছি না, কারণ বুঝতে পারছি পাতাগুলো ঝুরঝুরে হয়ে আছে। ফেলুদা বলল, 'আরাকিস এ খাতা খুলেছিল।'

'কী করে জানলে?'

'খাতার পাতা অসাবধানে উলটোলেই পাতার উপরের ডান দিকের কোণ আঙুলের চাপে ভেঙে যায়। এই দ্যাখ—'

ফেলুদা একটা পাতা অসাবধানে উলটে দেখিয়ে দিল।

'আর শুধু তাই না,' বলে চলল ফেলুদা, 'এই ফিতেটা দ্যাখ। কয়েক জায়গায় ক্ষয়ে গেছে—একশো বছরের উপর গেরোবাঁধা অবস্থায়

পাবার জন্য। কিন্তু ওই অক্ষরে যাওয়া জায়গা ছাড়াও দ্যাখ এই দুটো জায়গায় ফিতে কেমন পাকিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে টাটকা নতুন গেরোর চিহ্ন। যে খুলেছে সে অত হিসেব করে ঠিক একই জায়গায় গেরো বাঁধেনি; সেটা করলে ধরা মুশকিল হত।'

'তোমার আঙুলে কালো দাগ কেন?'—এটা আমি ঘরে ঢুকেই লক্ষ করেছি।

'এটা আরেকটা ক্লু,' বলল ফেলুদা। 'এটা বোঝানোর সময় পরে আসবে। দাগটা লেগেছে ওই নস্যির কৌটোটা থেকে।'

'কী জানলে ওই ডায়রি পড়ে?' আগ্রহে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

'টম গডউইনের শেষ বয়সের কথা,' বলল ফেলুদা। 'একটা পয়সা হাতে নেই, খিটখিটে মেজাজ। এক ছেলে মরে গেছে, অন্য ছেলে ডেভিডের উপর কোনও বিশ্বাস নেই, কোনও টান নেই। কাউকে ট্রাস্ট করে না, এমনকী নিজের মেয়ে শার্লটকেও না। কিন্তু শার্লট তবু তার পরিচর্যা করে, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, ভগবানের কাছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করে। জুয়ায় সর্বস্ব গেছে টমাস গডউইনের; শার্লট নিজে সেলাই-এর কাজ করে আর কার্পেট বুনে কলকাতার মেমসাহেবদের কাছে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। গডউইন লখনৌ-এর নবাবের কাছে দামি জিনিস যা পেয়েছিল সব বিক্রি করে দিয়েছে, কেবল তিনটি জিনিস ছাড়া। এই কাসকেট, এই নস্যির কৌটো—যেটা সে আগেই শার্লটকে দিয়েছিল—আর তৃতীয় হল সাদতের কাছে পাওয়া তার প্রথম বকশিশ।'

'সেটাও শার্লটকে দিয়ে গেছিল?'

'না। সেটা সে কাউকে দেয়নি। মারা যাবার আগে সে মেয়েকে বলে গিয়েছিল, সেটা যেন তার কফিনের মধ্যে পুরে তার মৃতদেহের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়। শার্লট তার বাপের ইচ্ছা পূরণ করে মনে শান্তি পেয়েছিল।'

'সেটা কী জিনিস?'

'শার্লটের ভাষায়—"ফাদার'স প্রেশাস পেরিগ্যাল রিপিটার"।'

'সেটা আবার কী?'

'এখানে ফেলু মিত্তিরও ফেল মেরে গেছে রে তোপসে। ডিকশনারিতে বলছে রিপিটার বন্দুক বা পিস্তল হতে পারে, আবার ঘড়িও হতে পারে। পেরিগ্যাল হয়তো কোম্পানির নাম। সিধু জ্যাঠাও শিওর নন। তুই ঘুম থেকে ওঠার আগে ওর বাড়িতে ঢুঁ মেরে এসেছি। দেখি, বিকাশবাবু যদি আলোকপাত করতে পারেন।'

পার্ক স্ট্রিটে একটা নিলামের দোকান আছে, নাম পার্ক অকশন হাউস। সেখানে বিকাশ চক্রবর্তী বলে এক ভদ্রলোক কাজ করেন যাঁর সঙ্গে ফেলুদার খুব আলাপ। একটা কেসের ব্যাপারে ফেলুদাকে ওখানে যেতে হয়েছিল বার কয়েক, তখনই চেনা হয়।

'এই সেলিংও দোকানটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখেছি অনেক পুরনো ঘড়ি সাজানো রয়েছে। আমার মন বলছে ওটা বন্দুক-টন্দুক নয়, ঘড়ি।'

লালমোহনবাবু আসার আগে অবধি ফেলুদা শার্লট গডউইনের ডায়রি থেকে অনেক ঘটনা বলল। শার্লটের এক ভাইঝি বা বোনঝিরও কথা নাকি আছে ডায়রিতে। শার্লট তাকে উল্লেখ করেছে 'মাই ডিয়ার ক্লেভার নীস' বলে। সে নাকি কোনও কারণে তার ঠাকুরদাদাকে অসন্তুষ্ট করেছিল, কিন্তু মারা যাবার আগে টম গডউইন তাকে ক্ষমা করে তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে যান। শার্লটের দুই ভাই ডেভিড আর জনের কথাও ডায়রিতে আছে। ডেভিডের সমাধি আমরা সার্কুলার রোডের গোরস্থানে দেখেছি। জন বিলেতে গিয়ে আত্মহত্যা করেন; কেন সেটা শার্লট জানতে পারেননি।

লালমোহনবাবু এসে বললেন, 'কাল সকাল অবধি দোটানার মধ্যে ছিলুম,—পুলকের জন্য ভক্তিমূলক গল্প লিখি, না আপনার সঙ্গে ভিড়ে পড়ি। কালকের কাণ্ডকারখানার পর আর দ্বিধা নেই। থ্রিল ইজ বেটার দ্যান ভক্তি। সেই বাক্সে কিছু পেলেন?'

'একটা সোয়াশো বছরের পুরনো ডায়রি থেকে জানলাম যে, টমাস গডউইনের কবর খুঁড়লে হয়তো একটা পেরিগ্যাল রিপিটার পাওয়া যেতে পারে।'

'কী পিটার?'

'চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। পেট্রোল কত আছে?'

'দশ লিটার ভরলুম তো আজ সকালেই।'

'গুড। ঘোরাঘুরি আছে।'

পার্ক অকশন হাউসে ঢুকেই ফেলুদার ভুরুটা কুঁচকে গেল।

'আসুন, মিস্টার মিত্তির! কী সৌভাগ্য আমার। কোনও নতুন কেস-টেস নাকি?'

বিকাশবাবু এগিয়ে এসেছেন। বেশ চকচকে নাদুসনুদুস চেহারা, গাল ভর্তি পান। কেন জানি দেখলেই মনে হয় নর্থ ক্যালকাটার লোক।

'আপনার যে সৌভাগ্য সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলল ফেলুদা। 'এই সেদিন দেখলাম গোটা আষ্টেক ছোট বড় ঘড়ি সাজানো রয়েছে; এর মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে গেল?'

'কেন? কী ঘড়ি চাই আপনার? ওয়াল ক্লক? অ্যালার্ম ক্লক?'

ফেলুদা তখনও এদিক ওদিক দেখছে। বিকাশবাবুকে দেখে কেন জানি মনে হচ্ছিল যে উনি ওই খটমট নামওয়ালা ঘড়ির বিষয় কিছু জানবেন না। ফেলুদার প্রশ্ন শুনে বললেন, 'রিপিটার বোধহয় এক রকমের অ্যালার্ম ঘড়ি। তবে পেরিগাল ঠিক বুঝলাম না। তা ঘড়ির বিষয়ে জানার জন্য তো খুব ভাল লোক রয়েছে। তার বাড়িতে শুনেছি আড়াইশো রকম ঘড়ি আছে। ঘড়ি-পাগলা লোক আর কী।'

'কার কথা বলছেন?'

'মিস্টার চৌধুরী। মহাদেব চৌধুরী।'

'বাঙালি?'

'বাঙালি হলেও মনে হয় পশ্চিম-টশ্চিমে মানুষ। ভাঙা-ভাঙা বলেন বাংলা; বেশির ভাগ ইংরিজিই বলেন। এলেমদার লোক। আগে বম্বে ছিলেন, এখন কলকাতায় এসেছেন। আর এসেই, যা পাচ্ছেন—একটু ভাল হলেই—কিনে নিচ্ছেন। অবিশ্যি পুরনো হওয়া চাই। আপনি যে বলছেন এখানে ঘড়ি দেখছেন না, তার বেশির ভাগই আপনি দেখতে পাবেন ওঁর বাড়িতে গেলে। আর লোকটা জানেও। আপনি একবারটি গিয়ে কথা বলে দেখুন না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—দেখেননি?'

'কী বিজ্ঞাপন?'

'কারুর কাছে কোনও পুরনো ঘড়ি বিক্রি থাকলে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

'লোকটিকে একটি পুরোদস্তুর ধনকুবের বলে মনে হচ্ছে!'

'বাবা—ক্লথ মিল, সিনেমা হাউস, চা, জুট, রেসের ঘোড়া, ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট—কী চাই আপনার?'

'ঠিকানা জানেন?'

'জানি বইকী। কলকাতায় আলিপুর পার্ক, আর তা ছাড়া পেনেটিতে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি কিনেছে। ওখানেই কাছাকাছির মধ্যে কাপড়ের মিল। এখন বোধহয় কলকাতায় আছে, তবে আপনারা সকালে না গিয়ে বিকেলে যাবেন; এখন অফিসে থাকবেন।...দাঁড়ান, ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।'

মহাদেব চৌধুরীর ঠিকানা নিয়ে আমরা পার্ক অকল্যান্ড হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। 'আপনারা এক কাজ করুন,' ফেলুদা গাড়িতে উঠে বলল, 'আমাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরির এসপ্লানেড রিডিং রুমে নামিয়ে দিয়ে একবারটি পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে গিয়ে দেখে আসুন তো রিপোর্ট করার মতো কিছু আছে কিনা।'

'রিপোর্ট?'—লালমোহনবাবুর গলা আর স্টেডি নেই।

'হ্যাঁ, রিপোর্ট। আর কিছু দেখবার দরকার নেই, শুধু গডউইনের সমাধিটা একবার দেখে আসবেন। এ দু দিন জল হয়নি, জায়গাটা শুকনোই পাবেন। ওখানে কাজ সেরে চলে আসবেন আমার কাছে, তারপর বাইরে কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে। এখন আর বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না। অনেক কাজ; একবার রিপন লেনেও যেতে হবে।'

ফেলুদা গডউইন সাহেবের বাক্সটা ভাল করে ব্রাউন কাগজে প্যাক করে সঙ্গেই এনেছে, আর সব সময় বগলদাবা করে রেখেছে।

'অবিশ্যি দিনের বেলা আর ভয়ের কী আছে বলুন,' বললেন লালমোহনবাবু, 'সন্ধের দিকটাতেই একটু ইয়ে-ইয়ে লাগে।'

'মন যদি কুসংস্কারের ডিপো না হয় তা হলে ভূতের ভয় কোনও সময়ই নেই।'

এসপ্লানেডের পথে একটা ট্রাফিক জ্যামে পড়ে অপেক্ষা করার ফাঁকে লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনি যে ঘড়ির খোঁজ করছেন, সে কি ট্যাঁক-ঘড়ি?'

'সে তো জানি না এখনও।'

'ট্যাঁক-ঘড়ি যদি হয় তো আমার কাছে একটা আছে।'

'কার ঘড়ি?'

'যার ঘড়ি তার তিনটে জিনিস রয়েছে আমার কাছে—ঘড়ি, ছড়ি আর পাগড়ি। প্রপিতামহের জিনিস। সেই প্যারীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। আচ্ছা, প্যারী নামটা কোত্থেকে এল মশাই?'

'এখানেই ছিল,' বলল ফেলুদা। 'আপনি বাংলা রাইটার হয়ে প্যারী মানে জানেন না? প্যারী হল রাধার আর এক নাম। যেমন রাধিকাচরণ, তেমনি প্যারীচরণ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। যা হোক, যা বলছিলাম—ঘড়িটা ভাবছি আপনাকে দিয়ে দেব।'

ফেলুদা বেশ অবাক।

'হঠাৎ?'

'একটা কিছু দেব দেব করছিলাম ক-দিন থেকে; আমার হিন্দি ছবির সাফল্যের পিছনে তো আপনার অবদান কম নয়।—আর তার মানে এই গাড়িটা হওয়ার পিছনেও। হয়তো দেখবেন এ ঘড়িও সেই পেরিপিটার না কী বলছিলেন, সে জিনিস।'

'সেটার চান্স কম। তবে আপনি যে জিনিসটা অফার করলেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার কাছে খুব যত্নে থাকবে এটা কথা দিতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর জিনিস তো আর ব্যবহার করা যায় না—তবে দম দেব রোজ। ঘড়িটা চলে?'

'দিব্যি।'

ফেলুদাকে নামিয়ে দিয়ে যখন আমরা গোরস্থানে পৌঁছলাম তখন প্রায় বারোটা বাজে। এখানে কাজ সেরে ফেলুদাকে তুলে নিয়ে আমরা যাব নিজামে মাটন রোল খেতে। এটা ফেলুদারই প্ল্যান, ও-ই খাওয়াবে। অবিশ্যি তার আগে যাওয়া হবে রিপন লেনে বাক্স ফেরত দিতে।

পার্ক স্ট্রিটে এ সময়টা ট্র্যাফিক কম, তাই দুপুর হওয়া সত্ত্বেও গোরস্থানের পরিবেশটা বেশ নিরিবিলি। গেট দিয়ে ঢুকে দু একবার ডাকাডাকি করেও বরমদেও দারোয়ানের দেখা পেলাম না। সে আবার

ইঁদুরের সৎকার করতে কোনও ঝোপের পিছনে গেছে কিনা কে জানে।

আমরা মাঝখানের পথটা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। লালমোহনবাবুকে যতই ঠাট্টা করি না কেন, আর ফেলুদা কুসংস্কারের কথা যাই বলুক না কেন, এই গোরস্থানটার ভিতরে ঢুকলে সাহসের খানিকটা কম পড়ে যায় ঠিকই। শুধু সমাধিগুলো থাকলেও না হয় হত; তার উপরে এত গাছপালা, এত ঝোপঝাড় আগাছা কচুবনে ছেয়ে আছে জায়গাটা যে, তাতে ছমছমে ভাবটা আরও বেড়ে যায়। অবিশ্যি লালমোহনবাবু যতটা বাড়াবাড়ি করছেন, ততটা করার মতো ভয়ের কারণ দিনের বেলা কী থাকতে পারে জানি না। ভদ্রলোক এগোতে এগোতে আড়চোখে ফলকগুলোর দিকে দেখছেন আর সমানে মন্ত্র আওড়ানোর মতো করে বিড়বিড় করছেন। কী যে বলছেন সেটা কান পেতে শুনে তবে বুঝতে পারলাম। সেটা শোনার মতোই বটে।

'দোহাই পামার সাহেব, দোহাই হ্যামিলটন সাহেব, দোহাই স্মিথ মেমসাহেব—ঘাড়টি মটকিও না বাবা, কাজে ব্যাগড়া দিয়ো না। তোমরা অনেক দিয়েচ, অনেক নিয়েচ, অনেক শিখিয়েচ, অনেক ঠেকিয়েচ...ক্যাম্বেল সাহেব, অ্যাডাম সাহেব, আর—হুঁ হুঁ—তোমার নামের তো বাবা উচ্চারণ জানি না।—দোহাই বাবা, তোমরা ধুলো, ধুলো হয়েই থাকো বাবা, ধুলো...ধুলো...'

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'কী ধুলো-ধুলো করছেন?'

'ছেলেবেলায় পড়িনি যে বাবা তপেশ—ডাস্ট দাউ আর্ট, টু ডাস্ট রিটার্নেস্ট। এ সবই তো ধুলো।'

'তাহলে আর ভয় কীসের?'

'কবিরা যা লেখে সব কি আর সত্যি?'

আমরা বাঁয়ের মোড় ঘুরেছি। গাছ এখনও পড়ে আছে। মাটি শুকনো। অনেক মাটি। টমাস গডউইনের সমাধি ঘিরে মাটির ঢিবি।

'ধুলো...ধুলো...ধুলো...'

লালমোহনবাবু যেন মনে সাহস আনার জন্যই যান্ত্রিক মানুষের মতো কথাটা বলতে বলতে গডউইনের সমাধির দিকে এগিয়ে

গেছেন। তারপর তাকে তিনবার 'ক' আর দু বার 'কং' কথাটা বলতে শুনলাম, আর তারপরই তিনি দাঁত কপাটি লেগে কাটা গাছের মতো সটান পড়ে গেলেন মাটির ঢিবির ওপর।

তার পা যেখানে পড়েছে তার পর থেকেই শুরু হয়েছে একটা গর্ত, সেটা প্রায় এক-মানুষ গভীর, আর সেই গর্তের মাটির ভিতর থেকে উঁকি মারছে একটা মড়ার খুলি।

॥ ৮ ॥

মিনিট দশেক ঝাঁকুনিতে লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরে না এলে সত্যিই মুশকিল হত। কারণ এরকম অবস্থায় এর আগে আমি কখনও পড়িনি। ভদ্রলোক গায়ের ধুলোমাটি ঝেড়ে বললেন সাহিত্যিকদের নাকি সহজে অজ্ঞান হবার একটা টেনডেনসি আছে, বিশেষত ভয় পেলে, কারণ তাদের কল্পনাশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি ধারালো। 'তোমার দাদা যে কুসংস্কারের কথাটা বললেন সেটা একদম বাজে। আমার মধ্যে ওসব ইয়ে একদম নেই।'

আমরা অবিশ্যি আর এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে সোজা চলে গিয়েছিলাম ফেলুদার কাছে। ওর কাজও শেষ হয়ে গিয়েছিল; না হলেও ও যে এমন খবর শুনে সব কাজ ফেলে গোরস্থানে চলে আসবে সেটা জানতাম। গডউইনের সমাধি দেখে, মাটির ভিতর থেকে উঁকি মারা প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো মড়ার খুলি দেখে আর চারিদিকটা ভাল করে সার্চ করে সমাধি থেকে হাত দশেক দূরে পড়ে থাকা একটা কোদাল ছাড়া আর কিছু পেল না ফেলুদা।

এবারে অবিশ্যি দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হল। সে বলল তার ভাতিজার পানের দোকান আছে কাছেই লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে, সেখানে একটা জরুরি কথা বলতে গিয়েছিল। সে কবর খোঁড়ার ঘটনা কিছুই জানে না। তার বিশ্বাস ঘটনাটা আগের রাত্রে ঘটেছে, আর যারা করেছে তারা পাঁচিল টপকে এসেছে। ফেলুদা দারোয়ানের সাহায্যে মিনিট পনেরোর মধ্যে মাটি আর গাছের পাতা দিয়ে গর্তটা মোটামুটি বুজিয়ে দিল। যাবার সময় দারোয়ানকে বলে

গেল্ল ঘটনাটা সে যেন কাউকে না বলে।

গোরস্থান থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম রিপন লেনে।

চোদ্দ বাই একের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আমাদের একটু বাধা পড়ল। একজন নামছেন সিঁড়ি দিয়ে, তাঁর হাতে একটা লম্বা চামড়ার কেস। গিটারের কেস। বছর পঁচিশেক বয়সের একজন যুবক। এ ধরনের চেহারা যে কোনও সময়ে, বিশেষ করে সন্ধের দিকে, পার্ক স্ট্রিটে গেলেই দেখা যায়, কাজেই বর্ণনা দেবার দরকার নেই। মিস গডউইন এই যে বেরল, ফিরবে বোধহয় সেই রাত্রে, ব্লু-ফক্সের বাজনা সেরে।

গৌতিথ্য আজ আর কালকের মতো নিস্তব্ধ নয়; বৈঠকখানায় গলাবাজি চলেছে। একটা গলা আমাদের চেনা; অন্যটা মনে হয় তিন তলার সাহেবের। প্রথম গলা বিশ্রী ভাষায় ধমকাচ্ছে, আর দ্বিতীয় গলা ইনিয়ে-বিনিয়ে দোষ অস্বীকার করছে। 'কাসকেট' কথাটা বার বার ব্যবহার করছেন দু জনেই।

ফেলুদা বারান্দায় গিয়ে বৈঠকখানার দরজায় টোকা মারল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের মতো শোনা গেল 'কৌন হ্যায়'। আমরা তিনজনেই চৌকাঠ পেরোলাম। অচেনা ভদ্রলোকটির গায়ের রং হলদে, সর্বাঙ্গে মেচেতা, মাথায় টাক, দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি। ভদ্রলোক আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, ফেলুদা তাঁকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে হাতের বাক্সটা মোড়ক খুলে সোফায় বসা মি. গডউইনের দিকে এগিয়ে দিল।

'এটা কাল নিয়ে যাবার লোভ সামলাতে পারিনি। আমার রিসার্চে প্রচুর সাহায্য করবে।'

গডউইন বাক্সটা পেয়ে এক মুহূর্ত হতভম্ব থেকে তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

'সো ইউ ফুলড দেম, ইউ ফুলড দেম! দোজ ফুলস!—ধূর্ত, ঠগ, জোচ্চোর।'—এবার শুধু রাগ আর বিদ্রূপ, আর তার সবটা গিয়ে পড়েছে অন্য ভদ্রলোকটির উপর।—'টম গডউইনের প্রেতাত্মা নিয়ে গেছে তার বাক্স? ইনি কি টম গডউইনের প্রেতাত্মা?—দিস জেন্টলম্যান? কী মনে হয় তোমার?—এই যে, ইনিই হচ্ছেন মিস্টার ম্যারাকিস, আমার তিনতলার প্রতিবেশী, যার টেবিলের ছটফটানি

আমার প্রত্যেক বিষ্যুদবারের সন্দেশগুলোকে মাটি করে দেয়।'

মিস্টার আরাকিস বোকার মতো বাক্সটার দিকে চেয়ে ছিলেন; এবারে তাঁর দৃষ্টি গেল ফেলুদার দিকে। তারপর আবার বোকার মতো দৃষ্টি ঘুরিয়ে দরজার দিকে এগোতে গিয়েই তাঁকে থেমে যেতে হল। ফেলুদা তার নাম ধরে ডেকেছে।

'মিস্টার অ্যারাকিস!'

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা ধীরকণ্ঠে বলল, 'এই বাক্সের একটা জিনিস বোধহয় আপনার কাছে রয়ে গেছে।'

'ন্যাসেন্স ন্যাট!' অ্যারাকিস গর্জিয়ে উঠলেন। 'আর সেটা আপনিই বা বুঝছেন কী করে? মার্কাস, তুমি বাক্স খুলে দেখে নাও তো কোনও জিনিস কম পড়ছে কিনা।'

এতক্ষণে জানলাম মি. গডউইনের প্রথম নাম, আর সেই সঙ্গে আর্কিস-মার্কিস রহস্যের সমাধান হল।

মার্কাস গডউইন বাক্স খুলে তার ভিতর হাতড়ে দেখে একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন, 'কই মি. মিটার, এতে তো সব জিনিসই আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'ওই নস্যির কৌটোটা একবার বার করবেন কি?—যেটার বর্ণনা শার্লট গডউইন তাঁর ডায়রিতে দিয়েছেন এবং বলেছেন ওর গায়ে পান্না চুনি এবং নীলা বসানো ছিল?'

মি. গডউইন কৌটো বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

ফেলুদা বলল, 'বুঝতে পারছেন কি যে, ওটা একটা শস্তা নতুন কৌটো, যাতে কালো রং মাখিয়ে পুরনো করার চেষ্টা করেছিলেন মি. অ্যারাকিস?'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওপর থেকে আসল নস্যির কৌটো এনে দিলেন মিস্টার অ্যারাকিস, আর মি. গডউইন তাকে দিয়ে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলিয়ে নিলেন যে, সামনের বিষ্যুদবার যদি আবার খটখটানি শোনেন তা হলেই পুলিশে খবর দেবেন। কালো মুখ করে চোর অ্যারাকিস চোরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার মিটার,' হাঁপ ছেড়ে বললেন মার্কাস গডউইন।

'শার্লট গডউইনের ডায়রি যে কত মূল্যবান জিনিস সেটা আপনি

জানেন?' প্রশ্ন ফেলুদার।

'না। শার্লট গডউইনের ডায়রি ওই বাক্সে রয়েছে তা আমি জানতাম না,' বললেন মার্কাস গডউইন। 'তবে একটা কথা আমি আপনাকে বলছি মি. মিটার—আমার পূর্বপুরুষদের নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। সত্যি বলতে কী আমার কোনও বিষয়েই কোনও কৌতূহল নেই। এখন শুধু মরার দিনটির জন্য অপেক্ষা। এই বেড়াল ছাড়া আর আমার আপন বলতে কেউ নেই। সন্ধেবেলা একজনের বাড়িতে গিয়ে পোকার খেলতাম, এখন গাউটের জন্য তাও পারি না।'

'তাহলে প্রশ্নগুলো করে বোধহয় লাভ নেই।'

'কী প্রশ্ন?'

'আপনার ঠাকুরদাদার বাবার নাম ছিল ডেভিড, যার সমাধি রয়েছে সার্কুলার রোড গোরস্থানে।'

'ইয়েস।'

'ডেভিডের আর কোনও ভাই বা বোন ছিল কি?'

'মনে নেই। আমার এক পূর্বপুরুষ আত্মহত্যা করেছিলেন। সে কিনা মনে নেই।'

'ডেভিডের ছেলে, অর্থাৎ আপনার ঠাকুরদাদার নাম ছিল অ্যান্ড্রু?'

'ইয়েস। হি ওয়াজ ইন দি আর্মি।'

'শার্লট গডউইন তার এক ভাইঝি বা বোনঝির কথা লিখেছেন। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, তিনি আপনার ঠাকুরদার আপন বোন কিংবা—'

'আমার ঠাকুরদাদার কোনও ভাই-বোন ছিল না।'

'তাহলে কাজিন।'

'তাদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না, মি. মিটার। আমার স্মরণশক্তি অনেকদিন থেকেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তা ছাড়া আমাদের পরিবার তোমাদের মতো কাছাকাছি থাকে না। তারা সব ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে। এ তো আর তোমাদের বাঙালিদের একান্নবর্তী পরিবার নয়।'

* * *

সোসাইটি সিনেমার সামনে নিজামেতে বসে মাটন রোল খেতে

খেতে খেতে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে একটা প্রশ্ন করল।

'নরেন বিশ্বাস লোকটাকে আপনার কেমন মনে হয়?'

লালমোহনবাবু চিবনো শেষ করে ঢোক গিলে বললেন, 'ভালই তো। চোখের মধ্যে বেশ একটা ইয়ে ভাব আছে।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল।'

'এখন আর হচ্ছে না?'

'অবিশ্যি একটা দোষেই একটা মানুষের গোটা চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় না। কিন্তু এটা বলতেই হয় যে, ভদ্রলোক একটা মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছেন।'

আমরা দু জনেই খাওয়া থামালাম।

'আজ প্রমাণ পেলাম যে, ওঁর মানিব্যাগের কাটিং দুটো ন্যাশনাল লাইব্রেরির রীডিং রুমে সযত্নে রক্ষিত দেড়শো দুশো বছরের পুরনো খবরের কাগজ থেকে ব্লেড দিয়ে কেটে নেওয়া। আমার মতে, এ অপরাধের জন্য মানুষের জেল হওয়া উচিত।'

আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম নরেনবাবু রিডিং রুমে বসে দম বন্ধ করে গোপনে কর্মচারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই দুষ্কর্মটি করছেন, কিন্তু পারলাম না। সত্যি, মানুষকে দেখে চেনার উপায় নেই।

'এটা একটা রোগ বলতে পারেন,' ফেলুদা বলে চলল, 'আর এ ধরনের অন্যায় কাজ ধরা না পড়ে সাকসেসফুলি করতে পারলে মানুষ একটা উৎকট আনন্দও পায়, নিজেকে আর পাঁচজনের চেয়ে বেশি চতুর মনে করে একটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। ভেরি স্যাড।'

মটন রোলের পর লস্যির অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা বিলটাও আনতে বলে দিল। ঘড়িতে বলছে আড়াইটা। আরও তিন ঘণ্টা সময় কাটিয়ে তারপর যেতে হবে ঘড়ি-পাগল মিস্টার চৌধুরীর বাড়িতে। আমি জানি পেরিগ্যাল রিপিটারের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ফেলুদার সোয়াস্তি নেই।

'আচ্ছা মশাই, হাড়গিলেও কি এইভাবে খাবারের প্রত্যাশায় জানালার উপর বসে হাঁক পাড়ত নাকি?'

আমাদের পাশেই রাস্তার দিকে একটা জানালা, তার উপর একটা কাক বসে বেশ কিছুক্ষণ থেকে কা-কা করছে। সেইটের দিকে

তাকিয়েই লালমোহনবাবু প্রশ্নটা করেছেন।

'সম্ভবত না', বলল ফেলুদা, 'তবে বাড়ির আলসে বা ছাতের পাঁচিলে যে বসত তার অনেক প্রমাণ পুরনো ছবিতেও আছে।'

'আশ্চর্য, পাখিটার চেহারা যে কীরকম তাই জানি না।'

'জানার একটা উপায় হচ্ছে চিড়িয়াখানায় যাওয়া। আর না হয় চলুন কর্পোরেশন স্ট্রিট দিয়ে ফেরাব। মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এর সামনেই কর্পোরেশনের সিম্বলে হাড়গিলের চেহারা দেখিয়ে দেব।'

'আপনি এখনও কর্পোরেশন স্ট্রিট বলছেন?' হেসে বললেন জটায়ু।

'থুড়ি, সুরেন ব্যানার্জি—'

ফেলুদা থেমে গেল। চোখের চাহনি চেঞ্জ। পকেট থেকে খাতা বার করে কী জানি দেখল। তারপরেই ছটফটে ভাব, কারণ বিল দিতে দেরি করছে। ফেলুদা বেয়ারা বলে হাঁক দিল—যেটা সচরাচর করে না। বিল দিয়ে গাড়িতে উঠে ড্রাইভার হরিপদকে নির্দেশ দিয়ে দিল। গাড়ি সুরেন ব্যানার্জি রোডে গিয়ে পড়ল। ফেলুদা বাড়ির নম্বর দেখছে, যদিও সব বাড়িতে নম্বর নেই—কলকাতার এই আরেকটা কেলেঙ্কারি। 'আরেকটু এগিয়ে যাবে ভাই।...তোপ্সে, ১৪১ দেখলেই বলবি।'

মনে পড়ে গেল—১৪১ SNB। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। বুকটা টিপ্ টিপ্ করছে।

'ওই যে একশো একচল্লিশ।'

গাড়ি থামল। বাড়ির গায়ে লেখা Bourne & Shepherd-BS! পাওয়া গেছে। মিলে গেছে।

ফেলুদার সঙ্গে আমরা দু জনও ভিতরে ঢুকলাম। লিফ্ট দিয়ে উঠতে হবে।

দোতলায় লিফ্ট থেকে বেরিয়েই একটা সোফা-দেওয়া পাতা ঘর। একজন কর্মচারী আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদার ইতস্তত ভাব, কারণ যে প্রশ্নটা করতে হল সেটায় একটা বেকুবি গন্ধ থাকতে বাধ্য।

'ইয়ে—ভিক্টোরিয়ার কোনও ছবি আছে আপনাদের এখানে?'

'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল?'

'না। কুইন ভিক্টোরিয়া।'

'আজ্ঞে না। আমাদের এখানে শুধু যাঁরা ভারতবর্ষে এসেছেন তাঁদের ছবি পাবেন। এডওয়ার্ড দ্য সেভেন্থ পাবেন—যখন প্রিন্স অফ ওয়েল্স ছিলেন—জর্জ দ্য ফিফ্থ, দিল্লির দরবার...'

'এ সব এখনও পাওয়া যায়?'

'প্রিন্ট তৈরি থাকে না। নেগেটিভ আছে; অর্ডার দিলে করে দিই। ১৮৫৪ থেকে সব নেগেটিভ রাখা আছে।'

'বলেন কী! আঠারোশো চুয়ান্ন?'

'বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড হল পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম ফোটোর দোকান।'

'তার মানে তো হাজার হাজার নেগেটিভ থাকবে আপনাদের এখানে!'

'আসুন না, দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই যে দেখুন দেয়ালে ঝুলছে—১৮৮০-তে মনুমেন্টের উপর থেকে তোলা ছবি।'

এতক্ষণ দেখিনি, এবার বলতে চোখ গেল। এক হাত বাই পাঁচ হাত সাইজের ছবি। মনুমেন্টের উপর থেকে প্রায় একশো বছর আগের কলকাতা শহর। ডালহৌসি-এসপ্ল্যানেড থেকে শুরু করে উত্তরে যতদূর দেখা যায়। গির্জাগুলির মাথা অন্য সব বাড়িকে ছাপিয়ে উঠেছে। স্কাইলাইনে একটাও হাইরাইজ নেই। দেখলেই বোঝা যায় শান্ত শহর।

নেগেটিভের ঘর দেখে চোখ টেরিয়ে গেল। ঘরের চার দেয়ালের মেঝে থেকে সিলিং অবধি শেলফ উঠে গেছে, আর প্রত্যেকটি শেলফ ব্রাউন রঙের চ্যাপটা চ্যাপটা বাক্সে ঠাসা। প্রত্যেক বাক্সের গায়ে লেখা রয়েছে তাতে কোন সালের কী ধরনের ছবি রয়েছে।

ফেলুদা শেলফগুলোর সামনে ঘুরে ঘুরে লেখাগুলোর দিকে কিছুক্ষণ খুব মন দিয়ে দেখে হাতের রিস্টওয়াচটার দিকে একবার চেয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোরা ঘণ্টাখানেক ঘুরে আয়; আমার একটু কাজ আছে এখানে।'

লিফটে উঠে লালমোহনবাবু বললেন, 'তোমার দাদার হুকুম শিরোধার্য। ওই একটা লোককে না বলা যায় না। কী পার্সোনালিটি! চলো একটিবার ফ্র্যাঙ্ক রস্-এ।'

গাড়িটা সুরেন ব্যানার্জি রোডেই রেখে আমরা চৌরঙ্গি দিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। লালমোহনবাবু কী ওষুধ কিনবেন জানি না, আমার দরকারও নেই। উদ্দেশ্য কেবল সময় কাটানো।

ভিড়ের মধ্যে কৌশলে বাঁচিয়ে কিছুদূর এগোনোর পর ভদ্রলোক বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছ ভাই তপেশ—তোমার দাদার মতিগতি?'

বলতে বাধ্য হলাম যে কিছুই বুঝছি না, তবে এটুকু আন্দাজ করতে পারছি যে, ফেলুদা ছাড়াও আরেকজন কেউ শার্লট গডউইনের ডায়রি পড়েছে, আর সেই পড়ার সঙ্গে টমাস গডউইনের কবর খোঁড়ার একটা সম্পর্ক রয়েছে।

'দুশো বছর মাটির নীচে থাকার পরও যে দেহ কঙ্কাল অবস্থায় থাকে সেটা তুমি জানতে?' জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

এ ব্যাপারে জোব চার্নকের মৃতদেহ নিয়ে একটা ঘটনা ফেলুদা আমাকে বলেছিল; সেটা লালমোহনবাবুকে বললাম। চার্নক মারা যাবার দুশো বছর পরে সেন্ট জন্স গির্জার একজন পাদ্রির মনে হঠাৎ সন্দেহ ঢোকে চার্নকের সমাধিটা সত্যিই সমাধি তো, নাকি এমনিই একটা স্তম্ভ খাড়া করা হয়েছে। সন্দেহটা এমনিই পেয়ে বসে যে, পাদ্রি শেষে লোক দিয়ে মাটি খোঁড়ালেন। চার ফুট নীচে পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু আর দু ফুট খুঁড়তেই একটা কঙ্কালের হাত বেরিয়ে পড়ল। পাদ্রি মানে মানে গর্ত বুজিয়ে দিলেন।

ফ্র্যাঙ্ক রস-এ গিয়ে লালমোহনবাবু যখন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন 'ওয়ান ফরহ্যানস ফর দি গামস ফ্যামিলি সাইজ', ঠিক তখনই লক্ষ করলাম দোকানে একজন চেনা লোক ঢুকছেন। তিনি অবিশ্যি আমাদের দেখামাত্র চেনেননি; বার দু-তিন আমাদের দিকে তাকিয়ে তারপর মুখে হাসিটা এল। নরেনবাবুর ভাই গিরীনবাবু। হাতে একটা বড় বাক্স, তাতে লেখা হংকং ড্রাই ক্লিনারস। বললেন, 'দাদার জন্য ওষুধ নিতে এসেছি।'

'কেমন আছেন নরেনবাবু?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'দাদা বেটার। ভাল কথা—আপনাদের সঙ্গে সেদিন যিনি ছিলেন তিনিই নাকি গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্তির? দাদা দিলেন খবরটা। ভদ্রলোকের নাম শুনেছি আগে। ভাবছিলাম—'

গিরীনবাবু ভুরু কুঁচকে একটু যেন অন্যমনস্ক হলেন। তারপর বললেন, 'ওঁকে বাড়িতে পাওয়া যায় কখন?'

'সেটা ঠিক বলা মুশকিল,' আমি বললাম, 'তবে ডিরেক্টরিতে নম্বর পাবেন। আপনি আসতে চাইলে আগে ফোন করে নিতে পারেন।'

'হুঁ...ওঁর সঙ্গে একটু...ঠিক আছে, আমি টেলিফোন করে নেব। বলবেন প্রদোষবাবুকে, দরকার পড়লে যাব—হেঃ হেঃ...'

আমরাও হেঁ হেঁ করতে করতে ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

নিউ মার্কেটে একটা চক্কর মেরে মতিশীল স্ট্রিট দিয়ে সুরেন ব্যানার্জিতে পড়লাম। বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডের সামনে এসে দেখি ফেলুদা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কাজ নাকি যা আন্দাজ করা গিয়েছিল তার একটু আগেই শেষ হয়ে গেছে। গিরীনবাবুর সঙ্গে দেখা হবার খবরটা ফেলুদাকে দিলাম। 'বটে?' বলল ফেলুদা, 'কী বললেন ভদ্রলোক?' আমি জানি ফেলুদাকে ভাসাভাসাভাবে কিছু বললে চলবে না, তাই যা কথা হল সব ডিটেলে বললাম। এমনকী ভদ্রলোকের হাতে লাড্ডুর বাক্সটার কথাও বললাম। ফেলুদা চুপ করে শুনে গেল। 'কাজ কেমন হল?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'ফার্স্ট ক্লাস,' বলল ফেলুদা, 'একেবারে রত্নখনি। আর ওখান থেকে ফোন করে জেনে নিয়েছি মি. চৌধুরী বাড়ি ফিরেছেন। পাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেছে। মখমলের মতো মোলায়েম গলায় কথা বলেন ভদ্রলোক।'

॥ ৯ ॥

বাজা-ঘড়ি বা চাইমিং ক্লক অনেক শুনেছি, কিন্তু মহাদেব চৌধুরীর বাড়িতে ঢুকতে না-ঢুকতে ছ-টা বাজার যে সব অদ্ভুত শব্দ একটার পর একটা ঘড়ি থেকে আমাদের কানে আসতে লাগল, সে রকম ঘড়ির বাজনা আমি কোনওদিন শুনিনি। লালমোহনবাবু বললেন, 'এ যেন স্বর্গদ্বার দিয়ে ঢুকছি মশাই। মাজলিক বাজছে। এ রিসেপশন ভাবা যায় না।'

ঢুকতেই যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল তা নয়। একজন কর্মচারী গোছের লোক এসে বলল, মি. চৌধুরী ব্যস্ত আছেন, আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমরা একটা আপিস ঘরে গিয়ে বসলাম। এই ছোট্ট ঘরেও দুটো বাহারের ঘড়ি—একটা দেয়ালে, একটা বুকশেলফের ওপর।

ঘড়ির শব্দ থামতে এখন বাড়িটা থমথমে মনে হচ্ছে। পেল্লায় হাল ফ্যাশানের বাড়ি, পায়ের নীচে শ্বেতপাথরের মেঝেতে মুখ দেখা যায়।

একটা গলার স্বর বাড়ির ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি; ফেলুদা বলল সেটাই নাকি মহাদেব চৌধুরীর গলা। মখমল কি না সেটা এখান থেকে বোঝা মুশকিল, তবে এই গলাটাই যে হঠাৎ সপ্তমে চড়ে আর মখমল রইল না সেটা বেশ বুঝতে পারলাম।

মহাদেব চৌধুরী কাকে যেন বেদম ধমক দিচ্ছেন। আমরা তিনজনে প্রায় দমবন্ধ করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আড়ি পাতছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি গলা তুলছে না, তাই তার কথা বুঝছি না। কথা হচ্ছে ইংরিজিতে। চৌধুরীর গলায় হুমকানি শোনা গেল—

'এ সব ব্যাপারে আমি ফ্যাড্ডাপ দিই না—আপনি অত করে বললেন বলে দিলাম—আর এখন বলছেন, সে টাকা খরচ হয়ে গেছে? আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আর এই সামান্য কাজটা করতে এত টাকা কেন লাগবে সেটাও আমি বুঝছি না। যাই হোক, আমি দিচ্ছি টাকা, কিন্তু দু দিনের মধ্যে আমি মাল চাই। আমি কোনও অসুবিধার কথা শুনতে চাই না, বুঝেছেন?'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর একটা জুতোর শব্দ পেলাম: মনে হল সেটা সদর দরজার দিকে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই কর্মচারীটি আবার এল।—

'আপলোগ আইয়ে।'

মি. চৌধুরীর মাথার চুল থেকে জুতোর ডগা পর্যন্ত সত্যিই মখমলের মতো। ভদ্রলোক দিনে দু বার দাড়ি কামান নিশ্চয়ই, নাহলে সন্ধ্যা ছ-টায় পুরুষ মানুষের গাল এত মসৃণ হয় না। (পরে লালমোহনবাবু বলেছিলেন, মনে হচ্ছিল গালে মাছি বসলে পিছলে যাবে)। যে বিশাল বৈঠকখানা ঘরটাতে আমরা বসেছি সেটাও মি.

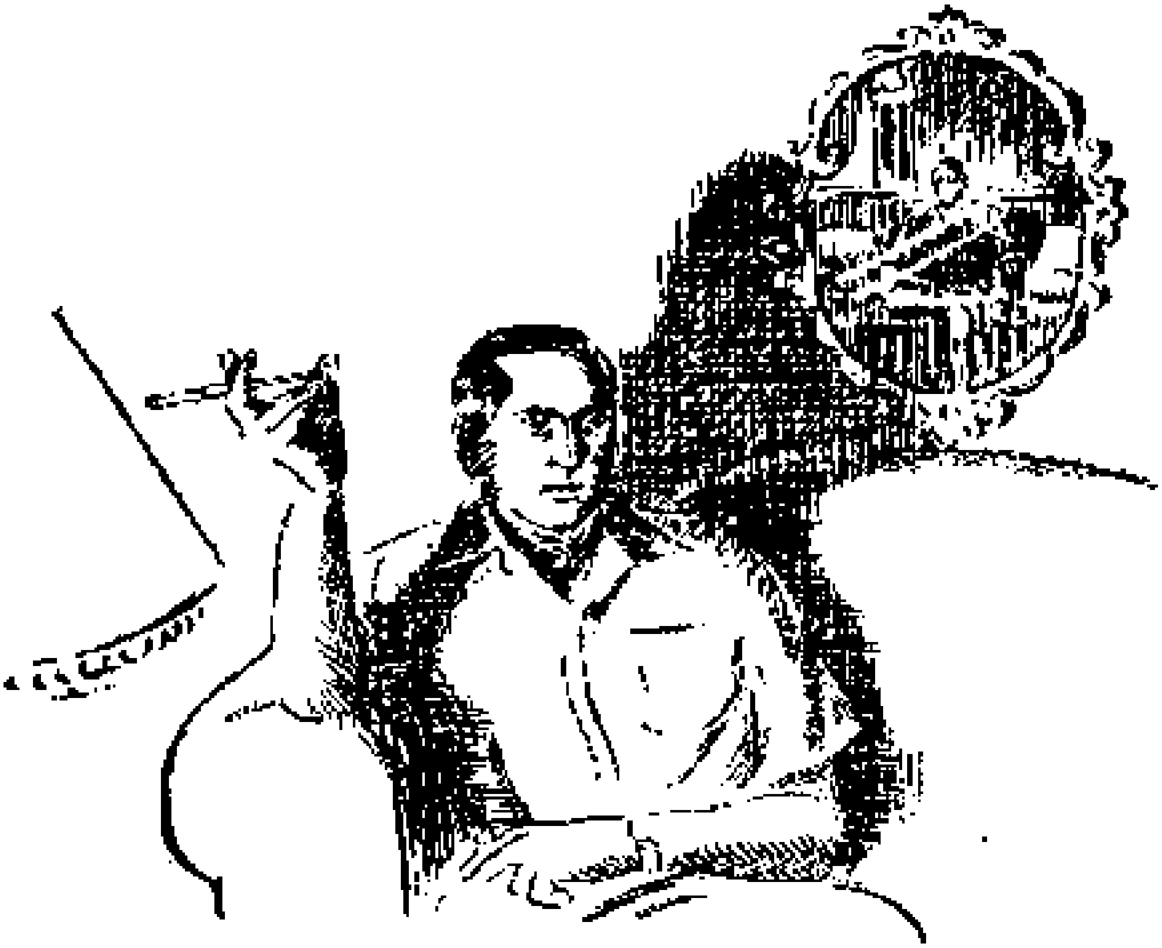

চৌধুরীর মতোই পালিশ করা। আনাচে-কানাচে কোথাও এক কণা ধুলো বা একটাও পিঁপড়ে বা আরশোলা থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

সোনার হোল্ডারে ধরা সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফেলুদার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন মি. চৌধুরী—

'ওয়েল—ঘড়িটা এনেছেন সঙ্গে?'

আমরা সকলেই অবাক; ফেলুদা তো বটেই।

'ঘড়ি? কী ঘড়ি বলুন তো?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'আপনি যে বললেন একটা ঘড়ির ব্যাপারে দেখা করতে আসছেন? আমি তো ভাবলাম আমার বিজ্ঞাপন পড়ে ফোন করছেন আমাকে।'

'মাপ করবেন মিস্টার চৌধুরী—আমি আপনার বিজ্ঞাপন পড়িনি। আমার একটা ব্যাপার একটু জানার দরকার হয়ে পড়েছে, সেটা সম্ভবত

ঘড়ি সংক্রান্ত। শুনলাম আপনি ঘড়ির বিষয় অনেক কিছু জানেন, তাই—'

মখমলে ভাঁজ পড়েছে। ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্তির সঙ্গেই নড়েচড়ে বসে বললেন—

'আমার সময় বেশি নেই মি. মিটার। একটু পরেই কলকাতার বাইরে চলে যাব। আপনার কী জানার আছে সংক্ষেপে বলুন।'

'পেরিগ্যাল রিপিটার জিনিসটা কী সেটা জানতে চাইছিলাম।'

মখমল হঠাৎ পাথর হয়ে গেল। সিগারেট হোল্ডার ঠোঁটের কাছে এসে থেমে গেছে। চোখের মণি পাথর, দৃষ্টি ফেলুদার দিকে, নিষ্পলক।

'আপনি কোথায় পেলেন নামটা?'

'ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা ইংরেজি উপন্যাসে।'

তার কাজের সুবিধের জন্য যে ফেলুদা অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলতে পারে সেটা আগেও দেখেছি।—'রিপিটার যে ঘড়িও হতে পারে বন্দুকও হতে পারে সেটা অভিধানে দেখেছি, কিন্তু পেরিগ্যাল সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল না।'

মহাদেব চৌধুরী এখনও সেইভাবেই চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে। এর পরের প্রশ্নটাতে মখমলের সঙ্গে মেশানো একটা ধারালো ভাব দেখা দিল।

'আপনি কি সব সময়েই কথার মানে জানতে অচেনা লোকের বাড়ি ধাওয়া করেন?'

'বিশেষ প্রয়োজন হলে করি বইকী।'

আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করবেন বিশেষ প্রয়োজনটা কী; কিন্তু তা না করে সেই একইভাবে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে থেকে যে কথাটা বললেন, তাতে আমার ডান পাশের টেবিলের উপরে ঘড়িটা যেভাবে টিক্‌টিক্‌ করছে, আমার হৃৎপিণ্ডটাও ঠিক সেইভাবেই টিক্‌টিক্‌ করতে আরম্ভ করে দিল।

'আপনি তো গোয়েন্দা, তাই না?'

ফেলুদার নার্ভের বলিহারি। জবাবটা দিতে বোধ হয় পাঁচ সেকেন্ড দেরি হয়েছিল, কিন্তু যখন এল তখন তারও গলা মখমল।

'আপনি খবর রাখেন দেখছি।'

'রাখতেই হয় মিস্টার মিটার। খবর সংগ্রহের জন্য লোক থাকে।'

'আমার প্রশ্নটা বোধ হয় ভুলে গেছেন। হয়তো উত্তরটা আপনার জানা নেই। আর যদি জেনেও জবাব না দিতে চান তা হলে আমি উঠি। বৃথা আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'সিট ডাউন, মিস্টার মিটার।'

ফেলুদা উঠে পড়েছিল, তাই এই হুকুম। লালমোহনবাবুকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর নিজের থেকে ওঠার ক্ষমতা নেই, ধরে উঠিয়ে দিতে হবে।

'সিট ডাউন, প্লিজ।'

ফেলুদা বসল।

'রিপিটার মানে বন্দুকও হয়', বললেন মহাদেব চৌধুরী, 'তবে তার সঙ্গে পেরিগ্যাল যোগ দিলে সেটা হয় ঘড়ি। পকেট ওয়াচ। ফ্রান্সিস পেরিগাল। ইংলিশম্যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পেরিগ্যালের মতো ঘড়ির কারিগর পৃথিবীতে কমই ছিল। দুশো বছর আগে ইংল্যান্ডেই সবচেয়ে ভাল ঘড়ি তৈরি হত, সুইটজারল্যান্ডে নয়।'

'আজকের দিনে একটা পেরিগ্যাল রিপিটারের দাম কত হতে পারে?'

'সে ঘড়ি কেনার সামর্থ্য তো আপনার নেই মি. মিটার।'

'তা জানি।'

'আমার আছে।'

'তাও জানি।'

'তাহলে দাম জেনে কী হবে?'

'কৌতূহল।'

'ব্যর্থ কৌতূহল।'

মি. চৌধুরী সিগারেটে শেষ টান দিয়ে হোল্ডার থেকে সেটা খুলে পাশে কাঁচের অ্যাশ-ট্রেতে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন সেটা আপনার জানা হয়ে গেছে', বললেন মি. চৌধুরী। 'এবার আপনি আসুন। পেরিগ্যাল রিপিটার কলকাতায় যেটা আছে সেটা আমিই পাব, আপনি পাবেন না।— প্যারেলাল!'

একজন কর্মচারী এসে দাঁড়াল। সেই একই লোক—যিনি আমাদের আপিস ঘরে বসিয়েছিলেন। আমরা উঠে পড়লাম। যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি, তখন মখমলের মতো গলাটা আরেকবার শোনা গেল।

'আমার কাছে অন্যরকম রিপিটারও আছে মি. মিটার; তবে তার আওয়াজ ছড়ির মতো সুরেলা নয়।'

* * *

'আপনার বর্তমান কাহিনীর নায়ক তো ইনিই বলে মনে হচ্ছে', বললেন জটায়ু।

আমরা আলিপুর পার্ক থেকে ফিরছি। গাড়ির কাচ আবার তুলে দিতে হয়েছে, কারণ বৃষ্টি। জাজেস কোর্ট রোডে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টিটা নেমেছে।

ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথায় কোনও জবাব না দিয়ে জানালার বাইরে দৃশ্য দেখতে লাগল। লালমোহনবাবু একটানা বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারেন না। বললেন, 'ঠিক নায়ক না বলে ভিলেন বলা উচিত, কিন্তু আপনি যে বলেন ক্রাইমের ব্যাপারে সকলকেই সন্দেহ করা উচিত—যে কেউ ভিলেন হতে পারে— তাই আর বললুম না। অবিশ্যি সন্দেহটাও যে ঠিক কী কারণে করা উচিত, সেটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। কবর খোঁড়াটা কি ক্রাইমের মধ্যে পড়ে?'

ফেলুদা কোনও কথারই জবাব দিচ্ছে না দেখে লালমোহনবাবু এবার অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—'ও মশাই, আপনি যে দমে গেলেন বলে মনে হচ্ছে! তাহলে আমাদের কী দশা হবে ভেবে দেখুন! একে তো ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে হাড়গোড় নড়বড়ে হয়ে যাবার অবস্থা। তারপরে ওই অতগুলো ঘড়ির ঢং ঢং, আর তার উপরে আবার আপনি গুম, বাইরে বৃষ্টি, রাস্তায় গাড্ডা...'

এতক্ষণে ফেলুদা মুখ খুলল।

'আপনার অনুমান ভুল, মি. গাঙ্গুলী। আমি দমিনি মোটেই। জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে পথ পেয়ে গেলে কি লোকে দমে? বরং উলটো।'

'পথ পেয়ে গেছেন?'

'পেয়েছি, তবে পথের শেষে কী আছে তা এখনও জানি না। পথ অত্যন্ত ঘোরালো। আরও বেশ কিছুটা এগোলে পরে শেষ দেখা যাবে।'

আমরা বাড়ি ফেরার পরও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। লালমোহনবাবু বলে গেলেন কাল সকাল সকাল আসবেন।—'এ কেসটায় আমি ছাড়া আপনার গতি নেই, ফেলুবাবু! বাস-ট্রামে

খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেলে আপনার কত সময় লাগত ভাবুন দিকি!'

আজ দুপুরে বিশ্রামে বসে থাকতেই লক্ষ করেছিলাম, ফেলুদা তার খাতায় কী যেন হিজিবিজি কাটছে; রাত্রে খাবার পর ওর ঘরে এসে জানতে পারলাম সেটা কী। ও যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তা নয়; এমনিতেই আমার ওর জন্য ভাবনা হচ্ছিল; মহাদেব চৌধুরীকে দেখে আর তার কথা শুনে অবধি দুশ্চিন্তা হচ্ছিল; ভদ্রলোকের মুখটা মনে করলেই কেমন জানি বুকটা কেঁপে উঠছিল। লালমোহনবাবু হিরো ভিলেন যা ইচ্ছে তাই বলুন না কেন, আমার কাছে উনি একটি ভয়াবহ চরিত্র। বাইরেটা মখমল হলে কী হবে, ভিতরটা ধু ধু মরুভূমির কাঁটা-ঝোপের জঙ্গল।

অবিশ্যি ফেলুদাকে দেখে মনেই হল না যে তার কোনও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সে এখন সামনে খাতা খুলে বসে একমনে একটা নকশার দিকে দেখছে। আমি ঢুকতে 'এই দ্যাখ শাখাপ্রশাখা' বলে খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। তাতে যে জিনিসটা আঁকা রয়েছে সেটা আমি তুলে দিচ্ছি—

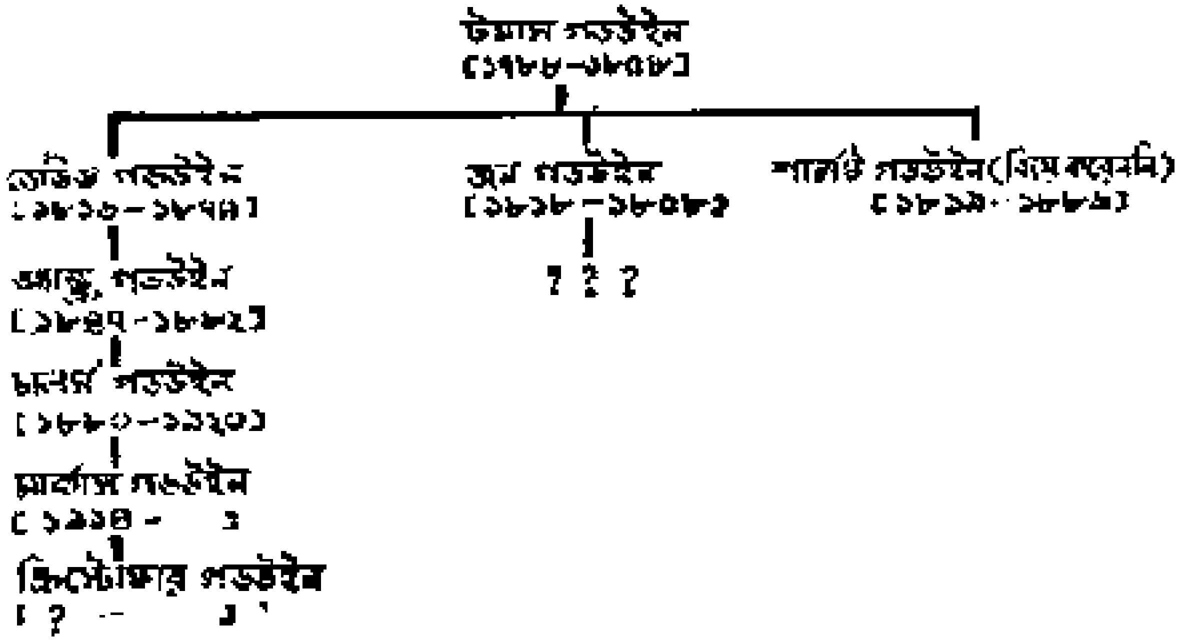

'ডান দিকটা কী রকম খালি-খালি লাগছে না?' বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'তা তো লাগবেই। শার্লট তো বিয়েই করেনি।'

'শার্লটকে নিয়ে সমস্যা নয়। সমস্যা ওই অন্য ব্যক্তিটিকে নিয়ে। ওই একটি শব্দের বাকি অংশটা লুকিয়ে আছে। অবিশ্যি একটা জিনিস উলটো অবস্থায় দেখেছি; সেটা সোজা দেখলে পরে কিছুটা আলোকপাত হতে পারবে। অর্থাৎ কাল সকালে।'

এটা ফেলুদার একটা মার্কামারা হেঁয়ালি; আর যখন হেঁয়ালি করে বলছে, তখন হেঁয়ালি করবার জন্যই বলেছে।

আমাদের কথার ফাঁকেই বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। ফেলুদাকে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বিছানা থেকে উঠতে দেখে অবাক লাগল।

বললাম, 'বেরোবে নাকি?'

'ইয়েস স্যার।'

'সে কী? কোথায়?'

'ডিউটি আছে।'

'কীসের ডিউটি?'

'পাহারা।'

তার হান্টিং বুট-জোড়া বার করে রেখেছে ফেলুদা সেটা এতক্ষণ দেখিনি। ওটা দেখলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়, কারণ ফেলুদার প্রত্যেকটা বিখ্যাত তদন্তের সঙ্গে ওটা জড়িয়ে আছে। মাঝরাত্তিরে গোরস্থানে চলতে ফিরতে হলে ওটা ছাড়া গতি নেই।

'গোরস্থানে?' ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আর কোথায় বল।'

'একা যাবে?'

'চিন্তা নেই। সঙ্গী আছে। রিপিটার।'

ফেলুদা আলমারি থেকে তার ৩২ কোল্টটা বার করে পকেটে পুরল। আমার ভাল লাগছে না ব্যাপারটা মোটেই। বললাম, 'কিন্তু ওখানে কী ঘটনা ঘটবে বলে আশা করছ? কবর তো খোঁড়া হয়ে গেছে। ঘড়ি যদি পেয়ে থাকে সে তো নিয়ে গেছে।'

'নেয়নি। যে বা যারা খুঁড়ছিল তারা মড়ার খুলি দেখেই ভয়ে

পালিয়েছে। নইলে ওভাবে কোদাল ফেলে দিয়ে যায় না। হয় নিয়ে যাবে, না হয় লুকিয়ে রাখবে।'

এ জিনিসটা আমার একেবারেই খেয়াল হয়নি।

॥ ১০ ॥

ফেলুদা ফিরেছে কখন জানি না। আমি যখন উঠে নীচে নেমেছি, তখন ওর ঘরের দরজা বন্ধ; তখন বেজেছে সোয়া সাতটা। বুঝলাম দু রাত না ঘুমিয়ে সকালে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

ন-টার সময় ও দরজা খুলল। ফিটফাট দাড়ি কামানো চেহারা, চোখে-মুখে কোনও ক্লান্তির ছাপ নেই। বুড়ো আঙুল নেড়ে বুঝিয়ে দিল রাত্রে কিছু ঘটেনি।

সাড়ে ন-টায় জটায়ু এলেন।

'দেখুন তো কীরকম জিনিস।'

জটায়ু তাঁর কথামতো তাঁর ঠাকুরদাদার ঘড়িটা নিয়ে এসেছেন। রুপোর ট্যাঁকঘড়ি, তার সঙ্গে ঝুলছে রুপোর চেন।

'বাঃ, দিব্যি জিনিস,' ঘড়িটা হাতে নিয়ে বলল ফেলুদা। 'কুকবেল্লভির বেশ নাম ছিল এককালে।'

'কিন্তু সে জিনিস তো হল না'—আক্ষেপের সুরে বললেন লালমোহনবাবু। 'এ তো কলকাতায় তৈরি ঘড়ি।'

'কিন্তু আপনি সত্যিই এটা আমাকে দিচ্ছেন?'

'উইথ মাই গ্রেসিংস অ্যান্ড বেস্ট কমপ্লিমেন্টস। আপনার চেয়ে সাড়ে তিন বছরের বড় আমি, সুতরাং আমার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা ঘড়িটাকে রুমালে মুড়ে পকেটে রেখে টেলিফোনের দিকে এগোল। কিন্তু ডায়াল করার আগেই রাস্তার দিকের দরজার কড়াটায় নাড়া পড়ল।

খুলে দেখি গিরীনবাবু। ইনি কাল হিন্ট দিলেও, সত্যি করে যে আসবেন, আর এত তাড়াতাড়ি আসবেন, সেটা ভাবিনি। কাজে বেরিয়েছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে পোশাক দেখে—কোট প্যান্ট, হাতে

একটা ব্রিফকেস।

'টেলিফোনে দশ মিনিট ডায়াল করেও লাইন পেলাম না। কিছু মনে করবেন না।' ভদ্রলোকের হাবভাব চনমনে, নার্ভাস।

'মনে করবার কিছু নেই। টেলিফোন তো না থাকারই সামিল। কী ব্যাপার বলুন।'

ভদ্রলোক সোফায় না বসে একটা চেয়ারে বসলেন। আমি ঘরের ওটায় তক্তপোষে, ফেলুদা সোফায়।

'কার কাছে যাওয়া উচিত ঠিক বুঝতে পারছিলাম না', রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন গিরীন বিশ্বাস, 'পুলিশের ওপর খুব ভরসা নেই, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি। ঘটনাচক্রে আপনি যখন এসেই পড়লেন...'

'সমস্যাটা কী?'

গিরীনবাবু গলা খাক্‌রে নিলেন। তারপর বললেন, 'দাদার মাথায় গাছ পড়েনি।'

আমরা তিনজনেই চুপ, ভদ্রলোকও কথাটা বলে চুপ।

'তাহলে?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'মাথার বাড়ি মেরে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল ওকে।'

ফেলুদা শান্তভাবে চারমিনারের প্যাকেটটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করাতে সে নিজের জন্য একটা বার করে বলল, 'কিন্তু আপনার দাদা নিজে যে বললেন গাছ পড়েছিল।'

'তার কারণ দাদা মরে গেলেও তার নিজের ছেলের নাম প্রকাশ করবে না।'

'নিজের ছেলে?'

'প্রশান্ত। বড় ছেলে। ছোটটি বিলেতে।'

'কী করে প্রশান্ত?'

'কী না-করে সেইটে জিজ্ঞেস করুন। যত রকম গর্হিত কাজ হতে পারে। গত তিন-চার বছরে এই পরিবর্তন। দাদা দুই ভাইকে সমান ভাগ দিয়ে উইল করেছিল। বউদি মারা গেছেন সেভেন্টিতে। মাসখানেক আগে দাদা প্রশান্ত-র ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাকে শাসায়; বলে তাকে উইলচ্যুত করবে, সব টাকা সুশান্তকে দিয়ে দেবে।'

'প্রশান্ত আপনাদের বাড়িতেই থাকে তো?'

'থাকার অধিকার আছে, তার জন্য ঘর আছে আলাদা, তবে থাকে না; কোথায় থাকে বলা শক্ত। তার দল আছে। ওখানকার ভাইদের গুণ্ডা সব। আমার বিশ্বাস সেদিন ও খুনই করে ফেলত, যদি না সাংঘাতিক ঝড়টা এসে পড়ত।'

'আপনার দাদা এ বিষয়ে কী বলেন?'

'দাদা বলছে সত্যিই গাছ পড়েছিল। সে জেনে-শুনেও বিশ্বাস করতে চাইছে না যে তার ছেলে তার মাথার জখমের জন্য দায়ী। কিন্তু দাদা যাই বলুক না কেন—আমার নিজের ভাইপো হলেও বলছি—আপনি একটা কিছু বিহিত না করলে সে আবার খুনের চেষ্টা দেখবে।'

'নরেনবাবু যদি নতুন উইল করেন তাহলে তো আর তার ছেলের তাকে খুন করে কোনও আর্থিক লাভ হবে না।'

'আর্থিক লাভটাই কি বড় কথা মিস্টার মিত্তির? সে তো খেপে গিয়েও খুন করতে পারে। প্রতিশোধের জন্য কি মানুষ খুন করে না?—আর দাদা উইল চেঞ্জ করবে না। তার মাথার ঠিক নেই। অপত্যস্নেহ যে কদ্দূর যেতে পারে তা আপনি জানেন না মিস্টার মিত্তির। এ ক-দিন আমি বাড়িতেই ছিলাম, কিন্তু আজ আমাকে একটু কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে দু-তিন দিনের জন্য, ব্যবসার কাজে। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি যদি ব্যাপারটা...'

'মিস্টার বিশ্বাস,' ফেলুদা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ছাইটা অ্যাশ-ট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমি আরেকটা তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার দাদার প্রোটেকশনের একটা ব্যবস্থা করা উচিত নিশ্চয়ই, কিন্তু এটাও ঠিক যে তিনি নিজেই যদি জোর গলায় বলেন যে তাঁর মাথায় গাছ পড়েছিল, তাঁকে কেউ হত্যা করার চেষ্টা করেনি—তাহলে পুলিশের বাবাও কিছু করতে পারবে না।'

গিরীনবাবু অনেকদিন-পরে-রোদ-ওঠা সকালের মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

'বিচিত্র ব্যাপার', বলে ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে টেলিফোনে নম্বর ডায়াল করল।

'হ্যালো, সুহৃদ? আমি ফেলু বলছি রে...'

সুহৃদ সেনগুপ্ত ফেলুদার সঙ্গে কলেজে পড়ত এটা আমি জানি।

'শোন—তোদের বাড়িতে একটা স্পেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের শতবার্ষিকী সংখ্যা দেখেছিলাম—তোর দাদার কপি—যদ্দূর মনে হয় পঞ্চান্নতে বেরিয়েছিল—সেটা আছে এখনও?...বেশ, ওটা তুই বেরোবার সময় তোর চাকরের হাতে রেখে যাস, আমি দশটা-সাড়ে দশটা নাগাত গিয়ে নিয়ে আসব...'

আমরা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তিন জায়গায় যাবার আছে ফেলুদার—নরেনবাবু, বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড আর পার্ক স্ট্রিট গোরস্থান। নরেনবাবু শুনে একটু অবাক হলাম। ফেলুদাকে বলতে বলল, 'গিরীনবাবুকে মুখে যাই বলি না কেন, ওঁর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না। কাজেই একবার যাওয়া দরকার। তৃতীয় জায়গাটায় তোদের না গেলেও চলবে, তবে রাত্রের পাহারাটায় আজ ভাবছি তোদের নিয়ে যাব। গোরস্থানে মাঝরাত্তিরের অ্যাটমোসফিয়ারটা অনুভব না করা মানে একটা অসামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া।'

'জয় মা সন্তোষী,' বললেন লালমোহনবাবু। তারপর মাঝপথে একবার বললেন, 'মশাই, সন অফ টারজানের মতো সান অফ সন্তোষী করা যায় না?'—বুঝলাম পুলক ঘোষালের অফারটা নিয়ে ভদ্রলোক এখনও ভাবা শেষ করেননি।

নরেনবাবু যদিও শরীরের দিক দিয়ে অনেকটা সুস্থ—বললেন ব্যথা-ট্যথা প্রায় সেরে গেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যান্ডেজ খুলবেন—তবু ওঁর চাহনিটা ভাল লাগল না। কেমন যেন শুকনো, বিষণ্ণ ভাব।

'আপনাকে শুধু দু-একটা প্রশ্ন করার আছে,' বলল ফেলুদা, 'বেশি সময় নেব না।'

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না—আপনি কি কোনও তদন্ত চালাচ্ছেন? আপনি গোয়েন্দা জেনেই এ প্রশ্নটা করছি।'

'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন', বলল ফেলুদা। 'সে ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য হবে যদি আপনি সত্য গোপন না করেন।'

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করলেন। অনেক সময় যন্ত্রণাবোধ করলে সেটাকে সহ্য করার চেষ্টায় মানুষে যেভাবে চোখ বন্ধ করে এও সেই

রকম। মনে হল উনি আন্দাজ করেছেন যে ফেলুদার জেরাটা ওঁর পক্ষে কষ্টকর হবে। ফেলুদা বলল, 'আপনি হাসপাতালে অজ্ঞান হবার পরমুহূর্তে উইল সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছিলেন।'

নরেনবাবু সেইভাবেই চোখ বন্ধ করে রইলেন।

'উইলের উল্লেখ কেন করে সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করবেন কি?'

এবার নরেন বিশ্বাস চোখ খুললেন। তাঁর ঠোঁট নড়ল, কাঁপল, তারপর কথা বেরল।

'আমি আপনার কথার জবাব দিতে বাধ্য নই নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই না।'

'তাহলে দেব না।'

ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ। আমরা সবাই চুপ। নরেনবাবু দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছেন।

'বেশ আমি অন্য প্রশ্ন করছি,' বলল ফেলুদা।

'জবাব দেওয়া না-দেওয়ার অধিকার কিন্তু আমার।'

'একশোবার।'

'বলুন।'

'ভিক্টোরিয়া কে?'

'ভিক-টোরিয়া...?'

'এখানে বলে রাখি আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। আপনার ব্যাগের ভিতরের কাগজপত্র আমি দেখেছি। তাতে একটি স্লিপ-এ—'

'ও হো হো!'—ভদ্রলোক আমাদের বেশ চমকে দিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন।—'ও তো মান্ধাতার আমলের ব্যাপার! আমিও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি তখনও চাকরিতে। এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাজ করত আমাদের আপিসে—নর্টন— জিমি নর্টন। বললে তার ঠাকুমার লেখা গুচ্ছের চিঠি রয়েছে ওদের বাড়িতে। সে চিঠি আমি চোখেই দেখিনি। এই ঠাকুমা নাকি মিউটিনির সময় বহরমপুরে ছিলেন তখন পাঁচ-সাত বছর বয়স। চিঠিগুলো পরে লেখা, কিন্তু তাতে তার ছেলেবেলার অভিজ্ঞতার কথা আছে। আজকাল তো এ সব নিয়ে বই-টই খুব বেরোচ্ছে, তাই নর্টনকে বলেছিলাম কিছু বিলিতি

পাবলিশারের নাম দিয়ে দেব। সে নিজে এ সব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি। দাঁড়ান—কাগজটা বার করি।'

নরেনবাবু বাঁ হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরের দেরাজটা খুলে ব্যাগ থেকে তার স্লিপটা বার করলেন।

'এই যে—বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড। ওকে বলতে চেয়েছিলুম খোঁজ করে দেখতে পারে, ওখানে ওর ঠাকুরমার কোনও ছবি পাওয়া যায় কি না। আর এই যে সব পাবলিশারের নামের অ্যাড্রেস। এ কাগজ আর তাকে দেওয়া হয়নি, কারণ নর্টনের জনডিস হয়। দেড়মাস ট্রিটমেন্টে ছিল, তারপরে চাকরি ছেড়ে দেয়।'

ফেলুদা উঠে পড়ল। 'ঠিক আছে, মিস্টার বিশ্বাস—শুধু একটা ব্যাপারে আক্ষেপ প্রকাশ না করে পারছি না।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনি ভবিষ্যতে কোনও লাইব্রেরির কোনও বই বা পত্রিকা থেকে কিছু ছিঁড়ে বা কেটে নেবেন না। এটা আমার অনুরোধ। আসি।'

ঘর থেকে বেরোবার সময় ভদ্রলোক আর আমাদের মুখের দিকে চাইতে পারলেন না।

বেণীনন্দন স্ট্রিটের সুহৃদ সেনগুপ্তের চাকর একটা ঢাউস বই এনে ফেলুদাকে দিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের শতবার্ষিকী সংখ্যা। সেটা ফেলুদা সারা রাস্তা কেন যে এত মন দিয়ে দেখল, আর দেখতে দেখতে কেন যে বার তিনেক 'বোঝো ব্যাপারখানা' বলল সেটা বুঝতে পারলাম না।

বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে ঢুকে ফেলুদা দশ মিনিটের মধ্যে একটা বড় লাল খাম নিয়ে বেরিয়ে এল। দেখেই বোঝা যায় তার মধ্যে বড় সাইজের ফোটো রয়েছে।

'কীসের ছবি আনালেন মশাই?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'মিউটিনি,' বলল ফেলুদা। আমি আর লালমোহনবাবু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ফেলুদার কথার মানে ছবিগুলো নট ফর দ্য পাবলিক।

'গোরস্থানে আর আপনাদের ভেতরে টানব না; আমি শুধু দেখে আসি সব ঠিক আছে কি না।'

আমরা গাড়িটা ঘুরিয়ে গোরস্থানের ঠিক সামনেই পার্ক করলাম।

ফেলুদা যখন গেট দিয়ে ঢুকল, তখন দেখলাম দারোয়ান ওকে দেখে বেশ একটা বড় রকমের সেলাম ঠুকল।

দশ মিনিটের মধ্যে ফেলুদা ফিরে এসে 'ওকে' বলে গাড়িতে উঠল। ঠিক হল রাত সাড়ে দশটায় আমরা আবার এখানে ফিরে আসছি।

আমার মন বলছে আমরা নাটকের শেষ অঙ্কের দিকে এগিয়ে চলেছি।

॥ ১১ ॥

ফেলুদার সঙ্গে এতবার এত জায়গায় ঘুরেছি রহস্যের পিছনে পিছনে—সিকিম, লখনৌ, রাজস্থান, সিমলা, কাশী—কোনওখানেই অ্যাডভেঞ্চারে কমতি পড়েনি; কিন্তু এই কলকাতাতে বসেই এমন একটা রক্ত-হিম-করা রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়তে হবে এটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিশেষ করে আজকের দিনটা, লালমোহনবাবু যেটার নাম দিয়েছিলেন ব্ল্যাক-লেটার ডে—যদিও সেটাকে আবার পরে বদলিয়ে করলেন ব্ল্যাক-লেটার নাইট। আর পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রি সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'ছেলেবেলায় মেজো জ্যাঠা বুঝিয়েছিলেন ওটাকে বলে গোরস্থান, কারণ ওখানে গোরাদের সমাধি আছে। এখন মনে হচ্ছে নামটা হওয়া উচিত গেরোস্থান। এমন গেরোয় এর আগে পড়েছি কখনও তপেশ? তোমার মনে পড়ছে?'

সত্যি বলতে কী, অনেক ভেবেও মনে করতে পারিনি।

লালমোহনবাবু এমনিতেই পাংচুয়াল; গাড়ি হবার পর মেজাজটা আরও মিলিটারি হয়ে গেছে। আগে কড়া নাড়তেন, আজ দেখি নক করলেন। আমরা দু জনেই খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে বসেছিলাম। আজ ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও হান্টিং বুট পরতে হয়েছে। আমারটা গত বছর কেনা, ওরটা এগারো বছরের পুরনো। বোধহয় অবস্থাটা খুব ভাল নয় বলে বিকেলে দেখছিলাম ও নিজেই মুকতলায় কী সব মেরামতের কাজ করছে। এখন একটু খোঁড়াচ্ছে দেখে মনে হল মুচি ডাকিয়ে কাজটা করালেই ভাল হত। এই বিপদের রাতে খোঁড়ালে

চললেন কেন?

দরজায় টোকা পড়তেই আমরা উঠে পড়লাম। ফেলুদার কাঁধে খয়েরি রঙের শান্তিনিকেতনি ঝোলা, তার ভিতর থেকে লাল খামের খানিকটা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। এখানে বলে রাখি, ওরই হুকুমমাফিক আজ আমরা সকলে গাঢ় রঙের পোশাক পরেছি। লালমোহনবাবু পরেছেন একটা কালো টেরিকটের সুট।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই বললেন, 'মডার্ন মেডিসিন কোথায় পৌঁছে গেল মশাই!—একটা নতুন নার্ভ-পিল বেরিয়েছে—নামটায় আবার দুটো 'এক্স'—ভবেন ডাক্তারের সাজেশনে ডিনারের পরে একটা খেয়ে নিলুম—এরই মধ্যে সমস্ত শরীরে বেশ একটা বল-দেওয়া ফিলিং হচ্ছে। তপেশ ভাই, যা থাকে কপালে—লড়ে যাব, কি বলো?' কীসের সঙ্গে লড়বেন সেটা অবিশ্যি উনিও জানেন না, আমিও জানি না।

ফেলুদা আগেই ঠিক করেছিল গাড়িটা গোরস্থানের গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাখবে—'গাড়ির রংটা আপনার আজকের পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করলে অতটা চিন্তা করতাম না।' সেন্ট জেভিয়ার্স ছাড়িয়ে রডন স্ট্রিটের মোড়ের একটু আগেই ও গাড়িটা থামাতে বলল। 'তোরা এগিয়ে যা' গাড়ি থেকে নেমে বলল ফেলুদা, 'আমি হরিপদবাবুকে কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আসছি।'

আমরা এগিয়ে গেলাম। ফেলুদা কী ইনস্ট্রাকশন দিল জানি না, কিন্তু এটা জানি যে হরিপদবাবু এ ক-দিন আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আর কথাবার্তা শুনে রীতিমত উৎসাহ পেয়ে গেছেন। এটা ওঁর হাবেভাবে বেশ বোঝা যায়।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই ফেলুদা ফিরে এল। বলল, 'আপনার লাক ভাল মি. গাঙ্গুলী যে আপনি এমন একটি ড্রাইভার পেয়েছেন। ভদ্রলোককে কাজের দায়িত্ব দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।'

'কী দায়িত্ব দিলেন মশাই?'

'এদিকে গণ্ডগোল না হলে কোনও দায়িত্ব নেই, আর হলে ওঁর উপর বেশ খানিকটা ভরসা রাখতে হবে।'

এর বেশি আর ফেলুদা কিছু বলল না।

লোহার ফটকের সামনে পৌঁছে দেখি সেটা খোলা। ফেলুদাকে

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করাতে ও ফিসফিস করে উত্তর দিল যে এমনিতে এ সময় খোলা থাকে না। কিন্তু আজ সেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'পাঁচিলের উপর কাঁচ বসানো, টপকানো রিসকি, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু হরমদেও আছেন কি?'

দারোয়ানের ঘরে টিমটিম করে বাতি জ্বলছে, কিন্তু সেখানে কেউ আছে বলে মনে হল না। আমরা ঘরের আশপাশটা ঘুরে দেখলাম। কেউ নেই। পার্ক স্ট্রিট থেকে আসা ফিকে আলোতে দেখতে পাচ্ছি ফেলুদার ভ্রূকুটি। বুঝলাম দারোয়ানের সঙ্গে যা ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে ওর থাকবার কথা।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আজ আর মাঝখানের সেই পথটা দিয়ে নয়। সেটা দিয়ে কয়েক পা গিয়েই ফেলুদা বাঁয়ে ঢুকল। আমরা সমাধির ভিতের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলাম। বাতাস বইছে বেশ জোরে। আকাশে ফালি ফালি মেঘের স্রোত। তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে ফিকে আধা-চাঁদটা উঁকি মেরেই আবার লুকিয়ে পড়ছে। সেই চাঁদের আলোতে ফলকের নামগুলো এই আছে এই নেই। এই আলোতেই বুঝলাম আমরা স্যামুয়েল কাথবর্ট ধর্নহিলের সমাধিতে আশ্রয় নিলাম। এটা সরু হয়ে উঠে যাওয়া ওবেলিস্ক নয়। এর নীচে বেদী, বেদীর উপর চারিদিকে ঘিরে থাম আর মাথায় গম্বুজ। তিনজন লোকে দিব্যি ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। এখানে আলো পৌঁছোয় না, তবে সুবিধে এই যে ডান দিকে চাইলে অন্য সমাধির ফাঁক দিয়ে লোহার ফটকের একটা অংশ দেখা যায়।

এ গোরস্থানে এখন আমরা ছাড়া কেউ থাকতে পারে না ভেবেই ফেলুদা মুখ খুলল; তবে গলা তুলল না।

'এটা ছড়িয়ে দিন তো একটু আশেপাশে।'

ফেলুদা ঝোলা থেকে একটা ছিপি-আঁটা বোতল বার করে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

'হোছ্—ছড়িয়ে?'

'কার্বলিক অ্যাসিড। সাপ আসবে না। চারদিকে হাত চারেক দূর অবধি ছিটিয়ে দিলেই হবে।'

লালমোহনবাবু আজ্ঞা পালন করে এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, 'যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সাপের ভয়টা মশাই নার্ভ-পিলেও যায় না।'

'ভূতের ভয় গেছে?'

'টোটালি।'

ব্যাঙ ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকছে। একটা ঝিঁঝি বোধহয় আমাদের পাশের কবরেই আস্তানা গেড়েছে। চলন্ত মেঘের এক-একটা খণ্ড বোধহয় একটু বেশি ঘন বলেই অন্ধকারটা হঠাৎ-হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠছে। তার ফলে সমাধিগুলো তালগোল পাকিয়ে চোখের সামনে একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আবার

সেই চাঁদ বেরোচ্ছে অমনি সমাধিগুলোর এক পাশে আলো পড়ে সেগুলো পরস্পর থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে।

ফেলুদা পকেট থেকে চিকলেট বার করে আমাদের দিয়ে নিজে দুটো মুখে পুরল।

গাড়ির শব্দ ক্রমেই কমে আসছে। এক দুই তিন করে সেকেন্ড গুনে হিসাব করে দেখলাম একটানা প্রায় আধ মিনিট ধরে ব্যাঙ ঝিঁঝি আর দমকা হাওয়ায় পাতার সরসর ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

'মিডনাইট', চাপা স্বরে লালমোহনবাবু বললেন।

মিডনাইট কেন বললেন? আমি দু মিনিট আগে হাত বাড়িয়ে আমার রিস্টওয়াচে চাঁদের আলো ফেলিয়ে দেখেছি বেজেছে এগারোটা পঁচিশ। জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'না, এমনি বলছি। মিডনাইটের একটা বিশেষ ইয়ে আছে তো।'

'কী ইয়ে?'

'গোরস্থানে মিডনাইট তো—তার একটা বিশেষ ইয়ে আছে। কোথায় যেন পড়িচি।'

'তখনই ভূত বেরোয়?'

লালমোহনবাবু কয়েকবার 'এক্স' 'এক্স' বলে শেষের বার এক্স-এর 'স'টাকে সাপের মতো কিছুক্ষণ টেনে রেখে চুপ মেরে গেলেন। আমার পাশে একটা প্রায়-শোনা-যায়-না খচ্‌ শব্দ থেকে বুঝলাম ফেলুদা হাতের আড়ালে দেশলাই জ্বালাল। তারপর হাতের আড়ালেই একটা চারমিনার ধরিয়ে হাতের আড়ালেই টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

আকাশে মেঘ বাড়ছে। গাড়ির আওয়াজ হাওয়া। হাওয়ার আওয়াজ হাওয়া। সব সাড়া, সব শব্দ শেষ। কাছের ঝিঁঝি ঠাণ্ডা। আমার শরীর ঠাণ্ডা, গলা শুকনো। ঠোঁট চেটে ঠোঁট ভিজল না।

চাঁ-এর পরে একগাদা ক্ষ-ফলা দিয়ে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। এক সঙ্গে দুটো থাপ্পড়ের আওয়াজে বুঝলাম লালমোহনবাবু হাত দিয়ে হৃৎপিণ্ডে কান ঢাকলেন। ফেলুদা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

একটা গাড়ি থেমেছে। কতদূরে, সেটা এই রাত্রে বোঝা যাবে না। দরজা বন্ধের শব্দ। মনে হচ্ছে শব্দটা উত্তরে পার্ক স্ট্রিট থেকে নয়, পশ্চিমের রডন স্ট্রিট থেকে। ওদিকে গেট নেই, পাঁচিল আছে;

পাঁচিলের উপর কাঁচ বসানো।

আমাদের চোখ তখন লোহার গেটের দিকে। লালমোহনবাবু মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, ফেলুদা আমার কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওঁর কাঁধে চাপ দিয়ে থামিয়ে দিল।

কিন্তু কেউ তো আসছে না গেটের দিকে।

হয়তো গাড়ি অন্য কোথাও অন্য কারণে থেমেছে। কত বাড়ি তো রয়েছে চারপাশে। হয়তো কেউ নাইট-শো দেখে ফিরল। আশা করি তাই; তাহলে আর এ গাড়িটা নিয়ে ভাববার কিছু থাকে না।

ফেলুদা কিন্তু সটান দাঁড়িয়ে আছে, পিছনের দেয়ালের সঙ্গে সেঁটিয়ে। তার সামনেই একটা থাম। চারদিকে বাদুড়ে অন্ধকার। কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।

কিন্তু আমরা তাদের দেখব কী করে? যদি তারা এসে থাকে?

দেখবার দরকার নেই। একটু পরেই সেটা বুঝতে পারলাম। চোখের দরকার নেই। কাজ করবে কান।

খুপ...খুপ...খুপ...খুপ...

মাটি খোঁড়ার শব্দ। কিছুক্ষণ চলল শব্দ। আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনছি।

খুপ...খুপ...

শব্দ থেমে গেল।

একটা আলো। দূরে দুটো ওবেলিস্কের ফাঁক দিয়ে ঘাসের উপর ক্ষীণ আলো। প্রতিফলিত আলো।

আলোটা স্থির নয়—দুলছে, নড়ছে, খেলছে। টর্চের আলো।

এবার নিভে গেল।

'পাঁচিল টপকে এসেছে' দাঁত চিপে মন্তব্য করল ফেলুদা। তারপর বলল, 'ফলো করব।' বুঝলাম আবার গাড়ির আওয়াজের অপেক্ষা করছে ফেলুদা।

এক মিনিট।

দু মিনিট, তিন মিনিট, চার মিনিট।

'স্ট্রেঞ্জ!' বলল ফেলুদা।

কোনও শব্দ আসছে না আর পার্ক স্ট্রিট থেকে। রডন স্ট্রিট থেকেও না। যে গাড়িটা এসেছিল সেটা থেমেই আছে। তাহলে?

আরও দু মিনিট গেল। আবার মেঘে ফাটল। চাঁদ বেরোল। কেউ কোথাও নেই।

'পর এটা'

ফেলুদা তার ঝোলাটা আমায় দিয়ে ঘাসে নামল। যেদিকে আলোটা দেখেছিলাম সেদিকে এগিয়ে গেল। ভয় নেই—ওর পকেটে কোল্ট ৩২। সঙ্গে সঙ্গে শিগগিরই তার গর্জনে এই গোরস্থানের জমাট নিস্তব্ধতা খান-খান হয়ে চলেছে। কিন্তু পা যে খোঁড়া ওর। সামান্য হলেও খোঁড়া। কেন যে সর্দারি করে নিজে জুতো মারাতে গেল জানি না।

কিন্তু কই? কোল্টের গর্জন?

'ভুল করলেন,' খড়খড়ে গলায় বললেন জটায়ু। 'তোমার দাদা ভুল করলেন।'

আর যেন কথা না বলেন তাই আমি জিভ দিয়ে সাপের শব্দ করে ওঁকে থামিয়ে দিলাম। ফেলুদা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। কী ঘটছে ওই সমাধিস্তম্ভগুলোর মধ্যে কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা শব্দ পাওয়া গেল কি? কানের ভুল নিশ্চয়ই।

মিডনাইট? এটা কোন ঘড়ি? সেন্ট পলস্? হাওয়া ওদিক থেকেই। পশ্চিমে হাওয়া হলে রাত্তিরে আলিপুরের চিড়িয়াখানার সিংহের গর্জন শোনা যায় আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে।

ওই যে গাড়ির শব্দ!

দরজা বন্ধ হল। স্টার্ট নিল। তারপর হুস্।

আর বসে থাকা যায় না। ভয় করছে না; শুধু ভাবনা।

উঠে পড়লাম দু জনেই। লালমোহনবাবুর বিড়বিড়ানিতে কান দেব না; সময় নেই।

এগিয়ে গেলাম দ্রুত পায়ে। মেরি এলিসের কবর। কবরের দেয়ালে হাত ঘষে ঘষে এগোচ্ছি। জটায়ু আমার শার্ট খামচে আছেন পিছন থেকে। পায়ের তলায় ঘাস এখনও ভিজে, এখনও ঠাণ্ডা।

জন মার্টিনের কবর। সিনথিয়া কোলেট। ক্যাপ্টেন এভানস। এবার একটা ওবেলিস্ক। কালো ফলকের উপরে—

২৮—

পায়ের তলায় কী জানি পড়ল। মৃদু শব্দ করে চেপটে গেল। পা

সরিয়ে নীচের দিকে চাইলাম। চাঁদের আলো রয়েছে। হাতে তুলে নিলাম জিনিসটা।

চারমিনারের প্যাকেট।

খালি না। অনেক সিগারেট রয়েছে ভিতরে। সব চ্যাপটা। ফেলুদা—

আর কিছু মনে নেই—কেবল মুখের উপর একটা চাপ, আর লালমোহনবাবুর এক চিলতে আর্তনাদ।

॥ ১২ ॥

জ্ঞান হয়ে প্রথমেই মনে হল পুরীর সমুদ্রের ধারে রয়েছি। এত হাওয়া সমুদ্রের ধারেই হয়। কান ঠাণ্ডা, নাক ঠাণ্ডা, চুল উড়ছে।

কিন্তু জল কোথায়? বালি? ঢেউ কোথায়? এ গর্জন তো ঢেউয়ের গর্জন নয়; এ তো চলন্ত গাড়ির শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে খোলা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। গাড়ির পিছনে বসে আছি আমি। আমি মাঝখানে, ডান পাশে লালমোহনবাবু, বাঁয়ে যে লোক তাকে চিনি না, দেখিনি কখনও। সামনে ড্রাইভারের মাথায় পাগড়ি, তার পাশে আরেকটা লোক। কেউ কথা বলছে না।

একটু মাথা তুলতেই পাশের লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। আধা-গুণ্ডা টাইপের চেহারা। কোনও ধমক দিল না। কেন দেবে? আমাদের ভয় করার তো কোনও কারণ নেই। আমাদের কাছে কোনও হাতিয়ার নেই। হাতিয়ার ফেলুদার কাছে। সে এ গাড়িতে নেই। সে কোথায় জানি না।

কিন্তু ফেলুদার সেই ঝোলাটা?

আমার মাথার পিছনে, কাঁচের সামনের তাকটায়। ঝোলার স্ট্র্যাপটা আমার গালের পাশ অবধি ঝুলে আছে।

'মিডনাইট', পাশ থেকে বলে উঠলেন জটায়ু। আমি আড়চোখে দেখলাম ওঁর চোখ এখনও বোজা।

'মিডনাইট, মা।—জয় মা, মা সন্তোষী!...মিডনাইট...'

'বকো মৎ।' পাশের লোক শাসাল।

আবার ঝিমুনি। আবার অন্ধকার। গাড়ির শব্দ মিলিয়ে এল...

এর পর আবার যখন চোখ খুলল তখন মন বলছে দেখব কোনও মন্দিরের ভিতর বসে আছি। না, মন্দির না—গির্জা। এ তো পিতলের ঢিপি ঘণ্টা নয়। এ সুর বিলিতি।

কিন্তু দেখলাম এটা মন্দির নয়। এটা বৈঠকখানা। মাথার উপর ঝাড় লণ্ঠন, তবে সেটা জ্বলছে না। ঘরে আলো বেশি নেই—কেবল একটা ল্যাম্প। সেটা একটা মখমলে মোড়া সোফার পাশে একটা টেবিলের উপর রাখা। আমিও বসে আছি মখমলের সোফায়। বসে না; আধ-শোয়া। আমার পাশেই লালমোহনবাবু। ওঁর চোখ বন্ধ। আমার ডান দিকে পরের সোফাটায় বসে আছে ফেলুদা। তার মুখ গম্ভীর। তার কপালের ডান দিকে একটা অংশ কালো হয়ে ফুলে আছে। বাঁয়ে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একটা লোক, যাকে আমরা পেয়ারেলাল বলে চিনি। তার হাতে রিভলভার। কোল্ট .৩২। নির্ঘাৎ ফেলুদারটা।

আরও তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে মুখ করে। কেউ কোনও কথা বলছে না। কথা বলার লোক বোধহয় এখনও আসেনি। আমাদের সামনে সবচেয়ে যে বড় সোফা, যার মখমলের রং কালো, সেটা এখনও খালি। মনে হয় সেটা কারুর অপেক্ষায় রয়েছে। বোধহয় মিস্টার চৌধুরী। কিন্তু এটা আলিপুরের কোনও হালের বাড়ি নয়। এ বাড়ি আদ্যিকালের। এর সিলিং বিশ হাত উঁচু। লোহার কড়িবরগা। এর দরজা দিয়ে ঘোড়া ঢুকে যায়।

আরও আছে। ঘড়ি। ঝুলনো আর দাঁড়ানো ঘড়ি। তার মধ্যে একটা প্রায় দেড় মানুষ উঁচু, আমার ডান দিকে। এই ঘড়িগুলোই বাজছিল একটু আগে। এখনও মাঝে মাঝে বেজে উঠছে। রাত দুটো।

ফেলুদার সঙ্গে একবারই চোখাচোখি হয়েছে। ওর চোখের ভাষাটা আমি জানি বলেই ভরসা পেয়েছি। ওর চোখ বলছে ঘাবড়াসনি, আমি আছি।

'গুড মর্নিং, মিস্টার মিটার!'

বিলিতি নিয়মে রাত বারোটার পরেই মর্নিং।

ভদ্রলোককে দেখতে পাইনি, কারণ ল্যাম্পের ঠিক পিছন দিকের দরজা দিয়ে ঢুকেছেন। এখনও মখমল। আগের বার যা দেখেছিলাম তার চেয়েও বেশি। না হবার কোনও কারণ নেই। এখন উনি আপ, ফেলুদা ডাউন।

'ওতে কী আছে পেয়ারেলাল? ওটা সার্চ করা হয়েছে ভাল করে?'

ভদ্রলোকের চোখ গেছে ফেলুদার ঝোলার দিকে। ওটা যে কখন ফেলুদার কাছে চলে গেছে জানি না।

পেয়ারেলাল জানাল যে ওতে বই খাতা আর ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। একটা বোতল ছিল, সরিয়ে রাখা হয়েছে।

'কিছু মনে করবেন না এইভাবে ধরে আনার জন্য'—গলায় একটু বেশি পালিশ দিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বললেন মি. চৌধুরী। 'ভাবলাম পেরিগ্যাল রিপিটার সম্পর্কে যখন আপনার এতই কৌতূহল, তখন জিনিসটা আমার হাতে এসে পড়ার মুহূর্তে আপনি থাকলে হয়তো খুশিই হবেন।—কেয়া বলওয়ন্ত, সাফা হুয়া ঘড়ি?'

একজন ভৃত্য মাথা নেড়ে বলল, ঘড়ি সাফা হয়ে এল, এক্ষুনি আসবে।

'টু হান্ড্রেড ইয়ারস গ্রেভের মধ্যে পড়েছিল,' বললেন মি. চৌধুরী। উইলিয়াম এ কথাটা আগে আমাকে বলেনি। বলেছে তার কাছে পেরিগ্যাল ঘড়ি আছে। অথচ আলবৎ-অলবৎ করে দেরি করছে। তারপর চাপ দিতে বলল ঘড়ি আছে মাটির নীচে তাই দেরি হচ্ছে। ডেডবডির পাশে পড়েছিল তাই বললাম বুরুশ দিয়ে কাড়ল দিয়ে সাফা না করে আমার কাছে আনবে না। ডেটলের পোঁছ দিয়ে দেবার কথাও বলেছি।'

ফেলুদা সটান চেয়ে আছে মি. চৌধুরীর দিকে। মুখ দেখে তার মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। আমাদের ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করেছিল; ওকে মাথায় বাড়ি মেরে।

'আপনি কোত্থেকে জানলেন এ ঘড়ির কথা মি. মিটার?' প্রশ্ন করলেন মহাদেব চৌধুরী।

'উনবিংশ শতাব্দীর একটা ডায়রি থেকে। যার ঘড়ি তার মেয়ের ডায়রি।'

'ডায়রি? চিঠি না?'

'না, ডায়রি।'

মি. চৌধুরী তার বিলিতি সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেছেন পকেট থেকে, আর সেইসঙ্গে সোনার লাইটার আর সোনার হোল্ডার।

'আপনার সঙ্গে উইলিয়ামসের পরিচয় নেই?' হোল্ডারে সিগারেট ঢোকালেন মি. চৌধুরী।

'উইলিয়াম নামে আমি কাউকে চিনি না।'

ফস্ করে মি. চৌধুরীর ডানহিল লাইটার জ্বলে উঠল।

'তাহলে ওই ডায়রি পড়েই আপনার ঘড়িটার উপর লোভ হয়েছিল?'

'লোভ জিনিসটা তো আপনার একচেটিয়া, মি. চৌধুরী।'

মখমলের উপর মেঘের ছায়া। দুই আঙুলে ধরা হোল্ডারটা ঈষৎ কাঁপছে।

'আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন, মি. মিটার।'

'সত্যি কথা বলতে আমি মুখ সামলাই না, মি. চৌধুরী। আমার উদ্দেশ্য ছিল ঘড়ি যাতে গডউইনের কবরেই থাকে; আপনার মতো লোকের হাতে—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একজন লোক হাতে একটা সিল্কের রুমালের উপর একটা জিনিস এনে মি. চৌধুরীকে দিল। চৌধুরী জিনিসটা হাতে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশ থেকে একটা গোঙানির শব্দ উঠল—

'আঁ...আঁ...আঁ...আঁম্...'

লালমোহনবাবুর জ্ঞান হয়েছে, আর হয়েই মি. চৌধুরীর হাতের জিনিসটা দেখেছেন। জিনিসটা তিনি খুব ভাল করেই চেনেন।

মি. চৌধুরীর অবস্থা যে কী হল সেটা আমার পক্ষে লিখে বোঝানো খুব মুশকিল। ফেলুদাকেই বলতে শুনেছি যে গানের সাত সুর আর রামধনুর সাত রঙের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু একটা মানুষের গলায় আর মুখে এত কম সময়ে এত রকম সুর আর এত রকম রং খেলতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। গালাগালে যা বেরল মানুষটার মুখ দিয়ে সেটা শোনা যায় না, বলা যায় না, লেখা যায় না। ফেলুদা অবিশ্যি নির্বিকার। আমি বুঝতে পারছি এটা তারই কীর্তি; কাল যখন

দুপুরে দশ মিনিটের জন্য সে যেরহ্মানে ঢুকেছিল তখনই সে এ কাজটা করে এসেছে। কিন্তু আসল ঘড়ি কি তাহলে নেই?

কুরুকেলভির ঘড়িটাকে মি. চৌধুরী উন্মাদের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তার ডান পাশে খালি সোফাটার দিকে। আর তার পরেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—

'উইলিয়াম সাহাবকো বোলাও!—আর উসকো রিভলভার দেও হামকো!'

পেয়ারেলাল রিভলভারটা মি. চৌধুরীর হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মি. চৌধুরী দু-একবার 'স্কাউন্ড্রেল' 'সুইন্ডলার' ইত্যাদি বলে সোফা ছেড়ে উঠে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে পায়চারি শুরু করলেন।

এবার পেয়ারেলাল সেই পিছনের দরজাটা দিয়ে আরেকটা লোককে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল। আবছা অন্ধকারে দেখলাম কাঁধ অবধি লম্বা মাথার চুল আর ঠোঁটের দু পাশে ঝুলে থাকা গোঁফ। পরনে প্যান্ট, সার্ট আর সুতির কোট।

'কী ঘড়ি নিয়ে এসেছ তুমি কবর খুঁড়ে?' বজ্রগম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন মি. চৌধুরী। তিনি আবার সোফায় গিয়ে বসেছেন, তাঁর হাতে এখনও রিভলভার, দৃষ্টি এখনও ফেলুদার দিকে।

'যা পেয়েছি তাই এনেছি, মি. চৌধুরী'—আগন্তুক কাতর স্বরে জবাব দিল। 'আপনাকে ঠকিয়ে কি আমি পার পাব? আপনি এত বড় এক্সপার্ট।'

'তাহলে সে চিঠির কথা কি মিথ্যে?' ঘর কাঁপিয়ে প্রশ্ন করলেন মহাদেব চৌধুরী।

'তা কী করে জানব মি. চৌধুরী? ওটার উপর ভরসা করেই তো সব কিছু। এই তো সেই চিঠি—দেখুন না।'

আগন্তুক একটা পুরনো চিঠি বার করে মি. চৌধুরীর হাতে দিল। চৌধুরী সেটায় চোখ বুলিয়ে বিরক্তভাবে সেটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিল পাশের সোফার উপর, আর ঠিক সেই সময় হেসে উঠল ফেলুদা। প্রাণখোলা হাসি। এমন হাসি ওকে অনেকদিন হাসতে দেখিনি।

'হাসির কী পেলেন আপনি মি. মিটার?' গর্জন করে উঠলেন মহাদেব চৌধুরী। কোনওমতে হাসিটাকে একটু চেপে ফেলুদা উত্তর দিল—

'আপনার এত নাটকীয় আয়োজন সব ভেস্তে গেল দেখে হাসি পেল, মি. চৌধুরী।'

চৌধুরী রিভলভার হাতে আবার সোফা ছেড়ে উঠে পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এগিয়ে এলেন ফেলুদার দিকে।

'আমার নাটক কি শেষ হয়ে গেছে ভাবছেন, মি. মিটার? আসল ঘড়ি যে আপনার কাছে নেই তার কী বিশ্বাস? আপনি তো গোরস্থানে অনেকবার গেছেন। আজও তো উইলিয়ামের আগে আপনি পৌঁছেছেন। আপনার কাছে ঘড়ি থাকলে সে ঘড়ি হাত না করে কি আমি ছাড়ব? আপনি যেখানে সেটা লুকিয়ে এসেছেন সেখান থেকে আপনাকেই সেটা বার করে দিতে হবে মি. মিটার। আর ঘড়ি যদিও নাও থেকে থাকে—এই চিঠি যদি মিথ্যে হয়ে থাকে—তাহলেও যে আমি আপনাকে ছেড়ে দেব এটা কী করে ভাবছেন? আপনার সব ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যাসটা যে আমার পক্ষে বড্ড অসুবিধাজনক, মি. মিটার। কাজেই, নাটক ফুরিয়েছে কী বলছেন? নাটক তো সবে শুরু!'

ফেলুদার গলায় এবার আমার একটা খুব চেনা সুর দেখা দিল। এটা ও নাটকের চরম মুহূর্তে ব্যবহার করে। লালমোহনবাবু বলেন, এ সুরটা নাকি ওঁকে ছিপছিপে শিকারির কথা মনে করিয়ে দেয়।

'আপনি ভুল করছেন, মি. চৌধুরী। নাটক এখন আমার হাতে, আপনার হাতে নয়। এই মুহূর্ত থেকে আমি নাটকটা চালাব। আমিই বিচার করব আপনাদের দু জনের মধ্যে কার অপরাধ বেশি—আপনার, না মিস্টার উইলিয়াম বস্কে—'

ঘরে তোলপাড় ব্যাপার। উইলিয়াম একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে তার সামনে দাঁড়ান পেয়ারেলালকে এক ঘুঁষিতে ধরাশায়ী করে বাইরের দরজার দিকে ধাওয়া করেছে। চৌধুরীর রিভলভারের গুলি তাকে হাত দু-একের জন্য মিস করে দরজার বাঁ দিকের একটা দাঁড়ানো ঘড়ির কাঁচের ডায়ালে ঝনঝন করে দিল; আর সবাইকে অবাক করে সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সেই জখম ঘড়ির ঘন্টাধ্বনি।

মিস্টার উইলিয়ামকে ধরতে আরও দু জন লোক ছুটেছে, কিন্তু তারা বেশি দূর যেতে পারল না। তাদের পথ আটকেছে কয়েকজন সশস্ত্র

লোক। তারা এবার উইলিয়াম সমেত সকলকে নিয়ে বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। সামনের ভদ্রলোককে দেখে বলে দিতে হয় না ইনি একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। সঙ্গে আরও পাঁচজন পুলিশ কনস্টেবল ইত্যাদি, আর সবার পিছন দিয়ে সাগ্রহে উঁকি দিচ্ছেন লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদ দত্ত।

'সাবাস, হরিপদবাবু,' বলল ফেলুদা।

'আপনিই তো ফেলু মিত্তির?' ঠিক লোকের দিকে চেয়েই প্রশ্নটা

করলেন ইন্‌স্পেক্টর মশাই। 'কী ব্যাপার বলুন তো? মি. চৌধুরীকে তো চিনি—কিন্তু ইনি কে, যিনি পালাচ্ছিলেন?'

ফেলুদা এর উত্তর দেবার আগে হতভম্ব মহাদেব চৌধুরীর হাত থেকে নিজের রিভলভারটি অনায়াসে বার করে নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. চৌধুরী—এবার আপনি কাইন্ডলি আপনার নিজের জায়গায় গিয়ে বসুন তো। নাটকের বাকি অংশটা দেখার সুবিধে হবে। আর তা ছাড়া আপনাকে কালো মখমলে মানায় বড্ড ভাল। আর মিস্টার উইলিয়াম তো'—ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেছে—'আপনার চুল আর গোঁফটাতে কিন্তু আপনাকে হুবহু আপনার প্রপিতামহের মতো দেখাচ্ছে। ও দুটো খুলবেন কী দয়া করে?'

পুলিশ টান দিতেই উইলিয়ামের গোঁফ আর পরচুলা খুলে এল, আর অবাক হয়ে দেখলাম উইলিয়ামের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন নরেন বিশ্বাসের ভাই গিরীন বিশ্বাস।

'এবার বলুন তো মি. বিশ্বাস,' বলল ফেলুদা, 'আপনার পুরো নামটা কী?'

'কেন, আমার নাম আপনি জানেন না?'

'আপনার এখন দুটো নাম জানা যাচ্ছে। এই দুটো জুড়েই বোধহয় আপনার আসল নাম, তাই না? উইলিয়াম গিরীন্দ্রনাথ বিশ্বাস—তাই না? অন্তত প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে গোল্ড মেডালিস্টদের তালিকায় তো তাই বলছে। আর আপনার ভাইয়ের নাম বলছে মাইকেল নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ভিজিটিং কার্ডের 'এম'টা হয়ে যাচ্ছে মাইকেল, তাই না? আপনারা বাংলা নামটা ব্যবহার করতেন বলেই বোধহয় নরেনবাবু ভিজিটিং কার্ডে "এম. এন" না ছেপে "এন. এম" ছেপেছিলেন—তাই না?'

গিরীনবাবু চুপ। বোঝাই যাচ্ছে ফেলুদা ঠিকই বলেছে।

'আপনার দাদা আপনাকে কী বলে ডাকেন, মি. বিশ্বাস?'

'তাতে আপনার কী প্রয়োজন?'

'আপনি যখন বলবেন না, তখন আমিই বলছি। উইল। উইল বলে ডাকেন আপনার দাদা। হাসপাতালে জ্ঞান হবার পর তিনি আপনারই নাম উচ্চারণ করেছিলেন দু বার—তাই না?'

এবারে ফেলুদা লাল খামটা থেকে একটা বড় ছবি টেনে বার করল। 'দেখুন তো গিরীনবাবু এঁদের চেনেন কিনা। এ ছবি হয়তো আপনাদের বাড়িতেও নেই। কিন্তু বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে ছিল।'

স্বামী-স্ত্রীর ছবি। যাকে বলে ওয়েডিং গ্রুপ। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে গিরীনবাবুর চেহারার আশ্চর্য মিল। আর ভদ্রমহিলা মেমসাহেব।

ফেলুদা বলল, 'চিনতে পারছেন এঁদের? ইনি হচ্ছেন পার্বতীচরণ—অর্থাৎ পি সি বিশ্বাস, আপনার প্রপিতামহ। ইনি যে ক্রিশ্চান হয়েছিলেন সেটা তো এঁর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর এই মহিলাটি হচ্ছেন টমাস গডউইনের নাতনি—ওই চিঠিটা যিনি লিখেছেন তিনি—ভিক্টোরিয়া গডউইন। এঁর কুমারী অবস্থার ছবিও বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে রয়েছে। এই ভিক্টোরিয়া আপনার প্রপিতামহের মতো একজন নেটিভ ক্রিশ্চানকে ভালবেসে তার ঠাকুরদাদার বিরাগভাজন হয়েছিলেন! কিন্তু মৃত্যুশয্যায় টম গডউইন ভিক্টোরিয়াকে ক্ষমা করে যান। তার এক বছর পরেই পার্বতীচরণ ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করেন। তার মানে হচ্ছে এই যে, কলকাতায় একটি নয়, দুটি পরিবারের সঙ্গে টম গডউইনের নাম জড়িত রয়েছে—একটি রিপন লেনে, আরেকটি নিউ আলিপুরে। আর আশ্চর্য এই যে, দু জনের কাছেই এমন দলিল রয়েছে যাতে টমাসের ঘড়ির উল্লেখ রয়েছে। এক হল ভিক্টোরিয়ার এই চিঠি, আর আরেক হল টমাসের মেয়ে শার্লট গডউইনের ডায়রি।'

আশ্চর্য ঘটনা! গল্পকে হার মানায়। ভিক্টোরিয়ার লেখা চিঠির একটা তাড়া বহুকাল থেকেই নাকি নরেনবাবুদের বাড়িতে রয়েছে পুরনো ট্রাঙ্কের মধ্যে, কিন্তু কেউ গরজ করে পড়েনি। পুরনো কলকাতা নিয়ে লিখতে শুরু করার পর নরেনবাবু চিঠিগুলো পড়েন। তখনই টমাস গডউইনের ঘড়ির ঘটনাটা জানতে পারেন, আর ভাইকে সে সম্বন্ধে বলেন।

গিরীনবাবু ফেলুদার জেরার ঠেলায় কাহিল, কিন্তু এখনও তাকে রেহাই দেবার সময় আসেনি। ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল—

'আপনার কি রেসের মাঠে যাবার অভ্যেস আছে, মি. বিশ্বাস?'

ভদ্রলোক কিছু বলার আগে মি. চৌধুরী খেঁকিয়ে উঠলেন।

'আমার কাছ থেকে টাকা আগাম নিয়ে সব ঘোড়ার পিছনে খুইয়েছে,

আর এখন কবর খুঁড়ে ক্রুকেন্ডেন্ডির ঘড়ি এনে হাজির করেছে—অকর্মা কোথাকার!'

ফেলুদা চৌধুরীর কথায় কান না দিয়ে গিরীনবাবুকেই উদ্দেশ করে বলে চলল, 'তার মানে টম গডউইনের একটি গুণ আপনি পেয়েছেন! আর সেই কারণেই বোধহয় এত বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন?'

উত্তরটা এল বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে। .

'মি. মিত্তির, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, একশো বছর পেরিয়ে গেলে কবরের ভিতরের কোনও জিনিসের উপর কোনও ব্যক্তিবিশেষের আর কোনও অধিকার থাকে না। ওই ঘড়িটা এখন আর টম গডউইনের সম্পত্তি নয়।'

'সেটা জানি মি. বিশ্বাস। ও ঘড়ি সরকারের সম্পত্তি, আপনারও নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, আপনার অপরাধ তো শুধু ঘড়ি চুরির চেষ্টা নয়, অন্য অপরাধও যে আছে।'

'কী অপরাধ?' গিরীন বিশ্বাস এখনও একদৃষ্টে ভাব করে চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে।

এবার ফেলুদা তার পকেট থেকে ছোট্ট একটা জিনিস বার করল।

'দেখি তো, এই বোতামটা আপনার ওই কোটটা থেকেই পড়েছে কিনা—যে কোটটা আপনি এই দু দিন আগে হংকং লন্ড্রি থেকে নিয়ে এলেন।'

ফেলুদা বোতাম নিয়ে এগিয়ে গেল।

'এই দেখুন, মিলে যাচ্ছে।'

'তাতে কী প্রমাণ হল?' প্রশ্ন করলেন গিরীনবাবু। 'এটা খুলে পড়ে যায় গোরস্থানে। আমি তো অস্বীকার করছি না যে সেখানে গিয়েছিলাম।'

'আমি যদি বলি এটা আপনার কোট নয়, আপনার দাদার কোট, তা হলে স্বীকার করবেন কি?'

'কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি?'

'আবোল-তাবোল আমি বকছি না, মি. বিশ্বাস, আপনি বকছেন। কাল আমার বাড়িতে এসে বকেছেন, আবার এখানে বকছেন। এ কোট আপনার দাদার। এটা পরে তিনি গোরস্থানে গিয়েছিলেন সেই ঝড়ের

দিন। গিয়ে দেখেন গডউইনের কবর খোঁড়া হচ্ছে, আপনি রয়েছেন। তিনি আপনাকে বাধা দিতে যান। আপনি তাঁর মাথায় বাড়ি মারেন—লাঠি বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে। নরেনবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আপনি হয়তো তাঁকে মেরেই ফেলতেন, কিন্তু সেই সময় ঝড়টা আসে। আপনি পালাতে যান। গাছ পড়ে—'

গিরীনবাবু আবার বাধা দিলেন।

'আমার দাদাকে আপনি মিথ্যেবাদী বানাতে চান? তিনি বলেছেন তাঁর মাথায় গাছের ডাল—'

কিন্তু ফেলুদার কথা আটকানো এখন সহজ নয়। সে বলেই চলল—

'গাছের ডাল ভেঙে পড়ে আপনার পিঠে। আপনার গায়ে কোট ছিল না। পিঠের জখম ঢাকবার জন্য আপনি দাদার কোট খুলে নিয়ে পরেন। কোটের বোতাম ছিঁড়ে যায়, পকেট থেকে মানিব্যাগ পড়ে যায়। আপনার নিজের পকেট থেকে রেসের বই—'

গিরীনবাবু আবার পালাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। এবার ফেলুদাই তাঁকে ধরে তাঁর কোটটা খুলে দিয়ে দেখিয়ে দিল তাঁর টেরিলিনের শার্টের নীচে ব্যান্ডেজটা।

'আপনার দাদা আপনাকে বাঁচাবার জন্য অনেক মিথ্যে বলেছেন গিরীনবাবু, কারণ তিনি আপনাকে অত্যন্ত বেশিরকম স্নেহ করতেন।'

ফেলুদা এবার তার ঝোলাটায় কুক্‌কেলভির ঘড়িটা আর ভিক্টোরিয়ার চিঠিটা ভরে নিয়ে, সেটা কাঁধে নিয়ে হতভম্ব মি. চৌধুরীর দিকে ফিরে বলল, 'আপনার সব ঘড়িতে এক সঙ্গে বারোটা বাজলে কেমন শোনায়, সেটা শোনার আর সুযোগ হল না। হবে হয়তো একদিন।'

তিনবার ডাকার পর জটায়ু উঠলেন। তিনি যে এর ফাঁকে আবার হুঁশ হারিয়ে নাটকের আসল দৃশ্যটাই মিস্ করে গেছেন সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি।

* * *

'এ সব লোককে দাবিয়ে রাখা যায় না রে। পুলিশও কিছু করতে

পারে না। মহাদেব চৌধুরীর মতো লোকগুলো হল এক-একটা হিটলার। কাজ গুছিয়ে নিতে এবং কত লোককে যে টাকার জোরে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে তার ঠিক নেই।'

আমরা তিনজনে পেনেটির গঙ্গার ঘাটে এসে বসেছি। চৌধুরীর বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ এই ঘাট। পুব আকাশের রং দেখে মনে হচ্ছে সূর্য এই উঠল বলে। হরিপদবাবু অক্ষরে অক্ষরে ফেলুদার নির্দেশ পালন না করলে আজ আমাদের কী দশা হত জানি না। (লালমোহনবাবু বললেন গঙ্গাপ্রাপ্তি)। একজন লোকের কতখানি দায়িত্বজ্ঞান থাকলে তবে আমাদের গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে এসে সটান গিয়ে থানায় খবর দেয়, সেটা ভাবতে অবাক লাগছে। লালমোহনবাবু হরিপদবাবুরই এনে দেওয়া ভাঁড়ের চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'গাড়ি ফেলার ফলটা আশা করি টের পেলেন?'

'মোক্ষমভাবে', বলল ফেলুদা। 'আপনার গাড়ির উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে এই তিন দিনে। আজ শহরে ফিরে দুটো জায়গায় যাবার পর আর বেশ কিছুদিন ও গাড়ির ওপর জুলুম করব না।'

'দুটো জায়গা মানে?'

'এক হল নরেনবাবুর বাড়ি। তাকে খবরটা আর সেই সঙ্গে এই চিঠিটা ফেরত দেওয়া দরকার।'

'আর দ্বিতীয়?'

'সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থান।'

'আ-হাবা-র!'

'কী সাবধানে পা ফেলতে হয়েছে জানিস তোপ্‌সে? এর জন্যে জুত করে লড়তে পারলাম না লোকগুলোর সঙ্গে।'

ফেলুদা তার বাঁ পায়ের হান্টিং বুটটা খুলে তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে প্রথমে বার করল তার তৈরি ফল্‌স সুকতলা, যার তলায় খোপ, যার মধ্যে তুলোর মোড়কে লুকিয়ে আছে একটি আশ্চর্য জিনিস, এত হুলস্থূল কাণ্ডের মধ্যেও যার শুধু কাঁচটি ছাড়া আর সবই অক্ষত, অটুট রয়েছে।

'এটা যথাস্থানে ফেরত দিতে হবে না?'

ফেলুদার হাতে ঝুলছে চার্লস গডউইনকে তার রান্নার জন্যে দেওয়া লখ্‌নৌ-এর নবাব সাদত আলির প্রথম বকশিশ—ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর ফ্রান্সিস পেরিগ্যালের তৈরি রিপিটার পকেট ঘড়ি—দুশো বছর তার মালিকের কঙ্কালের পাশে ভূগর্ভে থেকেও যার জৌলুস সূর্যের প্রথম আলোতে এখনও আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

ছিন্নমস্তার অভিশাপ

Pradosh C. Mitter

Private Investigator

ছিন্নমস্তার অভিশাপ

1

রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু চোখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'রামমোহন রায়ের নাতির সার্কাস ছিল সেটা জানতেন ?'

ফেলুদার মুখের উপর রুমাল চাপা, তাই সে শুধু মাথা নাড়িয়ে না জানিয়ে দিল।

প্রায় দশ মিনিট ধরে একটা পর্বতপ্রমাণ খড়বোঝাই লরি আমাদের যে শুধু পাশ দিচ্ছে না তা নয়, সমানে পিছন থেকে রেলগাড়ির মতো কালো ধোঁয়া ছেড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। লালমোহনবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হরিপদবাবু বার বার হর্ন দিয়েও কোনো ফল হয়নি। লরির পিছনের ফুলের নকশা, নদীতে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য, হর্ন প্লীজ, টা-টা গুডবাই, থ্যাঙ্ক ইউ সব মুখস্থ হয়ে গেছে। লালমোহনবাবু সার্কাস সম্বন্ধে বইটা কিছুদিন হল জোগাড় করেছেন; অনেক দিন আগের লেখা বই, নাম 'বাঙালীর সার্কাস'। বইটা ওঁর ঝোলার মধ্যে ছিল, লরির জ্বালায় সামনে কিছু দেখবার জো নেই বলে সেটা বার করে পড়তে শুরু করেছেন। ইচ্ছে আছে সার্কাস নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস লেখার, তাই ফেলুদার পরামর্শ অনুযায়ী বিষয়টা নিয়ে একটু পড়াশুনা করে রাখছেন। সার্কাসের কথা অবিশ্যি এমনিতেই হচ্ছিল, কারণ আজ সকালেই রাঁচি শহরে দা গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের বিজ্ঞাপন দেখেছি। হাজারিবাগে এসেছে সার্কাস, আর আমরা যাচ্ছিও হাজারিবাগেই। ওখানে সন্ধেবেলা আর কিছু করার না থাকলে একদিন গিয়ে সার্কাস দেখে আসব সেটাও তিনজনে প্ল্যান করে রেখেছি।

শীতের মুখটাতে কোথাও একটা যাবার ইচ্ছে ছিল; লালমোহনবাবুর নতুন বই পুজোয় বেরিয়েছে, তিন সপ্তাহে দু হাজার বিক্রি, ভদ্রলোকের মেজাজ খুশ, হাত

খালি। নতুন বইয়ের নাম 'ভ্যানকুভারের ভ্যামপায়ার'-এ ফেলুদার আপত্তি ছিল ; ও বলেছিল ভ্যানকুভার একটা পোনায় আধুনিক শহর, ওখানে ভ্যাম্পায়ার থাকতেই পারে না ; তাতে লালমোহনবাবু বললেন হর্নিম্যানের জিওগ্রাফির বই তন্নতন্ন করে ঘেঁটে ওঁর মনে হয়েছে ওটাই বেস্ট নাম। ফেলুদা কোডার্মায় একটা তদন্ত করে এসেছে গত সেপ্টেম্বরে, মক্কেল সর্বেশ্বর সহায়ের একটা বাড়ি আছে হাজারিবাগে, সেটা প্রায়ই খালি পড়ে থাকে, তাই ফেলুদার কাজে খুশি হয়ে ভদ্রলোক তাঁর বাড়িটা অফার করেছেন দিন দশেকের জন্য। চৌকিদার আছে, সে-ই দেখাশুনা করে, আর তার বৌ রান্না করে। খাওয়ার খরচ ছাড়া আর কোনো খরচ লাগবে না আমাদের।

লালমোহনবাবুর নতুন অ্যাম্বাসাডরেই যাওয়া ঠিক হল ; বললেন, 'লঙ রানে গাড়িটা কীরকম সার্ভিস দেয় সেটা দেখা দরকার।' গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আসানসোল-ধানবাদ হয়ে আসা যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খড়্গপুর-রাঁচি হয়ে আসাই ঠিক হল। খড়্গপুর পর্যন্ত ফেলুদা চালিয়েছে, তারপর থেকে ড্রাইভারই চালাচ্ছে। গতকাল সকাল আটটায় রওনা হয়ে খড়্গপুরে লাঞ্চ সেরে সন্ধ্যায় রাঁচি পৌঁছই। সেখানে অ্যাম্বার হোটেলে থেকে আজ সকাল ন'টায় হাজারিবাগ রওনা দিই। পঞ্চাশ মাইল রাস্তা, খালি পেলে সোয়া ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু এই লরির জ্বালায় সেটা নির্ঘাত বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

আরো মিনিট পাঁচেক হর্ন দেবার পর লরিটা পাশ দিল, আর আমরাও সামনে খোলা পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম। দু'পাশে বাবলা গাছের সারি, তার অনেকগুলোতেই বাবুইয়ের বাসা, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথের ধারেও টিলা পড়ছে। লালমোহনবাবু বই বন্ধ করে দৃশ্য দেখে আহা-বাহা করছেন আর মাঝে মাঝে বেমানান রবীন্দ্র-সঙ্গীত গুনগুন করছেন, যেমন অঘ্রান মাসে ফাগুনের নবীন আনন্দে। ওঁর চেহারায় গান মানায় না, গলার কথা ছেড়েই দিলাম। মুশকিল হচ্ছে, উনি বলেন কলকাতার ডামাডোল থেকে বেরিয়ে নেচারের কন্টাক্টে এলেই নাকি ওঁর গান আসে, যদিও স্টক কম বলে সব সময়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান মনে আসে না।

তবে এটা বলতেই হবে যে ওঁর দৌলতে এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সার্কাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে ফেলেছি। কে জানত আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালীর সার্কাস ভারতবর্ষে এত নাম কিনেছিল ? সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস। এই সার্কাসে নাকি বাঙালী মেয়েরাও খেলা দেখাত, এমনকি বাঘের খেলাও। আর সেই সঙ্গে রাশিয়ান, আমেরিকান, জার্মান আর ফরাসী খেলোয়াড়ও ছিল। গাস্ বার্নস বলে একজন আমেরিকানকে রেখেছিলেন প্রোফেসর প্রিয়নাথ বোস বাঘ-সিংহ ট্রেন করার জন্য। ১৯২০-এ

প্রিয়নাথ বোস মারা যান। আর তার পর থেকেই বাঙালী সার্কাসের দিন ফুরিয়ে আসে।

'এই গ্রেট ম্যাজেস্টিক কোন দেশী সার্কাস মশাই?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'দক্ষিণ ভারতীয়ই হবে', বলল ফেলুদা, 'সার্কাসটা আজকাল ওদের একচেটে হয়ে গেছে।'

'ভালো ট্র্যাপীজ আছে কিনা সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। ছেলেবেলায় হার্মস্টোন আর কার্লেকার সার্কাসে যা ট্র্যাপীজ দেখিচি তা ভোলবার নয়।'

লালমোহনবাবুর গল্পে নাকি ট্র্যাপীজের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। শূন্যে সব লোমহর্ষক খেলার মাঝখানে একজন ট্র্যাপীজের খেলোয়াড় ঝুলন্ত অবস্থায় আরেকজনকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে খুন করবে। রহস্যের সমাধান করতে হিরো প্রখর রুদ্রকে নাকি ট্র্যাপীজের খেলা শিখতে হবে। ফেলুদা শুনে বলল, 'যাক, একটা জিনিস তাহলে আপনার হিরোর এখনো শিখতে বাকি।'

৭২ কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই আরেকটা অ্যাম্বাসাডর দেখা গেল। সেটা রাস্তার এক ধারে বনেট খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক হাত তুলে যে ভঙ্গিটা করছেন সেটা রেলের স্টেশনে খুব দেখা যায়। সেখানে সেটা গুড-বাই, আর এখানে হয়ে গেছে থামতে বলার সংকেত। হরিপদবাবু ব্রেক কষলেন।

'ইয়ে, আপনারা হাজারিবাগ যাচ্ছেন কি?'

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রং ফরসা, চোখে চশমা, পরনে হয়েরি প্যান্টের উপর সাদা শার্ট আর সবুজ হাত-কাটা পুলোভার। সঙ্গে ড্রাইভার আছে, যার শরীরের উপরের অর্ধেকটা এখন বনেটের নিচে।

প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলায় ভদ্রলোক বললেন, 'আমার গাড়িটা গণ্ডগোল করছে, বুঝেছেন। বোধহয় সিরিয়াস। তাই ভাবছিলাম—'

'আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে চাইলে আসতে পারেন।'

'সো কাইন্ড অফ ইউ!'—ভদ্রলোক বোধহয় ভাবতে পারেননি যে না চাইতেই ফেলুদা অফারটা করবে।—'আমি ওখান থেকে একটা মেকানিক নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে আসব। তাছাড়া তো আর কোনো ইয়ে দেখছি না।'

'আপনার সঙ্গে লাগেজ কী?'

'একটা সুটকেস, তবে সেটা অবিশ্যি পরে নিয়ে যেতে পারি। এখান থেকে যেতে আসতে তিন কোয়ার্টারের বেশি লাগবে না।'

'চলে আসুন।'

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে আরো

দু'বার বললেন সো কাইন্ড অফ ইউ। তারপর বাকি পথটা আমরা কিছু না জিগ্যেস করতেই নিজের বিষয়ে একগাদা বলে গেলেন। ওঁর নাম প্রীতীন্দ্র চৌধুরী। বাপ বছর দশেক হল রিটায়ার করে হাজারিবাগে বাড়ি করে আছেন, আগে রাঁচিতে অ্যাডভোকেট ছিলেন, নাম মহেশ চৌধুরী; এ অঞ্চলের নামকরা লোক।

'আপনি কলকাতাতেই থাকেন?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'হ্যাঁ। আমি আছি ইলেকট্রনিকসে। ইন্ডোভিশনের নাম শুনেছেন?'

ইন্ডোভিশন নামে একটা নতুন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন কিছুদিন থেকে কাগজে দেখছি, সেটা নাকি এঁদেরই তৈরি।

'আমার বাবার সত্তর পূর্ণ হচ্ছে কাল', বললেন ভদ্রলোক, 'বড়দা আমার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দিন তিনেক হল পৌঁছে গেছেন। আমার আবার দিল্লিতে একটা কাজ পড়ে গেসল, আসা মুশকিল হচ্ছিল, কিন্তু বাবা টেলিগ্রাম করলেন মাস্ট কাম বলে।—একটু থামাবেন গাড়িটা কাইন্ডলি?'

গাড়ি থামল; কেন তা বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক তাঁর হাতের ব্যাগটা থেকে একটা ছোট্ট ক্যাসেট রেকর্ডার বার করে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশেই একটা শালবনে ঢুকে মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, 'একটা ফ্লাইক্যাচার ডাকছিল; লাকিলি পেয়ে গেলাম। পাখির ডাক রেকর্ড করাটা আমার একটা নেশা। সো কাইন্ড অফ ইউ।'

ধন্যবাদটা অবিশ্যি তাঁর অনুরোধে গাড়ি থামানোর জন্য।

আশ্চর্য, ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে এত বলে গেলেও, আমাদের কোনো পরিচয় জানতে চাইলেন না। ফেলুদা অবিশ্যি বলে যে একেকজন লোক থাকে যারা অন্যের পরিচয় নেওয়ার চেয়ে নিজের পরিচয় দিতে অনেক বেশি ব্যগ্র

হাজারিবাগ টাউনে পৌঁছে ইউরেকা অটোমোবিলস-এ প্রীতীন্দ্রবাবুকে নামিয়ে দেবার পর আরেকবার সো কাইন্ড অফ ইউ বলে ভদ্রলোক হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'ভালো কথা, আপনারা উঠছেন কোথায়?'

জবাবটা দিতে ফেলুদার গলা তুলতে হল, কারণ গাড়ির কাছেই কেন জানি লোকের ভিড় জমেছে, আর সবাই বেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। কী বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটা অবিশ্যি পরে জেনেছিলাম।

ফেলুদা বলল, 'সঠিক নির্দেশ দিতে পারব না, কারণ আমরা এই প্রথম আসছি এখানে। এটা বলতে পারি যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউস আর কর্নেল মোহান্তির বাড়ির খুব কাছে।'

'ও, তার মানে আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট সাতেকের হাঁটা পথ।—টেলিফোন আছে?'

'সেভেন ফোর টু।'

'বেশ, বেশ।'

'আর আমার নাম মিত্র। পি সি মিত্র।'

'দেখেছেন, নামটাই জানা হয়নি!'

ভদ্রলোককে ছেড়ে দিয়ে রওনা হবার পর ফেলুদা বলল, 'নতুন মাল বাজারে ছাড়ছে বলে বোধহয় টেন্‌স হয়ে আছে।'

'বাতিকগ্রস্ত,' বললেন লালমোহনবাবু।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউসের কথা জিগ্যেস করে আমাদের বাড়ির রাস্তা খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধা হল না। কর্নেল জি সি মোহান্তির নাম লেখা মার্বেল ফলকওয়ালা গেট ছাড়িয়ে তিনটে বাড়ি পরেই এস সহায় লেখা বুগেনভিলিয়ায় ঢাকা গেটের বাইরে এসে হর্ন দিতেই একজন বেঁটে মাঝবয়সী লোক এসে গেটটা খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকল। মোরাম ঢাকা পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একতলা বাংলো টাইপের বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থামল। মাঝবয়সী লোকটাও দৌড়ে এসেছে পিছন পিছন, জিগ্যেস করে জানলাম সে-ই চৌকিদার, নাম বুলাকিপ্রসাদ।

গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম জায়গাটা কী নির্জন। বাংলোটা ঘিরে বেশ বড় কম্পাউণ্ড (লালমোহনবাবু বললেন অ্যাট লীস্ট তিন বিঘে), একদিকে বাগানে তিন চার রকম ফুল ফুটে আছে, অন্য দিকে অনেকগুলো বড় বড় গাছ, তার মধ্যে তেঁতুল, আম আর অর্জুন চিনতে পারলাম। কম্পাউন্ডের পাঁচিলের উপর দিয়ে উত্তর দিকে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সেটাই নাকি কানারি হিল, এখান থেকে মাইল দুয়েক।

বাড়িটা তিনজনের পক্ষে একেবারে ফরমাশ দিয়ে তৈরি। সামনে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে চওড়া বারান্দার পর পাশাপাশি তিনটে ঘর। মাঝেরটা বৈঠকখানা, আর দু'দিকে দুটো শোবার ঘর। পিছন দিকে আছে খাবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। সানসেট দেখা যাবে বলে লালমোহনবাবু পশ্চিমের বেডরুমটা নিলেন।

সুটকেস থেকে জিনিস বার করে বাইরে রাখছি, এমন সময় বুলাকিপ্রসাদ আমার ঘরে চা নিয়ে এসে ট্রেটা টেবিলের উপর রেখে যে কথাটা বলল, তাতে আমাদের দু'জনেরই কাজ বন্ধ করে ওর দিকে চাইতে হল। লালমোহনবাবু সবে ঘরে ঢুকেছেন, তিনিও দরজার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন।

'আপলোগ যব বাহার যাঁয়ে,' বলল বুলাকিপ্রসাদ 'পয়দল যানেসে যারা সমঝলকে যানা।'

'চোর ডাকাতের কথা বলছে নাকি মশাই?' বললেন লালমোহনবাবু।

'নেহী, বাবু : বাঘ ভাগ গিয়া মজিস্টি সর্কস সে।'

সর্বনাশ ! লোকটা বলে কী !

জিগ্যেস করতে জানা গেল আজই সকালে নাকি একটা ডাগড়াই বাঘ সার্কাসের খাঁচা থেকে পালিয়েছে । কী করে পালিয়েছে সেটা বুলাকিপ্রসাদ জানে না, কিন্তু সেই বাঘের ভয়ে সারা হাজারিবাগ শহর তটস্থ । বাঘের খেলাই নাকি এই সার্কাসের যাকে বলে স্টার অ্যাট্রাকশন । সার্কাসের বিজ্ঞাপনও যা দেখেছি, তাতে বাঘের ছবিটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে । ফেলুদার অবিশ্যি চোখই আলাদা, তাই সে আমাদের চেয়ে বেশি দেখেছে । বলল, বাঘের খেলা যিনি দেখান তিনি নাকি মারাঠী, নাম কারান্ডিকার, আর নামটা নাকি বিজ্ঞাপনে দেওয়া ছিল ।

লালমোহনবাবু খবরটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন তাঁর গল্পে বাঘ পালানোর ঘটনা একটা রাখা যায় কিনা সেটা তিনি ভাবছিলেন, কাজেই এটাকে টেলিপ্যাথি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না ।—'তবে আপনি মশাই একেবারে ইনকগ্নিটো হয়ে থাকুন, গোয়েন্দা জানলে আপনাকে নির্ঘাত ওই বাঘ সন্ধানের কাজে লাগিয়ে দেবে ।'

ইনকগ্নিটো অবিশ্যি ইনকগনিটোর জটায়ু সংস্করণ । লালমোহনবাবু মাঝে মাঝে ইংরিজি কথায় এরকম ওলট পালট করে ফেলেন । খবরটা শুনে এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাঁকে আর শুধরে দেওয়া হল না । ফেলুদা অবিশ্যি অকারণে কখনই ওর পেশাটা প্রকাশ করে না । আর গোয়েন্দা বলেই যে ওকে যে কেউ যে কোনো তদন্তে ফাঁসিয়ে দেবে সেটারও কোনো সম্ভাবনা নেই ।

বুলাকিপ্রসাদ আরও বলল যে সার্কাসটা নাকি আগে শহরের মাঝখানে কার্জন মাঠে বসত, এইবারই নাকি প্রথম সেটা শহরের এক ধারে একটা নতুন জায়গায় বসেছে । এই মাঠটার উত্তরে নাকি বিশেষ বসতি নেই । বাঘ যদি সেদিক দিয়ে বেরোয় তাহলে রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই জঙ্গল পাবে । কাছাকাছি আদিবাসীদের গ্রাম আছে, খিদে পেলে সেখান থেকে গরু বাছুর টেনে নিয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয় ।

মোটকথা, ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর । আপসোস এই যে হাজারিবাগের মতো জায়গায় এসে বাঘের ভয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ানো যাবে না ।

চা খাওয়ার পর লালমোহনবাবু প্রস্তাব করলেন যে দুপুরে একবার গ্রেট ম্যাজেস্টিকে ঢুঁ মারা হোক । ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছে সেটা জানতে পারলে নাকি ওঁর খুব কাজে দেবে । 'ঢুঁ মারা মানে কি টিকিট কেটে সার্কাস দেখার কথা ভাবছেন ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল ।

'ঠিক তা নয়,' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমি ভাবছিলাম যদি খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা করা যায়। অনেক ডিটেলস জানা যেত ওঁর কাছে।'

'সেটা ফেলু মিত্তিরের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।'

॥ ২ ॥

দুপুরে বুলাকিপ্রসাদের বৌয়ের রান্না মুরগীর কারি আর অড়হড়ের ডাল খেয়ে গাড়িতে করেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বুঝতে পারলাম ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতূহল আছে এই বাঘ পালানোর ব্যাপারে। বেরোবার আগে থানায় একটা ফোন করল। কোডার্মায় ওকে বিহার পুলিশের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল, সর্বেশ্বর সহায়কেও এখানে সবাই চেনে, তাই নাম করতেই ইনস্পেক্টর রাউত ফেলুদাকে চিনে ফেললেন। আসলে পুলিশের সাহায্য ছাড়া হয়ত এই জরুরী অবস্থায় সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করা মুশকিল হত। রাউত বললেন, সার্কাসের সামনে পুলিশের লোক থাকবে, ফেলুদার কোনো অসুবিধা হবে না। ফেলুদা এটাও বলে দিল যে সে কোনোরকম তদন্ত করতে যাচ্ছে না, কেবল কৌতূহল মেটাতে যাচ্ছে।

সমস্ত শহরে যে সাড়া পড়ে গেছে সেটা গাড়িতে যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছিলাম। শুধু যে রাস্তার মোড়ে জটলা তা নয়, একটা চৌমাথায় দেখলাম ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে লোকদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। ফেলুদা একটা পানের দোকানে চারমিনার কিনতে নেমেছিল, সেখানে দোকানদার বলল যে বাঘটাকে নাকি উত্তরে ডাহিরি বলে একটা আদিবাসী গ্রামের কাছাকাছি দেখা গেছে, তবে কোনো উৎপাতের কথা এখনো শোনা যায়নি।

সার্কাসের তাঁবু দেখলেই বুকের ভিতরটা কেমন জানি করে ওঠে, ছেলেবেলা ফেলুদার সঙ্গেই কত সার্কাস দেখেছি সে কথা মনে পড়ে যায়। গ্রেট ম্যাজেস্টিকের সাদা আর নীল ডোরাকাটা ছিমছাম তাঁবুটা দেখলেই বোঝা যায় এটা ভাল সার্কাস। তাঁবুর চুড়োয় ফরফর করে হলদে ফ্ল্যাগ উড়ছে, চুড়ো থেকে বেড়া অবধি টেনে আনা দড়িতে আরো অজস্র রঙিন ফ্ল্যাগ। তাঁবুর গেটের বাইরে কমপক্ষে হাজার লোক, তারা অনেকেই টিকিট কিনতে এসেছে। বাঘ পালানোয় সার্কাস বন্ধ হয়নি, শুধু আপাতত বাঘের খেলাটাই স্থগিত। আরো কতরকম খেলা যে সে সার্কাসে দেখানো হয় সেটা হাতে আঁকা প্রকাণ্ড বড় বড় বিজ্ঞাপনে বোঝানো হয়েছে। শিল্পী খুব পাকা নন, তবে লোকের মনে চনমনে ভাব আনতে এই যথেষ্ট।

পুলিশের লোক গেটের বাইরেই ছিল। ফেলুদা কার্ডটা দিতেই খুব খাতির করে

ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। বলল, মালিক মিঃ কুট্টিকেও বলা আছে, তিনি তাঁর ঘরে অপেক্ষা করছেন।

তাঁবুটাকে ঘিরে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে তারপর টিনের বেড়া। এই বেড়ার মধ্যেই একধারে দাঁড়িয়ে আছে দা গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের মালিক মিঃ কুট্টির ক্যারাভান। বলা যায় একটা সুদৃশ্য চলন্ত বাড়ি। দু'পাশের সার বাঁধা কাচের জানালায় নকশা করা পর্দার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ ঢুকছে ভিতরের আবছা অন্ধকারে। মিঃ কুট্টি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাদের তিনজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বসবার জন্য মিনি-সোফা দেখিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের গায়ের রং ময়লা, বয়স পঞ্চাশের বেশি না হলেও মাথার চুল ধপধপে সাদা। হাসলে বোঝা যায় দাঁতও চুলের সঙ্গে মানানসই, যদিও ফল্স টীথ নয়।

ফেলুদা প্রথমেই বলে দিল যে ও পুলিশের লোক নয়, সার্কাস ওর খুব প্রিয় জিনিস, গ্রেট ম্যাজেস্টিকের খ্যাতির কথা ও জানে, হাজারিবাগে এসে সার্কাস দেখার ইচ্ছে ছিল, আপসোস এই যে একটা দুর্ঘটনার জন্য আসল খেলাটাই দেখা হবে না। সেই সঙ্গে লালমোহনবাবুরও পরিচয় করিয়ে দিল একজন বিশিষ্ট লেখক বলে। —'সার্কাস নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা ভাবছেন মিঃ গাঙ্গুলী।'

মিঃ কুট্টি বললেন, সার্কাসে আসার আগে ছ'বছর উনি কলকাতায় একটা জাহাজ কোম্পানিতে ছিলেন, বাঙালীদের ভালোবাসেন, কারণ বাঙালীরাই নাকি সার্কাসের সত্যিকার কদর করে। আমরা সার্কাস দেখায় নিরুৎসাহ বোধ করছি জেনে বললেন যে বাঘের খেলা ছাড়াও অনেক কিছু দেখার আছে গ্রেট ম্যাজেস্টিকে। —'কাল আমাদের স্পেশাল শো ছিল, হাজারিবাগের অনেক নামকরা লোককে আমরা ইনভাইট করেছিলাম। আপনাদেরও ইনভাইট করছি।'

'ব্যাপারটা হল কীভাবে ?' লালমোহনবাবু হিন্দি আর ইংরিজি মিশিয়ে জিগ্যেস করলেন। (আসলে জিগ্যেস করেছিলেন—'শের তো ভাগা, বাট হাউ ?')

'ভেরি আনফরচুনেট, মিঃ গাংগুলী,' বললেন মিঃ কুট্টি। 'বাঘের খাঁচার দরজাটা ঠিকভাবে বন্ধ করা হয়নি। বাঘ নিজেই সেটাকে মাথা দিয়ে ঠেলে তুলে পালিয়েছে। তার উপর আরেকটা গলতি হয়েছে এই যে টিনের বেড়ার একটা অংশ কে জানি ফাঁক করে বাইরে যাবে বলে শর্টকাট করেছিল, তারপর আর বন্ধ করেনি। কে দোষী সেটা আমরা বার করেছি, আর তার জন্য প্রপার স্টেপস নিচ্ছি।'

ফেলুদা বলল, 'বম্বেতে একবার ঠিক এইভাবে বাঘ পালিয়েছিল না ?'

'হ্যাঁ, ন্যাশনাল সার্কাস। শহরের রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল বাঘ। কিন্তু বেশি দূর যাবার আগেই রিং-মাস্টার তাকে ধরে নিয়েছিল।'

এখানকার বাঘ পালানোর ব্যাপারে আরো খবর জানলাম কুট্টির কাছে। কম করে জনা পঞ্চাশেক লোক নাকি বাঘটাকে তাঁবুর বাইরে দেখেছে। এক পেট্রোল স্টেশনের মালিকের বাড়ির উঠোনে নাকি বাঘটা ঢুকেছিল। ভদ্রলোকের স্ত্রী সেটাকে দেখতে পেয়ে ভিরমি যান। এক নেপালী-ভদ্রলোক স্কুটারে যাচ্ছিলেন, তিনি বাঘটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে সোজা ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরে পাঁজরার তিনটে হাড় ভেঙে এখন হাসপাতালে আছেন।

'আচ্ছা, আপনাদের তো রিং-মাস্টার আছে নিশ্চয়ই?'

রিং-মাস্টার কথাটা নতুন শিখে সেটা ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারলেন না জটায়ু।

'কে কারাণ্ডিকার? তার শরীর কিছুদিন থেকে এমনিতেই খারাপ যাচ্ছে। বয়স হয়েছে নিয়ারলি ফর্টি। ঘাড়ে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে, তাই নিয়েই খেলা দেখায়। আমার কথা শুনবে না, ডাক্তারও দেখাবে না। মাস খানেক হল তাই আমি আরেকজন লোক রেখেছি। নাম চন্দ্রন। কেরলের লোক। ভেরি গুড। সেও বাঘ ট্রেন করে, কারাণ্ডিকার অসুস্থ হলে সে-ই খেলা দেখায়।'

'কাল স্পেশ্যাল শো-তে কে দেখিয়েছিল?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'কাল কারাণ্ডিকারই দেখিয়েছিল। একটা খেলা ও ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারে না। খেলার ক্লাইম্যাক্সে দু'হাতে বাঘের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। দুঃখের বিষয়, কাল একটা বিশ্রী গণ্ডগোল হয়ে যায়। দু'বার চেষ্টা করেও যখন বাঘ মুখ খুলল না, তখন কারাণ্ডিকার হঠাৎ চেষ্টা থামিয়ে দিয়ে খেলা শেষ করে দেয়। ফলে হাততালির সঙ্গে তাকে কিছু টিটকিরিও শুনতে হয়েছিল।'

'আপনি তাতে কোনো স্টেপ নেননি?'

'নিয়েছি বৈকি। পুরনো লোক, কিন্তু তাও কথা শোনাতে হল। ও সতেরো বছর কাজ করছে সার্কাসে। প্রথম তিন বছর গোল্ডেনে ছিল, বাকি সময়টা এখানে। ওর যা নাম তা আমার সার্কাসে খেলা দেখিয়েই। এখন বলছে কাজ ছেড়ে দেবে। খুবই দুঃখের কথা, কারণ অন্তত আরো বছর তিনেক ও কাজ করতে পারত বলে আমার বিশ্বাস।'

'বাঘ খুঁজতে সার্কাসের লোক যায়নি?'

'কারাণ্ডিকারেরই যাবার কথা ছিল, কিন্তু ও রাজি হয়নি। তাই চন্দ্রনকে যেতে হয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকের সঙ্গে।'

লালমোহনবাবুর সাহস বেড়ে গেছে। বললেন, 'কারাণ্ডিকারের সঙ্গে দেখা করা যায়?'

'কোনো গ্যারান্টি দিতে পারি না,' বললেন মিঃ কুট্টি, 'খুব মুডি লোক। মুরুগেশের সঙ্গে যান আপনারা, গিয়ে দেখুন সে দেখা করে কিনা।'

মুরুগেশ হল মিঃ কুট্টির পার্সোনাল বেয়ারা। সে বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, মনিবের হুকুমে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেল রিং-মাস্টারের তাঁবুতে।

তাঁবুর ভিতরে দুটো ভাগ ; একটা বসার জায়গা, আরেকটা শোবার। আশ্চর্য এই যে খবর দিতেই বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন রিং-মাস্টার। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে বলে দিতে হয় না যে উনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ, বাঘের খেলা দেখানোর পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত চেহারা আর হয় না। লম্বায় ফেলুদার সমান, চওড়ায় ওর দেড়া। ফর্সা রঙে কুচকুচে কালো চাড়া-দেওয়া গোঁফটা আশ্চর্য খুলেছে, চোখের দৃষ্টি এখন উদাস হলেও হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথা বলতে জ্বলে ওঠে। ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন যে তিনি মারাঠী মালয়ালম তামিল আর ভাঙা ভাঙা ইংরিজি আর হিন্দি জানেন। শেষের দুটো ভাষাতেই কথা হল।

কারাণ্ডিকার প্রথমেই জানতে চাইলেন আমরা কোনো খবরের কাগজ থেকে আসছি কিনা। বুঝলাম ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর হাতে খাতা পেনসিল দেখেই প্রশ্নটা করেছেন। ফেলুদা প্রশ্নের জবাবটা যেন বেশ হিসেব করে দিল।

'যদি তাই হয়, তাহলে আপনার কোনো আপত্তি আছে?'

'আপত্তি তো নেইই, বরং সেটা হলে খুশিই হব। এটা পাবলিকের জানা দরকার যে বাঘ পালানোর জন্য ট্রেনার কারাণ্ডিকার দায়ী নয়, দায়ী সার্কাসের মালিক। বাঘ দু'জন ট্রেনারকে মানে না, একজনকেই মানে। অন্য ট্রেনার আসার পর থেকেই সুলতানের মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছিল। আমি সেটা মিঃ কুট্টিকে বলেছিলাম, উনি গা করেননি। এখন তার ফল ভোগ করছেন।'

'আপনি বাঘটাকে খুঁজতে গেলেন না যে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'ওরাই খুঁজুক না,' গভীর অভিমানের সঙ্গে বললেন কারাণ্ডিকার।

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে ফেলুদাকে বাংলায় বললেন, 'একটু জিগ্যেস করুন তো তেমন তেমন দরকার পড়লে উনি যাবেন কিনা। খবরটা পেলে বাঘ ধরা দেখা যেত। অবিশ্যি একা নয়, ইন ইওর কম্প্যানি। খুব থ্রিলিং ব্যাপার হবে নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা জিগ্যেস করাতে কারাণ্ডিকার বললেন যে বাঘকে গুলি করে মারার প্রস্তাব উঠলে তাঁকে যেতেই হবে বাধা দিতে, কারণ সুলতান ওঁর আত্মীয়ের বাড়া।

আমিও একটা জিনিস জিগ্যেস করার কথা ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই করল।

'আপনার মুখে কি বাঘ কোনোদিন আঁচড় মেরেছিল?'

'নট সুলতান,' বললেন কারাণ্ডিকার। 'গোল্ডেন সার্কাসের বাঘ। গাল আর নাকের খানিকটা মাংস তুলে নিয়েছিল।'

কথাটা বলে কারান্ডিকার তাঁর শার্ট খুলে ফেললেন। দেখলাম বুকে পিঠে কাঁধে কত যে আঁচড়ের দাগ রয়েছে তার হিসেব নেই।

আমরা ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম। তাঁবু থেকে বেরোবার সময় ফেলুদা বলল, 'আপনি এখন এখানেই থাকবেন?'

কারান্ডিকার গম্ভীর হয়ে বললেন,'আজ সতেরো বছর আমি সার্কাসের তাঁবুকেই ঘর বলে জেনেছি। এবার বোধহয় নতুন ডেরা দেখতে হবে।'

লালমোহনবাবু মিঃ কুট্টিকে বলে রেখেছিলেন যে তিনি ম্যাজেস্টিকের পশুশালাটা একবার দেখতে চান। মুরুগেশের সঙ্গে গিয়ে আমরা সার্কাসের অবশিষ্ট দুটি বাঘ, একটা বেশ বড় ভাল্লুক, একটা জলহস্তী, তিনটে হাতী, গোটা ছয়েক ঘোড়া আর সুলতানের গা ছমছম করা খালি খাঁচাটা দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল পাঁচটা। বুলাকিপ্রসাদকে চা দেবার জন্য ডেকে পাঠাতে সে বলল, চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে একজন বাবু এসেছিলেন, বলে গেছেন আবার আসবেন।

সাড়ে ছটায় এলেন প্রীতীন্দ্র চৌধুরী। ইতিমধ্যে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করে ঠাণ্ডা পড়েছে, আমরা সবাই কোট পুলোভার চাপিয়ে নিয়েছি, লালমোহনবাবুর মাঙ্কিক্যাপটা পরার মতো ঠাণ্ডা এখনো পড়েনি, কিন্তু ওঁর টাক বলে উনি রিস্ক না নিয়ে এর মধ্যেই ওটা চাপিয়ে বসে আছেন।

'আপনি যে ডিটেকটিভ সেটা তো বলেননি!' আমাদের তিনজনকেই অবাক করে দিয়ে বললেন প্রীতীন্দ্র চৌধুরী।—'বাবা তো আপনার মক্কেল মিঃ সহায়কে খুব ভালো করে চেনেন। সহায় ওঁকে জানিয়েছেন যে আপনারা এখানে আসছেন। বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন আপনারা তিনজনেই যেন কাল আমাদের সঙ্গে পিকনিকে আসেন।'

'পিকনিক?' লালমোহনবাবু ভুরু কপালে তুলে প্রশ্ন করলেন।

'বলেছিলাম না—কাল বাবার জন্মদিন। আমরা সবাই যাচ্ছি রাজরাপ্পা পিকনিক করতে। দুপুরে ওখানেই খাওয়া। আপনাদের তো গাড়ি রয়েছে, নটা নাগাদ আমাদের ওখানে চলে আসুন। বাড়ির নাম কৈলাস। আপনাদের ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি, খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

রাজরাপ্পা হাজারিবাগ থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূর, জলপ্রপাত আছে, চমৎকার দৃশ্য, আর একটা পুরানো কালীমন্দির আছে—নাম ছিন্নমস্তার মন্দির। এসব আমরা আসবার আগেই জেনে এসেছি, আর পিকনিকের নেমন্তন্ন না হলে নিজেরাই যেতাম।

প্রীতীনবাবু আরো বললেন যে আমরা যদি একটু আগে আগে যাই, তাহলে মহেশবাবুর প্রজাপতি আর পাথরের কালেকশনটাও দেখা হয়ে যেতে পারে।

'কিন্তু পিকনিকে যে যাচ্ছেন আপনারা, বাঘ পালানোর খবরটা জানেন কি ?' ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

'জানি বৈকি !' হেসে বললেন প্রীতীনবাবু, 'কিন্তু তার জন্য ভয় কী ? সঙ্গে বন্দুক থাকবে ; আমার বড়দা ক্র্যাক শট। তাছাড়া বাঘ তো শুনেছি উত্তরে হানা দিচ্ছে, রাজরাপ্পা তো দক্ষিণে, রামগড়ের দিকে। কোনো ভয় নেই।'

ঠিক হল আমরা সাড়ে আটটা নাগাদ মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছে যাব। লালমোহনবাবু 'কৈলাস নাম দিল কেন, মশাই'-এর উত্তরে ফেলুদা বলল, শিবের বাসস্থান কৈলাস, আর মহেশ শিবের নাম, তাই কৈলাস।

প্রীতীনবাবু চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে এল। আমরা বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বাতিটা জ্বাললাম না, যাতে চাঁদের আলো উপভোগ করা যায়। ছিন্নমস্তার মন্দিরের কথাটা লালমোহনবাবু জানতেন না, তাই বোধহয় মাঝে মাঝে নামটা বিড়বিড় করছিলেন। সাতবারের বার ছিন্ বলেই থেমে যেতে হল, কারণ ফেলুদা হাত তুলেছে।

আমরা তিনজনেই চুপ, ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, এমন সময় শোনা গেল—বেশ দূর থেকে, তাও গায়ের রক্ত জল করা—বাঘের গর্জন। একবার, দুবার, তিনবার।

সুলতান ডাকছে।

কোনদিক থেকে, কতদূর থেকে, সেটা বুঝতে হলে শিকারীর কান চাই।

॥ ৩ ॥

আমি ভেবেছিলাম যে সার্কাসের বাঘ পালানোটাই বুঝি হাজারিবাগের আসল ঘটনা হবে ; কিন্তু তা ছাড়াও যে আরো কিছু ঘটবে, আর ফেলুদা যে সেই ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়বে, সেটা কে জানত ? ২৩শে নভেম্বর মহেশ চৌধুরীর বার্থডে পিকনিকের কথাটা অনেকদিন মনে থাকবে, আর সেই সঙ্গে মনে থাকবে রাজরাপ্পার আশ্চর্য সুন্দর রুক্ষ পরিবেশে ছিন্নমস্তার মন্দির।

কাল রাত্রে বাঘের ডাক শোনার পর থেকেই লালমোহনবাবুর মুখটা জানি কেমন হয়ে গিয়েছিল, ভাবছিলাম বলি উনি আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে শোন, আর ফেলুদা পশ্চিমের ঘরটা নিক, কিন্তু সেদিকে আবার ভদ্রলোকের গোঁ আছে। চৌকিদারের কাছে টাঙি আছে জেনে, আর লোকটা বেঁটে হলেও সাহসী জেনে ভদ্রলোক খানিকটা আশ্বাস পেয়ে নিজের তিন সেলের টর্চের বদলে আমাদের পাঁচ সেলটা নিয়ে দশটা নাগাদ নিজের ঘরে চলে গেলেন। বড় টর্চ নেওয়ার কারণ এই যে, ফেলুদা বলেছে তীব্র আলো চোখে ফেললে বাঘ নাকি অনেক সময় আপনা

থেকেই সরে পড়ে।—'অবিশ্যি জানালার বাইরে যদি গর্জন শোনেন, তখন টর্চ জ্বালানোর কথা, আর সেই টর্চ জানালার বাইরে বাঘের চোখে ফেলার কথা, মনে থাকবে কিনা সেটা জানি না।'

যাই হোক, রাত্রে বাঘ এসে থাকলেও সে গর্জন করেনি, তাই টর্চ ফেলারও কোনো দরকার হয়নি।

আমরা প্রীতীনবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক সাড়ে আটটার সময় কৈলাসের লাল ফটকের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন যে বোঝাই যাচ্ছে এ শিব হল সাহেব শিব। সত্যিই, বছর দশেক আগে তৈরি হলেও বাড়ির চেহারাটা সেই পঞ্চাশ বছর আগের ব্রিটিশ আমলের বাড়ির মতো।

দারোয়ান গেট খুলে দিতে আমরা গাড়িটা বাইরে রেখে কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। আরো তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কম্পাউন্ডের এক পাশে: একটা কালকের দেখা প্রীতীনবাবুর কালো অ্যামবাসাডর, একটা সাদা ফিয়াট, আর একটা পুরানো হলদে পনটিয়াক।

'একটা ক্লু পাওয়া গেছে মশাই।'

লালমোহনবাবু বাগান আর রাস্তার মাঝখানে সাদা রং করা ইটের বেড়ার পাশ থেকে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি রহস্যের অবর্তমানেই ক্লুয়ের সন্ধান পাচ্ছেন?'

'জিনিসটা কীরকম মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে না?'

একটা রুলটানা খাতার পাতা, তাতে সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কিছু অর্থহীন ইংরিজি কথা। মিস্ট্রির কিছুই নেই, বোঝাই যাচ্ছে সেটা বাচ্চার হাতের লেখা, আর সেই কারণেই কথাগুলোর কোনো মানে নেই। যেমন—OKAHA, RKAHA, LOKC।

'ওকাহা যে জাপানী নাম সেটো বোঝাই যাচ্ছে' বললেন লালমোহনবাবু।

'বাঙলা নামটা না চিনে আগেই জাপানী নামটা চিনে ফেললেন?'—বলে ফেলুদা কাগজটা পকেটে পুরে নিল।

একজন ভীষণ বুড়ো মুসলমান বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল গাড়িবারান্দার নিচে, সে আমাদের সেলাম করে 'আইয়ে' বলে ভিতরে নিয়ে গেল। একটা চেনা গলা আগে থেকেই পাচ্ছিলাম, বৈঠকখানার চৌকাঠ পেরোতেই প্রীতীনবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'আসুন, আসুন—সো কাইন্ড অফ ইউ টু কাম।'

ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখ চলে যায় দেয়ালের দিকে। তিন দেয়াল জুড়ে ছবির

বৰাৰে টাঙানো রয়েছে ফ্রেমে বাঁধানো মহেশ চৌধুরীর সংগ্রহ করা পিনে আঁটা সার সার ডানা মেলা প্রজাপতি। প্রতি ফ্রেমে আটটা, সব মিলিয়ে চৌষট্টি, আর তাদের রঙের বাহারে পুরো ঘরটা যেন হাসছে।

যাঁর সংগ্রহ, তিনি সোফায় বসে ছিলেন, আমাদের দেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। বুঝলাম এককালে ভদ্রলোক বেশ শক্ত সুপুরুষ ছিলেন। টকটকে রঙ, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, চোখে রিমলেস চশমা, পরনে ফিনফিনে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর ঘন কাজ করা কাশ্মীরী শাল। বুঝলাম এটা মহেশ চৌধুরীর সত্তর বছরের জন্মদিন উপলক্ষে স্পেশাল পোশাক।

প্রীতীনবাবু শুধু ফেলুদার নামটাই জানেন, তাই বাকি দুজনের পরিচয় ফেলুদাকেই দিতে হল। ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই লালমোহনবাবু আমাদের অবাক করে দিয়ে বললেন, 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, স্যার!'

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন।—'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ! বুড়োমানুষের আবার জন্মদিন। এসব আমার বৌমার কাণ্ড।—যাক আপনারা এসে গিয়ে খুব ভালোই হল। হোয়্যার ইজ দা ডেড বডি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি তো?'

প্রশ্নটা শুনে আমার আর লালমোহনবাবুর মুখ একসঙ্গে হাঁ হয়ে গেছে। ফেলুদা কিন্তু ভুরুটা একটু তুলেই নামিয়ে নিল। 'আজ্ঞে না, অসুবিধা হয়নি।'

'ভেরি গুড। আমি বুঝেছিলাম আপনি যখন গোয়েন্দা তখন হয়ত আমার সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারবেন। তবে আপনার দুই বন্ধু মনে হচ্ছে বোঝেননি।'

ফেলুদা বুঝিয়ে দিল। 'কৈলাস হচ্ছে "কই লাশ"?'

এবারে লক্ষ করলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চিতাবাঘের ছালের উপর বসে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে ডান হাতে একটা চিমটের মতো জিনিস নিয়ে বাঁ হাতে ধরা একটি বিলিতি ডলের ভুরুর জায়গায় এক মনে চিমটি কাটছে। বোধহয় পুতুলের ভুরু প্লাক করা হচ্ছে। আমি ওর দিকে চেয়ে আছি বলেই বোধহয় মহেশবাবু বললেন, 'ওটি আমার নাতনী; ওর নাম জোড়া মৌমাছি।'

'আর তুমি জোড়া কাটারি', বলল মেয়েটি।

'বুঝলেনতো মিঃ মিত্তির?'

ফেলুদা বলল, 'বুঝলাম, আপনার নাতনী হলেন বিবি, আর আপনি ওর দাদু।'

লালমোহনবাবু আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে বুঝিয়ে দিলাম বিবি হচ্ছে Bee-Bee, আর দাদুর 'দা' হল কাটারি আর 'দু' হল দুই। ফেলুদা আর আমি অনেক সময়ই বাড়িতে বসে কথার খেলা তৈরি করে খেলি,

তাই এগুলো বুঝতে অসুবিধা হল না।

প্রীতীনবাবু 'দাদাকে ডাকি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ; আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম। মহেশবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসি, তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদার তাতে কোনো উসখুসে ভাব নেই, সেও দিব্যি উল্টে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে।

'ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল', অবশেষে বললেন মহেশ চৌধুরী, 'সহায় আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল, তাই আপনি এসেছেন শুনে তিন্নিকে বললুম, ভদ্রলোককে ডাক, তাকে একবার দেখি। আমার জীবনেও তো অনেক রহস্য, দেখুন যদি তার দু একটাও সমাধান করে দিতে পারেন।'

'তিন্নি মানে আপনার তৃতীয় পুত্র কি ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'রাইট এগেন', বললেন ভদ্রলোক। 'আমি যে কথা নিয়ে খেলতে ভালোবাসি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

'ও বাতিকটা আমারও আছে।'

'সে তো খুব ভালো কথা। আমার নিজের ছেলেদের মধ্যে টেক্কা তবু একটু আধটু বোঝে, তিন্নির মাথা এদিকে একেবারেই খেলে না। তা যাক্ গে—আপনি গোয়েন্দাগিরি করছেন কদ্দিন ?'

'বছর আষ্টেক।'

'আর উনি কী করেন ? মিঃ গাঙ্গুলী ?'

'উনি লেখেন। রহস্য উপন্যাস। জটায়ু ছদ্মনামে।'

'বাঃ ! আপনাদের কম্বিনেশনটি বেশ ভালো। একজন রহস্য-প্লট পাকান, আরেকজন রহস্যের জট ছাড়ান। ভেরি গুড।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার প্রজাপতি আর পাথরের সংগ্রহ তো দেখতেই পাচ্ছি ; এ ছাড়া আরো কিছু জমিয়েছেন কি কোনোদিন ?'

পাথরগুলো রাখা ছিল ঘরের একপাশে একটা বড় কাচের আলমারির ভিতর। এত রকম রঙের পাথর যে হয় তা আমার ধারণাই ছিল না। কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ এ প্রশ্ন করল কেন ? ভদ্রলোকও বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'অন্য সংগ্রহের কথা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন কেন ?'

'আপনার নাতনীর হাতের চিমটেটাকে পুরানো টুইজারস বলে মনে হচ্ছে তাই—'

'ব্রিলিয়ান্ট ! ব্রিলিয়ান্ট !'—ভদ্রলোক ফেলুদার কথার উপর তারিফ চাপিয়ে দিলেন।—'আপনার অদ্ভুত চোখ। আপনি ঠিক ধরেছেন, ওটা স্ট্যাম্প কালেকটরের চিমটেই বটে। ডাকটিকিট এককালে জমিয়েছি বইকি, আর বেশ যত্ন নিয়ে সিরিয়াসলি জমিয়েছি। এখনও মাঝে মাঝে গিবন্সের ক্যাটালগের

পাতা উলটোই। ওটাই আমার প্রথম ছবি। যখন ওকালতি করি তখন আমার এক মক্কেল, নাম লোবরজী, আমার উপর কৃতজ্ঞতাবশে তার একটি খাস পুরানো, অ্যালবাম আমাকে দিয়ে দেয়। তার নিজের অবিশ্যি শখ মিটে গিয়েছিল, কিন্তু এ জিনিস সহজে কেউ দেয় না। বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য টিকিট ছিল সেই অ্যালবামে।'

আমি নিজে স্ট্যাম্প জমাই, আর ফেলুদারও এক সময় ডাকটিকিটের নেশা হয়েছিল। ও বলল, 'সে অ্যালবাম দেখা যায়?'

'আজ্ঞে?'—ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—'অ্যালবাম? অ্যালবাম তো নেই ভাই। সেটা খোয়া গেছে।'

'খোয়া গেছে?'

'বলছি না—আমার জীবনে অনেক রহস্য। রহস্যও বলতে পারেন, ট্র্যাজিডিও বলতে পারেন। তবে আজকের দিনটায় সেসব আলোচনা থাক।—এসো টেকা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

টেকা মানে বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোকের বড় ছেলে। প্রীতীনবাবুর সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকলেন। বয়সে প্রীতীনবাবুর চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। ইনিও সুপুরুষ, যদিও মোটার দিকে, আর প্রীতীনবাবুর মতো ছটফটে নন; বেশ একটা ভারিক্কি ভাব।

'তিব্বিতে মাইক সম্বন্ধে জিগ্যেস করলে আপনি ভালো জবাব পাবেন', বললেন মহেশ চৌধুরী, 'আর ইনি মাইকার কারবারি! অরুণেন্দ্র। কলকাতায় অফিস, হাজারিবাগ যাতায়াত আছে কর্মসূত্রে।'

'আর দুরি বুঝি উনি?' ফেলুদা রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির দিকে দেখাল। ফ্যামিলি গ্রুপ। মহেশবাবু, তাঁর স্ত্রী, আর তিন ছেলে। অন্তত বছর পঁচিশ আগে তোলা, কারণ বাপের দু'পাশে দাঁড়ানো দুজন ছেলেই হাফ প্যান্ট পরা, আর তৃতীয়টি মায়ের কোলে। দাঁড়ানো ছেলে দুটির মধ্যে যে ছোট সেই নিশ্চয় মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে।

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' বললেন মহেশবাবু, 'তবে দুরির সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আপনার হবে কিনা জানি না, কারণ সে ভাগলওয়া।'

অরুণবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। 'বীরেন বিলেত চলে যায় উনিশ বছর বয়সে; তারপর আর ফেরেনি।'

'ফেরেনি কি?'—মহেশবাবুর প্রশ্নে কোথায় যেন একটা খটকার সুর।

'ফিরলে কি আর তুমি জানতে না, বাবা?'

'কী জানি!'—সেই একই সুরে বললেন মহেশ চৌধুরী। 'গত দশ বছর তো সে আমাকে চিঠিও লেখেনি।'

ঘরে কেমন একটা থমথমে ভাব এসে গেছিল বলেই বোধহয় সেটা দূর করার

জন্য মহেশবাবু হঠাৎ চাঙা হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন।—'চলুন, আপনাদের আমার বাড়িটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই। অখিল আর হিং যখন এখনো এল না, তখন হাতে কিছুটা সময় আছে।'

'তুমি উঠছ কেন বাবা', বললেন অরুণবাবু, 'আমিই দেখিয়ে আনছি।'

'নো স্যার, আমার প্ল্যান করা আমার বাড়ি, আমিই দেখাব। আসুন, মিঃ মিত্তির।'

দোতলায় উত্তরে রাস্তার দিকে একটা চমৎকার চওড়া বারান্দা, সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। বেডরুম তিনটে, তিনটেতেই এখন লোক রয়েছে। মাঝেরটায় থাকেন মহেশবাবু নিজে, এক পাশে বড় ছেলে, অন্য পাশে স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে প্রীতীনবাবু। নিচে একটা গেস্টরুম আছে, তাতে এখন রয়েছেন মহেশবাবুর বন্ধু অখিল চক্রবর্তী। অরুণবাবুর দুই সন্তানের মধ্যে বড়টি ছেলে, সে এখন বিলেতে, আর মেয়েটির সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা বলে সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় রয়ে গেছে।

মহেশবাবুর বেডরুমেও দেখলাম কিছু পাথর আর প্রজাপতি রয়েছে। একটা বুকশেলফে পাশাপাশি রাখা অনেকগুলো একরকম দেখতে বইয়ের দিকে ফেলুদার দৃষ্টি গিয়েছিল, ভদ্রলোক বললেন, ওগুলো ওঁর ডায়রি। চল্লিশ বছর একটানা ডায়রি লিখেছেন উনি। খাটের পাশে টেবিলে একটা ছোট্ট বাঁধানো ছবি দেখে লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, 'আরে, এ যে দেখছি মুকুলানন্দের ছবি।'

মহেশবাবু হেসে বললেন, 'আমার বন্ধু অখিল দিয়েছে ওটা।' তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'তিনটে মহাদেশের শক্তি ওঁর পিছনে।'

'কারেক্ট!' বললেন লালমোহনবাবু, 'বিরাট তান্ত্রিক সাধু। ইন্ডিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা—সর্বত্র ওঁর শিষ্য।'

'আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি,' বললেন মহেশ চৌধুরী, 'আপনিও ওঁর শিষ্য নাকি?'

'আজ্ঞে না, তবে আমার পাড়ায় আছেন একজন।'

দোতলায় থাকতেই একটা গাড়ির শব্দ পেয়েছিলাম, নিচে এসে দেখি, যে-দুজনের কথা মহেশবাবু বলছিলেন, তাঁরা এসে গেছেন। একজন মহেশবাবুরই বয়সী, সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি আর গাঢ় খয়েরি রঙের আলোয়ান গায়ে। ইনি যে উকিল-টুকিল ছিলেন না কোনোদিন সেটা বলে দিতে হয় না, আর সাহেবীয়ানারও কোনো গন্ধ নেই এঁর মধ্যে। অন্য ভদ্রলোককে মনে হল চল্লিশের নিচে বয়স, বেশ হাসিখুশি সপ্রতিভ ভাব, মহেশবাবু আসতেই তাঁকে ঢিপ করে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির হাতে মিষ্টির হাঁড়ি ছিল, সেটা তিনি প্রীতীনবাবুর হাতে চালান দিয়ে মহেশবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আমার কথা যদি শোনতো

পিকনিকের পরিকল্পনাটা বাদ দাও। একে যাত্রা অশুভ, তার উপর বাঘ পালিয়েছে। শার্দুলবাবাজী যদি মুক্তানন্দের শিষ্যটিষ্য হন তাহলে একবার ছিন্নমস্তায় হাজিরা দেওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।'

মহেশবাবু আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই—এই কুঁড়াক-ডাকা ভদ্রলোকটি হলেন আমার অনেকদিনের বন্ধু শ্রীঅখিলবন্ধু চক্রবর্তী, এক্স-স্কুলমাস্টার, জ্যোতিষচর্চা আর আয়ুর্বেদ হচ্ছে এনার হবি ; আর ইনি হলেন শ্রীমান শঙ্করলাল মিশ্র, আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, বলতে পারেন আমার মিসিং পুত্রের স্থান অনেকটা অধিকার করে আছেন।'

সবাই যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখে অখিলবাবু আরেকবার বললেন, 'তাহলে আমার নিষেধ কেউ মানছে না ?'

'না ভাই', বললেন মহেশ চৌধুরী, 'আমি খবর পেয়েছি বাঘের নাম সুলতান, কাজেই সে মুসলমান, তান্ত্রিক নয়।—ভালো কথা, মিঃ মিত্তির যদি সময় পানতো সার্কাসটা একবার দেখে নেবেন। আমাদের ইনভাইট করেছিল পরশু। বৌমা আর বিবিদিদিমণিকে নিয়ে আমি দেখে এসেছি। দিশী সার্কাস যে এত উন্নতি করেছে জানতাম না। আর বাঘের খেলার তো তুলনাই নেই।'

'কিন্তু পরশু নাকি বাঘের খেলায় গোলমাল হয়েছিল ?' প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'সেটা খেলোয়াড়ের কোনো গণ্ডগোলে নয়। জানোয়ারেরও তো মুড বলে একটা জিনিস আছে। সে-তো আর কলের পুতুল না যে চাবি টিপলেই লাফঝাঁপ করবে।'

'কিন্তু সেই মুডের ঠেলা তো এখন সামলানো দায়,' বললেন অরুণবাবু। 'শহরে ত্রোপ্যানিক। ওটাকে এক্ষুনি মেরে ফেলা উচিত। বিলিতি সার্কাস হলে এ জিনিস কক্ষনো হত না।'

মহেশবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—তুমি তো আবার বন্যপশু-সংহার সমিতির সভাপতি কিনা, তোমার হাত তো নিশপিশ করবেই।'

রাজরাপ্পা রওনা হবার আগে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ হল। উনি হলেন প্রীতীনবাবুর স্ত্রী নীলিমা দেবী। এঁকে দেখে বুঝলাম যে চৌধুরী পরিবারের সকলেই বেশ ভালো দেখতে।

॥ ৪ ॥

রাজরাপ্পা হাজারিবাগ থেকে আশি কিলোমিটার। ৪৮ কিলোমিটার গিয়ে রামগড় পড়ে, সেখান থেকে বাঁয়ে রাস্তা ধরে গোলা বলে একটা জায়গা হয়ে

ভেড়া নদী পর্যন্ত গাড়ি যায়। নদী হেঁটে পেরিয়ে খানিকপুর গিয়েই রাজরাপ্পা।

শঙ্করলাল মিশ্রের গাড়ি নেই। তিনি আমাদের গাড়িতেই এলেন। দু'জন বেয়ারাকেও নেওয়া হয়েছে পিকনিকের দলে, তাদের একজন হল বুড়ো নূর মহম্মদ, যে মহেশবাবুর ওকালতির জীবনের শুরু থেকে আছে। অন্য জন হল ষণ্ডা মার্কা জগৎ সিং, যার জিম্মায় রয়েছে অরুণবাবুর বন্দুক আর টোটার বাক্স।

মিঃ মিশ্রকে দেখেই বেশ ভালো লেগেছিল, তার সঙ্গে কথা বলে আরো ভালো লাগল। ভদ্রলোকের জীবনের ঘটনাও শোনবার মতো। শঙ্করলালের বাবা দীনদয়াল মিশ্র ছিলেন মহেশবাবুর দারোয়ান। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে, যখন শঙ্করলালের বয়স চার—দীনদয়াল নাকি একদিন হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। দু'দিন পরে এক কাঠুরে তার মৃতদেহ দেখতে পায় মহেশবাবুর বাড়ি থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে। কোনো জানোয়ারের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দীনদয়াল ওই জঙ্গলে কেন গিয়েছিল সেটা জানা যায়নি। একটা পুরোনো শিবমন্দির আছে সেখানে, কিন্তু দীনদয়াল কোনোদিন সেখানে যেত না।

এই ঘটনার পর থেকে নাকি মহেশবাবুর ভীষণ মায়া পড়ে যায় বাপহারা চার বছরের শিশু শঙ্করলালের উপর। তিনি শঙ্করলালকে মানুষ করার ভার নেন। শঙ্করলালও খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল ; পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, বি এ পাশ করে রাঁচিতে শঙ্কর বুক স্টোর্স নামে একটা বইয়ের দোকান খোলে। হাজারিবাগে ব্রাঞ্চ আছে, দু জায়গাতেই যাতায়াত আছে ভদ্রলোকের।

এই খবরটা শুনে অবিশ্যি লালমোহনবাবু জিগেস করার লোভ সামলাতে পারলেন না এই বইয়ের দোকানে বাংলা বইও পাওয়া যায় কিনা। 'নিশ্চয়ই', বললেন শঙ্করলাল, 'আপনার বইও বিক্রী করেছি আমরা।'

ফেলুদা সব শুনে বলল, 'মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে তাহলে আপনারই বয়সী ছিলেন ?'

'বীরেন্দ্র ছিল আমার চেয়ে কয়েক মাসের ছোট', বললো শঙ্করলাল। 'আমরা দুজন ইস্কুলে এক ক্লাসেই পড়েছি, যদিও কলেজের পড়াটা ওরা তিন ভাইই করেছে কলকাতায় ওদের এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে থেকে। বীরেনের পড়াশুনায় মন ছিল না। সে ছিল বেপরোয়া, রোমান্টিক প্রকৃতির ছেলে। উনিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।'

ফেলুদা বলল, 'মহেশবাবু কি সাধুসংসর্গ-টর্গ করেন নাকি ?'

'আগে করতেন না মোটেই, তবে ওঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি যদিও দেখিনি, তবে শুনেছি এককালে মিলিটারি মেজাজ ছিল, প্রচুর মদ্যপান করতেন। সব ছেড়ে দিয়েছেন।। সাধুসঙ্গ না করলেও, আমার বিশ্বাস আজ

রাজরাপ্পায় পিকনিকের কারণ ছিন্নমস্তার মন্দির।'

'এটা কেন বলছেন?'

'উনি বাইরে বিশেষ প্রকাশ করেন না, কিন্তু আমি এর আগেও কয়েকবার রাজরাপ্পা গিয়েছি ওঁর সঙ্গে। মন্দিরের সামনে এলে ওঁর মুখের ভাব বদলে যায়। এটা লক্ষ করেছি।'

'অতীতে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যার ফলে এটা হওয়া সম্ভব?'

'সেটা আমি বলতে পারব না। ভুলে যাবেন না, আমি ছিলাম ওঁর দারোয়ানের ছেলে।'

সাড়ে দশটা নাগাদ পরপর তিনখানা গাড়ি এসে থামল ভেড়া নদীর ধারে। আমাদের গাড়িটা ছিল সবচেয়ে পিছনে; আমাদের সামনে প্রীতীনবাবুর গাড়ি। তিনিই প্রথমে নামলেন গাড়ি থেকে, হাতে টেপ রেকর্ডার আর নেমেই চলে গেলেন বাঁয়ে জঙ্গলের দিকে। আমরা সবাই নামলাম। মহেশবাবু ছিলেন প্রথম গাড়িতে, তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'তাড়া নেই, নদী পেরোলেই রাজরাপ্পা, সঙ্গে ফ্লাস্কে কফি আছে, একটু রিল্যাক্স করে তবে ওপারে যাত্রা।'

আমরা সবাই নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড়ে নদী, যাকে বলে খরস্রোতা। বর্ষার ঠিক পরে এ নদী পেরোনো নাকি মুশকিল, কারণ তখন জল থাকে হাঁটু অবধি। ছোট বড় মেজ সেজো নানান সাইজের সাদা কালো খয়েরি পাটকিলে ছিটদার সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে, পালিশ করে বাস্তবাগীশ ভেড়া নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজরাপ্পা

নীলিমা দেবী কফি ঢেলে দিলেন কাগজের কাপে, আমরা সবাই একে একে গিয়ে নিয়ে নিলাম। প্রীতীনবাবুকে বোধহয় নদীর শব্দ বাঁচিয়ে পাখির ডাক রেকর্ড করতে হবে বলে বনের একটু ভিতর দিকে যেতে হয়েছে। পাখি যে ডাকছে নানারকম সেটা ঠিকই।

এখানে এসে নতুন যাদের সঙ্গে আলাপ হল, ফেলুদার কায়দায় তাদের একটু স্টাডি করার চেষ্টা করলাম।

বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, সে তার ডলটাকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল, 'চুপটি করে বসে থাক। দুষ্টুমি করলেই ভেড়া নদীতে ফেলে দেব, তখন দেখবে মজা।'

অরুণবাবু হাত থেকে কাগজের কাপ ফেলে দিয়ে একটু দূরে একটা ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হলেন, আর তার পরেই ঝোপের মাথার উপর ধোঁয়া দেখে বুঝলাম এই বয়সেও ভদ্রলোক বাপের সামনে সিগারেট খান না।

মহেশ চৌধুরী হাত দুটো পিছনে জড়ো করে নদীর কাছেই দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে আছেন।

ফেলুদা দুটো পাথর ঠোকাঠুকি করে সেগুলো চকমকি কিনা পরীক্ষা করছিল, অখিলবাবু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার রাশিটা কি জানা আছে?' ফেলুদা বলল, 'কুম্ভ। সেটা গোয়েন্দার পক্ষে ভালো না খারাপ?'

নীলিমা দেবী মাটি থেকে একটা বুনো হলদে ফুল তুলে সেটা খোঁপায় গুঁজে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে কী একটা বলায় লালমোহনবাবু মাথাটা পিছনে হেলিয়ে স্মার্টলি হাসতে গিয়ে এক পায়ে বাঁয়ে সরে গেলেন, আর নীলিমা দেবী খোলা হাসি হেসে বললেন, 'সে কী, আপনি গিরগিটি দেখে ভয় পাচ্ছেন?'

শঙ্করলালকে খুঁজতে গিয়ে দেখি উনি ইতিমধ্যে কখন জানি নদী পেরিয়ে গিয়ে ওপারে একজন গেরুয়াধারী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। একটা বাসে কিছু যাত্রী এসেছিল, তারা কিছুক্ষণ আগেই নদী পেরিয়েছে সেটা দেখেছিলাম।

কফি খাওয়া শেষ, প্রীতীনবাবুও এসে গেছেন, তাই আমরা ওপারে যাবার জন্য তৈরি হলাম। ধুতি, শাড়ি, প্যান্ট সবই একটু ওপরদিকে উঠে গেল, বিবি চড়ে বসল বুড়ো নূর মহম্মদের পিঠে, লালমোহনবাবু জলে নামবার আগে মনে হল চোখ বুজে কী জানি বিড়বিড় করে নিলেন, পেরোবার সময় বার তিনেক বেসামাল হতে হতে সামলে নিলেন, আর ওপারে পৌঁছিয়েই বললেন ব্যাপারটা যে এত সহজ সেটা উনি ভাবতেই পারেননি।

বাকি পথটার দু পাশে গাছপালা ছিল, যদিও সেটাকে জঙ্গল বলা চলে না। তাও লালমোহনবাবু সেদিকে বারবার আড়চোখে চাওয়াতে বুঝলাম উনি বাঘের কথা ভোলেননি।

একটা মোড় ঘুরতেই থিয়েটারের পর্দা সরে যাওয়ার মতো চোখের সামনে রাজরপ্পা বেরিয়ে পড়াতে লালমোহনবাবু এত জোরে বাঃ বললেন যে পাশের গাছ থেকে একসঙ্গে দুটো ঘুঘু উড়ে পালাল।

অবিশ্যি বাঃ বলার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে দুটো নদীই দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে উত্তরে ভেড়া, আর ডাইনে নিচে দামোদর। জলপ্রপাতের জায়গাটা দেখতে হলে আরো এগিয়ে বাঁয়ে যেতে হবে, যদিও শব্দটা এখান থেকেই পাচ্ছি। সামনে আর নদীর ওপারে বিশাল বিশাল কচ্ছপের পিঠের মতো পাথর, দূরে বন, আর আরো দূরে আবছা পাহাড়ের লাইন।

মন্দির আমাদের বাঁয়ে বিশ হাতের মধ্যে। বোঝাই যায় অনেকদিনের পুরানো, কিন্তু সেটাকে আবার নতুন করে সাজগোজ পরানো হয়েছে। এই ক'দিন আগেই কালীপুজোতে এখানে মোষ বলি হয়েছে বলে শুনলাম। লালমোহনবাবু বললেন এককালে নির্ঘাত নরবলি হত। অবিশ্যি সেটা যে খুব ভুল বলেছেন তা হয়ত না।

বাসে যেসব যাত্রী এসেছে তাদের দৃশ্য দেখার উৎসাহ নেই, তারা সবাই মন্দিরের সামনে জড়ো হয়েছে। শঙ্করলাল ঠিকই বলেছিলেন। মহেশ চৌধুরী প্রায় মিনিট খানেক ধরে মন্দিরের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন, যদিও অন্ধকারে বিগ্রহটা দেখাই যায় না। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন অন্যরা যেদিকে গেছে সেইদিকে। আমরা তিনজনও সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম।

খানিকটা যেতেই ফলসটা দেখতে পেলাম। যেখানে বালির উপর শতরঞ্চি পাতা হচ্ছে সেখান থেকে ওটা দেখা যাবে। লালমোহনবাবু বললেন, 'এটা কিন্তু ফাউ হয়ে গেল মশাই। হাজারিবাগ এসে সেকেন্ড দিনেই একজন রিটায়ার্ড অ্যাডভোকেটের জন্মদিনে পিকনিকে ইনভাইটেড হবেন, এটা কি ভাবতে পেরেছিলেন?'

'এ তো সবে শুরু', বলল ফেলুদা।

'বলছেন?'

'দাবা খেলেছেন কখনো?'

'রক্ষে করুন মশাই।'

'তাহলে ব্যাপারটা বুঝতেন। দাবার শেষ দিকে যখন দু'পক্ষের পাঁচটি কি সাতটি ঘুঁটি বোর্ডের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন অনড় অবস্থাতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলতে থাকে। যারা খেলছে তারা তাদের প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে ব্যাপারটা অনুভব করে। এই চৌধুরী পরিবারটিকে দেখে আমার দাবার ঘুঁটির কথা মনে হচ্ছে, যদিও কে সাদা কে কালো, কে রাজা কে মন্ত্রী, তা এখনো বুঝিনি।'

আমরা মন্দির আর পিকনিকের জায়গার মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটা অশ্বত্থগাছের তলায় পাথরের উপর বসলাম। এগারোটাও বাজেনি এখনো, খাবার তাড়া নেই, সবাইয়ের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত ঢিলেঢালা ভাব। অখিলবাবু বালিতে উবু হয়ে বসে বিবিকে হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছেন; নীলিমা দেবী শতরঞ্চিতে বসে তাঁর ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ইংরিজি পেপারব্যাক বার করলেন, সেটা নির্ঘাত ডিটেকটিভ বই; প্রীতীনবাবু একটি ঢিবির উপর বসে তাঁর টেপ রেকর্ডারে একটা নতুন ক্যাসেট ভরলেন; অরুণবাবু জগৎ সিংয়ের কাছ থেকে তাঁর বন্দুকটা নিলেন, মহেশবাবু মাটি থেকে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সেটা নেড়েচেড়ে দেখে আবার ফেলে দিলেন। 'শঙ্করলালকে দেখছি না', বললেন লালমোহনবাবু।

'আছেন, তবে দূরে', বলল ফেলুদা।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম মন্দির ছাড়িয়ে আরো বেশ কিছুটা দক্ষিণে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শঙ্করলাল কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই গেরুয়াধারীটির

সঙ্গে কথা বলছেন। 'একটু যেন সাসপিশাস বলে মনে হচ্ছে', মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদারও সাসপিশাস মনে হচ্ছে কিনা সেটা জানবার আগেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন অরুণবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। 'ওটা দিয়ে কি বাঘ মারা যায়?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'সার্কাসের বাঘ এতদূর আসবে না', হেসে বললেন অরুণবাবু। 'সাম্বর মেরেছি এটা দিয়ে, তবে সাধারণত পাখিটাখিই মারি। এটা টোয়েন্টি-টু।'

'তাই তো দেখছি।'

'আপনি শিকার করেন?'

'শুধু মানুষ।'

'আপনার কি কোনো এজেন্সি আছে নাকি? না প্রাইভেট?'

ফেলুদা তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লেখা একটা কার্ড অরুণবাবুকে দিয়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন, 'থ্যাঙ্কস। কখন কাজে লেগে যায় বলা তো যায় না।'

ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেইদিকেই চলে গেলেন। ফেলুদা এই ফাঁকে কখন যে সেই সকালের কাগজটা পকেট থেকে বের করেছে সেটা দেখতেই পাইনি। লালমোহনবাবু কাগজটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'বাঙলা নামের কথা কী বলছিলেন মশাই?'

'এই দেখুন।'

ফেলুদা পাশাপাশি লেখা চারটে ইংরিজি অক্ষরের দিকে দেখাল। লালমোহনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ওটা তো মনে হচ্ছে লক্ লিখতে গিয়ে বানান ভুল করে LOKC লিখেছে।'

'এলোকেশী!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। এরকম ভাবে ইংরিজি অক্ষরে বাঙলা কথা আমিও লিখেছি ছেলেবেলায়।

'বাঃ', বললেন লালমোহনবাবু, 'সত্যিই তো। আর এই জাপানী নামটা?'

'ওকাহা? এটা একটা বাংলা সেনটেন্স। OKAHA।'

'ও, কে, এ, এইচ, এ? এটা একটা বাংলা সেনটেন্স? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'ও, কে, এ, এইচ, এ—এটা তাড়াতাড়ি বলুন তো, না থেমে। দেখুন তো কী রকম শোনায়।'

এবার লালমোহনবাবুর মুখে একটা বিস্ময় আর খুশি মেশানো ভাব দেখা দিল। 'ও কে এয়েচে! ওয়াণ্ডারফুল!...বাঃ, বাঃ, এইত, জলের মতো সোজা—SO—এসো; DO—দিও; NADO—এনে দিও; NHE—এনেচি।—ও বাবা! এটা যে বিরাট সেনটেন্স; এর তো শেষ নেই

মশাই !—AKLO ATBB BBSO ADK SO RO ADK SO AT KLO PC LO ROT OT DD OK OJT RO OG এ আমার সাধ্যি নেই।'

'ধৈর্য নেই বলুন। তোপসে পড়। পাংচুয়েট করে নিলে জলের মতো সোজা।'

খুব বেশি না ঠেকেই পড়ে গেলাম আমি।—

'এ কে এল ? এটি বিবি। বিবি এস। এদিকে এস। আরো এদিকে এস। এটি কে এল ? পিসি এল। আর ওটি ? ওটি দিদি। ও কে ? ও জেঠি। আর ও ? ও ঝি।'

'ওটা কোথায় পেলেন আপনারা ?' মহেশবাবু হাসিমুখে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন।

'আপনার বাগানের ধারে পড়ে ছিল,' বলল ফেলুদা।

'বিবিদিদিমণির সঙ্গে একটু খেলা করছিলাম আর কী।'

'সেটা আন্দাজ করেছি', বলল ফেলুদা। আমরা তিনজনেই উঠতে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোক বাধা দিয়ে আমাদের পাশেই পাথরের উপর বসে পড়লেন।

'আরেকটি কাগজ দেখাব আপনাদের।'

মহেশবাবুর মুখে আর হাসি নেই। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তার ভিতর থেকে একটা পুরানো ভাঁজ করা পোস্টকার্ড বার করলেন।—'আমার দ্বিতীয় পুত্রের শেষ পোস্টকার্ড।'

ফেলুদা পোস্টকার্ডটা নিয়ে ভাঁজ খুলল। একদিকে রঙিন ছবি। লেক সমেত জুরিখ শহরের দৃশ্য। উল্টোদিকে শুধুই নাম ঠিকানা দেখে আমরা সকলেই বেশ অবাক।

মহেশবাবু বললেন, 'শেষের দিকে ও তাই করত। শুধু জানান দিয়ে দিত কোথায় আছে। আগেও দু'এক লাইনের বেশি লেখেনি কখনো।'

ভদ্রলোক ফেলুদার হাত থেকে পোস্টকার্ডটা নিয়ে আবার ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'বীরেনবাবু বিলেতে কী করতেন সেটা জানতে পেরেছিলেন ?'

মহেশবাবু মাথা নাড়লেন। মামুলি চাকরি করার ছেলে ছিল না বীরেন। সে ছিল যাকে বলে রেবেল। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। গতানুগতিকের একেবারে বাইরে। তার আবার একটি হিরো ছিল। বাঙালী হিরো। একশো বছর আগে তিনিও নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত যান। তারপর শেষ পর্যন্ত ব্রেজিল না মেক্সিকো কোথায় গিয়ে আর্মিতে ঢুকে কর্নেল হয়ে সেখানকার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখান।'

'সুরেশ বিশ্বাস কি ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল। লালমোহনবাবুরও চোখ চকচক করে উঠেছে। বললেন, 'ইয়েস ইয়েস, সুরেশ বিশ্বাস। ব্রেজিলে মারা যান

ভদ্রলোক। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস।'

মহেশবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছেন। ওই নাম। কোত্থেকে তার একটা জীবনী জোগাড় করেছিল, আর সেটা পড়েই ওর অ্যাডভেঞ্চারের শখ হয়। আমি বাধা দিইনি। জানতাম দিলে কোনো ফল হবে না। উধাও হয়ে গেল। তারপর মাস দুয়েক পরে এল ইউরোপ থেকে এক চিঠি। হল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া...কী করছে কিছু বলে না, শুধু জানিয়ে দেয় সে আছে। চলে গেছে বলে যেমন দুঃখ হত, তেমনি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে বলে গর্বও হত। তারপর সিক্সটি সেভনের পর আর চিঠি নেই।'

মহেশবাবু কিছুক্ষণ উদাস চোখে দূরের গাছপালার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'সে আর আমার কাছে আসবে না। এত সুখ আমার কপালে নেই। আমার উপরে যে অভিশাপ লেগেছে!'

'সে কি হে, তুমি আবার অভিশাপ-টভিশাপে বিশ্বাস কর নাকি?'—অখিলবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। মহেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি আমার কোষ্ঠীই বিচার করেছ অখিল, মানুষটাকে বিচার করনি।'

'ওইখানেই তো ভুল', বললেন অখিলবাবু, 'মানুষের কুষ্ঠী, মানুষের রাশি গ্রহ লগ্ন—এ সবের থেকে তো আলাদা নয় মানুষ। তোমায় বলেছিলুম সেই ফর্টিটুতে, যে তোমার জীবনে একটা বড় চেঞ্জ আসছে—মনে আছে তোমার?—শুনুন মশাই—' ফেলুদার দিকে ফিরলেন অখিলবাবু—'এই যে দেখছেন এঁকে, এখন দেখলে বুঝতে পারবেন কি যে ইনি এককালে রাঁচি টু নেতারহাট যাবার পথে এঁর একটি পুরানো ফোর্ড গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় তার উপর রাগ করে সেটাকে পাহাড় থেকে হাজার ফুট নিচে ফেলে দিয়েছিলেন?'

মহেশবাবু উঠে পড়েছিলেন। বললেন, 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায় সেটা বলে দিতে কি জ্যোতিষীর দরকার হয়?'

কথাটা বলে মহেশবাবু উত্তরদিকে চলে গেলেন, বোধহয় পাথরের সন্ধানে। অখিলবাবু বসলেন তাঁর জায়গায়। গল্প বলার মুডে ছিলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'আশ্চর্য লোক এই মহেশ। আমি ওঁর পড়শী ছিলাম। যদিও অন্য দিক দিয়ে ব্যবধান বিস্তর। আমি শিক্ষক, আর ও উদীয়মান অ্যাডভোকেট। ওর ছেলেদের টিউশনি করেছি কিছুদিন, সেই থেকে আলাপ। অ্যালোপ্যাথিতে আস্থা ছিল না, তাই অসুখ-টসুখ করলে মাঝে মাঝে শিকড় বাকল চেয়ে নিত আমার কাছে। সামাজিক ব্যবধানটা কোনোদিন বুঝতে দিত না। আমার ছেলেকেও নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করত। কোনো সবারি ছিল না।'

'আপনার ছেলে কী করে?'

'কে, অধীর? অধীর ইঞ্জিনিয়ার। বোকারোয় আছে। খড়্গপুরে পাশ করে

ডুসেলডর্ফে চাকরি নিয়ে চলে গেসল। বিলেতেই ছিল বছর দশেক, তারপর—'

একটা বিস্ফোরণের শব্দ অখিলবাবুর কথা থামিয়ে দিল। 'বন্দুক!'—চেঁচিয়ে উঠল বিবি—'জেঠু পাখি মেরেছে! আমরা রাত্তিরে তিত্তিরের মাংস খাব!'

'দেখি মহেশ আবার কোথায় গেল।' অখিলবাবু যেন কিছুটা চিন্তিত ভাবেই উঠে পড়লেন। 'পাথর খুঁজতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে-উড়ে গেলে কেলেঙ্কারি...'

'পিকনিক বলে মনেই হচ্ছে না।' প্রীতীনবাবুর স্ত্রী হাতের বইটা বন্ধ করে শতরঞ্চির উপর রেখে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'সবাই এমন ছড়িয়ে আছে কেন বলুন তো?'

'খিদে পেলেই সুড়সুড় করে এসে হাজির হবে,' বলল ফেলুদা।

'কিছু খেললে হত না?'

'তাস?' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমি কিন্তু স্ক্রু ছাড়া আর কিছু জানি না।'

'তাও আবার তিনে,' বলল ফেলুদা।

'তাস তো আনিনি সঙ্গে,' বললেন নীলিমা দেবী। 'এমনি মুখে মুখে কিছু খেলা যেতে পারে।'

'জল-মাটি-আকাশ হলে লালমোহনবাবু যোগ দিতে পারেন,' বলল ফেলুদা।

'সেটা আবার কী মশাই?'

'খুব সহজ,' বললেন নীলিমা দেবী, 'ধরুন, আপনার দিকে তাকিয়ে আমি জল, মাটি, আকাশ এই তিনটের যে কোনো একটা বলে দশ গুনতে শুরু করব। জল বললে জলের, মাটি বললে মাটির, আর আকাশ বললে আকাশের একটা প্রাণীর নাম করতে হবে আপনাকে ওই দশ গোনার মধ্যে।'

'এটা খুব কঠিন খেলা বুঝি?'

'খেলে দেখুন একবার। আমি আপনাকেই প্রশ্ন করছি।'

'বেশ। রেডি।' লালমোহনবাবু দম নিয়ে সোজা হয়ে যোগাসনে বসলেন। নীলিমা দেবী ভদ্রলোকের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—

'আকাশ! এক দুই তিন চার পাঁচ—'

'এ্-এ্-এ্—'

'ছয় সাত আট নয়—'

'বেঙুর!'

ফেলুদা অবিশ্যি জানতে চাইল বেঙুরটা কোন গ্রহের আকাশে চরে বেড়ায়। তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে ব্যাঙ, হাঙর আর বেলুন—এই তিনটে তিনি ভেবে রেখেছিলেন, বলার সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে। তাতে ফেলুদা বলল যে বেলুনকে প্রাণী বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু লালমোহনবাবু

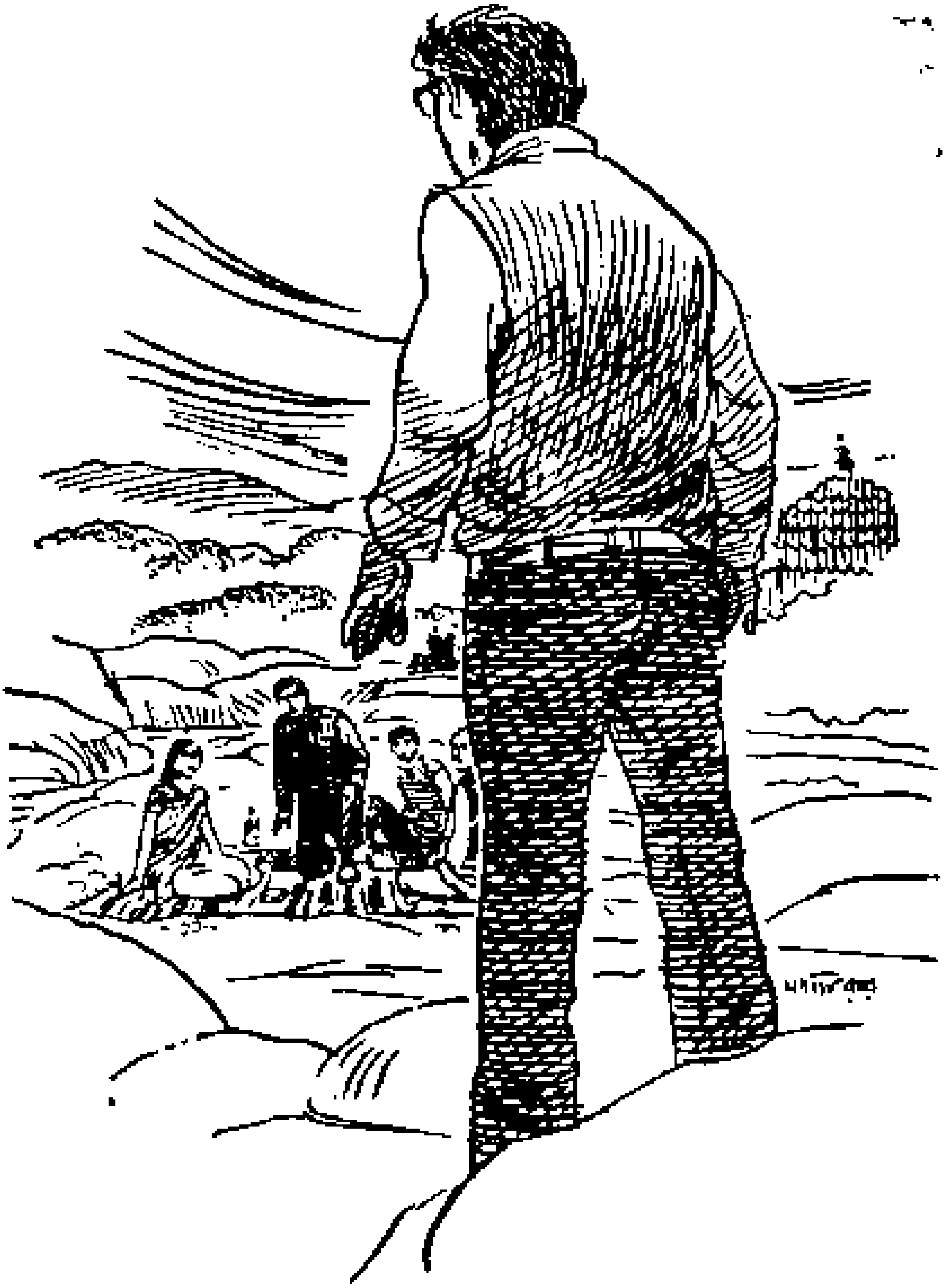

কথাটা মানতে চাইলেন না। বললেন, 'বেলুনে অক্সিজেন লাগে, প্রাণীরও অক্সিজেন ছাড়া চলে না, সুতরাং প্রাণী বলব না কেন মশাই ?' ফেলুদা বলল যে সে হাওয়া, হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের বেলুনের কথা শুনেছে, এমনকি কয়লার গ্যাসের বেলুনের কথাও শুনেছে, কিন্তু অক্সিজেন বেলুনের কথা এই প্রথম শুনল।

নীলিমা দেবী তর্ক থামানোর জন্য হাত তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে তর্ক আপনিই থেমে গেল।

প্রীতীন্দ্রবাবু।

মানুষে একসঙ্গে দুঃখ আর আতঙ্ক অনুভব করলে তার কীরকম ভাবভঙ্গী হতে পারে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির করা তার একটা ড্রইং ফেলুদা একবার আমাকে দেখিয়েছিল। প্রীতীনবাবুর চেহারা অবিকল সেই ছবির মতো।

ভদ্রলোক একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন।

নীলিমা দেবী ছুটে গেলেন স্বামীর দিকে, যদিও ফেলুদা তার আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথা বেরোতে বেশ সময় লাগল

'বা—বা—বাবা !' বললেন প্রীতীনবাবু, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা পিছন দিকে নির্দেশ করল।

॥ ৫ ॥

মহেশবাবুকে যখন বাড়িতে আনা হয় তখন প্রায় আড়াইটা। তখনও জ্ঞান হয়নি ভদ্রলোকের। মাথায় চোট লেগেছে, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সটান পড়েছিলেন মাটিতে। ডাক্তার বলছেন হার্ট অ্যাটাক। ভদ্রলোকের হার্ট এমনিতেই দুর্বল ছিল, তার উপর এই বয়সে হঠাৎ কোনো কারণে শক্ পেলে এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মোট কথা, তাঁর অবস্থা ভালো নয়, সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না।

যেখানটায় আমরা চা খেতে বসেছিলাম, তার উত্তরে খানিকটা দূরে একটা বেশ বড় পাথরের পিছনে একটা খোলা জায়গায় মহেশবাবুকে পাওয়া যায়। এটা কোনোদিন ভুলব না যে আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন তার কাছেই দুটো হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছিল। প্রীতীনবাবু পাহাড় বেয়ে উপর দিকের জঙ্গলে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে কিছুদূর নেমে এসে একটা ঝোপ পেরিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখেন মহেশবাবু পড়ে আছেন মাটিতে। তিনি ভেবেছিলেন ভদ্রলোক মারাই গেছেন, তাই ওরকম চেহারা করে এসেছিলেন খবর দিতে। ফেলুদা গিয়েই

মহেশবাবুর নাড়ী ধরে বলল তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর মাথাটা পড়েছিল একটা থান ইটের সাইজের পাথরের উপর, তার ফলে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল পাথর আর বালির উপর।

আমরা মহেশবাবুর কাছে পৌঁছানোর মিনিটখানেক পরে প্রথম এলেন অরুণবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। তারপর এলেন অখিলবাবু। সব শেষে এলেন শঙ্করলাল মিশ্র। শেষের ভদ্রলোকটিকে যেরকম ভেঙে পড়তে দেখলাম, তাতে বুঝলাম মহেশবাবুর প্রতি তাঁর টান কত গভীর।

এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে মহেশবাবুকে তুলে ভেড়া নদী পেরিয়ে হাজারিবাগ নিয়ে আসা অসম্ভব, তাই ভদ্রলোকের দুই ছেলে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন শহরে। ডাক্তার আর অ্যাম্বুলান্স নিয়ে আসতে লাগল প্রায় আড়াই ঘণ্টা, কৈলাসে পৌঁছতে আরো এক ঘণ্টা। আমরা কিছুক্ষণ কৈলাসেই রয়ে গেলাম। পিকনিক আর হয়নি, তাই কারুর খাওয়া হয়নি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই প্রীতীনবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্য পরোটা, আলুরদম, মাংসের কাবাব ইত্যাদি এনে দিলেন। আশ্চর্য শক্ত বলতে হবে ভদ্রমহিলা। বিবি অবিশ্যি ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না, বলছে দাদু মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। আমরা বৈঠকখানাতেই বসেছিলাম, অরুণবাবু ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন বাপের ঘরে, প্রীতীনবাবু মাঝে মাঝে এসে ভদ্রতার খাতিরে আমাদের সঙ্গে দু একটা কথা বলে যাচ্ছিলেন। শঙ্করলাল নির্বাক, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি একবারও মুখ খোলেননি। অখিলবাবুর মুখে একটাই কথা—'এত করে বললাম, তাও কথা শুনল না। আমি জানতাম আজ একটা কিছু অঘটন ঘটবে।'

চারটে নাগাদ আমরা উঠে পড়লাম। প্রীতীনবাবু ছিলেন, তাঁকে বললাম কাল এসে খবর নিয়ে যাব কেমন থাকেন মহেশবাবু।

বাড়ি ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসলাম তিনজন। একদিনে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলে মাথাটা কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করে, আমার সেই অবস্থা। ফেলুদা কথা বলছে না, তার মানে তার ভাবনা চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে ফেলছে। আমি জানি ও এখন বেশি কথা বলা পছন্দ করে না, তাও একটা জিনিস না বলে পারলাম না।

'আচ্ছা ফেলুদা, ডাক্তার বলেছেন একটা শক্ পেলে এরকম হতে পারে, কিন্তু রাজরাপ্পাতে কী শক্ পেতে পারেন মহেশবাবু?'

'গুড কোয়েশ্চেন,' বলল ফেলুদা, 'আজকের ঘটনার ওই একটা ব্যাপারই আমার কাছে অর্থপূর্ণ। অবিশ্যি শক্ পেয়েছেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এখনো।'

'সেটা ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে,' বললেন

লালমোহনবাবু।

'উঠবেন কি সুস্থ হয়ে?'

মহেশবাবু সম্বন্ধে ফেলুদার মনে যে কৌতূহলের ভাব জেগে উঠেছে, সেটা আজ কৈলাসের বৈঠকখানায় বসেই বুঝতে পারছিলাম। বেশির ভাগ সময়টাই ও ঘরের জিনিসপত্র, আলমারির বই, এই সব দেখে কাটিয়েছে। ভাবটা যে তদন্ত করছে তা নয়, বেশ ঢিলেঢালা, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে ও সব কিছু মনে মনে নোট করে নিচ্ছে। সেই ফ্যামিলি গ্রুপটা ও হাতে তুলে নিয়ে দেখল প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে।

আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ খেয়াল হল যে আজ ম্যাজেস্টিক সার্কাসের বাঘটার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। অবিশ্যি ধরা পড়লে নিশ্চয়ই জানা যেত। অন্তত বুলাকিপ্রসাদ নিশ্চয়ই জানাত।

ঠাণ্ডাটা পড়েছে, লালমোহনবাবু তাই মাঙ্কিক্যাপটা আরো টেনে নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'সিগ্‌নিফিক্যান্ট ব্যাপার।'

ভদ্রলোক বোধহয় ভেবেছিলেন আমরা দুজনেই জিগ্যেস করব ব্যাপারটা কী; সেটা না করাতে শেষে নিজেই বললেন, 'যে সময়টা ঘটনাটা ঘটল, তখন কিন্তু মিসেস প্রীতীন আর খুকী ছাড়া আর কে কী করছিল তা আমরা কেউই জানি না।'

'কেন জানব না,' বলল ফেলুদা। 'অরুণবাবু পাখি মারার চেষ্টা করছিলেন, প্রীতীনবাবু পাখির ডাক রেকর্ড করছিলেন, অখিলবাবু মহেশবাবুকে খুঁজছিলেন, শঙ্করলাল তাঁর সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন, আর বেয়ারা দু'জন আমাদের বিশ হাত দূরে শিমুল গাছের তলায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল।'

'বেয়ারাদের তো আমিও দেখেছি মশাই, কিন্তু আর সবাই সত্যি কথা বলছে কিনা সেটা জানছেন কী করে?'

'যাঁদের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ তাঁদের আচরণ সম্বন্ধে এত চট করে সন্দেহ প্রকাশ করতে আমি রাজি নই।'

'তা বটে, তা বটে।'

ডিনারের মাঝখানে লালমোহনবাবু হঠাৎ একটা নতুন কথা ব্যবহার করলেন—'সুপার-কেলেঙ্কারি'। এটাও বলা দরকার যে কথাটা বলার সময় তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছ'ইঞ্চি লাফিয়ে উঠেছিলেন। ফেলুদা স্বভাবতই জিগ্যেস করল ব্যাপারটা কী।

'আরে মশাই, একটা জরুরী কথাই বলা হয়নি। সাংঘাতিক ক্লু। যেখানে ডেড্‌বডি—থুড়ি, মহেশবাবু পড়েছিলেন, তার একপাশে পায়ে কী জানি ঠেকতে চেয়ে দেখি প্রীতীনবাবুর টেপ রেকর্ডার।'

'সেটা এনেছেন সঙ্গে?'

'ভাবলুম পরে তুলব, তুলে ভদ্রলোককে দেব, তা তখন যা অবস্থা····ফেরার সময় দেখি সেটা আর নেই।'

'প্রীতীনবাবু তুলে নিয়েছিলেন বোধহয়।'

'দূর মশাই, প্রীতীনবাবু এই দিকটাতেই যেসেননি ; তাছাড়া জিনিসটা পড়েছিল একটা ঝোপড়ার মধ্যে ; পায়ে না ঠেকলে চোখেই পড়ত না।'

ফেলুদা ব্যাপারটা নিয়ে কী যেন মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা টেলিফোন এল।

অরুণবাবু।

ফেলুদা দু একটা কথা বলেই ফোনটা রেখে বলল, 'কৈলাস চল। মহেশবাবুর জ্ঞান হয়েছে। আমার নাম করছেন।'

গাড়িতে কৈলাস যেতে লাগল এক মিনিট।

মহেশবাবুর ঘরে সকলেই রয়েছেন, এক বিবি ছাড়া। ভদ্রলোকের মাথায় ব্যান্ডেজ, চোখ আধবোজা, হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করা। ফেলুদাকে দেখে মুখে যে হাসিটা দেখা দিল সেটা প্রায় চোখে ধরাই পড়ে না। তারপর তাঁর ডান হাতটা উঠে তর্জনীটা সোজা হল।

'কা কা···'

'একটা কাজের কথা বলছেন কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

ভদ্রলোকের মাথাটা সামান্য নড়ে উঠল হ্যাঁ-য়ের ভঙ্গিতে। তারপর তর্জনীর পাশে মাঝের আঙুলটাও উঠে দাঁড়াল। একের জায়গায় দুই।

'উই····উই···'

এইটুকু বলে দুটো আঙুল আবার ভাঁজ হয়ে গিয়ে সেই জায়গায় বুড়ো আঙুলটা সোজা হয়ে উঠে এদিক ওদিক নড়ল।

তারপর ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে ঘাড়টা ডানদিকে ঘোরালেন। ওদিকে বেডসাইড টেবিল। তার উপর মুক্তানন্দের ছবি।

ছবির দিকে হাতটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে অরুণবাবু ছবিটা বাপের দিকে এগিয়ে দিলেন। মহেশবাবু সেটা নিজে না নিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। অরুণবাবু ছবিটা ফেলুদাকে দেবার পর মহেশবাবু আবার দু আঙুল দেখালেন। কী যেন একটা বলতেও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন না।

এর পরে আর কোনো কথা বলতে পারেননি মহেশ চৌধুরী।

॥ ৬ ॥

তিন মহাদেশের শক্তি যাঁর পিছনে, সেই মুক্তানন্দের ফ্রেমে বাঁধানো পাসপোর্ট সাইজের ছবি এখন আমাদের ঘরে। আমরা চলে আসার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মহেশবাবু মারা যান। যাবার আগে ফেলুদার উপর যে তিনি কী দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সেটা ফেলুদা বুঝলেও, আমি বুঝিনি। আর লালমোহনবাবুও নিশ্চয়ই বোঝেননি, কারণ উনি বললেন মহেশবাবু নাকি ফেলুদাকে মুক্তানন্দের শিষ্য হতে বলে গেছেন। ফেলুদা যখন জিগ্যেস করল যে ছবিটা দেবার পরে দুটো আঙুল দেখানোর মানে কী, তখন লালমোহনবাবু বললেন মুক্তানন্দের শিষ্য হলে ফেলুদার শক্তি ডবল হয়ে যাবে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। 'অবিশ্যি কাঁচকলা দেখালেন কেন সেটা বোঝা গেল না।' স্বীকার করলেন লালমোহনবাবু।

পরদিন সকালে অখিলবাবুর টেলিফোনে আমরা মৃত্যুসংবাদটা পেলাম।

এগারোটা নাগাদ শ্মশান থেকে ফেরার পথে লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কৈলাসে যাবেন, না বাড়ি যাবেন?' ফেলুদা বলল, 'এবেলা ওদিকটা না মাড়ানোই ভালো: অনেকে সমবেদনা জানাতে আসবে, কাজ হবে না কিছুই।'

'কী কাজের কথা বলছেন?'

'তথ্য সংগ্রহ।'

দুপুরে খাবার পর বারান্দায় বসে ফেলুদা ওর সবুজ খাতায় কিছু নোট লিখল। সেটা শেষ হলে পর এইরকম দাঁড়াল—

১। মহেশ চৌধুরী—জন্ম ২৩শে নভেম্বর ১৯০৭, মৃত্যু ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৭ (স্বাভাবিক হার্ট অ্যাটাক? শক?)। হেঁয়ালিপ্রিয়। ডাকটিকিট, প্রজাপতি, পাথর। নেপালবাবুর দেওয়া মূল্যবান স্ট্যাম্প অ্যালবাম লোপাট (how?) মেজো ছেলের প্রতি টান। অন্য দুটির প্রতি মনোভাব কেমন? শঙ্করলালের প্রতি অপত্য স্নেহ। স্বভাবি ছিল না। অতীতে মেজাজী, মদ্যপ। শেষ বয়সে সাত্ত্বিক, সদাশয়। অভিশাপ কেন?

২। ঐ স্ত্রী—মৃতা। কবে?

৩। ঐ বড় ছেলে অরুণেন্দ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৬। অভ্র ব্যবসায়ী। কলকাতা-হাজারিবাগ যাতায়াত। মৃগয়াপ্রিয়। স্বল্পভাষী।

৪। ঐ মেজো ছেলে বীরেন্দ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯। 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ'। ১৯ বছর বয়সে দেশ-ছাড়া। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের ভক্ত। বাপকে বিদেশ থেকে চিঠি লিখত '৬৭ পর্যন্ত। জীবিত? মৃত? বাপের ধারণা সে ফিরে এসেছে?

৫। ছোট ছেলে প্রীতীন্দ্র—অরুণের সঙ্গে ব্যবধান অন্তত ৯-১০ বছর (ভিভি ; ফ্যামিলি গ্রুপ)। অর্থাৎ জন্ম (আন্দাজ) ১৯৪৫। ইলেকট্রনিকস। পাখির গান। মিশুকে নয়। কথা বললে বেশি বলে, নিজের বিষয়। টেপ রেকর্ডার ফেলে এসেছিল রাজরাপ্পায়।

৬। প্রীতীনের স্ত্রী নীলিমা—বয়স ২৫/২৬। সহজ, সপ্রতিভ।

৭। অখিল চক্রবর্তী—বয়স আন্দাজ ৭০। এক্স-স্কুলমাস্টার। মহেশের বন্ধু। ভাগ্য গণনা, আয়ুর্বেদ।

৮। শঙ্করলাল মিশ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯। বীরেনের সমবয়সী। মহেশের দারোয়ান দীনদয়ালের ছেলে দীনদয়ালের মৃত্যু ১৯৪৩। প্রশ্ন—জঙ্গলে গিয়েছিল কেন ? শঙ্করকে মানুষ করেন মহেশ। বর্তমানে বইয়ের দোকানের মালিক। মহেশের মৃত্যুতে মুহ্যমান।

৯। নূর মহম্মদ—বয়স ৭০-৮০। চল্লিশ বছরের উপর মহেশের বেয়ারা।

ফেলুদা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। দুপুরে খাওয়ার পর কৈলাসে গিয়ে শুনলাম সকালে অনেকেই এসেছিলেন, কিন্তু একটা নাগাদ সবাই চলে গেছেন। বৈঠকখানায় মহেশবাবুর দুই ছেলে আর অখিলবাবু ছিলেন, আমরা সেখানেই বসলাম। প্রীতীনবাবুর অস্থির ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেছে ; একটা আলাদা সোফার এক কোণে বসে খালি হাত কচলাচ্ছেন। অখিলবাবু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর মাথা নাড়ছেন। অরুণবাবু যথারীতি গম্ভীর ও শান্ত। ফেলুদা তাঁকেই প্রশ্নটা করল।

'আপনারা কি কিছুদিন আছেন ?'

'কেন বলুন তো ?'

'আপনাদের একটু সাহায্যের দরকার। মহেশবাবু একটা কাজের ভার দিয়ে গেছেন আমাকে, কী কাজ সেটা অবিশ্যি স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। আমি প্রথমে জানতে চাই—উনি কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা আপনারা কেউ বুঝেছেন কিনা।'

অরুণবাবু একটু হেসে বললেন, 'বাবার সুস্থ অবস্থাতেই তাঁর অনেক সংকেত আমাদের বুঝতে বেশ অসুবিধা হত। রাশভারী লোক হলেও ওঁর মধ্যে একটা ছেলেমানুষী দিক ছিল সেটার কিছুটা আভাস হয়ত আপনিও পেয়েছেন। আমার মনে হয় বাবা শেষ অবস্থায় যে কথাগুলো বললেন সেটার উপর বেশি গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো।'

ফেলুদা বলল, 'আমার কাছে নির্দেশগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হয়নি।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ। তবে সব সংকেত ধরতে পেরেছি এটা বলতে পারব না। যেমন ধরুন, মুক্তানন্দের ছবি।' ফেলুদা অখিলবাবুর দিকে ফিরল। 'আপনি ওটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারেন। ছবিটা তো বোধহয় আপনারই দেওয়া।'

অখিলবাবু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমারই দেওয়া। মুক্তানন্দ রাঁচিতে এসেছিলেন একবার। আমার তো এসবের দিকে একটু ঝোঁক আছেই চিরকাল। বেশ জেনুইন লোক বলে মনে হয়েছিল। আমি মহেশকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম—তুমি তো কোনোদিন সাধু-সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস-টিশ্বাস করলে না, শেষ বয়সে একটু এদিকে মন দাও না। তোমাকে একটা ছবি এনে দেব। ঘরে রেখে দিও। মুক্তানন্দের প্রভাব খারাপ হবে না। তিনটি মহাদেশে এঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, না হয় তোমার উপরেও একটু পড়ল।—তা সে ছবি যে সে তার খাটের পাশে রেখে দিয়েছে সেটা কালই প্রথম দেখলাম। অসুখের আগে তো ওর শোবার ঘরে যাইনি কখনো।'

'আপনি ওটা সম্বন্ধে জানেন কিছু?' ফেলুদা অরুণবাবুকে প্রশ্ন করল।

অরুণবাবু মাথা নাড়লেন। 'ও জিনিসটা যে বাবার কাছে ছিল সেটাই জানতাম না। বাবার শোবার ঘরে আমিও কালই প্রথম গেলাম।'

'আমিও জানতাম না।'—প্রীতীনবাবুকে কিছু জিগ্যেস করার আগেই তিনি বলে উঠলেন।

ফেলুদা বলল, 'দুটো জিনিস পেলে আমার কাজের একটু সুবিধা হতে পারে।'

'কী জিনিস?' অরুণবাবু জিগ্যেস করলেন।

'প্রথমটা হল—মহেশবাবুকে লেখা তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের চিঠি।'

'বীরেনের চিঠি?' অরুণবাবু অবাক। 'বীরেনের চিঠি দিয়ে কী হবে?'

'আমার বিশ্বাস এই ছবিটা মহেশবাবু বীরেনকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন আমাকে।'

'হাউ স্ট্রেঞ্জ! এ ধারণা কী করে হল আপনার?'

ফেলুদা বলল, 'ছবিটা আমাকে দিয়ে মহেশবাবু দুটো আঙুল দেখিয়েছিলেন সেটা আপনারাও দেখেছিলেন; একটা সম্ভাবনা আছে যে দুই আঙুল মানে দুরি। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আপাতত এই বিশ্বাসেই আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।'

'কিন্তু বীরেনকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়?'

'ধরুন মহেশবাবু যদি ঠিকই দেখে থাকেন; যদি সে এখানে এসে থাকে।'

অরুণবাবু তাঁর বাপের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। 'বাবা গত পাঁচ বছরে কতবার বীরেনকে দেখেছেন তা আপনি জানেন? বিশ বছর যে ছেলে বিদেশে, বাবা তাঁর দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকে এক ঝলক দেখেই চিনে

ফেলবেন এটা আপনি ভাবছেন কী করে ?'

'আপনি ভুল করছেন অরুণবাবু, আমি নিজে একবারও ভাবছি না যে বীরেনবাবু ফিরে এসেছেন। কিন্তু তিনি যদি দেশের বাইরেও কোথাও থেকে থাকেন, তাহলেও আমার দায়িত্ব দায়িত্বই থেকে যায়। তিনি কোথায় আছেন জেনে জিনিসটা তাঁর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।'

অরুণবাবু একটু নরম হয়ে বললেন, 'বেশ। আপনি দেখবেন বীরেনের চিঠি। বাবা সব চিঠি এক জায়গায় রাখতেন। বীরেনের চিঠিগুলো আলাদা করে বেছে রাখব।'

'ধন্যবাদ', বলল ফেলুদা, 'আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে—মহেশবাবুর ডায়রি। সম্ভব হলে সেগুলোও একবার দেখব।'

আমি ভেবেছিলাম অরুণবাবু এতে আপত্তি করবেন, কিন্তু করলেন না। বললেন, 'দেখতে চান দেখতে পারেন। বাবা তাঁর ডায়রির ব্যাপারে কোনো গোপনতা অবলম্বন করতেন না। তবে আপনি হতাশ হবেন, মিঃ মিত্তির।'

'কেন ?'

'বাবার মতো ওরকম নীরস ডায়রি আর কেউ লিখেছে কিনা জানি না। অত্যন্ত মামুলি তথ্য ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।'

'হতাশ হবার ঝুঁকি নিতে আমার আপত্তি নেই।'

চিঠির ব্যাপারে ঠিক হল অরুণবাবু আর প্রীতীনবাবু ভাইয়ের গুলো বেছে আলাদা করে রাখবেন, সেগুলো কাল সকালে ফেলুদাকে দেওয়া হবে। ডায়রিগুলো আজই নিয়ে যাব আমরা, আর কালই ফেরত দিয়ে দেব। বুঝলাম ফেলুদাকে আজ রাত জাগতে হবে, কারণ ডায়রির সংখ্যা চল্লিশ।

তিনজনে ভাগাভাগি করে খবরের কাগজে মোড়া মহেশ চৌধুরীর ডায়রির সাতটা প্যাকেট নিয়ে কৈলাসের কাঁকরবিছানো পথ দিয়ে যখন ফটকের দিকে যাচ্ছি, তখন দেখলাম জোড়া-মৌমাছি তার বিলিতি ভল হাতে নিয়ে বাগানে ঘোরাফেরা করছে। পায়ের শব্দে সে হাঁটা থামিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে দেখল। তারপর বলল, 'দাদু আমাকে বলেনি।'

হঠাৎ এমন একটা কথায় আমরা তিনজনেই থেমে গেলাম।

'কী বলেনি দাদু ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'কী খুঁজছিল বলেনি।'

'কবে ?'

'পরশু তরশু নরশু।'

'তিনদিন ?'

'একদিন।'

'কী হয়েছিল বল তো।'

বিবি দূরে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে কথা বলছে, যদিও তার মন পুতুলের দিকে। সে পুতুলের মাথায় গোঁজার জন্য বাগান থেকে ফুল নিতে এসেছে। ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'দাদুর যে ঘর আছে দোতলায়, যেখানে টেবিল আছে, বই আছে, আর সব জিনিস-টিনিস আছে, সেইখানে খুঁজছিল দাদু।'

'কী খুঁজছিলেন ?'

'আমি তো জিগ্যেস করলাম। দাদু বলল, কী পাচ্ছি না, কী খুঁজছি।'

'আবোল তাবোল বকছে, মশাই,' চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

'আর কিছু বলেননি দাদু ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'দাদু বলল এটা হেঁয়ালি, পরে মানে বলে দেব, এখন খুঁজতে দাও। তারপর আর বলল না দাদু। দাদু মরে গেল।'

ইতিমধ্যে ডলের মাথায় ফুল গোঁজা হয়ে গেছে, বিবি বাড়ির দিকে চলে গেল, আর আমরাও হলাম বাড়িমুখো।

॥ ৭ ॥

ফেলুদা এখন মহেশ চৌধুরীর ডায়রি নিয়ে বসবে, ওকে ডিসটার্ব না করাই ভালো, তাই আমরা দুজনে চারটে নাগাদ চা খেয়ে একটু ঘুরব বলে গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবুর ধারণা শহরের দিকে গেলে হয়ত সুলতানের লেটেস্ট খবর পাওয়া যেতে পারে।—'মহেশ চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার দাদা যতই রহস্যের গন্ধ পেয়ে থাকুন না কেন, আমার কাছে বাঘ পালানোর ঘটনাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর।'

বাঘের খবর পেতে বেশি দূর যেতে হল না। পেট্রোল নেবার দরকার ছিল, মেন রোডে বৃজভূষণ তেওয়ারীর পেট্রোল পাম্পের সামনে ভিড় দেখেই বুঝলাম বাঘের আলোচনা হচ্ছে, কারণ একজন ভদ্রলোক থাবা মারার ভঙ্গি করলেন কথা বলতে বলতে।

লালমোহনবাবু গাড়ি থেকে নেমে সটান এগিয়ে গেলেন জটলার দিকে। ভদ্রলোক এককালে রাজস্থান যাবেন বলে বই পড়ে কিছুটা হিন্দী শিখেছিলেন, কিন্তু এখন সেটা ফেলুদার ভাষায় আবার শেয়ালের স্ট্যান্ডার্ডে নেমে গেছে। তার মানে কেয়া হুয়া-র বেশি এগোনো মুশকিল হয়। তবু ভালো, ভিড়ের মধ্যে একজন বাঙালী বেরিয়ে গেল। তার কাছেই জানলাম যে হাজারিবাগের পুবে বিষ্ণুগড়ের

দিকে একটা বনের মধ্যে নাকি সুলতানকে পাওয়া গিয়েছিল। ট্রেনার চন্দ্রনের সঙ্গে বনবিভাগের শিকারী নাকি বাঘটার দিকে এগিয়ে যায়। একটা সময় মনে হয়েছিল যে বাঘটা ধরা দেবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটা চন্দ্রনকে একটা থাবা মেরে পালিয়ে যায়। গুলিও চলেছিল, কিন্তু বাঘটা জখম হয়েছে কিনা জানা যায়নি। চন্দ্রন অবিশ্যি জখম হয়েছে, তবে তেমন গুরুতরভাবে নয়। সে এখন হাসপাতালে।

লালমোহনবাবু বললেন, 'কাণ্ডারিকারের কোনো খবর জানেন?'

এটা শুধরাতেই হল। বললাম, 'কাণ্ডারিকার নয়, কারাণ্ডিকার—যিনি বাঘের আসল ট্রেনার।'

ভদ্রলোক বললেন তার খবর জানেন না, তবে এটা জানেন যে বাঘের অভাবে নাকি সার্কাসের বিক্রি কিছুটা কমেছে।

বাঘের দিকে গুলি চলেছে জেনে কারাণ্ডিকারের মনোভাব কী হল সেটা জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল আমাদের দুজনেরই, তাই পেট্রোল নিয়ে সোজা চলে গেলাম গ্রেট ম্যাজেস্টিকে।

ফেলুদা সঙ্গে থাকলে দেখেছি লালমোহনবাবু নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে সাহস পান না ; আজ দেখলাম সোজা গেটে গিয়ে বললেন, 'পুট মি থ্রু টু মিস্টার কুট্টি প্লীজ।' গেটের লোকটা কী বুঝল জানি না। হয়ত সেদিন আমাদের চিনে রেখেছিল, তাই আর কিছু জিগ্যেস না করে আমাদের ঢুকতে দিল, আর আমরাও সোজা গিয়ে হাজির হলাম মিঃ কুট্টির ক্যারাভানে।

কুট্টির কাছে যে খবরটা পেলাম সেটাকেও একটা হেঁয়ালি বলা চলে।

কারাণ্ডিকার নাকি কাল রাত থেকে হাওয়া।

'দুদিন থেকেই পাবলিক আবার বাঘের খেলা ডিমাণ্ড করতে শুরু করেছে,' বললেন মিঃ কুট্টি। 'আমি নিজে কারাণ্ডিকারের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছি। বলেছি সে ছাড়া আর কেউ বাঘ ট্রেন করবে না। কিন্তু তাও সে না বলে চলে গেল। এর মধ্যেও দু-একদিন বেরিয়েছে, কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু আজ সে এখনও ফিরল না।'

খবরটা শুনে সার্কাসের বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'সুলতান-ক্যাপচারের দৃশ্য আর দেখা হল না, তপেশ। এমন সুযোগ আর আসবে না।'

আমারও মনটা খারাপ লাগছিল, তাই ঠিক করলাম গাড়িতে করে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসব। উত্তরে যাব না দক্ষিণে যাব—অর্থাৎ কানারি হিলের দিকে যাব না রামগড়ের দিকে যাব—সেটা ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত টস্ করলাম। দক্ষিণ পড়ল। লালমোহনবাবু বললেন, 'ওদিকটাতেও একটা পাহাড়

আছে, সেদিন যাবার পথে দেখেছি। খাসা দৃশ্য।'

'দৃশ্য ভালো ঠিকই, কিন্তু এগারো কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছু দূর গিয়েই একটা কালভার্টের ধারে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটাকে মোটেই ভালো বলা চলে না।

মাত্র ছ'মাস আগে কেনা লালমোহনবাবুর অ্যাম্বাসাডর বার তিনেক হেঁচকি তুলে মিনিটখানেক গোঁ গোঁ করে অবশেষে বেমালুম ধর্মঘটের দিকে চলে গেল।

'বোধহয় তেল টানছে না', বললেন হরিপদবাবু।

ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি। সূর্য আকাশের নিচের দিকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, কারণ পশ্চিমে দূরে শালবনের মাথার উপর মেঘ জমে আছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে কালভার্টের উপর গিয়ে বসলাম, হরিপদবাবু গাড়ি নিয়ে পড়লেন। লালমোহনবাবুকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি ড্রাইভারের উপর নির্ভর করতে হয়, কারণ উনি গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। উনি বলেন, 'আমার নিজের পায়ের ভেতর কটা হাড় আছে কটা মাসল আছে না জেনে যখন দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, তখন গাড়ির ভেতর কী কলকব্জা আছে সেটা জানার কী নেসেসিটি ভাই?'

মেঘের গায়ে নিচের দিকে একটা খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে একটিবার উঁকি দিয়ে সূর্যদেব যখন আজকের মতো ছুটি নিলেন, হরিপদবাবু সেই সময় জানালেন যে তিনি রেডি—'চলে আসুন, স্যার।'

কালভার্ট থেকে উঠে আরেকবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পাঁচটা তেত্রিশ। সময়টা জরুরী, কারণ ঠিক তখনই আমরা দেখলাম সুলতানকে।

খবরটা আরো অনেক নাটকীয়ভাবে দিতে পারতাম, কিন্তু ফেলুদা বলে এটাই ঠিক।—'গাদাগুচ্ছের মর্চে-ধরা বিশেষণ আর তথাকথিত লোম-খাড়া-করা শব্দ ব্যবহার না করে চোখে যা দেখলি সেইটে ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে ঢের বেশি।' আমিও সেটাই করার চেষ্টা করছি।

খাঁচার বাইরে বাঘ এর আগেও একবার দেখেছি, যেটার কথা রয়েল বেঙ্গল রহস্যে আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের সঙ্গে আরো অনেক লোক ছিল। শিকারী আর বন্দুক তো ছিলই, সবচেয়ে বড় কথা—ফেলুদা ছিল। তার উপরে আমি আর লালমোহনবাবু ছিলাম গাছের উপর, বাঘের নাগালের বাইরে। এখানে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছি খোলা রাস্তায়, যার দুদিকে বন, অদূরে একটা পাহাড়, যাতে ভল্লুক আছেই, আর সময়টা সন্ধে। এই সময় এই অবস্থায় আমাদের থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে পশ্চিম দিকের বন থেকে বেরিয়ে বাঘটা রাস্তার উপর উঠল। আমরা তিনজনে ঠিক একসঙ্গে একই সময় বাঘটা দেখেছি, কারণ আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজনও ঠিক সেইভাবেই কাঠ হয়ে গেল। হরিপদবাবুর বাঁ হাতটা

গাড়ির দরজার দিকে বাড়িয়েছিলেন, সেই বাড়ানোই রয়ে গেল ; লালমোহনবাবু নাক ঝাড়বেন বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা নাকের দুপাশে ধরে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়েছিলেন, তিনি সেই ভাবেই রয়ে গেলেন ; আমি ধুলো ঝাড়বার জন্য আমার ডান হাতটা আমার জীনসের পিছন দিকে নিয়েছিলাম, তার ফলে শরীরটা একটু বেঁকে গিয়েছিল, বাঘটা দেখার ফলে শরীরটা সেইরকম বেঁকেই রইল।

রাস্তায় উঠে বাঘটা ঠিক চার পা গিয়ে থেমে গেল। তারপর মাথাটা ঘোরালো আমাদের দিকে।

আমার পা কাঁপতে শুরু করেছে, বুকের ভিতরে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। অথচ আমার চোখ কিছুতেই বাঘের দিক থেকে সরছে না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছি যে আমার ডান পাশে আবছা কালো জিনিসটা হচ্ছে লালমোহনবাবুর মাথা, আর সেটা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আন্দাজে বুঝলাম তাঁর পা অবশ হয়ে যাবার ফলে শরীরের ভার আর বইতে পারছে না। এটাও বুঝতে পারছিলাম যে আমার দৃষ্টিতে কী জানি গণ্ডগোল হচ্ছে, কারণ বাঘের আউটলাইনটা বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, আর গায়ের কালো ডোরাগুলো স্থির না থেকে ভাইব্রেট করছে।

সুলতান যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের দেখল সেটার আন্দাজ দেওয়া মুশকিল। মনে হচ্ছিল সময়টা অফুরন্ত। লালমোহনবাবু পরে বললেন কম করে আট-দশ মিনিট ; আমার মতে আট-দশ সেকেন্ড, কিন্তু সেটাও যথেষ্ট বেশি।

দেখা শেষ হলে পর মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে আরো চার পা ফেলে বাঘ রাস্তা পেরিয়ে গেল। সাহস একটু বাড়াতে ধীরে ধীরে ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম শাল সেগুন সরল শিশু শিমুল আর আরো অনেক সব শুকনো গাছের জঙ্গলে সুলতান অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্চর্য এই যে, এর পরেও আমরা অন্তত মিনিটখানেক (লালমোহনবাবুর বর্ণনায় পনেরো মিনিট) প্রায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর তিনজনে কেবল তিনটে কথা বলে গাড়িতে উঠলাম—হরিপদবাবু 'চলুন', আমি 'আসুন' আর লালমোহনবাবু 'হুঃ'। খুব বেশি ভয় নিয়ে কথা বলতে গেলে লালমোহনবাবুর এরকম হয় এটা আমি আগেই দেখেছি। ডুয়ার্সে মহীতোষ সিংহরায়ের বাড়িতে আমরা তিনজন একঘরে শুয়েছিলাম। একদিন রাত্রে ঘরের বন্ধ দরজাটা হাওয়াতে খট্ খট্ করায় উনি 'কে' না বলে 'খে' বলেছিলেন।

হরিপদবাবুর নার্ভটা দেখলাম মোটামুটি ভালো। ফেরার পথে স্টিয়ারিং হুইলে হাতটাত কাঁপেনি। উনি নাকি এর আগেও রাস্তায় বাঘ দেখেছেন, জামসেদপুরে ড্রাইভারি করার সময়।

বাড়ি ফিরে দেখি ফেলুদা তখনো মহেশবাবুর ডায়রিতে ডুবে আছে। আমার মনে হচ্ছিল সুলতানের খবরটা লালমোহনবাবু দিতে পারলে খুশি হবেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না। ভদ্রলোক লেখেন-টেখেন বলেই বোধহয় সরাসরি খবরটা না দিয়ে একটু পাঁয়তারা কষে নিলেন। বার দু-তিন হুঁ হুঁ হুঁ করে কী একটা গানের সুর ভেঁজে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তপেশ, বাঘের পায়ের তলায় বোধহয় প্যাডিং থাকে, তাই না?'

আমি মজা দেখছি; বললাম, 'তাই তো শুনেছি।'

'নিশ্চয়ই তাই; নইলে এত কাছ দিয়ে গেল আর কোনো শব্দ হল না?'

লালমোহনবাবুর পাঁয়তারা কিন্তু মাঠে মারা গেল। ফেলুদা আমাদের দিকে চাইলও না, কেবল একটা ডায়রি সরিয়ে রেখে আরেকটা হাতে নিয়ে বলল, 'আপনারা যদি বাঘটাকে দেখে থাকেন, তাহলে ক'টার সময় কোনখানে দেখেছেন সেটা বন বিভাগে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া উচিত ইমিডিয়েটলি।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'টাইম পাঁচটা তেত্রিশ, লোকেশন রামগড়ের রাস্তায় এগারো কিলোমিটারের পোস্টের পরের কালভার্টের কাছে।'

'বেশ তো পাশের ঘরে ডিরেক্টরি রয়েছে, আপিসে এখন কেউ নেই, আপনি একেবারে ডি-এফ-ওর বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন। ওদের উপকার হবে।'

'আচ্ছা, হুঁ, তাহলে...' লালমোহনবাবু দেখলাম মাসলগুলোকে টান করে নিচ্ছেন।—'কীভাবে পুট করা যায় ব্যাপারটা? ইংরিজিতেই বলব তো?'

'হিন্দি ইংরিজি যেটায় বেশি দখল তাতেই বলবেন।'

'দি টাইগার হুইচ এসকেপড ফ্রম দি...এসকেপ্‌ড্‌ই বলব তো?'

'সহজ করে নিয়ে র‍্যান অ্যাওয়ে বলতে পারেন।'

'এসকেপটা বোধহয় ম্যানেজ করতে পারব।'

'তাহলে তাই বলুন।'

নম্বর বার করে দিলাম আমি।। ফোনটাও বোধহয় আমি করলেই ভালো হত, কারণ লালমোহনবাবু 'দি সার্কাস হুইচ এসকেপ্‌ড ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার—থুড়ি', বলে থেমে গেলেন। ভাগ্যিস ভদ্রলোক কথাটা খুব চেঁচিয়ে বলেছিলেন। ফেলুদা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে টেলিফোনটা ওঁর হাত থেকে ছিনিয়ে খবরটা নিজেই দিয়ে দিল।

॥ ৮ ॥

ফেলুদার ঘরেই চা এনে দিল বুলাকিপ্রসাদ। আমরা আসার আগেই বাঘের হাতে চন্দ্রনের জখম হবার খবরটা ফেলুদা বুলাকিপ্রসাদের কাছে পেয়ে

গিয়েছিল। ফেলুদার ধারণা কারাভিকার ছাড়া এই বাঘ জ্যান্ত ধরার সাধ্যি কারুর নেই।

লালমোহনবাবু গরম চায়ে একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন, 'কিছু পেলেন ও ডায়রিতে? নাকি অরুণবাবুর কথাই ঠিক?'

'আপনিই বলুন না।'

ফেলুদা একটা ডায়রি খুলে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

লালমোহনবাবু পড়লেন 'Self elected President of club—meeting on 8.4.46'—তারপর আরেকটা পাতা খুলে পড়লেন—Tea Party at Brig. Sudarshan's আর তার পরের পাতায়—'Trial for new suit at Shakur's—4 P.M.....কী মশাই, এসব খুব তাৎপর্যপূর্ণ বুঝি?'

'তোপ্‌সে, তোর কী মনে হয়?'

আমি লালমোহনবাবুর পিছন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম, এবার ডায়রিটা হাতে নিয়ে নিলাম। 'আলোর কাছে আন', বলল ফেলুদা।

টেবিল ল্যাম্পের নিচে ডায়রিটা ধরে চোখটা কাছে নিতেই একটা শিহরন খেলে গেল আমার শিরদাঁড়ায়।

বেশ বড় সাইজের ডায়রি, তার পাতার মাঝখানে ফাউনটেন পেনে ইংরিজিতে লেখা ছাড়াও অন্য লেখা রয়েছে যেটা প্রায় চোখে দেখা যায় না। পাতার একেবারে উপর দিকে ছাপা তারিখেরও উপরে, খুব সরু করে কাটা হার্ড পেনসিল দিয়ে খুদে খুদে অক্ষরে হাল্কা লেখা।

'কী দেখলি?'

'বাংলা লেখা।'

'কী লেখা?'

'এই পাতাটায় লেখা—"পাঁচের বশে বাহন ধ্বংসে"।'

'সর্বনাশ', বললেন লালমোহনবাবু, 'এ যে আবার হেঁয়ালি দেখছি মশাই।'

'তাতো বটেই', বলল ফেলুদা, 'এবার এটা দেখুন। এটা ১৯৩৮ অর্থাৎ প্রথম বছরের ডায়রি, আর এটাই পেনসিলে প্রথম সাংকেতিক লেখা।'

১৯৩৮-এর ডায়রির প্রথম পাতাতেই লিখেছেন ভদ্রলোক "শম্ভু দুই-পাঁচের বশ।"

'শম্ভুটি কে?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক নিজের বিষয় বলতে গেলে সব সময়ই শিবের কোনো না কোনো একটা নাম ব্যবহার করেছেন।'

'শিবের নাম তো হল, কিন্তু দুই-পাঁচের বশ তো বোঝা গেল না।'

'রিপু বোঝেন ?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'মানে ছেঁড়া কাপড় সেলাই-টেলাই করা বলছেন ?'

'আপনি ফারসী-সংস্কৃত গুলিয়ে ফেলছেন, লালমোহনবাবু। আপনি যেটা বলছেন সেটা হল রিফু। আমি বলছি রিপু।'

'ওহো—ষড়রিপু ? মানে শত্রু ?'

'শত্রু। এবার মানুষের এই ছটি শত্রুর নাম করুন তো ?'

'ভেরি ইজি। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য।'

'হল না। অর্ডারে ভুল। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। অর্থাৎ দুই আর পাঁচ হল ক্রোধ আর মদ।'

'ওয়াণ্ডারফুল !' বললেন লালমোহনবাবু, 'এ তো মিলে যাচ্ছে মশাই !'

'এবার তাহলে প্রথমটা আরেকবার দেখুন, এটাও মিলে যাবে।'

এবারে আমার কাছেও ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে। বললাম, 'বুঝেছি, দুইয়ের বশে বাহন ধ্বংস হচ্ছে, রাগের মাথায় গাড়ি ভাঙা।'

'ভেরি গুড', বলল ফেলুদা, 'তবে দুই-পাঁচ নিয়ে একটা সংকেতের এখনো সমাধান হয়নি।'

যে ডায়রিগুলো দেখা হয়ে গেছে, সেগুলোর বিশেষ বিশেষ জায়গায় কাগজ গুঁজে রেখেছে ফেলুদা। তারই একটা জায়গা খুলে আমাদের দেখালো। লেখাটা হচ্ছে—২+৫-X।

লালমোহনবাবু বললেন, 'এক্স তো মশাই আননোন কোয়ান্টিটি। ওটা বাদ দিন। আর, সব সংকেতেরই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে থাকবে সেটাই বা ভাবছেন কেন ?'

ফেলুদা বলল, 'যেখানে একটা লোক বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে মাত্র পনেরো-বিশ দিন সংকেতের আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে কারণটা যে জরুরী তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কাজেই X-এর রহস্য আমাকে উদ্‌ঘাটন করতেই হবে।'

'ওই তারিখের কাছাকাছি কোনো লেখা থেকে কোনো হেল্‌প পাচ্ছেন না ?'

'ওর দশ দিন পরে আরেকটা সংকেত আছে। দেখুন—'

এটাও আমার কাছে অসম্ভব কঠিন বলে মনে হল। লেখাটা হচ্ছে—'অনর্গল— ঘৃতকুমারী'।

ফেলুদা বলল, 'লোকটা যে কথা নিয়ে কী না করেছে তাই ভাবছি।'

'আপনি ধরে ফেলেছেন ?'

'আপনিও পারবেন—একটু হেল্‌প করলে।'

'ঘৃতকুমারী তো কবরেজীর ব্যাপার মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু।

'হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা, 'ঘৃতকুমারীর তেল মাথায় মাখলে মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

অর্থাৎ রাগ কমায়।'

'কিন্তু তেল অনর্গল মাখতে হয় এতো জানতুম না মশাই।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আপনি ড্যাশটা অগ্রাহ্য করছেন কেন? ওটারও একটা মানে আছে। আর অর্গল মানে জানেন তো?'

'কপাট। খিল।'

'এবারে ওই দ্বিতীয় মানেটার সঙ্গে একটা নেগেটিভ জুড়ে দিন।'

'অখিল!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'তার মানে অখিলবাবু ওঁকে ঘৃতকুমারী ব্যবহার করতে বলেছিলেন।'

'শাবাশ। এবার পরেরটা দ্যাখ।'

তিন পাতা পরে পড়ে দেখলাম—'আজ থেকে পাঁচ বাদ।' তার মানে মহেশবাবু মদ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তার এক মাস বাদেই মহেশবাবু লিখছেন—'ভোলানাথ ভোলে না। আবার পাঁচ। পাঁচেই বিস্মৃতি।'

ফেলুদা বলল, 'কিছু একটা ভুলে থাকার জন্য মহেশবাবু আবার মদের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে—কী ভুলতে চাইছেন?'

লালমোহনবাবু আর আমি মাথা চুলকোলাম। মহেশবাবু বলেছিলেন তাঁর জীবনে অনেক রহস্য। এখন মনে হচ্ছে কথাটা ঠাট্টা করে বলেননি।

ফেলুদা আরেকটা জায়গায় ডায়রিটা খুলে বলল, 'এটা খুব মন দিয়ে পড়ে দেখুন। কথা নিয়ে খেলার একটা আশ্চর্য উদাহরণ। অনেক তথ্য, অনেক জটিল মনের ভাব এই কয়েকটি কথার মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে।'

আমরা পড়লাম—'আমি আজ থেকে পালক। পালক = feather = হাল্কা। পালক = পালনকর্তা। আজ থেকে শম্ভুর ভার আমার। শম্ভু আমার মুক্তি।'

শম্ভু যে শঙ্করলাল মিত্র সেটা আমি বুঝতে পারলাম। ফেলুদা বলল, 'শঙ্করলালকে মানুষ করার ভার বহন করতে পেরে মহেশবাবুর মন থেকে একটা ভার নেমে গেছে। এই ভারটা কিসের ভার সেইটে জানা দরকার।'

ফেলুদা খাট থেকে উঠে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে পায়চারি করল। আমি ডায়রিগুলোর দিকে দেখছিলাম। কী অদ্ভুত লোক ছিলেন এই মহেশ চৌধুরী। বেঁচে থাকলে ফেলুদার সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাব জমে যেত, কারণ ফেলুদারও হেঁয়ালির দিকে ঝোঁক আর হেঁয়ালির সমাধানও করতে পারে আশ্চর্য চটপট।

লালমোহনবাবু খাটের এক কোনায় ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন। বললেন, 'অখিলবাবু ভদ্রলোকের এত বন্ধু ছিলেন, ওঁকে কবরেজী ওষুধ দিয়েছেন, ওঁর কুষ্ঠী ঘেঁটেছেন, তাঁরতো মহেশবাবুর নাড়ীনক্ষত্র জানা উচিত। আপনি ডায়রি না ঘেঁটে তাঁকেই জেরা করুন না।'

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'এই ডায়রিগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি আসল মানুষটার সঙ্গে যোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি। ওই পেনসিলের লেখাগুলোতে আমার কাছে মহেশ চৌধুরী এখনো বেঁচে আছেন।'

'ওঁর ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু পেলেন না ডায়রিতে?'

'প্রথম পনেরো বছরে বিশেষ কিছু নেই, তবে পরে—'

একটা গাড়ি থামল আমাদের গেটের বাইরে। ফিয়াটের হর্ন। চেনা শব্দ।

আমরা তিনজনে বারান্দায় এসে দেখলাম অরুণবাবু হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন।

'মিঃ সিং-এর ওখানে যাচ্ছিলাম—এখানকার ফরেস্ট অফিসার,' বললেন অরুণবাবু, 'তাই ভাবলাম বীরেনের চিঠিগুলো দিয়ে যাই। চিঠি অবিশ্যি নামেই। তাও আপনি যখন চেয়েছেন...'

'আপনাকে এই অবস্থায় এত ঝামেলার মধ্যে ফেললাম বলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত।'

'দ্যাটস্ অল রাইট,' বললেন অরুণবাবু 'বাবা যে কী বলতে চাইছিলেন সেটা আমার কাছে রহস্য। দেখুন যদি আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বার করতে পারেন। সত্যি বলতে কী, আমি বাবার সঙ্গ খুব বেশি পাইনি। হাজারিবাগে আসি মাঝে মাঝে আমার কাজের ব্যাপারে। এককালে প্রায়ই আসতাম শিকারের জন্য। তা, বড় শিকার তো এরা বন্ধই করে দিয়েছে। কাল একটা সুযোগ পাওয়া গেছে—দেখি!...'

'কী সুযোগ?'

'যে কারণে সিং-এর কাছে যাচ্ছি। খবর এসেছে রামগড়ের রাস্তায় আজ বিকেলেই নাকি বাঘটা দেখা গেছে। এদিকে একটি ট্রেনার তো হাসপাতালে, অন্যটি মালিকের সঙ্গে ঝগড়াটগড়া করে নিখোঁজ। আমি সিংকে বলেছি যে বাঘটাকে যদি মারতেই হয়, তো আমাকে মারতে দাও। অলরেডি তো তার দিকে গুলি চলেছে; যদি জখম হয়ে থাকে তাহলে তো হি ইজ এ ডেঞ্জারাস বীস্ট।'

আমার বলার ইচ্ছে ছিল বাঘটাকে দেখে তো জখম বলে মনে হয়নি, কিন্তু ফেলুদার ইশারাতে সেটা আর বললাম না।

'আমি তো সঙ্গে থ্রি ওয়ান ফাইভটা নিচ্ছি,' বললেন অরুণবাবু, 'কারণ এমনিতেই চারিদিকে প্যানিক। গরু ছাগলও গেছে এক-আধটা। সার্কাসের খাঁচায় বন্দী অবস্থায় বুড়ো হয়ে মরার চেয়ে জঙ্গলে গুলি খেয়ে মরাটা খারাপ কিসে?...যাই হোক, আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে আপনিও আসতে পারেন। কাল সকালে বেরোব আমরা।'

'দেখি....' বললো ফেলুদা। 'আমার এই কাজটা কতদূর এগোয় তার উপর

নির্ভর করছে। ভালো কথা—'

অরুণবাবু যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, ফেলুদার কথায় থামলেন। ফেলুদা বলল, 'সেদিন পিকনিকে আপনিই তো বন্দুক ছুঁড়েছিলেন, তাই না ?'

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। 'আপনি বোধহয় ভাবছিলেন—বন্দুক চলল, অথচ শিকার নেই কেন ? গোয়েন্দার মন তো ! ওয়েল, আই মিসড ইট। একটা বটের। সেরা শিকারীরও লক্ষ্য কি সব সময় অব্যর্থ হয়, মিঃ মিত্তির ?'

॥ ৯ ॥

বিলেত থেকে লেখা মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলের চিঠিগুলো থেকে সত্যিই বিশেষ কিছু জানা গেল না। চিঠি বলতে সবই পোস্টকার্ড, তার একদিকে ছবি, অন্যদিকে ঠিকানা। যেখানে ঠিকানা ছাড়াও কিছু লেখা আছে, সেখানে বীরেন তার বাবার দেওয়া নাম ব্যবহার করেছে—দুরি।

ন'টায় বুলাকিপ্রসাদ ডিনার রেডি করে আমাদের ডাক দিল। ফেলুদা ডায়রি আর খাতা নিয়ে খেতে বসল। যে-সংকেতগুলো তৎক্ষণাৎ সমাধান হচ্ছে না, সেগুলো সে নিজের খাতায় লিখে রাখছে। বাঁ হাতে লিখছে, এবং দিব্যি লিখছে। লালমোহনবাবু একবার বললেন, 'লেখা বন্ধ না করলে আজকের মাংসের কারিটার ঠিক জাসটিস করতে পারবেন না। দুর্ধর্ষ হয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'বাঁদর সমস্যা নিয়ে পড়েছি, এখন মাংস-টাংস বলে ডিসটার্ব করবেন না !'

আমি লক্ষ করছিলাম ফেলুদার ভুরুটা সাংঘাতিক কুঁচকে রয়েছে, যদিও ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাসও রয়েছে। জিগ্যেস করতেই বলল ব্যাপারটা কী। ফেলুদা ডায়রি থেকে পড়ে শোনাল—'অগ্নির উপাসকের অসীম বদান্যতা। নবরত্ন বাঁদরের হিসাবে দু হাজার পা।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'রাঁচিতে পাগলাগারদ আছে বলে এখানকার বাসিন্দারাও নাকি একটু ইয়ে হয় বলে শুনিচি। সেটাও একটু মনে রাখবেন।'

ফেলুদা এ কথায় কোনো মন্তব্য না করে বলল, 'অগ্নির উপাসক পার্সীদের বলে জানি, কিন্তু বাকিটা সম্পূর্ণ ধোঁয়া।'

তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে, প্রথমত নবরত্ন বাঁদর বলে কোনোরকম বাঁদর হয় কিনা সে বিষয়ে ওঁর সন্দেহ আছে ; আর দ্বিতীয়ত, নটা রত্নের কী করে দু হাজার পা হয়, আর বাঁদর কী করে সে হিসেবটা করে সেটা কোনোমতেই বোধগম্য হচ্ছে না—'এইবার আপনি খাতা বন্ধ করে একটু বিশ্রাম করুন।'

লালমোহনবাবু বলার জন্য নিশ্চয়ই নয়, হয়ত চোখ আর মাথাটাকে একটু

রেস্ট দেবার জন্য ফেলুদা খাবার পরে হাঁটতে বেরোল। অবিশ্যি একা নয়, আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে।

পূর্ণিমার চাঁদ এই কিছুক্ষণ হল উঠেছে, তার গায়ের রং থেকে এখনো হলুদের ছোপটা যায়নি। আকাশে মেঘ জমেছে, তাই দেখে জটায়ু বললেন, 'চন্দ্রালোক ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হচ্ছে।' পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে একটা দমকা বাতাস দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে একটা শব্দ ভেসে আসছে যেটা ভালো করে শুনলে বোঝা যায় সার্কাসের ব্যান্ড।

ডাইনে মোড় নিয়ে দুটো বাড়ি পরেই কৈলাস। এক সারি ইউক্যালিপটাসের ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। দোতলায় একটা ঘরের জানলা খোলা, ঘরে আলো জ্বলছে। সেই আলোর সামনে দিয়ে কে যেন দ্রুত পায়চারি করছে। ফেলুদারও চোখ সেইদিকে। আমরা হাঁটা থামিয়েছি। ওটা কার ঘর? প্রীতীনবাবুর। পায়চারি করছেন নীলিমা দেবী। একবার জানালায় এসে থামলেন, আবার সরে গিয়ে পায়চারি। অস্থির ভাব।

আমরা আবার চলা শুরু করলাম। জানালাটা ক্রমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

পরপর আরো বাড়ি। প্রত্যেকটাতেই বেশ বড় কম্পাউন্ড। রেডিওতে খবর বলছে; কোন্ বাড়িতে চলছে রেডিও জানি না। লালমোহনবাবু আরেকটা বেমানান রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরতে যাচ্ছিলেন—গুনগুনানি শুনে মনে হল ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়—এমন সময় দেখলাম দূরে একজন লোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে। গায়ে নীল রঙের পুলোভার।

আরেকটু কাছে এলেই চিনতে পারলাম।

'আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম,' নমস্কার করে বললেন শঙ্করলাল মিশ্র। চেহারা দেখে মনে হল অনেকটা সামলে নিয়েছেন, যদিও সেই হাসিখুশি ছেলেমানুষী ভাবটা এখনো ফিরে আসেনি।

'কী ব্যাপার?' বলল ফেলুদা।

'আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

'কী অনুরোধ?'

'আপনি তদন্ত ছেড়ে দিন।'

হঠাৎ এমন একটা অনুরোধে রীতিমত হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফেলুদা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'কেন বলুন তো?'

'এতে কারুর উপকার হবে না, মিঃ মিত্তির।'

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ থেকে একটা হালকা হেসে বলল, 'যদি বলি আমার নিজের উপকার হবে? মনে খটকা থাকলে আমি বড় উদ্বেগ বোধ করি মিঃ মিশ্র; সেটাকে দূর না করা অবধি শান্তি পাই না। তা ছাড়া মৃত্যুশয্যায় একজন

একটা কাজের ভার আমাদের দিয়ে গেছেন, সেটা না করেও আমার শান্তি নেই। এইসব কারণে আমাকে তদন্ত চালাতেই হবে। উপকার-অপকারের প্রশ্নটা এখানে খুব বড় নয়। ভেরি সরি, আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না। শুধু তাই নয়—এই তদন্তের ব্যাপারে আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আমাকে একটু সাহায্য করুন। মহেশবাবু সম্বন্ধে আর কেউ যাই ভাবুন না কেন, আপনি ওঁকে শ্রদ্ধা করতেন এটা তো ঠিক?'

'নিশ্চয়ই ঠিক।' ফেলুদার কথাটা মনে ধরতে কিছুটা সময় নিল বলেই বোধহয় জবাবটা এল একটু পরে; কিন্তু যখন এল তখন বেশ জোরের সঙ্গেই এল। 'নিশ্চয়ই ঠিক', আবার বললেন শঙ্করলাল। তারপর তার গলার সুরটা কেমন যেন বদলে গেল। বললেন, 'যে শ্রদ্ধাটা বহুদিন ধরে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে, সেটাকে কি এক ধাক্কায় ভাঙতে দেওয়া উচিত?'

'আপনি কি সেটাই করছিলেন?'

'হ্যাঁ, সেটাই করছিলাম। কিন্তু সেটা ভুল। এখন বুঝেছি সেটা মস্ত ভুল, আর বুঝতে পেরে মনে শান্তি পাচ্ছি।'

'তাহলে আপনার কাছে সাহায্য আশা করতে পারি?'

'কী সাহায্য চাইছেন বলুন,' ফেলুদার দিকে সোজাসুজি চেয়ে বেশ সহজভাবে কথাটা বললেন শঙ্করলাল

'তাঁর দুই ছেলের প্রতি মহেশবাবুর মনোভাব কেমন ছিল সেটা জানতে চাই। চৌধুরী পরিবার সম্বন্ধে আপনি যতটা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারবেন, তেমন অনেকেই পারবেন না।'

শঙ্করলাল বললেন, 'আমি যেটুকু বুঝেছি তা বলছি। আমার বিশ্বাস শেষ বয়সে বীরেন ছাড়া আর কারুর উপর টান ছিল না মহেশবাবুর। অরুণদা আর প্রীতীন দুজনেই ওঁকে হতাশ করেছিল।'

'সেটার কারণ বলতে পারেন?'

'সেটা পারব না, জানেন, কারণ, ওই দু ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না অনেকদিন থেকেই। তবে অরুণদাকে যে জুয়ার নেশায় পেয়েছে সে কথা আমাকে একদিন মহেশবাবু বলেছিলেন। সোজা করে বলেননি, ওঁর নিজস্ব ভাষায় বলেছিলেন। আমি বুঝতে পারিনি; শেষে ওঁকেই বুঝিয়ে দিতে হল। বললে, "অরুণ গুড হলে আমি খুশি হতুম, বেটার হয়েই আমায় চিন্তায় ফেলেছে। শুনছি নাকি আজকাল মহাজাতি ময়দানে যাতায়াত করছে নিয়মিত।"—বেটার তো বুঝতেই পারছেন, আর জাতি হল রেস; মহাজাতি ময়দান হল মহেশবাবুর ভাষায় রেসের মাঠ।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু প্রীতীনবাবু তাঁকে হতাশ করবেন কেন? উনি তো

ইলেকট্রনিক্সে বেশ—'

'ইলেকট্রনিক্স!'—শঙ্করলাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'ও কি আপনাকে এই বলেছে নাকি?'

'টেলিভিশনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই?'

শঙ্করলাল সশব্দে হেসে উঠলেন। 'হরি, হরি! টেলিভিশন! প্রীতীন একটা সদাগরি অফিসে সাধারণ চাকরি করে। সেটাও ওর শ্বশুরের সুপারিশে পাওয়া। প্রীতীন ছেলে খারাপ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ইমপ্র্যাকটিক্যাল আর খামখেয়ালী। এককালে সাহিত্য-টাহিত্য করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেও খুব মামুলি। ওর স্ত্রী বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে। ও যে গাড়িটাতে এসেছে সেটাও ওর শ্বশুরের। অফিস থেকে ছুটি পাচ্ছিল না, তাই আসতে দেরী হয়েছে।'

এবার আমাদের আকাশ থেকে পড়ার পালা।

'তবে ওর পাখির নেশাটা খাঁটি,' বললেন শঙ্করলাল, 'ওতে কোনো ফাঁকি নেই।'

ফেলুদা বলল, 'আরেকটা প্রশ্ন আছে।'

'বলুন।'

'সেদিন রাজরাপ্পায় যে গেরুয়াধারীটির সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন, তিনিই কি বীরেন?'

হঠাৎ এ রকম একটা প্রশ্ন শুনে শঙ্করলাল থতমত খেলেও, মনে হল চট করে সামলে নিলেন। কিন্তু উত্তর যেটা দিলেন সেটা সোজা নয়।

'আপনার যা বুদ্ধি, আমার মনে হয় ক্রমে আপনি সব কিছুই জানতে পারবেন।'

'এটা জিগ্যেস করার একটা কারণ আছে,' বলল ফেলুদা। 'যদি তিনি বীরেন হন, তাহলে মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে আমার একটা জিনিস দিতে হবে। আপনি প্রয়োজনে বীরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন কি?'

শঙ্করলাল বললেন, 'মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছা যাতে পূরণ হয়, তার চেষ্টা আমি করব। এটা আমি কথা দিচ্ছি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। আমায় মাপ করবেন।'

কথাটা বলে শঙ্করলাল যে পথে এসেছিলেন, আবার সেই পথেই ফিরে গেলেন।

আমরা যে হাঁটতে হাঁটতে বেশ অনেকখানি পথ চলে এসেছিলাম সেটা বুঝতেই পারিনি। ফেলুদা টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বলল সাড়ে দশটা। আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। কৈলাসে সব বাতি নিভে গেছে, চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে, সার্কাসের বাজনাও আর শোনা যাচ্ছে না। এই থমথমে পরিবেশে ফেলুদার

'বাঁদর' বলে চেঁচিয়ে ওঠাটা এত অপ্রত্যাশিত যে লালমোহনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে 'কোথায়' বলাতে কিছুই আশ্চর্য হলাম না। আমি অবিশ্যি বুঝেছিলাম যে ফেলুদা মহেশবাবুর ডায়রির বাঁদরের কথা বলছে। 'কী অদ্ভুত মাথা ভদ্রলোকের!' বলল ফেলুদা। 'বাঁদরেও যে বই লিখেছে সেটা তো খেয়ালই ছিল না।'

'আপনি সিমপল ফ্র্যাকচারটাকে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারে পরিণত করছেন কেন বলুন তো মশাই? শুধু বাঁদরে শানাচ্ছে না, তার উপর আবার বই-লিখিয়ে বাঁদর?'

'গিবন! গিবন! গিবন!' বলে উঠল ফেলুদা।

আরেব্বাস্! সত্যিই তো। গিবন তো একরকম বাঁদর বটেই।

কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন জানি মুষড়ে পড়ল। বাড়ির গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন চাপা গলায় বলতে শুনলাম, 'সাংঘাতিক দাঁও মেরেছে লোকটা. সাংঘাতিক।'

'কে মশাই?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'স্ট্যাম্প-অ্যালবাম চোর,' বলল ফেলুদা।

রাত বারোটা পর্যন্ত আমাদের ঘরে থেকে লালমোহনবাবু ফেলুদার হেঁয়ালি সমাধান দেখলেন। একটা হেঁয়ালির উত্তরের জন্য এগারোটার সময় বৈকুণ্ঠকে ফোন করতে হল। ১৯৫১-র ১৮ই অক্টোবর মহেশবাবু লিখেছেন He passes away। কার মৃত্যু সংবাদ ডায়রিতে লেখা রয়েছে জানবার জন্য অরুণবাবুকে জিগ্যেস করে জানা গেল ওই দিনে অরুণবাবুর মা মারা গিয়েছিলেন। মা-র নাম জিগ্যেস করাতে বললেন হিরণ্ময়ী। তার ফলে বেরিয়ে গেল He হল 'হি'।

১৯৫৮-তে কিছু লেখা পাওয়া গেল যেগুলো পড়লে মনে হয় ইংরিজি 'মটো'। যেমন 'Be foolish', 'Be stubborn', 'Be determined'। তারপর যখন এল 'Be leaves for England' তখন বোঝা গেল Be হচ্ছে বী অর্থাৎ বীরেন।

১৯৭৫-এর পাতায় পাওয়া গেল 'এ তিনের বশ'। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। তিন হল লোভ। 'এ' হচ্ছে A—অরুণবাবু।

শেষ লেখা মহেশবাবুর জন্মদিনের আগের দিন। —'ফিরে আসা। ফিরে আসা'—ব্যস—তারপর আর কিছু নেই।

ডায়রি দেখা যখন শেষ হল তখন রাত একটা। ফেলুদার তখনও ঘুম আসেনি, কারণ আমি যখন লেপটা গায়ের উপর টানছি, তখন দেখলাম ও লালমোহনবাবুর দেওয়া সার্কাসের বইটা খুলল। উনি কথাই দিয়েছিলেন ওঁর পড়া হলে ফেলুদাকে পড়তে দেবেন, আর ফেলুদার পড়া হলে আমি পড়ব।

যখন তন্দ্রার ভাব আসছে, তখন শুনলাম ফেলুদা কথা বলছে, আর সেটা আমাকেই বলছে।—

'কোথাও খুন হলে পুলিসে গিয়ে খুনের জায়গার একটা নকশা করে লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে একটা চিহ্ন দেয়। সে চিহ্নটা কী জিনিস?'

'এক্স মার্কস দ্য স্পট?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'ঠিক বলেছিস। এক্স মার্কস দ্য স্পট।'

এই এক্সটাই স্বপ্নে হয়ে গেল দু হাত তোলা পা ফাঁক করা কালী মূর্তি, যেটা অরুণবাবুর দিকে চোখ রাঙিয়ে বলছে 'তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ,' আর অরুণবাবু চিৎকার করে বলছেন 'আমি দেখছিলাম! আমি দেখছিলাম!' তারপরই কালীর মুখটা হয়ে গেল লালমোহনবাবুর মুখ, আর যেই সেই মুখটা বলেছে 'এক মাসে তিন হাজার বিক্রি—হুঁ হুঁ—কালমোহন বেঙ্গলী!'—অমনি স্বপ্নটা ভেঙে গেল একটা শব্দে।

দরজায় ধাক্কা লাগার শব্দ। আর তার সঙ্গে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এটাও বুঝতে পারলাম।

আমার হাতটা আপনা থেকেই টেবিল ল্যাম্পের সুইচটার দিকে চলে গেল। আলো জ্বলল না। বিহারেও যে লোডশেডিং হয় এটা খেয়াল ছিল না।

মেঝেতে ধুপ্ করে কী একটা পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার গলা—

'টর্চ জ্বাল, তোপ্‌সে—আমারটা পড়ে গেছে!'

টেবিলের উপর হাতড়ে জলের গেলাসটাকে মাটিতে ফেলে ভেঙে তবে টর্চটা পেলাম। ফেলুদা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলোতে তার নিষ্ফল ক্রোধটা চোখে মুখে ফুটে বেরোচ্ছে।

'কে ছিল ফেলুদা?'

'দেখিনি, তবে অনুমান করতে পারি। লোকটা ষণ্ডা।'

'কী মতলবে এসেছিল, বলতো?'

'চুরি।'

'কিছু নেয়নি তো?'

'নেয়নি, তবে নির্ঘাত নিত—যদি আমার ঘুমটা এত পাতলা না হত।'

'কী নিত?'

ফেলুদা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল বিড়বিড় করে বলল, 'এখন দেখছি ফেলু মিত্তিরই একমাত্র লোক নয় যে মহেশ চৌধুরীর সংকেতের মানে বুঝতে পারে। যদিও এটা একটু লেটে বুঝেছে।'...

॥ ১০ ॥

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু সব শুনে-টুনে বললেন, 'আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম দরজা বন্ধ করে শোবেন। এ সব জায়গায় চোর ডাকাতের উপদ্রব তো হবেই।'

'আপনি তো বাঘের ভয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন।'

'আর আপনি চোরের জন্য খোলা রেখেছিলেন! বন্ধ রাখলে দুটোর হাত থেকেই সেফ। ওহে বুলাকিপ্রসাদ, চটপট ব্রেকফাস্টটা দাও ভাই।'

'এত তাড়া কিসের,' বলল ফেলুদা।

'বাঘ ধরা দেখতে যাবেন না?'

'ধরবে কে? কারান্ডিকার তো নিখোঁজ।'

'নিখোঁজ হলে কী হবে? বাঘ মারার তাল হচ্ছে সে খবর কি তার কাছে পৌঁছয়নি?—ওঃ...কী থ্রিলিং ব্যাপার মশাই! এ চান্স ছাড়া যায় না। আপনি ব্যাপারটা কী করে এত কামলি নিচ্ছেন জানি না।'

আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে ডায়রি আর চিঠির প্যাকেট নিয়ে কৈলাসে যাবার জন্য তৈরি হয়েছি, এমন সময় অখিলবাবু এলেন। বললেন তাঁর এক হোমিওপ্যাথ বন্ধু কাছেই থাকেন, তাঁর কাছেই যাচ্ছিলেন, আমাদের বাড়ি পথে পড়ে বলে ঢুঁ মেরে যাচ্ছেন।

'ঘৃতকুমারীতে মহেশবাবুর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল?' ফেলুদা প্রশ্ন করল হালকাভাবে।

'ও বাবা! এত কথাও লিখেছে নাকি মহেশ ডায়রিতে?'

'আরও অনেক কথাই লিখেছেন।'

অখিলবাবু বললেন, 'আমার ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি কাজ দিয়েছিল ওর মনের জোর। যাকে বলে উইল পাওয়ার। সে যে কীভাবে মদ ছাড়ল সে তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে তো আর ঘৃতকুমারীতে হয়নি।'

'উইলের কথাই যখন তুললেন,' বলল ফেলুদা, 'তখন বলুন তো মহেশবাবুর উইল সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা। আমি অবিশ্যি দলিলের কথা বলছি, মনের জোরের কথা বলছি না।'

'ডিটেল জানি না, তবে এটুকু জানি যে মহেশ একবার উইল করে পরে সেটা বাতিল করে আরেকটা উইল করে।'

'আমার ধারণা এই দ্বিতীয় উইলে বীরেনের কোনো অংশ ছিল না।'

অখিলবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'এটা কি ডায়রিতে পেলেন নাকি?'

'না। এটা উনি মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন। সংকেতটা আপনার মনে আছে কিনা জানি না। প্রথমে দুটো আঙুল দেখালেন, তারপর উই উই বললেন, আর তারপর বুড়ো আঙুলটা নাড়ালেন। দুই আঙুল যদি দুরি হয়, তাহলে ও ছাড়া আর কোনো মানে হয় না।'

'আশ্চর্য সমাধান করেছেন আপনি,' বললেন অখিলবাবু। 'প্রথম উইলে বীরেনের অংশ ছিল। তার কাছ থেকে চিঠি আসা বন্ধ হবার পর পাঁচ বছর অপেক্ষা করে ছেলে আর আসবে না ধরে নিয়ে গভীর অভিমানে বীরেনকে বাদ দিয়ে মহেশ নতুন উইল করে।'

'বীরেন ফিরে এসেছে জানলে কি আবার নতুন উইল করতেন?'

'আমার তো তাই বিশ্বাস।'

এবার ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল—

'বীরেন সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে এমন কোনো সম্ভাবনা তার মধ্যে কখনো লক্ষ করছিলেন কি?'

'দেখুন, বীরেনের কুষ্ঠী আমিই করি। সে যে গৃহত্যাগী হবে সেটা আমি জানতাম। তাই যদি হয় তাহলে সন্ন্যাসী হবার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?'

'আরেকটা শেষ প্রশ্ন।—সেদিন আপনি বললেন মহেশবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছেন অথচ আপনি এলেন আমাদের পরে। আপনি কি পথ হারিয়েছিলেন? জায়গাটা তো তেমন গোলকধাঁধা নয় কিছু।'

'এ প্রশ্ন আপনি করবেন সে আমি জানতাম,' মৃদু হেসে বললেন অখিলবাবু। 'জায়গাটা গোলকধাঁধা নয় ঠিকই, তবে পথটা দুভাগ হয়ে গেছে সেটা আপনি লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই। মহেশকে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সহজই ছিল। কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার স্মৃতি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে মনে; সেই রকম একটা স্মৃতি আমাকে অন্য পথে নিয়ে যায়। সেটা আর কিছুই না; পঞ্চান্ন বছর আগে ওই দিকেই একটা পাথরে আমি আমার নামের আদ্যক্ষর আর তারিখ খোদাই করে রেখেছিলাম। গিয়ে দেখি সে পাথর এখনো আছে, আর সে খোদাইও আছে—A. B. C.; 15.5.23—বিশ্বাস না হয় আপনি গিয়ে দেখতে পারেন।'

কৈলাসে গিয়ে নূর মহম্মদের কাছে শুনলাম তরুণবাবু আধঘন্টা আগে বেরিয়ে গেছেন বাঘের সন্ধানে—'ছোটাবাবা' আছেন।

প্রীতীনবাবু দোতলায় ছিলেন, খবর দিতে নিচে নেমে এলেন। তাঁর হাতে চিঠি আর ডায়রির প্যাকেট তুলে দিয়ে চলে আসছি, এমন সময় বাধা পড়ল।

নীলিমা দেবী। তিনি ঘরে ঢুকতেই প্রীতীনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে সেটা লক্ষ করলাম।

'আপনাকে একটা কথা বলার ছিল, মিঃ মিত্তির। সেটা আমার স্বামীরই বলা উচিত ছিল, কিন্তু উনি বলতে চাইছেন না।'

প্রীতীনবাবু তাঁর স্ত্রীর দিকে কাতরভাবে চেয়ে আছেন, কিন্তু নীলিমা দেবী সেটা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি বলে চললেন, 'সেদিন বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার স্বামীর হাত থেকে টেপ রেকর্ডারটা পড়ে যায়। আমি সেটা তুলে আমার ব্যাগে রেখে দিই। আমার মনে হয় এটা আপনার কাজে লাগবে। এই নিন।'

প্রীতীনবাবু আবার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে চ্যাপটা ক্যাসেট-রেকর্ডারটা কোটের পকেটে পুরে নিল।

প্রীতীনবাবুকে দেখে মনে হল তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

আমার মন বলছিল যে বাঘ ধরার ব্যাপারে ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতূহল আছে। গাড়িতে উঠে ও হরিপদবাবুকে যা নির্দেশ দিল, তাতে বুঝলাম আমার অনুমান ঠিক।

লালমোহনবাবু যতটা সাহস নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তার কিছুটা বোধহয় কমেছে, কারণ যাবার পথে একবার ফেলুদাকে বললেন, 'ভদ্রলোকের তো অনেক বন্দুক ছিল মশাই—একটা চেয়ে নিলেন না কেন? আপনার কোল্ট বত্রিশ এ ব্যাপারে কোনো কাজে লাগবে কি?'

তাতে ফেলুদা বলল, 'বাঘের গায়ে মাছি বসলে সেটা মারা চলবে।'

সারা পথ ফেলুদা টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে ভল্যুম কমিয়ে কানের কাছে ধরে রইল। কী শুনল ওই জানে।

কাল রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় অনেক জায়গাই ভিজে ছিল। বড় রাস্তা থেকে একটা মোড়ের কাছে এসে কাঁচা মাটিতে টায়ারের দাগ দেখে বুঝলাম কিছু গাড়ি মেন রোড থেকে বেঁকে ওই দিকেই গেছে। আমরাও বাঁয়ের রাস্তা নিলাম, আর মাইল খানেক গিয়েই দেখলাম রাস্তার বাঁ ধারে একটা বটগাছের পাশে তিনটে তিনরকম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—একটা বন বিভাগের জীপ, একটা অরুণবাবুর ফিয়াট আর একটা বাঘের খাঁচাসমেত সার্কাসের ট্রাক। পাঁচজন লোক গাছটার তলায় বসে ছিল, তারা বলল আধঘণ্টা হল বাঘ খোঁজার দল বনের ভিতর চলে গেছে। কোনদিকে গেছে সেটাও দেখিয়ে দিল। লোকগুলোর মধ্যে একটাকে সেদিন সার্কাসের তাঁবুতে দেখেছি; ফেলুদা তাকেই জিগ্যেস করল ট্রেনারও এসেছে কিনা। লোকটা বলল যে দ্বিতীয় ট্রেনার চন্দ্রন এসেছে।

আমরা রওনা দিলাম। সামনে কী অভিজ্ঞতা আছে জানি না, তবে এইটুকু

জানি যে অরুণবাবুর হাতে বন্দুক আছে, হয়ত বন বিভাগের শিকারীর হাতেও আছে, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই। লালমোহনবাবু মনে হল একটু মুষড়ে পড়েছেন তার কারণ নিশ্চয়ই কারাগুিকারের বদলে চন্দ্রনের আসা।

ভিজে মাটিতে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ গাইড হিসেবে কাজ করছে। বন ঘন নয়, শীতকালে আগাছাও কম, তাই এগোতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। এর মধ্যে দু একবার ময়ূর ডেকে উঠেছে; সেটা যে বাঘের সংকেত হতে পারে সেটা আমরা সবাই জানি।

মিনিট দশেক চলার পর শব্দটা পেলাম।

বাঘের ডাক, তবে গর্জন বলব না। ইংরিজিতে এটাকে গ্রাউল বলে, বাঙলায় হয়ত গোঙানি, কিংবা গরগরানি বা গজগজানি। ঘন ঘন ডাক, আর বিরক্তির ডাক, বিক্রমের নয়।

আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। অদ্ভুত কেননা এ জিনিস সার্কাসের বাইরে কখনো যে দেখতে পাব এটা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমাদের সামনে বাঁয়ে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দুজনের হাতে বন্দুক। একটা বন্দুক অরুণবাবুর হাতে, সেটা উঁচিয়ে তাগ করা আছে সামনের দিকে।

এই তিনজনের পিছনে একটা খোলা জায়গা, যেটাকে বলা যেতে পারে সার্কাসের রিং। এই রিং-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ডান হাতে চাবুক আর বাঁ হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে একটা লোক। বাঁ কাঁধে ব্যান্ডেজ দেখে বুঝলাম ইনিই হলেন ট্রেনার চন্দ্রন। আমার দিকে পিছন ফিরে হাতের চাবুকটা মাঝে মাঝে সপাং করে মাটিতে মেরে চন্দ্রন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে যার দিকে সে হল আমাদের কালকের দেখা গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাস থেকে পালানো বাঘ সুলতান।

এ ছাড়া আরো চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাঁয়ে একটু দূরে, তাদের দুজনের হাতে যে শিকলটা রয়েছে সেটাই নিশ্চয়ই বাঘকে পরানো হবে, যদি সে ধরা দেয়।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সুলতানের হাবভাব। সে পালানোর কোনো চেষ্টা করছে না, অথচ ধরা দেবারও যেন বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। শুধু তাই নয়, তার চোখে মুখে যে রাগ আর অবজ্ঞার ভাবটা ফুটে উঠেছে সেটা সে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে চাপা গর্জনে।

চন্দ্রন যদিও এক পা এক পা করে এগোচ্ছে বাঘটার দিকে, তাকে দেখে মনে হয় না যে তার নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সে যে একবার জখম হয়েছে এই বাঘেরই হাতে সেটা সে নিশ্চয়ই ভুলতে পারছে না।

আমি আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছি অরুণবাবুর দিকে। তিনি যেভাবে বন্দুক উঁচিয়ে স্থির লক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বেশ বুঝতে পারছি সুলতান বেসামাল কিছু করলেই বন্দুক গর্জিয়ে উঠে তাকে ধরাশায়ী করে দেবে। আমার বাঁ পাশে দু পা সামনে ফেলুদা পাথরের মতো দাঁড়ানো ডাইনে লালমোহনবাবু, তাঁর মুখ এমনভাবে হাঁ হয়ে রয়েছে যে মনে হয় না চোয়াল আর কোনোদিনও উঠবে। (ভদ্রলোক পরে বলেছিলেন যে তাঁর ছেলেবয়সে তিনি যত সার্কাসে যত বাঘের খেলা দেখেছিলেন, তার সমস্ত স্মৃতি নাকি মুছে গেছে আজকের হাজারিবাগের বনের মধ্যে দেখা এই সার্কাসে)।

চন্দ্রন যখন পাঁচ হাতের মধ্যে, তখন সুলতান হঠাৎ তার সমস্ত মাংসপেশী টান করে শরীরটা একটু নিচু করল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফেলুদা একটা নিঃশব্দ লাফে অরুণবাবুর ধারে পৌঁছে গিয়ে তাঁর বন্দুকের নলের উপর হাত রেখে মৃদু চাপে সেটাকে নামিয়ে দিল।

'সুলতান!'

গুরুগম্ভীর ডাকটা এসেছে আমাদের ডান দিক থেকে। যিনি ডাকটা দিয়েছেন, তাঁকে আগে থেকে দেখতে পেয়েই যে ফেলুদা এই কাজটা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'সুলতান! সুলতান!'

গম্ভীর স্বরটা নরম হয়ে এল। অবাক হয়ে দেখলাম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন রিং-মাস্টার কারান্তিকার; এঁরও হাতে চাবুক, পরনে সাধারণ প্যান্ট আর শার্ট। গলা অনেকখানি নামিয়ে নিয়ে পোষা কুকুর বা বেড়ালকে যেমন ভাবে ডাকে, সেই ভাবে ডাকতে ডাকতে কারান্তিকার এগিয়ে গেলেন সুলতানের দিকে।

চন্দ্রন হতভম্ব হয়ে পিছিয়ে গেল। অরুণবাবুর বন্দুক ধীরে ধীরে নেমে গেল। বন বিভাগের কর্তার মুখ লালমোহনবাবুর মুখের মতোই হাঁ হয়ে গেল। বনের মধ্যে এগারো জন হতবাক দর্শক দেখল গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের রিংমাস্টার কী আশ্চর্য কৌশলে পালানো বাঘকে বশ করে তার গলায় চেন পরিয়ে দিল, আর তারপর সেই চেন ধরে সুলতানকে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে এল একেবারে সার্কাসের খাঁচার কাছে। তারপর খাঁচার দরজা খুলে তার বাইরে টুল রেখে দিল সার্কাসের লোক, আর কারান্তিকার চাবুকের এক আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আপ্!' বলতেই সেই বাঘ তীরবেগে ছুটে গিয়ে টুলে পা দিয়ে আবার সার্কাসের খাঁচায় বন্দী হয়ে গেল।

আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম; বাঘ খাঁচায় বন্দী হওয়া মাত্র কারান্তিকার আমাদের দিকে ফিরে একটা সেলাম ঠুকল। তারপর সে একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। এটা একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি, আগে ছিল না।

গাড়িটা চলে যাবার পর অরুণবাবুকে বলতে শুনলাম, 'ব্রিলিয়ান্ট'। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'থ্যাঙ্কস'।

॥ ১১ ॥

কৈলাসে ফিরে এসে ফেলুদা প্রথমে অরুণবাবুর অনুমতি নিয়ে একটা টেলিফোন করল, কাকে জানি না। তারপর বৈঠকখানায় এল, যেখানে আমরা সবাই বসেছি। নীলিমা দেবী চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওঁরা তিনজনে কালই কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন। মহেশবাবুর শ্রাদ্ধ কলকাতাতেই হবে। অখিলবাবুকে বাঘের খবরটা দেওয়াতে তিনি ঘটনাটা দেখতে পেলেন না বলে খুব আপসোস করলেন।

'আমিও ভাবছি কালই বেরিয়ে পড়ব,' বললেন অরুণবাবু, 'অবিশ্যি যদি আপনার তদন্ত শেষ হয়ে থাকে।'

ফেলুদা জানাল সব শেষ।—'আপনার পিতৃদেবের শেষ ইচ্ছা পালনেও কোনো বাধা নেই। সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।'

অরুণবাবু চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি তুললেন।

'সে কি, বীরেনের খোঁজ পেয়ে গেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাবা ঠিকই অনুমান করেছিলেন।'

'মানে?'

'তিনি এখানেই আছেন।'

'হাজারিবাগে?'

'হাজারিবাগে।'

'খুবই আশ্চর্য লাগছে আপনার কথাটা শুনে।'

আশ্চর্য লাগার সঙ্গে যে একটা অবিশ্বাসের ভাবও মিশে আছে সেটা অরুণবাবুর কথার সুরেই বোঝা গেল। ফেলুদা বলল 'আশ্চর্য তো হবারই কথা, কিন্তু আপনারও এ রকম একটা সন্দেহ হয়েছিল, তাই নয় কি?'

অরুণবাবু হাতের কাপটা নামিয়ে সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'শুধু তাই নয়,' ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার মনে এমনও ভয় ঢুকেছিল যে মহেশবাবু হয়ত আবার নতুন উইল করে আপনাকে বাদ দিয়ে বীরেনকে তাঁর সম্পত্তির ভাগ দেবেন।'

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব। লালমোহনবাবু আমার পাশে বসে সোফার একটা কুশন খামচে ধরেছেন। প্রীতীনবাবুর মাথায় হাত। অরুণবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর চোখ লাল, তাঁর কপালের রগ ফুলে উঠেছে।

'শুনুন মিঃ মিত্তির,' গর্জিয়ে উঠলেন অরুণবাবু, 'আপনি নিজেকে যত বড়ই গোয়েন্দা ভাবুন না কেন, আপনার কাছ থেকে এমন মিথ্যে, অমূলক, ভিত্তিহীন অভিযোগ আমি বরদাস্ত করব না।—জগৎ সিং!'

পিছনের দরজা দিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

'আর একটি পা এগোবে না তুমি!'—ফেলুদার হাতে রিভলভার, সেটার লক্ষ্য অরুণবাবুর পিছনে জগৎ সিং-এর দিকে।—'ওর মাথার একগাছা চুল কাল রাত্রে আমার হাতে উঠে এসেছিল। আমি জানি ও আপনারই আজ্ঞা পালন করতে এসেছিল আমার ঘরে। ওর মাথার খুলি উড়ে যাবে যদি ও এক পা এগোয় আমার দিকে!'

জগৎ সিং পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

অরুণবাবু কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন সোফাতে।

'আ-আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'শুনুন সেটা মন দিয়ে,' বলল ফেলুদা, 'আপনি উইল চেঞ্জ করার রাস্তা বন্ধ করার জন্য আপনার বাবার চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন। বিবি দেখেছিল মহেশবাবুকে চাবি খুঁজতে। মহেশবাবু হেঁয়ালি করে তাঁর নাতনীকে বলেছিলেন তিনি কী হারিয়েছেন, কী খুঁজছেন। এই কী হল Key—অর্থাৎ চাবি। কিন্তু চাবি সরিয়েও আপনি নিশ্চিন্ত হননি। তাই আপনি সেদিন রাজরাপ্পায় সুযোগ পেয়ে আপনার মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন আপনার বাবার উপর। আপনি জানতেন সেই অস্ত্রে মৃত্যু হতে পারে—এবং সেটা হলেই আপনার কার্যসিদ্ধি হবে—'

'পাগলের প্রলাপ! পাগলের প্রলাপ বকছেন আপনি!'

'সাক্ষী আছে, অরুণবাবু—একজন নয়, তিনজন—যদিও তাঁরা কেউই সাহস করে সেটা প্রকাশ করেননি। আপনার ভাই সাক্ষী—অখিলবাবু সাক্ষী—শঙ্করলাল সাক্ষী।'

'সাক্ষী যেখানে নির্বাক, সেখানে আপনার অভিযোগ প্রমাণ করছেন কী করে, মিঃ মিত্তির?'

'উপায় আছে, অরুণবাবু। তিনজন ছাড়াও আরেকজন আছে যে নির্দ্বিধায় সমস্ত সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করবে।'

কৈলাসের বৈঠকখানায় পাখির ডাক কেন? জলপ্রপাতের শব্দ কেন?

অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে প্রীতীনবাবুর ক্যাসেট রেকর্ডারটা বার করেছে।

'সেদিন একটি ঘটনা দেখে এবং কয়েকটি কথা শুনে বিহ্বল হয়ে প্রীতীনবাবু হাত থেকে এই যন্ত্রটা ফেলে দেন। নীলিমা দেবী এটা কুড়িয়ে নেন। এই যন্ত্রে পাখির ডাক ছাড়াও আরো অনেক কিছু রেকর্ড হয়ে গেছে, অরুণবাবু।'

এইবারে দেখলাম অরুণবাবুর মুখ ক্রমে লাল থেকে ফ্যাকাসের দিকে চলেছে। ফেলুদার ডান হাতে রিভলভার, বাঁ হাতে টেপ রেকর্ডার।

পাখির শব্দ ছাপিয়ে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। ক্রমে এগিয়ে আসছে গলার স্বর, স্পষ্ট হয়ে আসছে। অরুণবাবুর গলা—

'বাবা, বীরু ফিরে এসেছে এ ধারণা তোমার হল কী করে?'

তারপর মহেশবাবুর উত্তর—

'বুড়ো বাপের যদি তেমন ধারণা হয়েই থাকে, তাতে তোমার কী?'

'তোমার এ বিশ্বাস মন থেকে দূর করতে হবে। আমি জানি সে আসেনি, আসতে পারে না। অসম্ভব।'

'আমার বিশ্বাসেও তুমি হস্তক্ষেপ করবে?'

'হ্যাঁ, করব। কারণ বিশ্বাসের বশে একটা অন্যায় কিছু ঘটে যায় সেটা আমি চাই না।'

'কী অন্যায়?'

'আমার যা পাওনা তা থেকে বঞ্চিত করতে দেব না তোমাকে আমি।'

'কী বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি। একবার উইল বদল করেছ তুমি বীরু আসবে না ভেবে। তারপর আবার—'

'উইল আমি এমনিও চেঞ্জ করতাম!'—মহেশবাবুর গলার স্বর চড়ে গেছে; তাঁর পুরানো রাগ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তিনি বলে চলেছেন—

'তুমি আমার সম্পত্তির ভাগ পাবার আশা কর কী করে? তুমি অসৎ, তুমি জুয়াড়ী, তুমি চোর!—লজ্জা করে না? আমার আলমারি থেকে শোবেকচাঁদের দেওয়া স্ট্যাম্প অ্যালবাম—'

মহেশবাবুর বাকি কথা অরুণবাবুর কথায় ঢাকা পড়ে গেল। তিনি উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠেছেন—

'আর তুমি? আমি যদি চোর হই তবে তুমি কী? তুমি কি ভেবেছ আমি জানি না? দীনদয়ালের কী হয়েছিল আমি জানি না? তোমার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সব দেখেছিলাম আমি পর্দার ফাঁক দিয়ে। পঁয়ত্রিশ বছর আমি মুখ বন্ধ রেখেছি। তুমি দীনদয়ালের মাথায় বাড়ি মেরেছিলে পিতলের বুদ্ধমূর্তি দিয়ে। দীনদয়াল মরে যায়। তারপর নূর মহম্মদ আর ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়িতে করে তার লাশ—'

এর পরেই একটা ধুপ শব্দ, আর কথা বন্ধ। তারপর শুধু পাখির ডাক আর জলের শব্দ।

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে সেটা শ্রীতীনবাবুকে ফেরত দিয়ে দিল ফেলুদা।

মিনিটখানেক সকলেই চুপ, আর সকলেই কাঠ, এক ফেলুদা ছাড়া।

ফেলুদা রিভলভারটা চালান দিল পকেটে। তারপর বলল, 'আপনার বাবা গর্হিত কাজ করেছিলেন, সাংঘাতিক অন্যায় করেছিলেন, সেটা ঠিক, কিন্তু তার জন্য তিনি পঁয়ত্রিশ বছর যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, যত রকমে পেরেছেন প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তবুও তিনি শান্তি পাননি। যেদিন সেই ঘটনা ঘটে, সেইদিন থেকেই তাঁর ধারণা হয়েছে যে, তাঁর জীবনটা অভিশপ্ত, তাঁর অন্যায়ের শাস্তি তাঁকে একদিন না একদিন পেতেই হবে। অবিশ্যি সেই শাস্তি এভাবে তাঁর নিজের ছেলের হাত থেকে আসবে, সেটা তিনি ভেবেছিলেন কিনা জানি না।'

অরুণবাবু পাথরের মতো বসে আছেন মেঝের কার্পেটটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। যখন কথা বললেন, তখন মনে হল তাঁর গলার স্বরটা আসছে অনেক দূর থেকে।

'একটা কুকুর ছিল। আইরিশ টেরিয়ার। বাবার খুব প্রিয়। দীনদয়ালকে দেখতে পারত না কুকুরটা। একদিন কামড়াতে যায়। দীনদয়াল লাঠির বাড়ি মারে। কুকুরটা জখম হয়। বাবা ফেরেন বাড়িতে—পার্টি থেকে। কুকুরটা ওঁর ঘরেই অপেক্ষা করত। সেদিন ছিল না। নূর মহম্মদ ঘটনাটা বলে। বাবা দীনদয়ালকে ডেকে পাঠান। রাগলে বাবা আর মানুষ থাকতেন না...'

ফেলুদার সঙ্গে আমরাও উঠে পড়লাম। অখিলবাবুও উঠছেন দেখে ফেলুদা বলল, 'আপনি একটু আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন কি? কাজ ছিল।'

'চলুন', বললেন ভদ্রলোক, 'মহেশ চলে গিয়ে আমার তো এখন অখণ্ড অবসর।'

॥ ১২ ॥

গাড়িতে অখিলবাবু বললেন— 'আমার নাম লেখা পাথরটার পাশে দাঁড়িয়েই আমি ওদের কথা শুনতে পাই। তাকে অনেক সময় জিগ্যেস করেছি সে হঠাৎ হঠাৎ এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কেন। সে ঠাট্টা করে বলত—"তুমি গুনে বার কর, আমি বলব না।" আশ্চর্য—তার জীবনের এত বড় একটা ঘটনা—সেটা কুষ্ঠীতে ধরা পড়ল না কেন বুঝতে পারছি না! হয়ত আমারই অক্ষমতা।'

বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন বুঝতে পারলাম ফেলুদা কাকে ফোন করেছিল।

ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন শঙ্করলাল মিত্র।

'আপনার মিশন সাকসেসফুল?' গাড়ি থেকে নেমে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'হ্যাঁ', বললেন শঙ্করলাল, 'বীরেন এসেছে।'

আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতে সেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলেন। লম্বা চুল, রুক্ষ লম্বা দাড়ি, লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা।

'বাপের শেষ ইচ্ছার কথা শুনে বীরেন আসতে রাজি হল,' বললেন শঙ্করলাল, 'মহেশবাবুর উপর কোনো আক্রোশ নেই ওর।'

'যেমন আক্রোশ নেই, তেমনি আকর্ষণও নেই,' বললেন বীরেন-সন্ন্যাসী। 'শঙ্কর এবার অনেক চেষ্টা করেছিল আমাকে ফিরিয়ে আনতে। বলেছিল—ওদের দেখলে তোমার টানটা হয়ত ফিরে আসবে। ওর কথাতেই আমি রাজরাপ্পায় গিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু দূর থেকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম আমার আত্মীয়দের উপর আমার কোনো টান নেই। বাবা তবু আমাকে কিছুটা বুঝেছিলেন, তাই প্রথম প্রথম ওঁকে চিঠিও লিখেছি। কিন্তু তারপর...'

'কিন্তু সে চিঠি তো আপনি বিদেশ থেকে লেখেননি,' বলল ফেলুদা, 'আমার বিশ্বাস আপনি দেশের বাইরে কোথাও যাননি কোনোদিন?'

বীরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে ফেললেন। আমি হতভম্ব, কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

'শঙ্কর আমাকে বলেছিল আপনার বুদ্ধির কথা,' বললেন বীরেনবাবু, 'তাই আপনাকে একটু পরীক্ষা করছিলাম।'

'তাহলে আর কী। খুলে ফেলুন আপনার অতিরিক্ত সাজ পোশাক। হাজারিবাগের রাস্তার লোকের পক্ষে ওটা যথেষ্ট হলেও আমার পক্ষে নয়।'

বীরেনবাবু হাসতে হাসতে তাঁর দাড়ি আর পরচুলা খুলে ফেললেন। লালমোহনবাবু আমার পাশ থেকে চাপা গলায় 'কান্...কান্...কান্' বলে থেমে গেলেন। আমি জানি তিনি আবার ভুল নামটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এবার বললেও আর শুধরোতে পারতাম না, কারণ আমার মুখ দিয়েও কথা বেরোচ্ছে না। কথা বললেন অখিলবাবু, 'বীরেন বাইরে যায়নি মানে? ওর চিঠিগুলো তাহলে...?'

'বাইরে না গিয়েও বিদেশ থেকে চিঠি লেখা যায় অখিলবাবু, যদি আপনার ছেলের মতো একজন কেউ বন্ধু থাকে বিদেশে, সাহায্য করার জন্য।'

'আমার ছেলে!'

'ঠিকই বলেছেন মিস্টার মিত্তির,' বললেন বীরেন কারান্দিকার, 'অধীর যখন ডুসেলডর্ফে, তখন ওকে চিঠি লিখে আমি বেশ কিছু ইউরোপীয় পোস্টকার্ড আনিয়ে নিই। সেগুলোতে ঠিকানা আর যা কিছু লিখবার লিখে খামের মধ্যে ভরে ওর কাছেই পাঠাতাম, আর ও টিকিট লাগিয়ে ডাকে ফেলে দিত। অবিশ্যি অধীর দেশে ফিরে আসার পর সে সুযোগটা বন্ধ হয়ে যায়।'

'কিন্তু এই লুকোচুরির প্রয়োজনটা হল কেন?' জিগ্যেস করলেন অখিলবাবু।

'কারণ আছে' বলল ফেলুদা। 'আমি বীরেনবাবুকে জিগ্যেস করতে চাই আমার অনুমান ঠিক কিনা।'

'বলুন।'

'বীরেনবাবু কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর মতো হতে চেয়েছিলেন। সুরেশ বিশ্বাস যে ঘর ছেড়ে খালাসী হয়ে বিদেশে গিয়ে শেষে ব্রেজিলে যুদ্ধ করে নাম করেছিলেন সেটা আমার মনে ছিল। যেটা মনে ছিল না সেটা আমি কাল রাত্রে বাঙালীর সার্কাস বলে একটা বই থেকে জেনেছি। সেটা হল এই যে সুরেশ বিশ্বাস ছিলেন প্রথম বাঙালী যিনি বাঘ সিংহ ট্রেন করে সার্কাসের খেলা দেখিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে আশ্চর্য খেলা ছিল সিংহের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া।'

এখানে লালমোহনবাবু কেন জানি ভীষণ ছটফট করে উঠলেন।

'ও মশাই! ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ এই সেদিন পড়লুম, তাও খেয়াল হল না, ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ...'

'আপনি ছ্যাছ্যাটা পরে করবেন, আগে আমাকে বলতে দিন।'

ফেলুদার ধমকে লালমোহনবাবু ঠাণ্ডা হলেন। ফেলুদা বলে চলল, 'বীরেনবাবুর অ্যাম্বিশন ছিল আসলে বাঘ সিংহ নিয়ে খেলা দেখানো। কিন্তু বাঙালী ভদ্রঘরের ছেলে আজকের দিনে ওদিকে যেতে চাইছে শুনলে কেউ কি সেটা ভালো চোখে দেখত? মহেশবাবুই কি খুশি মনে মত দিতেন? তাই বীরেনবাবুকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তাই নয় কি?'

'সম্পূর্ণ ঠিক,' বললেন বীরেনবাবু।

'কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অ্যাদ্দিন পরে ছেলেকে রিং-মাস্টার হিসেবে দেখেও মহেশবাবু তাকে চিনতে পেরেছিলেন, যদিও অরুণবাবু সামনে থেকে দেখেও চিনতে পারেননি। সেটার কারণ এই যে বীরেনবাবুর নাকে প্ল্যাস্টিক সার্জারি করানো হয়েছিল, যে কারণে ছেলেবেলার ছবির সঙ্গেও নাকের মিল সামান্যই।'

'তাই বলুন!' বলে উঠলেন অখিলবাবু, 'তাই ভাবছি সবাই বীরেন বীরেন করছে, অথচ আমি সঠিক চিনতে পারছি না কেন!'

'যাক্ গে,' বলল ফেলুদা, 'এখন আসল কাজে আসি।'

ফেলুদা পকেট থেকে মুক্তানন্দের ছবিটা বার করল। তারপর বীরেনবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি বোধহয় জানেন না যে, আপনি আর ফিরবেন না ভেবে মহেশবাবু আপনাকে তাঁর উইল থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সেই উইল আর বদল করার উপায় ছিল না। অথচ আপনি একেবারে বঞ্চিত হন সেটাও উনি চাননি। তাই এই ছবিটা আপনাকে দিয়েছেন।'

ফেলুদা ছবিটা উলটে পিছনটা খুলে ফেলল। ভিতর থেকে বেরোল একটা

ভাঁজ করা সেলোফেনের খাম, তার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট কতগুলো রঙিন কাগজের টুকরো।

'তিনটি মহাদেশের ন'টি দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট আছে এখানে। অ্যালবাম চুরি যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান স্ট্যাম্প ক'টি এইভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন। গিবন্‌স ক্যাটালগের হিসেবে পঁচিশ বছর আগে এই ডাকটিকিটের দাম ছিল দু' হাজার পাউন্ড। আমার ধারণা আজকের দিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।'

বীরেন্দ্র কারান্ডিকার খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন সেটার দিকে। তারপর বললেন, 'সার্কাসের রিং-মাস্টারের হাতে এ জিনিস যে বড় বেমানান, মিঃ মিত্তির! আমি খুব অসহায় বোধ করছি। আমরা যাযাবর, ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াই, আমাদের কাছে এ জিনিস... ?'

'বুঝতে পারছি,' বলল ফেলুদা, 'এক কাজ করুন। ওটা আমাকেই দিন। কলকাতার কিছু স্ট্যাম্প ব্যবসায়ীর সঙ্গে চেনা আছে আমার। এর জন্য যা মূল্য পাওয়া যায় সেটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আমার উপর বিশ্বাস আছে তো আপনার?'

'সম্পূর্ণ।'

'কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে আমাকে দিতে হবে!'

'গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাস,' বললেন বীরেনবাবু, 'কুট্টি বুঝেছে যে আমাকে ছাড়া তার চলবে না। আমি এখনো কিছুদিন আছি এই সার্কাসের সঙ্গে। আজ রাত্রে সুলতানকে নিয়ে খেলা দেখাব। আসবেন।'

★

রাত্রে গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসে সুলতানের সঙ্গে কারান্ডিকারের আশ্চর্য খেলা দেখে বেরোবার আগে আমরা বীরেনবাবুকে থ্যাঙ্ক ইউ আর গুড বাই জানাতে তাঁর তাঁবুতে গেলাম। আইডিয়াটা লালমোহনবাবুর, আর কারণটা বুঝতে পারলাম তাঁর কথায়।

'আপনার নামটার মধ্যে একটা আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা রয়েছে,' বললেন জটায়ু, 'ডু ইউ মাইন্ড যদি আমি নামটা আমার সামনের উপন্যাসে ব্যবহার করি? সার্কাস নিয়েই গল্প, রিং-মাস্টার একটা প্রধান চরিত্র।'

বীরেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, 'নামটা তো আমার নিজের নয়! আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর ফেলুদা বলল, 'তাহলে ইনজেকশন বাদ ?'

'বাদ কেন মশাই ? ইনজেকশন দিচ্ছে বাঘকে । ভিলেন হচ্ছে সেকেন্ড ট্রেনার । বাঘকে নিস্তেজ করে কারাণ্ডিকারকে ডাউন করবে দর্শকদের সামনে ।'

'আর ট্র্যাপীজ ?'

'ট্র্যাপীজ ইজ নাথিং,' অবজ্ঞা আর বিরক্তি মেশানো সুরে বললেন লালমোহন গাঙ্গুলী ।

গোয়েন্দা ফেলুদার
রহস্য
অ্যাডভেঞ্চার
হত্যাপুরী
সত্যজিৎ রায়

ডুংরুর কথা

ডুংরু পাশেই শিশির ভেজা ঘাসের উপর বাজনাটা রেখে শুধু-গলায় গান ধরল। ওর কান ভাল, তাই দুদিন শুনেই তুলে নিয়েছে গানটা। হনুমান ফটকের বাইরে বসে যে ভিখিরি গানটা গায়, সে অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও বাজায়। তাই ডুংরুর শখ হয়েছিল সেও বাজাবে। এই বাজনাটা সবজিওয়ালা শ্যাম গুরুঙের। ডুংরু একবেলার জন্য চেয়ে এনে রেখে দিয়েছে তিনদিন। ছড় টেনে সুর বার করা যে এত শক্ত তা কি ও জানত?

ডুংরু গলা ছাড়ল। সামনে ভুট্টা খেতের ওপরে দুটো মোষ আর কয়েকটা ছাগল ছাড়া কাছে-পিঠে কেউ নেই। ডুংরুর ঠিক পিছনেই খাড়া পাহাড়, তার নীচে একটা বাদাম গাছ, তারই ঠিক সামনে ডুংরুর বসার ঢিবি। ওই যে দূরে ইটের তৈরি টালির ছাতওয়ালা দোতলা বাড়ি, ওটা ডুংরুদের বাড়ি। ভুট্টার খেতটাও ওদের। উত্তরে কুয়াশায় আবছা পাহাড়ের পিছনে তিনদিকে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে যেটার চুড়ো মাছের লেজের মতো দু ভাগ হয়ে গেছে, যেটার নাম মাচ্ছাপুছরে, সেটার ডগা এখন গোলাপি।

প্রথম দুটো লাইন গাইবার পর তিনের মাথায় যেখানে সুরটা চড়ে, সেখানে আসতেই আকাশ ভাঙল। গুড় গুড় শব্দটা শুনেই ডুংরু এক লাফে পাঁচ হাত পাশে সরে গিয়েছিল, নইলে ওই হাতির মাথার মতো পাথরটা বাজনাটার সঙ্গে সঙ্গে ওকেও থেঁতলে দিত।

ওরে বাব্বা! ওটা কী—বাদামগাছটার মাথা ফুঁড়ে সেটাকে তছনছ করে একরাশ ডালপালা খুবলে নিয়ে মাটিতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল ওটা কী?

একটা মানুষ।

না, একটা বাবু।

মাথায় রক্ত, থুতনিতে রক্ত, একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে দুমড়ে আছে যেন খড়ের পুতুল। লোকটা মরে গেছে কি?

না, ওই যে মাথাটা নড়ল।

ডুংরুর ধাঁ করে মনে পড়ে গেল ওদের কথা। ওই পুবের গমের খেতটা পেরিয়ে রাস্তার ওপারে পাহাড়ের গায়ে ঝরনার ধারে তাঁবু ফেলে যে চারজন আছে—যাদের দাড়ির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ডুংরু, কারণ ওর নিজের বাপ খুড়ো দাদু মামা মেসো কারু দাড়ি নেই—যদি কেউ কিছু করতে পারে তো ওরাই পারবে। ওরা চেনে ডুংরুকে। ডুংরু ওদের গান শুনিয়েছে, খেত থেকে ভুট্টা

নিয়ে গিয়ে দিয়েছে, ওরা ডুংরুকে পয়সা দিয়েছে—এক টাকা, দু টাকা, একদিন পাঁচ টাকা।

ডুংরু দিল ছুট।

'হাই, হাই—কাম, জো, কাম!'

'হোয়াটস আপ?'

ডুংরু জিভ বার করে মাথা চিতিয়ে চোখ উলটিয়ে দেখিয়ে দিল। এরা বুঝল। এ ভাষা সকলেই বোঝে।

'গো!—জিপ, জিপ!—গো!'

এদের জিপের গায়ে রামধনুর রং। এমন গাড়ি ডুংরু দেখেনি কখনও। অনেক গাড়ি সে দেখেছে বড় রাস্তা দিয়ে পোখরার দিকে যেতে।

জো, মার্ক, ডেনিস আর ব্রুস উঠে পড়ল জিপে। ডুংরুকে তুলে নিল সঙ্গে। একটা কিছু হয়েছে; দেখা দরকার।

হ্যাঁ, হয়েছেই বটে।

জাম্পিং জেহোশাফ্যাট! সর্বনাশের মাথায় বাড়ি!

চারজনে ঝুঁকে পড়ল লোকটার উপর। মার্ক মিনেসোটায় ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে নেপালে।

বেহুঁশ রক্তাক্ত লোকটাকে ধরাধরি করে তুলল ওরা জিপে।

হাসপাতাল কাঠমাণ্ডুতে। এখান থেকে তেত্রিশ কিলোমিটার।

॥ ১ ॥

মানুষের হাতে যে রেখাটাকে বিলিতি মতে হেডলাইন বা বুদ্ধির রেখা বলে, ফেলুদার যে সেটা আশ্চর্যরকম লম্বা আর স্পষ্ট, সেটা আমি জানি। ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলে বলে ও পামিস্ট্রিতে বিশ্বাস করে না, অথচ পামিস্ট্রির বই ওর আছে, আর সে বই ওকে পড়তেও দেখেছি। একবার এটাও দেখেছি—ফেলুদা ওর মার্কামারা একপেশে হাসিটা হেসে লালমোহনবাবুকে ওর বুদ্ধির রেখাটা দেখাচ্ছে। লালমোহনবাবু অবিশ্যি ঐ সব ষোলো আনা বিশ্বাস করেন। তাই ফেলুদার হেডলাইনের বহর দেখে দুবার চাপা গলায় 'অ্যামেজিং' কথাটা বলেছিলেন, আর মিনিটখানেক পরে কথার ফাঁকে নিজের ডান হাতের মুঠো খুলে চোখ নামিয়ে রেখাগুলোর দিকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

হাত দেখে মোটামুটি অতীত-ভবিষ্যৎ বলতে আমার ছোট কাকাই পারেন। এমনকী মুখ দেখে ভাগ্য বলে দেবার ক্ষমতাও কারুর কারুর আছে বলে শুনেছি। কিন্তু কোনও লোকের কপালের ঠিক মধ্যিখানে কড়ে আঙুলের ডগা ঠেকিয়ে রেখে চোখ বুজে সেই লোকের ভাগ্য গণনার ক্ষমতা যে কারুর থাকতে পারে, সেটা এই পুরী এসে প্রথম শুনলাম।

কলকাতায় লোডশেডিং-এ নাজেহাল অবস্থা, তার উপর একটানা গরম চলেছে একশো দশ ডিগ্রি। ছাপাখানায় লোডশেডিং-এর জন্য রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর নতুন উপন্যাস বৈশাখে বেরোতে পারেনি। ভদ্রলোকের আরও আপশোস এই জন্য যে, এটা ওঁর প্রথম ভৌতিক উপন্যাস। ফেলুদাই ওঁকে বলেছিল যে মোমবাতির আলোয় রহস্য-কাহিনীর চেয়ে ভূতের গল্প জমবে বেশি। সত্যি বলতে কী, 'পিঠাপুরমের পিশাচ' গল্পের আইডিয়াটা ফেলুদাই জটায়ুকে দিয়েছিল। কিন্তু সে বই সময় মতো বেরোল না দেখে লালমোহনবাবু রীতিমতো খাপ্পা হয়ে এক রোববারের সকালে আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, 'নাঃ, এ শহরে আর থাকা চলবে না। আর শুনেছেন তো স্কাইল্যাবের ব্যাপার?'

স্কাইল্যাব কলকাতায় পড়বে এ খবর কোথাও বেরোয়নি, কিন্তু লালমোহনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস কলকাতার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাই স্কাইল্যাবের একটা বড় অংশ এখানে না পড়ে যায় না।

ফেলুদাকে দেখেছি ও প্রায় যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে। ওয়েটিং রুমে জায়গা না পেলে প্ল্যাটফর্মে চাদর বিছিয়ে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে রাত কাটাতে দেখেছি কতবার। বালিশও লাগে না—হাত ভাঁজ করে তার উপর

মাথা। কিন্তু বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ঘণ্টাখানেক না পড়লে যার ঘুম আসে না, তার পক্ষে সেই অভ্যাসটা বন্ধ হয়ে গেলে আর কতদিন মাথা ঠিক রাখা যায়? বই পড়া ছেড়ে কিছুদিন তাস নিয়ে হাত সাফাই অভ্যেস করল। তারপর কিছুদিন মুখে মুখে লিমেরিক বানাল, তার একটা লালমোহনবাবুকে নিয়ে—

বুঝে দেখ জটায়ুর কলমের জোর
ঘুরে গেছে রহস্য কাহিনীর মোড়
থোড় বড়ি খাড়া
লিখে তাড়াতাড়া
এইবারে লিখেছেন খাড়া বড়ি থোড়।

এটা অবিশ্যি জটায়ুকে বলা হয়নি, আর এই লিমেরিক লেখাও বেশিদিন চলেনি। ভাবলে মনে হয়, শহরে রাত্তিরে বাতি না থাকলে হয়তো খুন-রাহাজানি অনেক বাড়বে; কিন্তু দুঃখের বিষয় গত তিন মাসে ফেলুদার কোনও কেস জোটেনি, আর ক্রাইমও যা হয়েছে, সেগুলোর কিনারা পুলিশেই করেছে।

তাই বোধহয় ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'সত্যি, কল্লোলিনী তিলোত্তমা বড় জ্বালাচ্ছে; শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ক্রমাগত কাজের ব্যাঘাত, পড়াশুনার ব্যাঘাত, মশার কামড়ে চিন্তার ব্যাঘাত—এগুলো বরদাস্ত করা কঠিন।'

'উড়িষ্যাতে তো একসেস্, তাই না?'

লালমোহনবাবুর এই প্রশ্ন থেকে এল পুরীর কথা, আর পুরী থেকে এল সি-বিচের কাছে নতুন তৈরি নীলাচল হোটেলের কথা, যার মালিক শ্যামলাল বারিক লালমোহনবাবুর বাড়িওয়ালা সুধাকান্তবাবুর ক্লাস-ফ্রেন্ড।

কিন্তু তা হলে কী হবে? সুধাকান্তবাবু খোঁজ নিয়ে জানালেন জুনের মাঝামাঝির আগে ঘর পাওয়া যাবে না।

তাতেও অবিশ্যি আমরা পেছপা হইনি। জুনের মধ্যে কলকাতার অবস্থার উন্নতির কোনও আশা নেই। একুশে জুন আমরা পুরী এক্সপ্রেসে গিয়ে দিলাম রওনা। একবার কথা হয়েছিল যে লালমোহনবাবুর অ্যাম্বাসাডরে যাওয়া হবে, শেষে ভদ্রলোক নিজেই 'এই সময়টায় লং জার্নিতে মাঝপথে ঝড়বাদল হলে ফ্যাসাদ হতে পারে মশাই' বলে পিছিয়ে গেলেন। গাড়ি যাবে, তবে সেটা ড্রাইভার হরিপদবাবু নিয়ে যাবেন; আমাদের একদিন পরে পৌঁছবে। পুরী ছাড়াও আরও দু-একটা জায়গা ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে, সেটা নিজেদের গাড়ি থাকলে সুবিধে হবে।

ট্রেনের ঘটনার মধ্যে একটাই লেখার মতো। আমাদের ফোর-বার্থ কামরায় একটা আপার বার্থে একজন ভদ্রলোক ছিলেন যিনি সিগারেট খাচ্ছিলেন একটা হোল্ডারে যেটা ফেলুদা বলল সোনার। যে লাইটারে সিগারেট ধরাচ্ছিলেন সেটা নাকি গোল্ড-প্লেটেড, আর তার দাম নাকি তিন হাজার টাকা। যে কেস থেকে সিগারেট বার করলেন সেটা সোনার, চশমা সোনার, শার্টের কাফ-লিংকস

সোনার। দুহাত মিলিয়ে তিনটে আংটি সোনার, আর ওপর থেকে পা ঝুলিয়ে নীচে নামতে গিয়ে লালমোহনবাবুর কাঁধে বুড়ো আঙুল লাগাতে যখন হেসে 'সরি' বললেন, তখন দেখলাম একটা দাঁত সোনার। পুরী স্টেশনে নেমে কুলির মাথায় জিনিস তুলে ভদ্রলোকটি যখন ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, তখন লালমোহনবাবু বললেন, 'ইস, এমন সোনায় মোড়া ভদ্রলোকটির নামটা জিজ্ঞেস করা হল না।' ফেলুদা বলল, 'সেটা জানার একটা সহজ উপায় ছিল। কামরার বাইরে রিজার্ভেশন চার্ট টাঙানো ছিল হাওড়া থেকেই। ভদ্রলোকের নাম এম. এল. হিঙ্গোরানি।'

॥ ২ ॥

নীলাচল হোটেলে একবেলা থেকেই সেটাকে সিক্স-স্টার হোটেল বলে ঘোষণা করলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা বলল, 'হোটেলে সুইমিং পুল না থাকলে সেটা পাঁচ তারার পর্যায়ে ওঠে না; আর পাঁচের উপর রেটিং নেই। আপনি কি দুশো গজ দূরে ওই সমুদ্রটাকে নীলাচলের নিজস্ব সাঁতারের চৌবাচ্চা বলে ধরছেন? তা হলে অবিশ্যি আপনার রেটিং-এ ভুল নেই।'

আসলে দুপুরে খাওয়াটা বেশ ভাল হয়েছিল। লালমোহনবাবুকে লোভী বলা চলে না, তবে তিনি রসিক খাইয়ে তাতে সন্দেহ নেই। বললেন, 'কাঁচকলার কোফতা এত উপাদেয় হয় জানা ছিল না মশাই। এদের কুকিং-এর জবাব নেই। তা ছাড়া তকতকে বেডরুম-বাথরুম, সদালাপী ম্যানেজার, ইনস্ট্যান্ট পাখা-বাতি, সমুদ্রের নৈকট্য—সিক্স-স্টার বলব না কেন মশাই?'

পুরনো হলে কী হবে জানি না, নতুন অবস্থায় হোটেলটা সত্যিই বেশ ভাল। ফেলুদা আর আমি দোতলায় একটা ডাবলরুমে আছি, পাশের ডাবল রুমটা লালমোহনবাবু গড়িয়াহাটার এক কাপড়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে শেয়ার করে আছেন। ম্যানেজার শ্যামলাল বারিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, বলেছেন সন্ধ্যাবেলা একটু ফাঁক পেলেই আমাদের ঘরে আসবেন।

হোটেলের গেট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে মিনিটখানেক গেলেই পায়ের তলায় বালি শুরু হয়ে যায়। আমি শেষ পুরী এসেছি যখন আমার বয়স পাঁচ বছর। ফেলুদা বছর দুয়েক আগে রাউরকেল্লা এসেছিল একটা কেসে, তখন উড়িষ্যার অনেক জায়গাই দেখে গেছে, পুরী তো বটেই। কেবল লালমোহনবাবু বললে বিশ্বাস করা কঠিন—এই প্রথম নাকি পুরী এলেন। আমরা অবাক ভাব দেখানোয় উনি বললেন, 'আরে মশাই, কলকাতার ভেতরেই কত কী আছে এখনও দেখলুম না, আর পুরী! ভাবতে পারেন, আমার বাড়ির তিন মাইলের মধ্যে জৈন টেম্পল; জন্মে অবধি নাম শুনে আসছি, এখনও চোখে দেখিনি।'

সমুদ্র দেখে লালমোহনবাবু যে কবিতাটা আবৃত্তি করলেন সেটা আমি কক্ষনও শুনিনি। জিজ্ঞাসা করতে বললেন সেটা বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের লেখা। তিনি নাকি এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশনের বাংলার মাস্টার ছিলেন। লালমোহনবাবু যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন, তখন নাকি এই কবিতাটা আবৃত্তি করে প্রাইজ পেয়েছিলেন। বললেন শেষের দুটো লাইন নাকি পার্টিকুলারলি ভাল—'আরেকবার মন দিয়ে শোনো তপেশ, তা হলেই বিউটিটা ধরতে পারবে—

'অসীমের ডাক শুনি কল্লোল মর্মরে
এক পায়ে খাড়া থাকি একা বালুচরে।'

ফেলুদা মন্তব্য করল, 'কবি নিশ্চয়ই এখানে নিজেকে সারসের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করছেন, কারণ এই ঝোড়ো বাতাসে বালির উপর মানুষের পক্ষে এক পায়ে খাড়া থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। যাই হোক, এবার বলুন তো বালির উপর ওই ছাপগুলোর কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে কি না।'

বালির উপর দিয়ে কেউ হেঁটে গেছে পুব থেকে পশ্চিমে। জুতোর ছাপের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ছাপ চলেছে, সেটা নিশ্চয়ই লাঠি। লালমোহনবাবু বেশ কিছুক্ষণ ছাপগুলোর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'জুতো অ্যান্ড লাঠি সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে, তবে বিশেষ তাৎপর্য...'

'তোপসে, তোর কী মনে হয়?'

আমি বললাম, 'লোকে তো সাধারণত ডান হাতে লাঠি ধরে। এখানে দেখছি ছাপটা বাঁদিকে।'

ফেলুদা আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে দিল, যার মানে সাবাস। তারপর

বলল, 'ভদ্রলোক ন্যাটা হলে আশ্চর্য হব না।'

আমরা যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে লোক বলতে তিনটে নুলিয়ার বাচ্চা, তার মধ্যে একটা কাঁকড়া ধরছে, আর দুটো ঝিনুক কুড়োচ্ছে। ভিড়টা আরম্ভ হয় আরও এগিয়ে গিয়ে, যেখানে কাছাকাছির মধ্যে বেশ কয়েকটা বাঙালি হোটেল রয়েছে। আমরা আরও এগিয়ে যাব যাব করছি, এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল।

'মিস্টার গাঙ্গুলী!'

ঘুরে দেখি জটায়ুর রুমমেট, সেই দোকানের মালিক। গোলগাল হাসিখুশি মিশুকে লোক, আলাপ হতে জানলাম নাম শ্রীনিবাস সোম, দোকানের নাম হেমাঙ্গিনী স্টোর্স, হেমাঙ্গিনী ভদ্রলোকের মায়ের নাম।

'যাইবেন না?' ভদ্রলোক লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন। 'ছয়টায় টাইম দিসে কিন্তু।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছিলেন; এবার কারণটা বুঝলাম। কিন্তু-কিন্তু ভাব করে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি তো বোধহয় নট ইন্টারেস্টেড তাই আপনাকে জোর করব না।'

'ব্যাপারটা কী?'

'ইয়ে, ইনি এক আশ্চর্য গণকের কথা বলছিলেন। কপালে আঙুল রেখে ভাগ্য বলে দেন।'

'কার কপালে?'

'যার ভাগ্য বলছেন তার, ন্যাচারেলি।'

'কপালের লিখন পড়তে পারেন বলছেন?'

'শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা অবিশ্যি কপালের লেখা পড়াতে রাজি হল না। তাও আমরা দুজনে গণৎকারের বাড়ি অবধি গেলাম ওঁদের সঙ্গে। গণৎকারের বাড়ি বলাটা অবিশ্যি ঠিক হল না; একটা তিনতলা বাড়ির একতলার দুটো ঘর নিয়ে থাকেন ভদ্রলোক। সমুদ্রের ধার দিয়ে সোজা পুবদিকে নুলিয়া বস্তি লক্ষ রেখে গিয়ে যেখানে চেঞ্জারদের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে, সেখানে বাঁয়ে বালির চড়াই উঠে ত্রিশ চল্লিশ গজ গেলে বালিতে বসা একটা পোড়ো বাড়ির কিছুটা দূরেই এই তিনতলা বাড়িটা। গেটের একদিকে শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা 'সাগরিকা,' অন্যদিকে 'ডি. জি. সেন'। পুরনো ধাঁচের হলেও, বেশ বাহারের বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে একটা মাঝারি বাগানও আছে।

'মালিক থাকেন ওই তিনতলার ঘরে,' বললেন শ্রীনিবাস সোম, 'আর একতলার বারান্দার পিছনে ওই যে দরজা, ওইটা হইল লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের ঘর।'

গণৎকারের নামটা এই প্রথম শুনলাম। বারান্দায় যে আট-দশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তারাও যে গণৎকারের কাছেই এসেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

লালমোহনবাবু 'জয় গুরু' বলে সোম মশাইয়ের সঙ্গে গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন।

*　　　*　　　*

'কপাল কী বলছে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। লালমোহনবাবু তীষণ উত্তেজিতভাবে এইমাত্র ঢুকেছেন আমাদের ঘরে।—'অবিশ্বাস্য, অলৌকিক, অসামান্য।' বললেন ভদ্রলোক,—'সাড়ে সাতে হুপিং কফ, আঠারোয় আছাড় পড়ে মালাই চাকি ডিসলোকেশন, প্রথম উপন্যাস, স্পেকট্যাকুলার পপুলারিটি, সামনের বই কটা এডিশন হবে—সব গড় গড় করে বলে দিলেন।'

'স্কাইল্যাব মাথায় পড়বে কি না বলেছে ?'

'ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন মশাই, আপনাকে একবারটি ধরে নিয়ে যাবই। আর, ইয়ে, বলেছেন আমার বন্ধুভাগ্য ভাল। শুধু তাই নয়, বন্ধুর চেহারার ডেসক্রিপশনও দিলেন।'

'আর বন্ধুর পেশা ?'

'বলেছেন বন্ধু মেধাবী, কর্মঠ, অনুসন্ধিৎসু, গভীর পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। মিলছে ? আর কী চাই ?'

'মে আই কাম ইন ?'

হোটেলের ম্যানেজার শ্যামলাল বারিক ঘরে ঢুকতেই সুগন্ধি জর্দার গন্ধে ঘর ভরে গেল।—'আসুন।' পানের ডিবে খুলে এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে। আমরা ইতস্তত করছি দেখে আশ্বাস দিলেন যে এ পানে জর্দা নেই।

ফেলুদা একটা পান মুখে পুরে চারমিনারের প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করে বলল, 'আচ্ছা, এই ডি. জি. সেন ভদ্রলোকটির পুরো নামটা কী ?'

'দেখেছেন !' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু, 'ওঁর বাড়ি থেকেই ঘুরে এলুম, অথচ ওঁর পুরো নামটা জেনে এলুম না। দোলগোবিন্দ নয় তো ?'

আমি জানি, ভদ্রলোকের 'পিঠাপুরমের পিশাচ' বইতে একটা আধপাগলা চরিত্র আছে যার নাম দোলগোবিন্দ দত্ত রায়।

শ্যামলালবাবু হেসে বললেন, 'মাপ করবেন মশাই, ওঁর পুরো নাম আমারও জানা নেই। কেউই জানেন কি না সন্দেহ। সবাই ডি. জি. সেন বলেই বলেন। এমনকী 'ডিজিবাবু'ও বলতে শুনেছি কাউকে কাউকে।'

'বেশি মেশামেশি-টেশেন না বুঝি ?'

'গোড়ায় তবু এখানে সেখানে দেখা যেত। গত বছর সিকিম না ভুটান কোথায় যেন গিয়েছিলেন ; মাস ছয়েক হল ফিরে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে।'

'কেন, সেটা জানেন ?'

শ্যামলালবাবু মাথা নাড়লেন।

'বাড়িটা কি ওঁরই তৈরি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না। ওঁর বাপের। বাপের পরিচয় দিলে হয়তো চিনতে পারেন। সেন পারফিউমারস-এর নাম শুনেছেন তো ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—কিন্তু সে ব্যবসা তো উঠে গেছে অনেককাল। 'এস. এন. সেন'স সেনসেশন্যাল এসেনসেজ—সেই সেন তো ?'

'ঠিক বলেছেন। ইনি ওই এস. এন. সেনের ছেলে। জোর ব্যবসা ছিল। কলকাতায় তিনটে বাড়ি, মধুপুরে একটা, পুরীতে একটা। ভদ্রলোক মারা যাবার পর ব্যবসা আর বেশিদিন টেকেনি। দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেন উইল করে। ডি. জি. সেন বোধহয় ছোট ছেলে; তিনি এই বাড়িটা পান। দুই ছেলের কেউই ব্যবসায় যায়নি। ইনি এককালে চাকরি-টাকরি করে থাকতে পারেন, এখন আর্ট নিয়ে আছেন।'

'আর্ট?' ফেলুদার হঠাৎ কী যেন মনে পড়েছে। 'এনারই কি পুঁথির কালেকশন?'

আমাদের সিধু জ্যাঠার কাছে পুঁথি দেখেছি আমি। তিনশো বছরের পুরনো তিনটে পুঁথি আছে ওঁর কাছে। ছাপাখানার আগের যুগে বই লেখা হত হাতে; তাকেই বলে পুঁথি। সবচেয়ে পুরনো কালে একরকম গাছের ছাল সরু লম্বা করে কেটে তাতে লেখা হত, তাকে বলত ভূর্জিপত্র, তারপরে তালপাতা আর কাগজে লেখা হত। সিধু জ্যাঠা বলে পুঁথি জিনিসটা যে আমাদের আর্টের একটা বড় অঙ্গ, সেটা অনেকেই মনে রাখে না।

শ্যামলালবাবু বললেন, 'পুঁথি নিয়েই তো আছেন। দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসে ওঁর পুঁথি দেখে যায়।'

'ভদ্রলোকের ছেলেপিলে নেই?'

'একটি ছেলে তো মাঝে মাঝে আসত, বউকে নিয়ে। অনেককাল দেখিনি। ভদ্রলোক নিজেই এসেছেন বছর তিনেক হল। নিজে থাকেন তিনতলায়; একাই থাকেন। বিপত্নীক। এক তলায় কিছুকাল থেকে এক পার্মানেন্ট বাসিন্দা এসে রয়েছেন, এক গণৎকার; দোতলাটা সিজনে ভাড়া দেন। এখন রয়েছে সস্ত্রীক এক রিটায়ার্ড জজ সাহেব।'

'হুঁ...'

ফেলুদা ফুরিয়ে যাওয়া চারমিনারটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল।

'আপনার কি আলাপ করার ইচ্ছে?' শ্যামলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন।—'ভারী পিকিউলিয়ার লোক কিন্তু; ফস করে কারুর সঙ্গে দেখা করতে চান না। অবিশ্যি আপনার যদি পুঁথিতে ইন্টারেস্ট থাকে, তা হলে—'

'ইন্টারেস্ট কেন থাকবে না; সেই সঙ্গে কিছুটা জ্ঞানও তো থাকা চাই। একটু হোমওয়ার্ক না করে এসব লোকের সঙ্গে দেখা করার কোনও মানে হয় না।'

'কোনও চিন্তা নেই,' বললেন শ্যামলালবাবু, 'বটীশ কানুনগোর বাড়ি আমার এই হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। র‍্যাভেনশ কলেজের প্রোফেসর ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন। জানেন না এমন বিষয় নেই। ওঁর সঙ্গে দেখা করুন, আপনার হোমওয়ার্ক হয়ে যাবে।'

॥ ৩ ॥

ফেলুদা যে সত্যিই পরদিন ভোরে উঠে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তক্ষুনি প্রোফেসর কানুনগোর সঙ্গে দেখা করতে চলে যাবে, সেটা আমি ভাবিনি। আমার ইচ্ছা ছিল আজ সমুদ্রে স্নান করব ; ও থাকলে একজন সঙ্গী জুটত, কারণ লালমোহনবাবুকে বলাতে উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'দেখো তপেশ, তোমাদের বয়সে রেগুলার সাঁতার কেটেছি। আমার বাটারফ্লাই স্ট্রোক দেখে লোকে ক্ল্যাপ পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু হেদো আর বে অফ বেঙ্গল এক জিনিস নয় ভাই। আর পুরীর ঢেউ বড় ট্রেচারস। বোম্বাই-এর সমুদ্র হলে দ্বিধা করতুম না।'

সত্যি বলতে কী, আজকের দিনটা স্নানের পক্ষে খুব সুবিধের নয়। সারা রাত টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েছে, এখনও মেঘলা আর গুমোট হয়ে রয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল স্নানটা না হয় ফেলুদার সঙ্গেই করা যাবে, আজ শুধু একটু বিচে হেঁটে আসব। সাতটার মধ্যেই চা-ডিম-রুটি খেয়ে আমরা দুজন বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবুর কাল রাত থেকেই বেশ খুশি-খুশি ভাব ; মনে হয় লক্ষ্মণ গণৎকারই তার জন্য দায়ী।

বিচে এসে দেখি খাঁ খাঁ। এই দিনে এত সকালে কে আর আসবে? দূরে জলে দু-তিনটে নুলিয়াদের নৌকো দেখা যাচ্ছে। তবে কালকের সেই নুলিয়া বাচ্চাগুলো নেই। তার বদলে কয়েকটা কাক রয়েছে, ঢেউ-এর জল সরে গেলেই তিড়িং তিড়িং করে এগিয়ে গিয়ে ফেনায় ঠোকর দিয়ে কী যেন খাচ্ছে, আবার ঢেউ এলেই তিড়িং তিড়িং করে পিছিয়ে আসছে।

দুজনে ভিজে বালির উপর দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'সি-বিচে শুয়ে রোদ পোয়ানোর বাতিক আছে সাহেব-মেমদের এটা শুনিচি, কিন্তু মেঘ-পোয়ানোর কথা তো শুনিনি!'

আমি জানি কথাটা কেন বললেন ভদ্রলোক। একজন লোক চিত হয়ে শুয়ে আছে বালির উপর, হাত পঞ্চাশেক দূরে। বাঁয়ে যেখানে বিচ শেষ হয়ে পাড় উঠে গেছে, সেই দিকটায়। আরেকটু বাঁয়ে শুলেই লোকটা একটা খোপড়ার আড়ালে পড়ে যেত।

'কেমন ইয়ে মনে হচ্ছে না?'

আমি জবাব না দিয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। খটকা লেগেছে আমারও।

দশ হাত দূর থেকেও মনে হয় লোকটা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু আরেকটু এগোতেই বুঝলাম তার চোখ দুটো খোলা আর মাথার কোঁকড়ানো ঘন চুলের পাশে বালির

উপর চাপ-বাঁধা রক্ত।

পুরু গোঁফ, ঘন ভুরু, রং বেশ ফরসা, গায়ে হাইরঙের সুতির কোট, সাদা প্যান্ট আর নীল স্ট্রাইপ্‌ড শার্ট। জুতো আছে, মোজা নেই। ডান হাতের কড়ে আঙুলে একটা নীল পাথর-বসানো আংটি, হাতের নখ কাটা হয়নি অন্তত এক মাস। কোটের বুক পকেট ফুলে উঁচু হয়ে আছে; মনে হয় কাগজপত্তর আছে। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল কাগজগুলো বার করে দেখতে, কারণ পুলিশ তাই করবে, আর তা হলে হয়তো লোকটা কে তা জানা যাবে।

'ডোন্ট টাচ,' বললেন লালমোহনবাবু, যদিও সেটা বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ফেলুদার সঙ্গে থেকে এসব আমার জানা আছে।

'আমরাই তো ফার্স্ট?' বললেন লালমোহনবাবু। ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছেন, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব, কিন্তু গলার স্বরে বোঝা যায় ওঁর তালু শুকিয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

ভদ্রলোক আবার বিড়বিড় করে বললেন, 'যাক, তা হলে আমরাই ডিসকাভার করলুম।'

আমি ধ ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বললাম, 'চলুন, রিপোর্ট করতে হবে।'

'ইয়েস ইয়েস—রিপোর্ট।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেলে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে ফেলুদা হাজির। —'পাপোশে যখন পা না মুছেই ঢুকলেন, এবং ঘরের মেঝেতে ছটাক খানেক বালি ছড়ালেন, তখন বেশ বুঝতে পারছি আপনি সবিশেষ উত্তেজিত,' কফি হাতে খাটে বসে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে বলল।

লালমোহনবাবু ঘটনায় রং চড়াতে গিয়ে দেরি করে ফেলবেন বলে আমি দু-কথায় ব্যাপারটা বলে দিলাম। এক মিনিটের মধ্যে ফেলুদা নিজেই ফোন করে থানায় খবরটা দিয়ে দিল। ওই ভাবে সংক্ষেপে গুছিয়ে আমি বলতে পারতাম না, লালমোহনবাবু তো নয়ই।

খুন সম্পর্কে ফেলুদা শুধু একটাই প্রশ্ন করল—

'লোকটার পাশে কোনও অস্ত্র পড়ে থাকতে দেখেছিলি, পিস্তল-টিস্তল?'

'না, ফেলুদা।'

'তবে বাঙালি নয়, এ বিষয়ে আমি ডেফিনিট,' বললেন লালমোহনবাবু।

'কেন বলছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'জোড়া ভুরু,' ভয়ংকর কনফিডেন্সের সঙ্গে বললেন জটায়ু—'বাঙালিদের হয় না। আর ওরকম চোয়ালও হয় না। বাজরার রুটি আর গোস্ত খাওয়া চোয়াল। যদ্দুর মনে হয় বুন্দেলখণ্ডের লোক।'

ফেলুদা যে ইতিমধ্যে ডি. জি. সেনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলেছে সে কথা এতক্ষণ বলেনি। সাড়ে আটটায় টাইম দিয়েছেন তাঁর সেক্রেটারি, আর বলেছেন পনেরো মিনিটের বেশি থাকা চলবে না। আমরা পনেরো মিনিট হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এবারে বিচে পৌঁছে দূর থেকেই বুঝলাম যে লাশের পাশে বেশ ভিড়। খবর এতক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে, পুরীর সমুদ্রতটে এভাবে এর আগে খুন হয়েছে কি না সন্দেহ।

আমি জানতাম যে এখানকার থানার কিছু অফিসারের সঙ্গে রাউরকেল্লার কেসটার সময় ফেলুদার আলাপ হয়েছিল। যিনি ফেলুদাকে দেখে হেসে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন তিনি শুনলাম সাব-ইনস্‌পেকটর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র।

'এবার কী, ছুটি ভোগ?' মহাপাত্র জিজ্ঞেস করলেন।

'সেই রকমই তো বাসনা,' বলল ফেলুদা। 'কে খুন হল?'

'স্থানীয় লোক নয় বলেই তো মনে হচ্ছে। নাম দেখছি রূপচাঁদ সিং।'

'কীসে পেলেন?'

'ড্রাইভিং লাইসেন্স।'

'কোথাকার?'

'নেপাল।'

পুরু চশমা পরা একজন বাঙালি ভদ্রলোক পুলিশের ফোটোগ্রাফারকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি লোকটাকে দেখেছি। কাল বিকেলে স্বর্গদ্বার রোডে একটা চায়ের দোকানের বাইরে বসে চা খাচ্ছিল। আমি পান কিনছিলাম পাশের দোকান থেকে; লোকটা আমার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায়।'

'মরল কীভাবে?' ফেলুদা মহাপাত্রকে জিজ্ঞেস করল।

'রিভলভার বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে ওয়েপন পাওয়া যায়নি। এইটে দেখতে পারেন, লাইসেন্সের ভিতর গোঁজা ছিল।'

ভদ্রলোক একটা মাঝারি সাইজের ভিজিটিং কার্ড ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। একদিকে কাঠমাণ্ডুর একটা দরজির দোকানের নাম-ঠিকানা, অন্যদিকে বেশ কাঁচা হাতে ইংরিজিতে লেখা—'এ. কে. সরকার, ১৪ মেহের আলি রোড, ক্যালকাটা।' বানান ভুলগুলোর কথা আর বললাম না।

ফেলুদা কার্ডটা ফেরত দিয়ে বলল, 'ইন্টারেস্টিং ফ্যাকর্‌ যদি বেরোয় তো জানাবেন। আমরা নীলাচল হোটেলে আছি।'

আমরা লাশ পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

কাল যে বাড়িটাকে দেখে আমরা তারিফ না করে পারিনি, আজ মেঘলা দিনে সেটা যেন মেদা মেরে গেছে, ভেতরে যাবার জন্য আর হাতছানি দিয়ে ডাকছে না।

গেটের বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে, বয়স পঁচিশের বেশি না, দেখলে মনে হয় চাকর, সে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'মিত্রবাবু?'

ফেলুদা এগিয়ে গেল।—'আমিই মিত্রবাবু।'

'আসুন ভিতরে।'

বাগানটাকে দুভাগে চিরে একটা নুড়ি-ফেলা পথ বারান্দার দিকে চলে গেছে। দেখলাম সেটা আমাদের পথ নয়। তিনতলায় যেতে হলে বাড়ির বাঁ পাশ দিয়ে

গলির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কারণ তিন তলার দরজা আর সিঁড়ি বাড়ির পিছন দিকে। গলির মাঝামাঝি এসে লালমোহনবাবু হঠাৎ 'হিক' শব্দ করে তিন হাত পিছিয়ে গিয়েছিলেন, তার কারণ মাটিতে পড়ে থাকা একটা সরু লম্বা সাদা কাগজের ফালি। লালমোহনবাবু সেটাকে সাপ মনে করেছিলেন।

সিঁড়ির সামনে গিয়ে চাকর আমাদের ছেড়ে দিল, কারণ ওপর থেকে একটি ভদ্রলোক নেমে এসেছেন।

'মিস্টার মিত্র ? আসুন আমার সঙ্গে।'

ফেলুদাকে চিনেছেন নাকি ? মুখের হাসি তো তাই বলছে। ভদ্রলোকের চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা, গায়ের চামড়া বলছে বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু মাথার চুল এর মধ্যেই বেশ পাতলা হয়ে গেছে।

'আপনার পরিচয়টা ?' সিঁড়ি উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'আমার নাম নিশীথ বোস। আমি দুর্গাবাবুর সেক্রেটারি।'

'দুর্গাবাবু ? ওঁর নাম তা হলে—'

'দুর্গাগতি সেন। এখানে সবাই ডি. জি. সেনই বলে।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাইনে একটা ঘর, বোধহয় সেটাতেই সেক্রেটারি থাকেন, কারণ একটা তক্তপোশের পাশে একটা ছোট্ট টেবিলের উপর একটা টাইপরাইটার চোখে পড়ল। বাঁয়ে একটা প্যাসেজের দুদিকে দুটো ঘর, শেষ মাথায় ছাত। সেই ছাতেই যেতে হল আমাদের।

মাঝারি ছাত, একপাশে একটা কাচের ঘরের মধ্যে কিছু অর্কিড। ছাতের মাঝখানে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন একটি বছর ষাটেকের ভদ্রলোক। লালমোহনবাবু পরে যে বলেছিলেন 'ব্যক্তিত্ব উইথ এ ক্যাপিটাল বি', সেটা খুব ভুল বলেননি। টকটকে রং, ভাসা ভাসা চোখ, কাঁচা-পাকা মেশানো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর মুগুরভাঁজা চওড়া কাঁধ। চেয়ারে বসেই নমস্কার করছেন দেখে প্রথমে একটু কেমন-কেমন লাগছিল, তারপর কারণটা বুঝলাম। নীল প্যান্টের তলা দিয়ে ভদ্রলোকের বাঁ পায়ের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সবটুকুই ব্যান্ডেজে ঢাকা।

আমাদের জন্য আরও তিনটে চেয়ার বার করে রাখা হয়েছে; আমরা বসলে পর ফেলুদা বলল, 'আপনি যে আমাদের সময় দিয়েছেন তার জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনি পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করেন শুনে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না।'

'ওটা আমার অনেকদিনের শখ।'—আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কথাটা বললেন ভদ্রলোক। চেহারার সঙ্গে মানানসই গলার স্বর।

ফেলুদা বলল, 'আমার এক জ্যাঠামশাই আছেন, নাম সিদ্ধেশ্বর বোস, তাঁর তিনটে পুঁথি আছে। আপনি বোধহয় একবার সেগুলো দেখতে গিয়েছিলেন।'

'কী পুঁথি ?'

'তিনটেই বাংলা। দুটো অন্নদামঙ্গল, আর একটা গোরক্ষবিজয়।'

'তা গিয়ে থাকতে পারি। পুঁথির পেছনে ঘুরেছি অনেক।'

'আপনার কি সব বাংলা পুঁথি ?'

'অন্য ভাষাও আছে। যেটা বেস্ট সেটা সংস্কৃত।'

'কবেকার পুঁথি ?'

'টুয়েল্‌ফ্‌থ সেঞ্চুরি।'

আমি মনে মনে বললাম, জিনিসটা যদি আমাদের দেখার ইচ্ছেও থাকে, বলে কোনও লাভ হবে না। ভদ্রলোকের মর্জি হলে দেখাবেন, না তো নয়।

'লোকনাথ !'

বুঝলাম চাকরের নাম লোকনাথ। কিন্তু তাকে হঠাৎ ডাকা কেন ?

চাকরের বদলে মুহূর্তের মধ্যে চলে এলেন নিশীথবাবু। পর্দার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন কি ?

'লোকনাথ নেই, স্যার। বেরিয়েছে। কিছু বলবেন কি ?'

মিঃ সেন ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। নিশীথবাবু সেটা ধরে ভদ্রলোককে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করলেন।

'আসুন।'

ভদ্রলোকের পিছন পিছন আমরা ছাত থেকে প্যাসেজ ও প্যাসেজ থেকে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর, বাঁয়ে একটা প্রকাণ্ড খাট, যাকে ইংরিজিতে বলে ফোর-পোস্টার। খাটের পাশে একটা কাশ্মীরি টেবিলে একটা ল্যাম্প, দুটো ওষুধের শিশি আর একটা কাচের গেলাস। ডাইনে একটা মাঝারি সাইজের রোলটপ ডেস্ক, একটা চেয়ার, আর দেয়ালে লাগানো পাশাপাশি দুটো গোদরেজের আলমারি।

'খোলো।'

হুকুমটা হল সেক্রেটারিকে। নিশীথবাবু খাটের উপর রাখা বালিশের তলা হাতড়িয়ে একটা চাবির গোছা বার করে ডেস্কের ঠিক পাশের আলমারিটা খুললেন।

ভিতরে চারটে শেল্‌ফ। তার প্রত্যেকটাতে পাশাপাশি থরে থরে সাজানো শালুতে মোড়া লম্বা লম্বা প্যাকেট। সব মিলিয়ে আন্দাজ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা।

'এতেও আছে কিছু', অন্য আলমারিটা দেখিয়ে বললেন দুর্গাগতি সেন।—'তবে আসলটা—'

আসলটা বেরোল শেল্‌ফ থেকে নয়, নীচের দিকের একটা দেরাজ থেকে। লক্ষ করলাম তার নীচে আরেকটা পুঁথি রয়েছে।

নিশীথবাবু হুকুম পেয়ে শালুর উপর ফিতের বাঁধনটা খুলে ফেললেন। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুদিকে কাঠের পাটার মধ্যিখানে স্যান্ডউইচ করা দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পুঁথি।

'অষ্টাদশসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা', বললেন দুর্গাগতি সেন,—'অন্যটা কল্পসূত্র।'

কাঠের পাটার উপরে আশ্চর্য সুন্দর রঙিন ছবি, এতদিনের পুরনো হওয়া সত্ত্বেও রঙের জৌলুস কমেনি। পুঁথিটা কাগজের নয়, তালপাতার। হাতের লেখা যে এত পরিপাটি আর এত সুন্দর হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না।

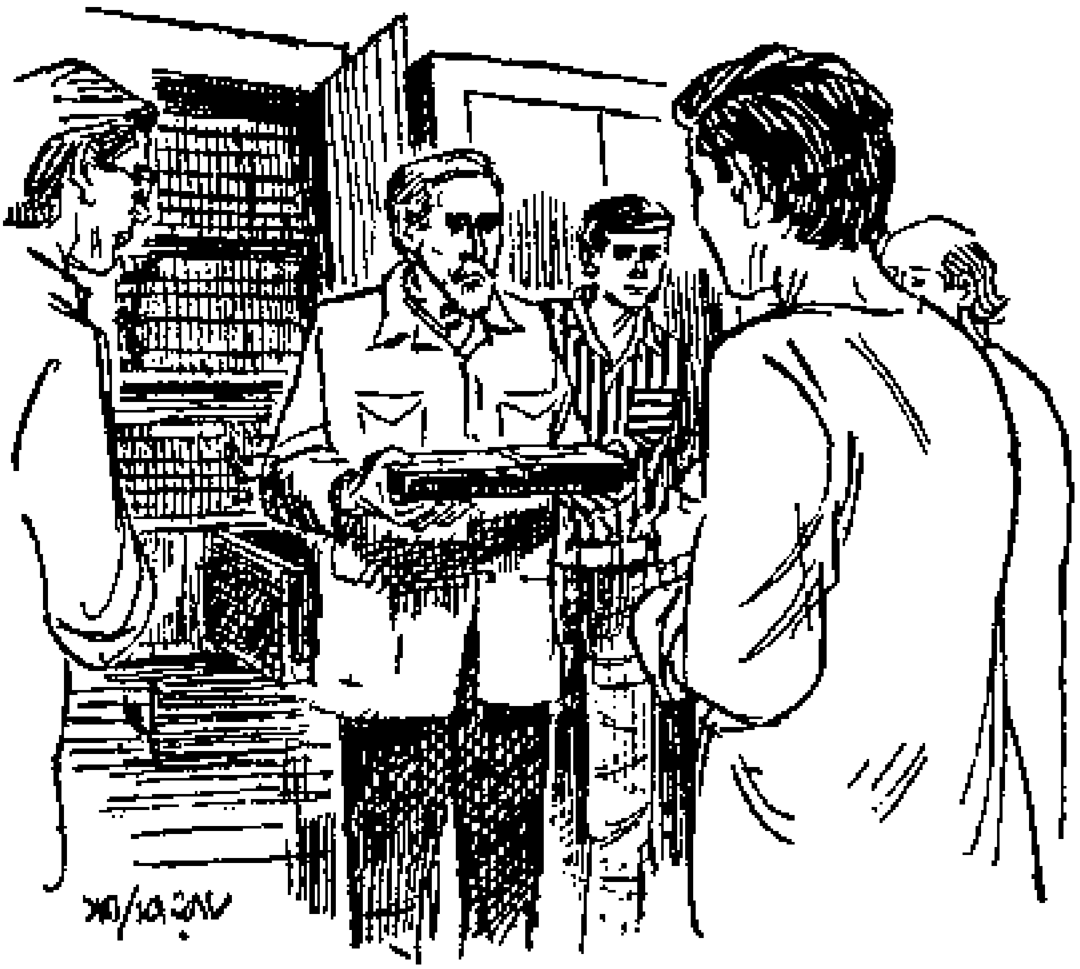

লালমোহনবাবু চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, 'ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়।'

ফেলুদা বলল, 'এটা কোথায় পেলেন জানতে পারি কি?'

'ধরমশালা', বললেন ভদ্রলোক।

'তার মানে কি এ জিনিস তিব্বত থেকে দালাই লামার সঙ্গে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক পুঁথিটা ফেলুদার হাত থেকে নিয়ে নিশীথবাবুকে দিয়ে দিলেন। সেটা আবার ফিতে বাঁধা অবস্থায় যেখানে ছিল সেখানে চলে গেল।

'আপনি কি আপনার জ্যাঠার হয়ে সুপারিশ করতে এসেছেন?'

প্রশ্নটা শুনে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ফেলুদা কিন্তু নানান বেয়াড়া প্রশ্নের সামনে পড়েও নিজেকে দিব্যি ঠাণ্ডা রাখতে পারে। বলল, 'আজ্ঞে না।'

'আমি এসব জিনিস নিয়ে ব্যবসা করি না,' বললেন মিঃ সেন, 'কেউ যদি দেখতে চায় তো দেখাতে পারি—এই পর্যন্ত।'

'আমার জ্যাঠার সামর্থ্য নেই এ জিনিস কেনার,' হেসে বলল ফেলুদা। 'অবিশ্যি আমার কোনও ধারণা নেই এর কত দাম হতে পারে।'

'অমূল্য।'

'কিন্তু এসবও তো দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে?'

'চামার। যারা বিক্রি করে তারা চামার।'

'আপনার ছেলের এ সবে ইন্টারেস্ট নেই?'

দুর্গাগতিবাবু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন প্রশ্নটা শুনে। খাটের পাশের টেবিলটার দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'ছেলেকে আমি চিনি না।'

'স্যার, ইনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা, স্যার।'

নিশীথবাবু হঠাৎ এই সময় এই কথাটা কেন বললেন বুঝলাম না। দুর্গাগতিবাবু একবার ফেলুদার মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'তাতে ভয়ের কী? আমি কি খুন করেছি?'

শ্যামলালবাবু ঠিকই বলেছিলেন। ভদ্রলোকের হাবভাব কথাবার্তা সত্যিই পিকিউলিয়ার। অবিশ্যি এর পরের কথাটা আরও তাজ্জব, প্রায় একেবারে হেঁয়ালির মতো।—

'যা হারিয়েছে, তা ফিরিয়ে আনা গোয়েন্দার কম্মো নয়। যে পারে সেই করছে চেষ্টা, বন্ধ দরজা খুলছে একে একে। গোয়েন্দার কিছু করার নেই।'

পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, তাই ফেলুদা দরজার দিকে ফিরল। নিশীথবাবু যেন একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আসুন।' আমরা পুঁথির মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে নীচে রওনা দিলাম।

'ভদ্রলোকের পায়ে কী ব্যাপার?' ফেলুদা নীচে নামতে নামতে প্রশ্ন করল।

'ওঁকে গাউটে ধরেছে। গেঁটে বাত,' বললেন নিশীথবাবু, 'খুব শক্ত-সমর্থ লোক ছিলেন আগে। এই মাস তিনেক হল কাহিল হয়ে পড়েছেন।'

'যে ওষুধগুলো দেখলাম সে কি গাউটের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কেবল একটা ঘুমের ওষুধ। লক্ষ্মণবাবুর দেওয়া।'

'গণৎকার লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যি?' প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি অ্যালোপ্যাথি আয়ুর্বেদ দুটোই বেশ ভাল জানেন। বেশ কোয়ালিফায়েড লোক। অনেক কিছু জানেন।'

'বটে?'

'কর্তার সঙ্গে মাঝে মাঝে পুঁথি নিয়েও কথাবার্তা বলতে শুনিচি।'

'আশ্চর্য লোক!' বললেন জটায়ু।

ফেলুদার ভুরুটা যে কেন কুঁচকে রয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম না।

॥ ৪ ॥

লালমোহনবাবুর ইচ্ছে ছিল লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফেলুদার আলাপ করিয়ে দেবেন, কিন্তু সেটা আর হল না, কারণ গণৎকারের দরজায় তালা। আমরা সাগরিকা থেকে বেরিয়ে হোটেলমুখো হলাম। সমুদ্রের ধারে ভিড় হয়ে গেছে এই পনেরো মিনিটের মধ্যেই, কারণ মেঘ পাতলা হয়ে গিয়ে সূর্যটা উঁকি মারব মারব করছে। ডাইনে রেলওয়ে হোটেলটা দেখা যাচ্ছে, ফেলুদা বলল এই ভিড়ের বেশির ভাগ লোকই নাকি ওই হোটেলের। আমরা ভিড় ছাড়িয়ে কয়েক পা যেতেই পিছন থেকে অচেনা গলায় ডাক এল।

'মিস্টার মিত্তির!'

অন্যদের থেকে একটু আলগা হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে হাসছেন। বোঝা যাচ্ছে ইনি বেশ কয়েকদিন সমুদ্রতটে ঘোরাফেরা করেছেন, কারণ সানগ্লাসটা খুলতেই চোখ থেকে কান অবধি একটা ফিকে লাইন দেখা গেল যেখানে চশমার ডাঁটিটা চামড়ায় রোদ লাগতে দেয়নি।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রায় ফেলুদার মতোই লম্বা, সুপুরুষ বলা চলে, কালো চাপ দাড়ি আর গোঁফটা বেশ হিসেব করে ছাঁটা, কালো ট্রাউজারের ওপর চিজক্লথের শার্টটা হাওয়ায় সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে।

'আপনার নাম শুনেছি,' বললেন ভদ্রলোক। 'এসেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নাকি?'

'কেন বলুন তো?'

'একটা খুন হয়েছে শুনলাম যে। তাই ভাবলাম আপনি আবার জড়িয়ে পড়লেন কি না।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'খুন হলেই জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় ঠিকই, কিন্তু কেউ না ডাকলে আর কী করে যাই বলুন।'

'আপনি তো নীলাচলে উঠেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হোটেলে ফিরছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ইয়ে—'

ভদ্রলোক কী যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করছেন। ফেলুদা বলল, 'আপনাকে বুঝি আংটি সামলাতে হচ্ছে?'

এটা আমি আগেই লক্ষ করেছি। ভদ্রলোক ডান হাতের তেলোয় তিনটে সোনার আংটি নিয়ে রয়েছেন, ফলে বেশ বোকা বোকা দেখাচ্ছে।

'আর বলবেন না,' বললেন ভদ্রলোক, 'আমাদের হোটেলের এক বাসিন্দা, কালই আলাপ হয়েছে, জলে নামবেন, তা বললেন এগুলো নাকি আঙুল থেকে খুলে আসে। বলুন তো কী ঝক্কি।'

আংটির মালিক যে কে সে আর বলতে হবে না। ওই যে, নুলিয়ার হাত ধরে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে আসছেন তিনি। সোনায় মোড়া মিঃ হিঙ্গোরানি। ফেলুদাকে দেখে ভদ্রলোক 'গুড মর্নিং' বলে একটা হাঁক দিলেন, তারপর আরও এগিয়ে এসে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে আংটিগুলো ফেরত নিয়ে আঙুলে পরে জানিয়ে দিলেন যে গোয়া, ওয়াইকিকি, মায়ামি, আকাপুলকো, নিস্ ইত্যাদি অনেক জায়গার সমুদ্রতটের অভিজ্ঞতা আছে তাঁর, কিন্তু পুরীর মতো বিচ নাকি কোথাও নেই।

নতুন ভদ্রলোকটি এবার হিঙ্গোরানির কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের সঙ্গ নিলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি।'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'আমার নাম বললে হয়তো চিনবেন না, একটা বিশেষ লাইনে আমার কিছুটা কনট্রিবিউশন আছে, তবে সেটা সকলের জানার কথা নয়। আমার নাম বিলাস মজুমদার।'

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে ভদ্রলোকের দিকে চাইল।—'আপনার কি পাহাড়-টাহাড়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে?'

ভদ্রলোক অবাক।—'বাবা, আপনার জ্ঞানের পরিধি দেখছি—'

'না, না,' ফেলুদা বিলাসবাবুর কথা শেষ করতে দিল না—'তেমন কিছু নয়। গত মাসখানেকের মধ্যে কোথায় যেন বিলাস মজুমদার নামটা দেখেছি—বোধহয় কোনও পত্রিকায় বা খবরের কাগজে। মনে হচ্ছে তাতে মাউন্টেনিয়ারিং বা ওই জাতীয় কিছুর উল্লেখ ছিল।'

'ঠিকই দেখেছেন। আমি মাউন্টেনিয়ারিং শিখেছিলাম দার্জিলিং-এর ইনস্টিটিউটে। আমার আসল কাজ হচ্ছে ওয়াইল্ড-লাইফ ফোটোগ্রাফি। একটা জাপানি দলের সঙ্গে স্নো-লেপার্ডের ছবি তুলতে যাবার কথা ছিল। জানেন বোধহয়—হিমালয়ের হাই অলটিচিউডে স্নো-লেপার্ডের আস্তানা। দেখেছে অনেকেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ছবি তোলা সম্ভব হয়নি জানোয়ারটার।'

পথে আর কোনও কথা হল না। লালমোহনবাবু বার বার সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে দেখছেন সেটা লক্ষ করেছি।

হোটেলে ফিরে এসেই ফেলুদা চায়ের অর্ডার দিল। ভদ্রলোক চেয়ারে বসে প্রথমেই পকেট থেকে একটা ছবি বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

'দেখুন তো এঁকে চেনেন কি না।'

পোস্টকার্ড সাইজের ছবি। মাটিতে উবু হয়ে বসা চ্যাপ্টা টুপি পরা একটা লোক একটা অদ্ভুত জানোয়ারকে জাপটে ধরে আছে, আর আট-দশজন লোক সেই জানোয়ারটাকে দেখছে। মিঃ মজুমদার যে লোকটির দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন তাকে আমরা চিনি।

'এঁর কাছ থেকেই তো আসছি আমরা,' বলল ফেলুদা, 'যদিও চিনতে একটু সময় লাগে, কারণ ভদ্রলোক দাড়ি রেখেছেন।'

মিঃ মজুমদার ছবিটা ফেরত নিয়ে বললেন, 'এইটেই আমার দরকার ছিল। বাড়ির গেটে 'ডি. জি. সেন' নাম দেখলাম, কিন্তু তিনি এই ছবির ডি. জি. সেন কি না সে বিষয়ে শিওর হতে পারছিলাম না।'

'জানোয়ারটি প্যাঙ্গোলিন বলে মনে হচ্ছে!' বলল ফেলুদা।

ঠিক তো!—ওই প্যাঙ্গোলিন নামটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। একরকম পিপীলিকাভুক। দেখে মনে হয় গায়ে বর্ম পরে রয়েছে।

বিলাসবাবু বললেন, 'প্যাঙ্গোলিনই বটে। নেপালে পাওয়া যায়। কাঠমাণ্ডুর এক হোটেলের বাইরে তোলা। ডি. জি. সেন ছিলেন তখন ওই হোটেলে। আমিও ছিলাম।'

'এটা কবেকার ঘটনা?'

'গত অক্টোবরে। আমি গেছি সেই জাপানি টিম আসবে বলে। জাপানের কাগজেও আমার তোলা ছবি-টবি বেরিয়েছে। জাপানি দলটা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। স্বভাবতই আমি খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ি। কিন্তু শেষ অবধি আর যাওয়া হয়নি।'

'কেন, কেন?' ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন জটায়ু। বুঝলাম লেপার্ড-টেপার্ড শুনে ভদ্রলোক একটা রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়েছেন।

'কপাল !' বললেন মিঃ মজুমদার। 'একটা অ্যাক্সিডেন্টে জখম হয়ে হাসপাতালে পড়ে ছিলাম তিন মাস।'

'আপনার বাঁ পা কি জখম পা ?' হঠাৎ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'কেন বলুন তো ? বাঁ পায়ের শিন্ বোনটা ভেঙেছিল বটে ; কিন্তু আমার হাঁটা দেখলে কি বোঝা যায় ?'

'তা যায় না,' বলল ফেলুদা, 'কাল একটা পায়ের ছাপ দেখেছিলাম বালিতে—জুতো-পরা পা, সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ পাশে লাঠির ছাপ। ভাবলাম, হয় লাঠি, না হয় বাঁ পায়ে জখম। তা আপনি লাঠি ব্যবহার করেন না দেখছি।'

'মাঝে মাঝে করি,' বললেন বিলাস মজুমদার, 'কারণ বালিতে হাঁটতে কষ্ট হয়। কিন্তু উনচল্লিশ বছর বয়সে হাতে লাঠি ধরতে ইচ্ছে করে না।'

'তা হলে অন্য কেউ হবে।'

'অবিশ্যি শিন্ বোন ভাঙাই একমাত্র ইনজুরি নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে পাঁচশো ফুট গড়িয়ে পড়েছিলাম। একটা গাছের উপর পড়ি তাই জখমটা তবু কম হয়। এক চাষার ছেলে কয়েকজন হিপিকে খবর দেয়, তারাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিন্ বোন ছাড়া সাতটা পাঁজরার হাড় আর কলার বোন ভেঙেছিল। থুতনি থেঁতলে গিয়েছিল ; দাড়ি রেখেছি ক্ষতচিহ্ন ঢাকবার জন্য। দুদিন পরে জ্ঞান হয়। স্মৃতিশক্তি তছনছ হয়ে গিয়েছিল। ডায়রি থেকে নাম ঠিকানা বার করে কলকাতার বাড়িতে খবর দেয়। এক ভাইপো চলে আসে। তাকে চিনতে পারিনি। হাসপাতালে থাকতেই কিছুটা স্মৃতি ফিরে আসে। চিকিৎসার ফলে আরও খানিকটা ইম্প্রুভ করেছে, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের ঠিক আগের ঘটনা এখনও ঠিক মনে পড়েনি। যেমন, ডি. জি. সেন বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেটা আমার ডায়রিতে পাচ্ছি কিন্তু তার চেহারাটা মনে পড়েছে মাত্র দুদিন আগে।'

'ডি. জি. সেন কেন গিয়েছিল কাঠমাণ্ডু, সেটা মনে পড়ছে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল—'পুঁথি সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার কি ?'

'পুঁতি ?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।—'যা দিয়ে মালা গাঁথে ?'

'না,' ফেলুদা হেসে বলল।—'পুথি বা পুঁথি। পুস্তিকা। হাতে লেখা প্রাচীন বই। ভদ্রলোকের খুব ভাল কালেকশন আছে পুঁথির।'

'ও, তাই বলুন !'

ভদ্রলোক চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'কী রকম দেখতে হয় বলুন তো এই পুঁথি ?'

'সরু, লম্বা, চ্যাপ্টা,' বলল ফেলুদা।—'ধরুন স্টেট এক্সপ্রেসের একটা কার্টনের সাইজ। তার চেয়ে একটু ছোট বা বড়ও হতে পারে। সাধারণত শালুতে মোড়া থাকে।'

ভদ্রলোক আবার কিছুক্ষণ চুপ। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন টেবিল ল্যাম্পটার দিকে, আর আমরা চেয়ে আছি ভদ্রলোকের দিকে।

বেশ মিনিটখানেক পরে বিলাস মজুমদার বললেন, 'তা হলে বলি শুনুন।

কাঠমাণ্ডুতে যে হোটেলে ছিলাম, বিক্রম হোটেল, সেখানে ভারী এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। দু-একটা ঘর ছিল যার চাবি অন্য ঘরে লেগে যেত—যেটা হোটেলে কখনওই হবার কথা না। একদিন আমি আমার ঘরের চাবি নিয়ে ভুল করে আমার পাশের ঘরের দরজায় লাগিয়ে ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। সেটা ছিল ডি. জি. সেন-এর ঘর। প্রথমে ঠিক ধরতে পারিনি। ভাবছি আমার ঘরে এরা কারা, ঢুকল কী করে। আসল ব্যাপারটা বুঝতেই স্যরি বলে বেরিয়ে আসি, কিন্তু ততক্ষণে একটা ঘটনা আমি দেখে ফেলেছি। খাটে বসে আছেন মিঃ সেন, আর চেয়ারে দুটি অচেনা লোক. তাদের একজন একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে একটি প্যাকেট বার করছে। যতদূর মনে পড়ে প্যাকেটটা ছিল লাল, তবে সেটা কাগজ কি কাপড় তা মনে নেই।'

'তারপর ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'তারপর ব্ল্যাঙ্ক। অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। এর পরের মেমরি হচ্ছে হাসপাতালে জ্ঞান হওয়া।'

লালমোহনবাবু হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—'আরে মশাই, এমন ভাল গণৎকার রয়েছেন এই পুরীতে, আপনি তাঁর কাছে যান না একবারটি। যা ভুলে গেছেন, সব ডিটেলে বলে দেবেন।'

'কার কথা বলছেন ?'

'লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য দি গ্রেট। ওই ডি. জি. সেনেরই বাড়ির এক তলার ভাড়াটে। যদি দ্বিধা হয় তো বলুন, আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমিই আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি একটিবার ট্রায়াল নিয়ে দেখুন।'

'বলছেন ?'

ভদ্রলোকের যেন আইডিয়াটা ভালই লেগেছে।

'একশোবার !' বললেন লালমোহনবাবু—'আপনার কপালের ওই আঁচিলটার উপর আঙুল রেখে সব গড়গড় করে বলে দেবেন।'

এটা এতক্ষণ বলা হয়নি—বিলাসবাবুর কপালের ঠিক মধ্যিখানে একটা আঁচিল, হঠাৎ দেখলে মনে হবে ভদ্রলোক বুঝি টিপ পরেছেন।

'ভদ্রলোক কি ভিজিটর অ্যালাউ করেন ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'হোয়াই নট ?' বললেন লালমোহনবাবু। 'আপনি আর তপেশ থাকেন তো ? সে আমি ওঁকে বলে রাখব, কোনও চিন্তা নেই।'

ঠিক হল, আজই সন্ধ্যা ছটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হবে। ভদ্রলোকের ফি পাঁচ টাকা পঁচাত্তর শুনে বিলাসবাবু হেসেই ফেলেছিলেন কিন্তু ফেলুদা হিসেব করে দেখিয়ে দিল দশজন খদ্দের হলেও ভদ্রলোকের মাসিক আয় হয়ে যায় প্রায় দু হাজার টাকা।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে নিজের ভাগ্য গণনা করাবার ইচ্ছে না থাকলেও, বিলাস মজুমদারের স্মৃতি উদ্ধার হয় কি না দেখার জন্য ফেলুদার যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে।

॥ ৫ ॥

আজ ঠিকই করে রেখেছিলাম যে বিকেলে একটু মন্দিরের দিকটায় যাব। মন্দিরের চেয়েও রথটা দেখার ইচ্ছে বেশি। ফেলুদার কাছেই শুনলাম যে এই বিশাল রথ নাকি প্রতিবারই রথযাত্রার পর ভেঙে ফেলা হয় আর তার কাঠ দিয়ে খেলনা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করা হয়। পরের বছর আবার ঠিক একই রকম নতুন রথ তৈরি হয়।

যাবার পথে ফেলুদাকে কেন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। হয়তো এই দুদিনে নতুন আলাপীদের সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলো ওর মাথায় ঘুরছিল। একটা কথা ওকে না বলে পারলাম না—

'আচ্ছা ফেলুদা, নেপালটা কী রকম বারবার এসে পড়ছে, তাই না ? যে লোকটা খুন হল সে নেপালের লোক, বিলাসবাবু কাঠমাণ্ডু গিয়েছিলেন, দুর্গাগতিবাবু ঠিক সেই সময় কাঠমাণ্ডুতে ছিলেন...'

'তুই কি এতে কোনও তাৎপর্য খুঁজে পেলি ?'

'না। তবে—'

'সমপাত মানে জানিস ?'

'না তো।'

'সমপাত হল ইংরিজিতে যাকে বলে কোইনসিডেন্স। যতক্ষণ না আরও এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কাঠমাণ্ডুর ব্যাপারটা একটা কোইনসিডেন্স বলে ধরতে হবে—বুঝলি ?'

'বুঝেছি।'

পুরীর বিখ্যাত রথ দেখে মন্দিরের সামনে বিশাল চওড়া রাস্তার একপাশে দোকানগুলোয় ঘুরে ঘুরে পাথরের তৈরি খুদে খুদে মূর্তি, কোনারকের চাকা, এইসব দেখছি, এমন সময় সাব-ইনস্পেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্রের আবির্ভাব। হঠাৎ চিনতে পারিনি, কারণ এই ফাঁকে কখন জানি চুল ছেঁটে এসেছেন। আমাদের এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন, যিনি হেয়ার কাটিং সেলুনে চেয়ারে বসলেই ঘুমিয়ে পড়েন ; ফলে নাপিত বেহিসাবি কিছু করলেও টের পান না। ঘুম ভাঙার পর অবিশ্যি প্রতিবারই কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। মহাপাত্রকে দেখে মনে হল এনারও সে ব্যতিক আছে।

ফেলুদা ভদ্রলোককে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'তদন্ত এগোল ? মেহেরালি রোডের মিস্টার সরকার কী বলেন ?'

'ইনফরমেশন এসেছে আজ আড়াইটেয়,' বললেন মহাপাত্র। 'চোদ্দো নম্বর মেহেরালি রোড হল একটা ফ্ল্যাট বাড়ি ; সবসুদ্ধ আটটা ফ্ল্যাট, সরকার থাকেন তিন নম্বরে। দিন সাতেক হল ওঁর ঘর তালাবন্ধ। প্রায়ই নাকি বাইরে যান।'

'এবার কোথায় গেছেন জানতে পারলেন ?'

'পুরী।'

'বটে ? কে বলল ?'

'চার নম্বরের বাসিন্দা। তাকে নাকি বলেছে চেঞ্জে যাচ্ছে।'

'চেহারা কেমন জানতে পারলেন ?'

'লম্বা, মাঝারি রং, দাড়ি-গোঁফ নেই, বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। এ ধরনের বর্ণনার অবিশ্যি কোনও মূল্য নেই।'

'পেশা ?'

'বলে ট্রাভেলিং সেলসম্যান। কী সেল করে তা কেউ জানে না। বছর খানেক হল ওই ফ্ল্যাটে এসেছে।'

'আর রূপচাঁদ সিং ?'

'সে এখানে এসেছে গতকাল সকালে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা হোটেলে ছিল। ভাড়া চুকোয়নি। কাল রাত্রে নাকি একটা ফোন করতে চেয়েছিল হোটেল থেকে, ফোন খারাপ ছিল। শেষে একটা ডাক্তারি দোকান থেকে কাজ সারে। কম্পাউন্ডার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু খদ্দের ছিল বলে কী কথা হয়েছে তা শোনেনি ! এগারোটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরোয়। আর ফেরেনি। ঘরে একটা সুটকেস পাওয়া গেছে, তাতে জামা-কাপড় রয়েছে কিছু। দুটো টেরিলিনের শার্ট দেখে মনে হয় লোকটা বেশ শৌখিন ছিল।'

'সেটা কিছুই আশ্চর্য না,' বলল ফেলুদা, 'আজকাল ড্রাইভারের মাইনে আপিসের কেরানির চেয়ে অনেক বেশি।'

কথাই ছিল রেলওয়ে হোটেল থেকে বিলাসবাবুকে আমরা তুলে নেব ; ছটা বাজতে পনেরো মিনিটে আমরা হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। ব্রিটিশ আমলের হোটেল, এখন রং ফেরানো হলেও চেহারায় পুরনো যুগের ছাপটা রয়ে গেছে। সামনে বাগান, সেখানে রঙিন ছাতার তলায় বেতের চেয়ারে বসে হোটেলের বাসিন্দারা চা খাচ্ছে। তারই একটা থেকে উঠে পাশের চেয়ারে বসা দুজন সাহেবকে 'এক্সকিউজ মি' বলে বিলাসবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'চলুন, কপালে কী আছে দেখা যাক !'

আজ লালমোহনবাবু আমাদের গাইড, তাই তাঁর হাবভাব একেবারে পালটে গেছে। দিব্যি গটগটিয়ে সাগরিকার গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের মধ্যিখানের নুড়ি ফেলা পথ দিয়ে সটান গিয়ে বারান্দায় উঠে কাউকে না দেখে একটু থতমত খেয়ে তৎক্ষণাৎ আবার নিজেকে সামলে নিয়ে সাহেবি মেজাজে 'কোই হ্যায়' বলতেই বাঁদিকে একটা দরজা খুলে গেল।

'স্বাগতম !'

বুঝলাম ইনিই লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর চিকণের কাজ করা

সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি। মাঝারি হাইটের চেহারার বিশেষত্ব হল সরু গোঁফটা, যেটা ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি নেমে এসেছে নীচের দিকে।

লালমোহনবাবু আলাপ করাতে যাচ্ছিলেন, ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটা ভিতরে গিয়ে হবে। আসুন।'

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের বৈঠকখানার বেশির ভাগটা দখল করে আছে একটা তক্তপোশ; বুঝলাম ওটার উপরে বসেই ভাগ্যগণনা হয়। এ ছাড়া আছে দুটো কাঠের চেয়ার, একটা মোড়া, একটা নিচু টেবিলের উপর ওড়িশা হ্যান্ডিক্রাফ্‌টসের একটা অ্যাশট্রে, আর পিছনে একটা দেয়ালের আলমারিতে দুটো কাঠের বাক্স, কিছু বই, কিছু শিশি-বোতল-বয়াম ইত্যাদি ওষুধ রাখার পাত্র, আর একটা ওয়েস্ট এন্ড অ্যালার্ম ঘড়ি।

'আপনি বসুন এইখেনটায়'—তক্তপোশের একটা অংশ দেখিয়ে বিলাসবাবুকে বললেন গণৎকার। —'আর আপনারা এইখেনে।'

চেয়ার আর মোড়া দখল হয়ে গেল।

লালমোহনবাবু এইবারে আমাদের সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিলেন। ফেলুদার বিষয় বললেন, 'ইনিই আমার সেই বন্ধু,' আর বিলাস মজুমদারের নামটা বলে 'ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ওয়াই'—বলেই জিভ কেটে চুপ করে গেলেন। আমি জানি উনি বলতে গিয়েছিলেন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার; নিজের বুদ্ধিতেই যে নিজেকে সামলে নিয়েছেন সেটা আশ্চর্য বলতে হবে।

ফেলুদা বোধহয় কেলেঙ্কারিটা চাপা দেবার জন্যই বলল, 'আমরা দুজন অতিরিক্ত লোক এসে পড়েছি বলে আশা করি আপনি বিরক্ত হননি।'

'মোটেই না,' বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। —'আমার আপত্তি যেটাতে সেটা হচ্ছে স্টেজে উঠে ডিমনস্ট্রেশন দেওয়ায়। সে অনুরোধ অনেকেই করেছে। আমি যে যাদুকর নই সেটা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না। এই যেমন—'

ভদ্রলোকের কথা থেমে গেল। তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে বিলাস মজুমদারের দিকে। —'কী আশ্চর্য!' বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য—'আপনার কপালে ঠিক থার্ড আই-এর জায়গায় দেখছি একটি উপমাংস!'

উপমাংস মানে যে আঁচিল সেটা জানতাম না।

'ঠিক ওইখানে খুলির আবরণের তলায় কী থাকে জানেন তো?' ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন।

'পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের কথা বলছেন?' ফেলুদা বলল।

'হ্যাঁ—পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। মানুষের মগজের সবচেয়ে রহস্যময় অংশ। অন্তত পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকরা তাই বলেন। আমরা যদিও জানি যে ওটা আসলে প্রমাণ করে যে আদিম যুগে প্রাণীদের তিনটি করে চোখ ছিল, দুটি নয়। ওই থার্ড আইটাই এখন হয়ে গেছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। নিউগিনিতে একরকম সরীসৃপ আছে, নাম টারাট্রিয়া, যার মধ্যে এখনও এই থার্ড আই দেখতে পাওয়া যায়।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার কপালে আঙুল রাখার উদ্দেশ্য কি এই পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের সঙ্গে যোগস্থাপন করা?'

'তা একরকম তাই বলতে পারেন,' বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। —'অবিশ্যি যখন প্রথম শুরু করি তখন পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের নামও শুনিনি। জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনে ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন। এক রবিবার আমার জ্যাঠামশাইয়ের মাথা ধরল। বললেন, 'লখ্না, আমার মাথাটা একটু টিপে দিবি? আমি তোকে আইসক্রিমের পয়সা দেব।' কপাল টনটন করছে, কপালের মধ্যিখানে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে টিপছি, এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। চোখের সামনে বায়স্কোপের ছবির মতো পরপর দেখতে লাগলাম—জ্যাঠার পৈতে হচ্ছে, জ্যাঠা পুলিশের ভ্যানে উঠছেন—মুখে বন্দেমাতরম্ স্লোগান, জ্যাঠার বিয়ে, জেঠিমার মৃত্যু, এমনকী জ্যাঠার নিজের মৃত্যু পর্যন্ত, কীসে মরছেন, কোন খাটে শুয়ে মরছেন, খাটের পাশে কে কে রয়েছেন, সব।...তখন কিছু বলিনি, কিন্তু এই মৃত্যুর ব্যাপারটা যখন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল, তখন...বুঝতেই পারছেন—'

লালমোহনবাবুকে দেখে বেশ বুঝছিলাম যে ওঁর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। বিলাসবাবু দেখলাম একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন গণৎকারের দিকে।

ফেলুদা বলল, 'আপনি তো শুনেছি ডাক্তারিও করেন, আর তার চিহ্নও দেখছি ঘরে। নিজেকে কী বলেন—ডাক্তার, না গণৎকার?'

'দেখুন, গণনার ব্যাপারটা আমি শিখিনি। আয়ুর্বেদটা শিখেছি। অ্যালোপ্যাথিও যে একেবারে জানি না তা নয়। পেশা কী জিজ্ঞেস করলে ডাক্তারিই বলব। আসুন, এগিয়ে আসুন, কাছে এসে বসুন।'

শেষের কথাগুলো অবিশ্যি বিলাসবাবুকে বলা হল। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তক্তপোশে পা তুলে বাবু হয়ে বসে বললেন, 'দেখুন, কপালের ব্ল্যাক স্পটটি যদি ইনফরমেশনের সহায়ক হয়!'

লক্ষ্মণবাবুর পাশেই যে একটা ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বাটি রাখা ছিল সেটা এতক্ষণ লক্ষ করিনি। তার মধ্যে তরল পদার্থটা যে কী তা জানি না, কিন্তু দেখলাম লক্ষ্মণবাবু তাতে ডান হাতের কড়ে আঙুলের ডগাটা তিনবার চুবিয়ে নিলেন। তারপর একটা ধবধবে পরিষ্কার রুমালে আঙুলটা মুছে নিয়ে চোখ বুজে মাথা হেঁট করে আঙুলের ডগাটা মোক্ষম আন্দাজে ঠিক বিলাসবাবুর কপালের আঁচিলের উপর বসিয়ে দিলেন!

তারপর মিনিটখানেক সব চুপ। সবাই চুপ। কেবল ঘড়ির টিকটিক আর—এই প্রথম খেয়াল হল—বাইরে থেকে আসা একটানা ঢেউ ভাঙার শব্দ।

'তেত্রিশ—তেত্রিশ—উনিশ শো তেত্রিশ—তুলা লগ্ন, সিংহ রাশি—পিতামাতার প্রথম সন্তান...'

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য চোখ বন্ধ করেই বলতে শুরু করেছেন।

'সাড়ে আটে টনসিল অ্যাডিনয়েডস— পরীক্ষায় বৃত্তি— স্বর্ণপদক...বিজ্ঞান— পদার্থ বিজ্ঞান— উনিশে গ্র্যাজুয়েট— তেইশে উপার্জন শুরু— চাক...না, চাকরি না— ফ্রিলান্স— ফটোগ্রাফার— স্ট্রাগল...স্ট্রাগল দেখছি, স্ট্রাগল— উদ্যম, একাগ্রতা, অধ্যবসায়— পর্বতারোহণে পটুতা— বন্যপশুপক্ষী-প্রীতি— বেপরোয়া জীবন— ভ্রাম্যমাণ— অকৃতদার...'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওড়িশা হ্যান্ডিক্রাফ্‌টসের অ্যাশট্রেটা দেখছে। লালমোহনবাবু হাতদুটো মুঠো করে টান হয়ে বসেছেন। আমার বুক টিপ টিপ করছে। বিলাসবাবুর মুখ দেখলে কিছু বোঝার উপায় নেই, তবে ওঁর চোখ যে গণৎকারের দিক থেকে একবারও সরেনি, সেটা আমি লক্ষ করেছি।

'সেভেনটি এইট—সেভেনটি এইট...'

আবার কথা শুরু হয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বেশ স্ট্রেন হচ্ছে ভদ্রলোকের সেটা বোঝা যায়।

'বন দেখছি, বন—হিমালয়—অপঘাত—অপ—না—'

পাঁচ সেকেন্ড চুপ থেকে ভদ্রলোক হঠাৎ বিলাসবাবুর কপাল থেকে আঙুল নামিয়ে নিয়ে চোখ খুললেন। তারপর সটান বিলাসবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার বেঁচে থাকার কথা নয়, কিন্তু রাখে হরি মারে কে?'

'অ্যাক্সিডেন্ট নয়?' বিলাসবাবু ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন।

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে একটা পান মুখে পুরে বললেন, 'যতদূর দেখছি, নট অ্যাক্সিডেন্ট। আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল পাহাড়ের প্রান্ত থেকে। অর্থাৎ, ডেলিবারেট অ্যাটেম্‌প্ট অ্যাট মার্ডার। মরেননি সেটা আপনার পরম ভাগ্যি।'

'কিন্তু কে ঠেলল সেটা—?'

প্রশ্নটা করেছেন লালমোহনবাবু। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য মাথা নাড়লেন।—'স্যরি।

যা দেখেছি তার বাইরে বলতে পারব না। বললে মিথ্যে বলা হবে। দেবতা রুষ্ট হবেন।'

'দিন আপনার হাতটা।'

বিলাসবাবু করমর্দনের জন্য তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে।

॥ ৬ ॥

'এটাকে কী বলবেন ? ফাইভ স্টার না সিক্স স্টার ?' লালমোহনবাবুকে প্রশ্নটা করল ফেলুদা।

আমরা রেলওয়ে হোটেলে এসেছি ডিনার খেতে। বিলাসবাবু সাগরিকা থেকে বেরিয়েই আমাদের নেমন্তন্ন করলেন। বললেন, 'আপনারা আমার অশেষ উপকার করেছেন ; আমার এই অনুরোধটা রাখতেই হবে।'

রেলওয়ে হোটেলের খাওয়া যে অপূর্ব তাতে কোনও সন্দেহ নেই আর সেটা লালমোহনবাবুও না স্বীকার করে পারলেন না। বললেন, 'রেলের খাওয়ার যা ছিরি হয়েছে আজকাল মশাই, আমি ভাবলুম রেলওয়ে হোটেলের খাওয়াও বুঝি সেই স্ট্যান্ডার্ডের হবে। সে ভুল ভেঙে গেছে—থ্যাঙ্কস টু ইউ।'

বিলাসবাবু হেসে বললেন, 'এবার সুফ্লেটা খেয়ে দেখুন।'

'কী খাব সুপ প্লেটে ? সুপ তো গোড়াতেই খেলুম।'

'সুপ প্লেট নয়। সুফ্লে—মিষ্টি।'

এই সুফ্লে খেতেই বিলাসবাবু লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দৌলতে মনে পড়ে যাওয়া ঘটনাটা বললেন।—

'মিস্টার সেনের ঘরে দেখা সেই ঘটনাটা আমার মনে কোনওরকম খটকার সৃষ্টি করেনি। পরদিন ভদ্রলোক পোখরা যাচ্ছিলেন ; আমাকে সঙ্গে যাবার জন্য ইনভাইট করলেন। জাপানি দল আসতে আরও তিনদিন দেরি, তাই রাজি হয়ে গেলুম। পোখরা কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার। পথে একটা জঙ্গল পড়ল, ভদ্রলোক সেখানে গাড়ি থামাতে বললেন। বললেন নাকি ভাল অর্কিড পাওয়া যায় ওই জঙ্গলে। আমিও ক্যামেরা নিয়ে নামলুম। আর কিছু না হোক, এক-আধটা ভাল পাখিও যদি পাই, তা হলেই বা মন্দ কী ?—আমি পাখি খুঁজছি, উনি অর্কিড। দুজনে ভাগ হয়ে গেছি, কথা আছে আধ ঘণ্টা বাদে দুজনেই গাড়িতে ফিরব। ওপরে গাছের দিকে চোখ রেখে এগোচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে মাথায় একটা বাড়ি, আর তারপরেই অন্ধকার।'

ভদ্রলোক থামলেন। আর কিছু বলার নেই, কারণ বাকি ঘটনা উনি আগেই বলেছেন। ফেলুদা বলল, 'আঘাতটা কে মেরেছিল সেটা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত নন ?'

বিলাসবাবু মাথা নাড়লেন।—'একেবারেই না, তবে এটা বলতে পারি যে সেই জঙ্গলে ত্রিসীমানার মধ্যে আর কোনও মানুষ চোখে পড়েনি। গাড়িটা ছিল মেন

রোডে, প্রায় কিলোমিটার খানেক দূরে।'

'তা হলে অ্যাটেম্পটেড মার্ডারটা যে মিঃ সেনের কীর্তি, আদালতে সেটা প্রমাণ করার কোনও উপায় নেই ?'

'আজ্ঞে না, তা নেই।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উশখুশ করছিলেন, এবার বুঝলাম কেন। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি একবারটি সেনমশাইয়ের সামনে গিয়ে হাজির হন না। উনিই যদি কালপ্রিট হন, তা হলে আপনাকে দেখে বেশ একটা ভূত দেখার মতো ব্যাপার হতে পারে। সেটা মন্দ হবে কী ?'

'সে কথা আমি ভেবেছি, কিন্তু সেখানে একটা মুশকিল আছে। উনি আমাকে নাও চিনতে পারেন। কারণ আমার তখন দাড়ি ছিল না। এটা রেখেছি থুতনির ক্ষতচিহ্নটা ঢাকবার জন্য।'

আরও মিনিট পাঁচেক থেকে বিলাসবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক আমাদের গেট অবধি পৌঁছে দিলেন। মেঘ কেটে গেছে, গুমোট ভাবটাও আর নেই। ফেলুদার পকেটে একটা ছোট্ট জোরালো টর্চ আছে জানি, কিন্তু ফিকে চাঁদের আলো থাকার দরুন সেটা আর জ্বালাবার দরকার হবে না।

রাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রের ধার অবধি বাঁধানো পথটা দিয়ে চলতে চলতে লালমোহনবাবু বললেন, 'এবার ফ্র্যাঙ্কলি বলুন তো মশাই, কী রকম দেখলেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যিকে। তাজ্জব ব্যাপার নয় কি ?'

'হতে পারে তাজ্জব,' বলল ফেলুদা, 'কিন্তু অত জেনেও গোয়েন্দার ভাত মারতে পারবে না। বিলাস মজুমদারকে দুর্গাগতি সেনই হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কি না সেটা জানতে হলে ফেলু মিত্তির ছাড়া গতি নেই।'

'আপনি তদন্ত করছেন তা হলে ?'

চাঁদের আলোতেই বুঝলাম লালমোহনবাবুর চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

ফেলুদা কী উত্তর দিত জানি না, কারণ ঠিক তখনই সামনে একজন চেনা লোককে দেখে আমাদের কথা থেমে গেল। মাটির দিকে চেয়ে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছেন আমাদেরই পথ ধরে মিঃ হিঙ্গোরানি।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন; তারপর ফেলুদার দিকে আঙুল নেড়ে বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, 'ইউ বেঙ্গলিজ আর ভেরি স্টাবর্ন, ভেরি স্টাবর্ন!'

'হঠাৎ এই আক্রোশ কেন ?' ফেলুদা হালকা হেসে ইংরিজিতে প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক বললেন, 'আই অফারড হিম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজ্যান্ড, অ্যান্ড হি স্টিল সেড নো!'

'পঁচিশ হাজারের লোভ সামলাতে পারে এমন লোক তা হলে আছে বিশ্বসংসারে ?'

'আরে মশাই, ভদ্রলোক যে পুঁথি সংগ্রহ করেন সেটা আগে জানতাম। তাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে গেলাম। বললাম তোমার সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল

পিস কী আছে সেটা দেখাও। তৎক্ষণাৎ আলমারি খুলে দেখালেন—দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পুঁথি। অসাধারণ জিনিস। চোরাই মাল কি না জানি না। আমার তো মনে হয় গত বছর ভাতগাঁওয়ের প্যালেস মিউজিয়ম থেকে তিনটে পুঁথি চুরি গিয়েছিল, এটা তারই একটা। দুটো উদ্ধার হয়েছিল, একটা হয়নি। আর সেটাও ছিল প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি।'

'হোয়ার ইজ ভাতগাঁও ?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু। জায়গাটার নাম আমিও শুনিনি।

'কাঠমাণ্ডু থেকে দশ কিলোমিটার। প্রাচীন শহর, আগে নাম ছিল ভক্তপুর।'

'কিন্তু চোরাই মাল কি কেউ চট করে দেখায় ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল—'আর

আমি যতদূর জানি প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি একটা নয়, বিস্তর আছে।'

'আই নো, আই নো,' অসহিষ্ণুভাবে বললেন মিঃ হিঙ্গোরানি। 'উনি বললেন এটা দলাই লামার সঙ্গে এসেছিল, উনি নাকি ধরমশালা গিয়ে কিনে এনেছিলেন। কত দিয়ে কিনেছিলেন জানেন? পাঁচশো টাকা। আর আমি দিচ্ছি পঁচিশ হাজার—ভেবে দেখুন!'

'তার মানে কি বলছেন পুরী আসাটা আপনার পক্ষে ব্যর্থ হল!'

'ওয়েল, আই ডোণ্ট গিভ আপ সো ইজিলি। মহেশ হিঙ্গোরানিকে তো চেনেন না মিস্টার সেন! ওঁর আরেকটা ভাল পুঁথি আছে, ফিফটিনথ সেনচুরি। আমাকে দেখালেন। আরও দুটো দিন সময় আছে হাতে। দেখা যাক কদ্দিন ওঁর গোঁ টেঁকে।'

ভদ্রলোক সংক্ষেপে গুডনাইট জানিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন হোটেলের দিকে।

'একটু সাসপিশাস লাগছে না?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন। ফেলুদা বলল, 'কার বা কীসের কথা বলছেন সেটা না জানলে বলা সম্ভব নয়।'

'পাঁচশ টাকা দিয়ে কেনা জিনিস পঁচিশ হাজারে ছাড়ছে না?'

'কেন, মানুষ নির্লোভ হতে পারে এটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? সিধুজ্যাঠা দুর্গাগতিবাবুকে পুঁথি বিক্রি করতে রিফিউজ করেছেন সেটা আপনি জানেন?'

'কই, সেটা তো মিঃ সেন বললেন না।'

'সেটা তো আমার কাছে আরও সাসপিশাস। ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র এক বছর আগে।'

আমার মনে হল দুর্গাগতিবাবু শুধু পিকিউলিয়ার নন, বেশ রহস্যজনক চরিত্র। আর বিলাসবাবু যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়...

'সাসপিশন কিন্তু একজনের উপর পড়ে নেই,' বলল ফেলুদা, 'নিউক্লিয়ার ফল-আউটের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কাকে বাদ দেবেন বলুন। আপনার গণৎকার যে তৃতীয়-চক্ষু-সম্পন্ন সরীসৃপের কথা বললেন, সেটার নাম টারাটুয়া নয়, টুয়াটারা। আর তার বাসস্থান নিউ গিনি নয়, নিউজিল্যাণ্ড। এ ধরনের ভুল জটায়ুর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য যদি তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে লোককে ইমপ্রেস করতে চান, তা হলে তাঁকে আরও অ্যাকুরেট হতে হবে। তারপর ধরুন নিশীথবাবু। আড়িপাতার অভ্যাস আছে ভদ্রলোকের; সেটা মোটেই ভাল নয়। তারপর দুর্গাগতিবাবু বললেন ওঁর গাউট হয়েছে কিন্তু ওঁর টেবিলের ওষুধগুলো গাউটের নয়।'

'তবে কীসের?'

'একটা ওষুধ তো সবে গত বছর বেরিয়েছে, টাইম ম্যাগাজিনে পড়ছিলাম ওটার কথা। কীসের ওষুধ ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু গাউটের নয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, ভদ্রলোককে এত অন্যমনস্ক কেন মনে হয় বলো তো? আর তা ছাড়া বললেন, ওঁর ছেলেকে চেনেন না...'

'সেটারও তো কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'ধরুন যদি উনি সত্যিই বিলাস মজুমদারকে খুন করার চেষ্টা করে থাকেন, তা হলে সেটাই একটা অন্যমনস্কতার কারণ হতে পারে। এখানে অবিশ্যি অন্যমনস্কতা ইজ ইকুয়াল টু নার্ভাসনেস।'

এখানে আমাদের কথা থেমে গেল। শুধু কথা না, হাঁটাও।

বালির উপরে জুতোর ছাপ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পাশে লাঠির ছাপ।

ছাপটা হয়েছে গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে বিলাসবাবু লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে সোজা হোটেলে ফিরে গিয়ে স্নান-টান সেরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এর মধ্যে আর নীচে আসেননি।

তা হলে এ ছাপ কার ?

আর কে বাঁ হাতে লাঠি নিয়ে হেঁটে বেড়ায় পুরীর বিচে ?

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে আমরা চা খেয়ে বেরোব বেরোব ভাবছি, এমন সময় লালমোহনবাবুর গাড়ি চলে এল। ড্রাইভার হরিপদবাবু বললেন যে যদিও সকাল সকাল রওনা হয়েছিলেন, বালাসোরের ৩০ কিলোমিটার আগে নাকি প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে, ফলে ওঁকে ঘণ্টা চারেক বালাসোরেই থাকতে হয়েছিল। গাড়ি নাকি দিব্যি এসেছে, কোনও ট্রাবল দেয়নি।

হরিপদবাবুর জন্য আমাদের হোটেলের কাছেই নিউ হোটেলে একটা ঘর বুক করে রাখা হয়েছিল, কারণ নীলাচলে জায়গা ছিল না। গাড়িটা নীলাচলে রেখে ভদ্রলোক চলে গেলেন নিজের হোটেলে। আমরা বলে দিলাম দিন ভাল থাকলে দুপুরের দিকে ভুবনেশ্বরটা সেরে আসতে পারি। একটার মধ্যে মন্দির-টন্দির সব দেখে ঘুরে আসা যায়।

ফেলুদা বলেই রেখেছিল সকালে একবার স্টেশনে যাবে। ওর আবার স্টেটস্‌ম্যান না পড়লে চলে না, হোটেলে দেয় শুধু বাংলা কাগজ।

হাঁটা পথে হোটেল থেকে স্টেশনে যেতে লাগে আধ ঘণ্টা। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন পৌনে নটা। কলকাতা থেকে জগন্নাথ এক্সপ্রেস এসে গেছে সাতটায়; পুরী এক্সপ্রেস এক ঘণ্টা লেট, এই এল বলে। কোথাও যাবার না থাকলেও স্টেশনে আসতে দারুণ লাগে। বিশেষ করে কোনও বড় ট্রেন আসামাত্র ঠাণ্ডা স্টেশন কী রকম টগবগিয়ে ফুটে ওঠে, সে জিনিস দেখে দেখেও পুরনো হয় না।

বুক-স্টলে গিয়ে লালমোহনবাবু প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন বিখ্যাত রহস্যরোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ুর কোনও বই আছে কি না। এটা করার কোনও মানে হয় না, কারণ ওই সিরিজের গোটা দশেক বই সামনেই রাখা রয়েছে, আর তার মধ্যে তিনটে যে জটায়ুর সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ফেলুদা খবরের কাগজ কিনে অন্য বই ঘাঁটছে, এমন সময় একটা গলা পেলাম।

'জ্যৈষ্ঠের রহস্য মাসিকটা এসেছে?'

পাশ ফিরে দেখি নিশীথবাবু। ভদ্রলোক প্রথমে আমাদের দেখেননি; চোখ পড়তেই কান অবধি হেসে ফেললেন।

'দেখুন। পাশে গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে, আর আমি কিনছি রহস্য মাসিক!'

'আপনার বস্-এর কী খবর?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আর বলবেন না', বললেন নিশীথবাবু, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে লোক চলে আসে, আর দেখা করার জন্য ঝুলোঝুলি করে। পুঁথির এত সমঝদার আছে জানতুম না মশাই।'

'আবার কে এল ?'

'লম্বা, চাপ দাড়ি, চোখে কালো চশমা। নাম জানতে চাইলে বললেন নাম বললে চিনবেন না তোমার মনিব। বলো ভাল পুঁথির খবর আছে। বললুম কর্তাকে, বললেন নিয়ে এসো। হাতে নিয়ে গিয়ে বসালুম। আরও কিছু চিঠি টাইপ করার ছিল, ঘরে চলে গেছি, ও মা, তিন মিনিটের মধ্যেই হাঁকডাক। গিয়ে দেখি কর্তার মুখ ফ্যাকাশে, এই বুঝি হার্ট ফেল করবেন। বললেন এঁকে নিয়ে যাও। ভদ্রলোককে তৎক্ষণাৎ নিয়ে চলে এলুম। সে আবার যাবার সময় বলে কী, তোমার মনিবের হার্টের ব্যামো আছে নিশ্চয়ই, ডাক্তার দেখাও !'

'এখন কেমন আছেন উনি ?'

'এখন অনেকটা ভাল।' ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি দিয়েই আঁতকে উঠেছেন—'এত যে লেট হয়ে গেছে সেটা খেয়ালই করিনি। শুনুন মশাই আছেন তো কদিন ? একদিন সব বলব। সে অনেক ব্যাপার। আ—চ্ছা !'

ইতিমধ্যে পুরী এক্সপ্রেস এসে পড়েছিল, গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল, আর নিশীথবাবুও ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

ফেলুদা একটা চটি বই রেখে রেখেছিল, সেটা কিনে নিল। দাম সতেরো পঞ্চাশ। নাম—এ গাইড টু নেপাল।

ফেরার পথে ফেলুদা বলল, 'আপনারা বরং আজই ভুবনেশ্বরটা দেখে আসুন। একটা ফিলিং হচ্ছে, আমার এখানে থাকা দরকার। এখুনি কিছু হবে বলে মনে হয় না, তবে আবহাওয়া সুবিধের নয়। তা ছাড়া আমার কিছু কাজও আছে। কাঠমাণ্ডুতে একটা ফোন করা দরকার। তথ্যগুলো জট পাকিয়ে যাবার আগে একটু গুছিয়ে ফেলা দরকার।'

আমি ফেলুদার এই মুডটা ভাল করে জানি। ও এখন গুটিয়ে নেবে নিজেকে, মৌনী হয়ে যাবে। খাটে চিত হয়ে শুয়ে শূন্যে চেয়ে থাকবে। আমি লক্ষ করেছি এই অবস্থায় ওর প্রায় তিন-চার মিনিট ধরে চোখের পাতা পড়ে না। আমরা যদি এ সময়ে ঘরে থাকি তো ফিস্ ফিস্ করে কথা বলি। সবচেয়ে ভাল হয় ঘরে না থাকলে। আর ফেলুদার সঙ্গই যদি না পাই তো ভুবনেশ্বরে যেতে ক্ষতি কী ?

আমি লালমোহনবাবুকে ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম যে আমাদের যাওয়াই উচিত।

হোটেলের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন দেখি একজন চেনা লোক গেট দিয়ে বেরোচ্ছেন।

'দেখেছেন, আর এক মিনিট এদিক-ওদিক হলেই আর দেখা হত না,' বললেন বিলাস মজুমদার।

'চলুন ওপরে !'

বিলাসবাবু আমাদের ঘরে এসে চেয়ারে বসে কপালের ঘাম মুছলেন।

'আপনি তো আমার অ্যাডভাইস নিয়েছেন শুনলাম,' একগাল হেসে বললেন

লালমোহনবাবু।

'শুধু তাই না,' বললেন ভদ্রলোক, 'আপনি ঠিক যেমনটি বলেছিলেন একেবারে হুবহু তাই; যাকে বলে ভূত দেখা। আমি তো অপ্রস্তুতেই পড়ে গেলাম মশাই। দাড়ি সত্ত্বেও লোকটা চিনে ফেলল!'

ফেলুদা বলল, 'আপনি বোধহয় খেয়াল করেননি যে আপনার চেহারায় একটি বিশেষত্ব আছে যেটা চট করে ভোলবার নয়।'

বিলাসবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কী বলুন তো?'

'আপনার কপালে থার্ড আই,' বলল ফেলুদা।

'ঠিক বলেছেন। ওটা আমার খেয়ালই হয়নি। যাকগে, একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল, জানেন। লোকটার দশা দেখে ওর ওপর মায়া হল। আর, ওই ঘটনাটির ফলেই বোধহয়, ওঁকে কাঠমাণ্ডুতে যেমন দেখেছিলাম তেমন আর উনি নেই। এই ছয়-সাত মাসে বয়স যেন বেড়ে গেছে দশ বছর। আজ দেখা হয়ে খুব ভাল হল। এবার ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলতে কোনও অসুবিধা হবে না।'

'এটা সুখবর,' বলল ফেলুদা—'শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আপনি বেশি দূর এগোতেও পারতেন না।'

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

'আপনাদের প্ল্যান কী?'

ফেলুদা বলল, 'এঁরা দুজন যাচ্ছেন ভুবনেশ্বর, সন্ধ্যায় ফিরবেন। আমি এখানেই আছি।'

'আমি ভাবছি কালই বেরিয়ে পড়ব। উড়িষ্যার ফরেস্টগুলো দেখা হয়নি।...যদি পারি যাবার আগে গুডবাই করে যাব।'

আমাদের বেরোতে বেরোতে সাড়ে বারোটা হলেও, দিনটা ভাল থাকায়, আর চমৎকার রাস্তায় হরিপদবাবু স্পিডোমিটারের কাঁটা ৮০ কিলোমিটারের নীচে নামতে না দেওয়ার দরুন আমরা ঠিক বেয়াল্লিশ মিনিটে ভুবনেশ্বর পৌঁছে গেলাম।

আমরা প্রথমে চলে গেলাম রাজারানী মন্দির দেখতে, কারণ এরই গায়ের একটা যক্ষীর মাথা চুরি হয়ে গিয়েছিল, আর ফেলুদা তার আশ্চর্য গোয়েন্দাগিরির ফলে সেটা উদ্ধার করে দিয়েছিল। সেটাকে মন্দিরের গায়ে চিনতে পেরে শিরদাঁড়ায় এমন একটা শিহরন খেলে গেল যে বলতে পারি না।

অবিশ্যি মন্দির তো শুধু ওই একটাই নয়—লিঙ্গরাজ, কেদারগৌরী, মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর আর আরও কত যে ঈশ্বর তা মনেও নেই। লালমোহনবাবুর আবার সবগুলো দেখা চাই, কারণ এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনের সেই কবি-শিক্ষক বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের নাকি চার লাইনের একটা গ্রেট পোয়েম আছে ভুবনেশ্বর নিয়ে, যেটা ওঁকে মুখস্থ করে। মুক্তেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় চল্লিশ জন দেশি-বিদেশি টুরিস্টের সামনে উনি সেটা গলা ছেড়ে আবৃত্তি করলেন—

'কত শত অজ্ঞাত মাইকেল এঞ্জেলো
একদা এই ভারতবর্ষে ছেলো—

নীরবে ঘোষিছে তাহা ভাস্কর্যে ভাস্বর
ভুবনেশ্বর !'

ভদ্রলোক যাতে কষ্ট না পান তাই আমি মুখে 'বাঃ' বললাম, যদিও এঞ্জেলোর সঙ্গে মিল দেবার জন্য 'ছিল'কে 'ছেলো' করাটা আমার মোটেই গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ বলে মনে হল না। কথাটা নরম করে ওঁকে বলাতে ভদ্রলোক রেগেই গেলেন।

'পোয়েটের ব্যাকগ্রাউন্ড না জেনে তার্স ক্রিটিসাইজ করার বদ অভ্যাসটা কোথায় পেলে, তপেশ ? বৈকুণ্ঠ মল্লিক চুঁচড়োর লোক ছিলেন। ওখানে ছিলকে ছেলই বলে। ওতে ভুল নেই।'

ভুবনেশ্বর ছিমছাম শহর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মতে, সমুদ্র না থাকায় পুরীর পাশে দাঁড়াতে পারে না। কাজেই সাতটা নাগাদ আবার নীলাচল হোটেলে ফিরে আসতে দিব্যি ভাল লাগল।

তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের বারান্দায় উঠতেই ম্যানেজার শ্যামলাল বারিক তাঁর ঘর থেকে হাঁক দিলেন।

'ও মশাই, মেসেজ আছে।'

আমরা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলাম তাঁর ঘরে।

'মিত্তির মশাই এই দশ মিনিট হল বেরোলেন। বললেন আপনারা যেন ঘরেই

থাকেন।'

'কী ব্যাপার ? কোথায় গেলেন ?'

'থানা থেকে ফোন করেছিল ওঁকে। ডি. জি. সেনের বাড়িতে চুরি হয়েছে। একটি মহামূল্য পুঁথি।'

আশ্চর্য ! ফেলুদার মন বলছিল কিছু একটা হবে, আর সত্যিই হয়ে গেল।

॥ ৮ ॥

স্নান করে চা খেয়ে শরীরের ক্লান্তি দূর হল ঠিকই। কিন্তু মন ছটফট, বুকের ভিতর টিপ টিপ। ফেলুদা তদন্তে লেগে গেছে। পুরী আমাদের হতাশ করেনি।

কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে, এতে ফেলুদার ট্যাঁকে কিছু আসবে কি? অবিশ্যি কেস তেমন জমাটি হলে রোজগার হল কি না হল সেটা ফেলুদা ভুলে যায়। অনেক সময় রোজগার যেগুলোতে হয়—মানে, যেখানে মক্কেল ঘরে এসে ফেলুদাকে তদন্তের ভার দেয়, সেখানে পকেট ভরলেও মন ভরে না, কারণ রহস্যটা হয় মামুলি। আবার এমন অনেকবার হয়েছে যে ফেলুদা শখ করে তদন্ত করেছে, পয়সা হয়তো কিছুই আসেনি, অথচ রহস্য জটিল হওয়াতে সমাধান করে মন মেজাজ মগজ সব একসঙ্গে চাঙিয়ে উঠেছে।

'কাকে সাসপেক্ট করছ, তপেশ?' আটটা নাগাত প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। উনি এতক্ষণ হাত দুটোকে পিছনে জড়ো করে আমাদের ঘরে পায়চারি করেছেন।

আমি বললাম, 'চুরি করার সুযোগ সবচেয়ে বেশি নিশীথবাবুর, কিন্তু সেইজন্যেই উনি করবেন বলে মনে হয় না। এ ছাড়া হিঙ্গোরানির তো লোভ ছিলই ওই পুঁথির ওপর। বিলাস মজুমদারও টাকা আর প্রতিশোধের জন্য করতে পারেন। তারপর লক্ষ্মণ ভট—'

'না না না,' ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে উঠলেন লালমোহনবাবু। 'এমন একজন লোককে এর মধ্যে টেনো না—প্লিজ। কী অলৌকিক ক্ষমতা ভেবে দেখো তো ভদ্রলোকের।'

'আপনার কী মনে হয়?' আমি পালটা প্রশ্ন করলাম।

'আমার মনে হয় তুমি আসল লোকটাকেই বাদ দিয়ে গেলে।'

'কে?'

'সেন মশাই হিমসেলফ্।'

'সে কী? উনি নিজের জিনিস চুরি করতে যাবেন কেন?'

'চুরি নয়, চুরি নয়, পাচার। চোরাই মাল পাচার করলেন অ্যাদ্দিনে। হিঙ্গোরানি হাইয়ার প্রাইস অফার করেছেন, আর উনি বেচে দিয়েছেন। লোককে বলছেন চুরি।'

আমি ভেবে দেখছিলাম লালমোহনবাবুর কথা ঠিক হতে পারে কি না, এমন সময় রুম বয় এসে খবর দিল যে, আমার টেলিফোন আছে। ফেলুদা।

রুদ্ধশ্বাসে নীচে গিয়ে ফোন ধরলাম।

'কী ব্যাপার ?'

'শ্যামলালবাবু বলেছেন ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে ?'

'নিশীথবাবু হাওয়া।'

'তাই বুঝি ? পুলিশে খবর দিল কে ?'

'সে সব গিয়ে বলব। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরছি। ভুবনেশ্বর কেমন লাগল ?'

'ভাল। ইয়ে—'

ফেলুদা ফোন রেখে দিয়েছে।

লালমোহনবাবুকে বললাম। ভদ্রলোক মাথা চুলকে বললেন, 'সিন অফ ক্রাইমে একবার গিয়ে পড়তে পারলে ভালই হত, তবে তোমার দাদা বোধহয় চাইছেন না।'

আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন ফেলুদা এল না, তখন সত্যিই চিন্তা হতে শুরু করল। রুম-বয়কে বলে আরেক দফা চা আনিয়ে নিলাম। দুজনে পালা করে পায়চারি করছি। ইতিমধ্যে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু না করে পারলাম না। ফেলুদার খাতাটা খাটের উপরই ছিল, তাতে আজ দুপুরে ও কী লিখেছে সেটা দেখে ফেলেছি, যদিও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি। ওর ধনী ব্যবসায়ী মক্কেল হরিহর জরিওয়ালার দেওয়া 'ক্রস' মার্কা ডট পেনে একটা পাতায় ছড়িয়ে লেখা রয়েছে—

ডায়াবিড ?—গাউট—সাপ ?—কী ফিরে আসবে ? ছেলেকে চেনে না কেন ?—কালোভাক ? কাকে ? কেন ?—লাঠি হাতে কে হাঁটে ?...

নটা নাগাত ধৈর্য ফুরিয়ে গেল। যা থাকে কপালে বলে দুজন বেরিয়ে পড়লাম। সাগরিকা থেকে ফিরতে হলে ফেলুদা সমুদ্রের ধার দিয়ে শর্টকাটই নেবে। আমরা তাই হোটেল থেকে বেরিয়ে ডাইনেই ঘুরলাম।

কালও রাত্রে রেলওয়ে হোটেল থেকে সমুদ্রের ধার ধরে ফিরবার সময় মনে হয়েছে, দিনে আর রাতে কত তফাত। ঢেউ-এর গর্জন যেমন দিনে তেমনি রাত্তিরেও চলে, কিন্তু রাত্রে সমস্ত ব্যাপারটা আবছা অন্ধকারে ঘটে বলে গা ছমছম করে অনেক বেশি। প্রকৃতির কী অদ্ভুত খেয়াল। জলের ফসফরাস না থাকলে এমন মেঘলা রাত্তিরে কি ঢেউগুলো দেখা যেত ?

দূরে বাঁয়ে আকাশটা যে ফিকে হয়ে আছে, সেটা শহরের আলোর জন্য। সামনে দূরের টিমটিমে আলোর বিন্দুগুলো নিশ্চয় নুলিয়া বস্তির।

আমরা দুজনে যতটা পারা যায় জল দূরে রেখে বাঁদিক ধরে চলতে লাগলাম। ঢেউয়ের ফেনা আমাদের বিশ-পঁচিশ হাত দূর অবধি গড়িয়ে এসে থেমে যাচ্ছে। লালমোহনবাবুর সঙ্গে টর্চ আছে, কিন্তু অপ্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করার কোনও মানে হয় না।

আজ সারাদিন বৃষ্টি না হওয়ায় বালি শুকনো কিন্তু তাও পা বসে যায়। এ বালি দিঘার মতো জমাট নয় যে প্লেন ল্যান্ড করবে। লালমোহনবাবু কেড্‌স পরেছেন, আর আমি চপ্পল। এই চপ্পলেই হঠাৎ আমি কীসের সঙ্গে ঠোক্কর খেলাম, আর

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে বালিতে। লালমোহনবাবুও 'কী হল, কী হল' করে এগিয়ে এসে কীসে জানি বাধা পেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে দুবার 'হেলপ্ হেলপ্' বলে বিকট চিৎকার করে উঠলেন। আমি ধরা গলায় বললাম, 'আমার পেটের নীচে দুটো ঠ্যাং।'

'বলো কী!'

আমরা দুজনেই কোনওরকমে উঠে পড়েছি, লালমোহনবাবু টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করে পারছেন না বলে সেটার পিছনে থাবড়া মারছেন।

একটা গোঙানির শব্দ, আর তারপর একটা মানুষের শরীর বালি থেকে উঠে বসল। চোখে যত না দেখছি, তার চেয়ে বেশি আন্দাজে বুঝছি।

'হাতটা দে—'

ফেলুদা!

আমি ডান হাতটা বাড়ালাম। ফেলুদা সেটা ধরে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আমার পিঠে হাত রেখে টলল।

টর্চ জ্বলেছে। লালমোহনবাবু কাঁপা হাতে আলোটা ফেলুদার মুখে ফেললেন। ফেলুদা নিজের ডান হাতটা সাবধানে মাথার উপর রেখে যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে হাতটা নামিয়ে নিল।

টর্চের আলোতে দেখলাম হাতের তেলোয় রক্ত।

'ফে ফ্-ফেটে গেছে?' ফাটা গলায় প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

কিন্তু ফেলুদার চোখে ভ্রূকুটি।—'কী রকম হল?'

ফেলুদাকে এত হতভম্ব হতে দেখিনি কখনও। ও নিজের পকেট থেকে ছোট্ট টর্চটা বার করে এদিক ওদিক ফেলল। এক জোড়া জুতো পরা পায়ের ছাপ ফেলুদা যেখানে পড়েছিল তার পাশ থেকে চলে গেছে উঁচু পাড়টার দিকে, যেখানে বালি শেষ হয়ে গেছে।

আমরা এগিয়ে গেলাম পায়ের ছাপ ধরে। পাড় এখানে বুক অবধি উঁচু। উপরে ঘাস আর ঝোপড়া। কাছাকাছির মধ্যে বাড়ি-টাড়ি নেই। যেখানে লোকটা ওপরে উঠে গেছে, সেখানে বালিতে কিছু ঘাসের চাবড়া পড়ে থাকতে দেখে বুঝলাম, লোকটাকে বেশ কসরত করে উঠতে হয়েছে।

ফেলুদা হোটেলমুখো ঘুরল, আমরা তার পিছনে।

'আপনি কতক্ষণ এই ভাবে পড়ে ছিলেন বলুন তো?' লালমোহনবাবুর গলার স্বর এখনও স্বাভাবিক হয়নি। ফেলুদা রিস্টওয়াচের ওপর টর্চ ফেলে বলল, 'প্রায় আধ ঘণ্টা।'

'মাথায় তো স্টিচ দিতে হবে মনে হচ্ছে।'

'না,' বলল ফেলুদা।—'আমার মাথায় শুধু বাড়ি লেগেছে, জখম হয়নি।'

'তা হলে রক্ত— ?'

ফেলুদা কোনও জবাব দিল না।

॥ ৯ ॥

হোটেলে এসে মাথায় বরফ দিয়ে ফেলুদার ব্যথাটা কমল। এই কীর্তির জন্য কে দায়ী সে সম্বন্ধে ফেলুদার কোনও ধারণা নেই। সাগরিকা থেকে ফেরার পথে জনমানবশূন্য বিচে হঠাৎ চোখের উপর আচমকা টর্চের আলো, আর তারপরেই মাথায় বাড়ি। ফেলুদা ফোন করে মহাপাত্রকে ঘটনাটা বলায় ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি একটু বুঝে-সুঝে চলুন মশাই। কিছু অত্যন্ত বেপরোয়া লোক যে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি চুপচাপ থেকে পুরো ব্যাপারটা আমাদের হ্যান্ডল করতে দিলে সবচেয়ে ভাল হয়। ফেলুদা উত্তরে বলে যে এই ঘটনাটা ঘটবার আগে সেটা বললে ও হয়তো ভেবে দেখতে পারত, এখন টু লেট।

রাত্রে খাওয়া সেরে ঘরে এসেছি, ঘড়িতে বলছে পৌনে এগারোটা, এমন সময় শ্যামলাল বারিক একটি ভদ্রলোককে নিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। বছর চল্লিশেক বয়স, ফরসা ফিটফাট চেহারা, চোখে পুরু কালো ফ্রেমের চশমা। শ্যামলালবাবু বললেন, 'ইনি আধ ঘণ্টা হল অপেক্ষা করছেন। আপনারা খাচ্ছিলেন, তাই আর ডিসটার্ব করিনি।'

ভদ্রলোককে বসিয়ে শ্যামলালবাবু বিদায় নিলেন।

আগন্তুক ফেলুদার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'আমি আপনার নাম শুনেছি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার কীর্তিকলাপ পড়ার দরুন এঁদের দুজনকেও চিনতে পারছি। আমার নাম মহিম সেন।'

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল। 'তার মানে— ?'

'দুর্গাগতি সেন আমার বাবা।'

আমরা তিনজনেই চুপ। ভদ্রলোকই কথা বলে চললেন।

'আমি এসেছি আজই দুপুরে। মোটরে। আমাদের কোম্পানির একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে উঠেছি।'

'আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করেননি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ফোন করেছিলাম এসেই। ওঁর সেক্রেটারি ধরেছিলেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম। উনি বাবার সঙ্গে কথা বলে জানালেন বাবা ফোনে আসতে চাইছেন না।'

'কারণ ?'

'জানি না।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে, তিনি আপনার প্রতি খুব প্রসন্ন নন। কেন, সেটা আপনি অনুমান করতে পারছেন না?'

ভদ্রলোক ফেলুদার অফার করা চারমিনার প্রত্যাখ্যান করে নিজের একটা রথম্যান ধরিয়ে বললেন, 'দেখুন, বাবার সঙ্গে আমার খুব একটা মেলামেশা কোনওদিনও ছিল না ; তাই বলে অসদ্ভাবও ছিল না। আমি ওঁর ছবি সম্বন্ধে কোনওদিন বিশেষ ইনটারেস্ট দেখাইনি ; আর্টের চোখ আমার নেই। আমি থাকি কলকাতায় ; কোম্পানির কাজে বছরে বার-দুয়েক বিদেশে যেতে হয়। চিঠি লিখে সব সময়ই উত্তর পেয়েছি, তা পোস্টকার্ডে দুটো লাইনই হোক। বাবা এখানে আসবার পর দুবার আমি আর আমার স্ত্রী ওঁরই বাড়ির দোতলায় হপ্তা-দুয়েক করে থেকে গেছি। আমার একটি বছর আটেকের ছেলে আছে, তাকে উনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু এবার যেটা করলেন সেটা আমার কাছে একেবারে রহস্য। বাবার মতো শক্ত লোকের বাষট্টি বছরে ভীমরতি ধরবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এর জন্য দায়ী কি না তাও জানি না। তাই যখন শুনলাম আপনি এসে রয়েছেন পুরীতে, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।'

'আপনার বাবার সেক্রেটারিটি কদ্দিন রয়েছেন?'

'তা বছর চারেক হবে। আমি সেভেনটি সিক্সে এসে ওঁকে দেখেছি।'

'কী রকম লোক বলে মনে হয়েছে আপনার?'

'আমার পক্ষে বলা শক্ত। এটুকু বলতে পারি যে চিঠি টাইপ করা ইত্যাদি মোটামুটি জানলেও, বাবা ওঁর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চয়ই আনন্দ পেতেন না।'

'তা হলে আপনাকে খবর দিই—আপনার বাবার সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান পুঁথিটি আজ চুরি হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সেক্রেটারিও উধাও।'

মহিমবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'বলেন কী! আপনি গিয়েছিলেন ওখানে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী রকম দেখলেন বাবাকে?'

'স্বভাবতই মুহ্যমান। ওঁর দুপুরে ওষুধ খেয়ে ঘুমোনোর অভ্যাস হয়েছে আজকাল ; আগে ছিল কি না জানি না। আজ বিকেলে সাড়ে ছটায় নাকি একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের আসবার কথা ছিল। নিশীথবাবুই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারটা দেখেন, কেউ এলে উনিই সঙ্গে করে নিয়ে যান। আজ উনি ছিলেন না। চাকর ছিল, সে-ই সাহেবকে নিয়ে যায় ওপরে। আপনার বাবা সাধারণত সাড়ে চারটের মধ্যে উঠে পড়েন, কিন্তু আজ উঠতে হয়ে গেছিল প্রায় ছটা। যাই হোক, সাহেব পুঁথি দেখতে চায়। মিঃ সেন আলমারির দেরাজ খুলে দেখেন শালুর মোড়ক ঠিকই আছে, কিন্তু তার ভিতরে রয়েছে দুটো কাঠের মাঝখানে ফালি করে কাটা এক গোছা সাদা কাগজ। আপনার বাবা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন, শেষটায় ওই আমেরিকানই পুলিশে ফোন করেন।'

'কিন্তু তার মানে নিশীথবাবুই কি— ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে সকালে স্টেশনে দেখা হয়েছিল।

এখন মনে হচ্ছে টিকিট কিনতে গিয়েছিলেন ; কারণ ওঁর ঘরে সুটকেস-বেডিং নেই। স্টেশনে গিয়েছিল পুলিশ, কিন্তু ততক্ষণে পুরী এক্সপ্রেস, হাওড়া প্যাসেঞ্জার দুটোই চলে গেছে। অবিশ্যি ওরা পরের স্টেশনগুলোতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে।'

আমরা তিনজনেই চুপ। এর মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেছে শুনে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

'আপনার বাবা গত বছর নেপালে গিয়েছিলেন সে খবর জানেন ?'

মহিমবাবু বললেন, 'অগাস্টের পর গিয়ে থাকলে জানার কথা নয়, কারণ আমি তখন থেকে সাত মাস দেশের বাইরে। বাবা পুঁথির খোঁজে অনেক জায়গায় যেতেন। কেন, নেপালে কী হয়েছিল ?'

ফেলুদা এ প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনার বাবার গাউট হয়েছে এটাও কি আপনার কাছে নতুন খবর ?'

মহিমবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'গাউট ? বাবার গাউট ?'

'বিশ্বাস করা কঠিন ?'

'খুবই। গত বছর মে মাসেও দেখেছি বাবা ভোরে আর সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে বালির উপর দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে চলেছেন। ওনার খাওয়া-দাওয়া ছিল পরিমিত, ড্রিংক করতেন না, কোনওরকম অনিয়ম করতেন না। স্বাস্থ্য নিয়ে ওঁর একটা অহংকার ছিল। বাবার গাউট হলে খুবই আশ্চর্য হব, এবং খুবই ট্র্যাজিক ব্যাপার হবে।'

'এটাই কি ওঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার কারণ হতে পারে ?'

'তা তো পারেই,' বেশ জোরের সঙ্গে বললেন মহিমবাবু। 'নিজেকে পঙ্গু বলে মেনে নেওয়াটা বাবার পক্ষে খুবই কঠিন হবে।'

ফেলুদা বলল, 'আমি রয়েছি আরও কয়েকদিন। দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার কাছে অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত ধোঁয়াটে।'

মহিমবাবু উঠে পড়ে বললেন, 'আমি এসেছি বাবার সঙ্গে আমাদের পুরনো ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু জরুরি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে। সেটা যদ্দিন না সম্ভব হচ্ছে, তদ্দিন আমাকেও থাকতে হবে।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর শুতে শুতে প্রায় বারোটা হল।

পাশের ঘর থেকে লালমোহনবাবু গুডনাইট করতে এলেন, যেমন রোজই আসেন। ওঁর রুমমেট আজ সকালে চলে গেছেন, উনি এখন একা। বললেন, 'ভাল কথা, আপনি তো আজ কাঠমাণ্ডুতে ফোন করেছিলেন।'

'তা করেছিলাম।'

'কী ব্যাপার মশাই ?'

'বীর হাসপাতালের ডাঃ ভার্গবকে জিজ্ঞেস করলাম, গত অক্টোবরে বিলাস মজুমদার নামে কোনও ব্যক্তি হেভি ইনজুরি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কি না।'

'কী বললেন ?'

'বললেন, হ্যাঁ। শিন্‌বোন, কলারবোন, পাঁজরার হাড়, থুতনি—সব বললেন।'

'আপনার বুঝি মজুমদারের কথা বিশ্বাস হয়নি?'

'সন্দেহ জিনিসটা গোয়েন্দাগিরির একটা অপরিহার্য অঙ্গ লালমোহনবাবু। কেন, আপনার গল্পের গোয়েন্দা প্রখর রুদ্র কি এই ব্যাতিক থেকে মুক্ত?'

'না না, তা তো নয়—মোটেই নয়...' বিড়বিড় করতে করতে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন ওঁর ঘরে।

বেশি রাত হলেই সমুদ্রের গর্জন শোনা যায় আমাদের ঘর থেকে। আমি জানি ফেলুদার মনের মধ্যেও ঢেউয়ের ওঠা-নামা চলেছে, যদিও বাইরে দেখছি শান্ত গাম্ভীর্য। এটাও অবিশ্যি সমুদ্রেরই একটা রূপ। এই রূপটা নুলিয়ারা দেখতে পায় মাছের নৌকো করে ব্রেকারস পেরিয়ে গেলে পর।

'ওটা কী ফেলুদা?'

বেডসাইড ল্যাম্পটা নেভাতে গিয়ে দেখি ফেলুদা পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা চৌকো ব্রাউন রঙের জিনিস বার করে দেখছে।

ভাল করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা মানিব্যাগ।

ব্যাগটার ভিতর থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করে অন্যমনস্ক ভাবে দেখে সেগুলো আবার ভিতরে পুরে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'এটা নিশীথবাবুর দেরাজে কিছু কাগজপত্তরের তলায় ছিল। আশ্চর্য। লোকটা বাক্স বিছানা নিয়েছে, অথচ পার্সটাই ভুলে গেছে।'

॥ ১০ ॥

চোখ খুলতেই যখন দেখলাম ফেলুদা যোগ ব্যায়াম করছে, তখন বুঝলাম সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি। অথচ এটা জানি যে ও অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাম্প জ্বালিয়ে কাজ করেছে।

একটা শব্দ শুনে বারান্দার দিকের জানালাটার দিকে চাইতে দেখি, লালমোহনবাবুও এরই মধ্যে উঠে পড়ে টুথব্রাশে ওঁর প্রিয় লাল সাদা ডোরাকাটা সিগন্যাল টুথপেস্ট লাগাচ্ছেন। বুঝলাম, আমাদের দুজনের মনের একই অবস্থা।

ফেলুদা ব্যায়াম শেষ করে বলল, 'চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।'

'কোথাও যাবার আছে বুঝি?'

'মাথাটা পরিষ্কার করা দরকার। বিশালত্বের সামনে পড়লে সেটা সময় সময় হয়। ভোরের সমুদ্রের দিকে চাইলেই একটা টনিকের কাজ দেয়।'

বেরোবার আগে শ্যামলাল বারিকের ঘরে গিয়ে ফেলুদা বলল, 'শুনুন, কয়েকটা ব্যাপার আছে। নেপালে একটা কল বুক করতে হবে, এই নিন নম্বর। আর মহাপাত্রের কাছ থেকে কোনও মেসেজ এলে রেখে দেবেন। আর, হ্যাঁ—এখানে খুব ভাল অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার কে আছে?'

'কটা চাই? আপনি কি ভাবছেন অজ পাড়াগাঁয়ে এসে পড়েছেন?'

'বুড়ো হাবড়া হলে চলবে না। ইয়াং চৌকস ডাক্তার চাই।'

'বেশ তো, ডাঃ সেনাপতি আছেন। গ্র্যান্ড রোডে উৎকল কেমিস্টে চেম্বার আছে। সকালে দশটার পর গেলেই দেখা পাবেন।'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

সমুদ্রের ধারে স্নানের লোক এখনও কেউ আসেনি, শুধু নুলিয়া ছাড়া আর কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। পুবের আকাশ ফিকে লাল, ছাই রঙের মেঘের টুকরোগুলোর নীচের দিকটা গোলাপি হয়ে আসছে। সমুদ্র কালচে নীল, শুধু তীরে এসে ভাঙা ঢেউয়ের মাথাগুলো সাদা।

প্রথমদিন এসে যে তিনটে নুলিয়া ছেলেকে তীরে বসে খেলতে দেখেছিলাম, কাঁকড়া সম্বন্ধে তাদের ভীষণ কৌতূহল। ওই কাঁকড়াই হল লালমোহনবাবুর মতে পুরীর সমুদ্রতটের একমাত্র মাইনাস পয়েন্ট।

'কী নাম রে তোর?'

তিনটে নুলিয়া ছেলের একটার মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধা লাল কাপড়; সে ফেলুদার প্রশ্নে দাঁত বার করে হেসে বলল, 'রামাই, বাবু।'

আমরা এগিয়ে চললাম। লালমোহনবাবুর কবিত্বভাব জেগে উঠেছে, বললেন, 'এই উন্মুক্ত উদার পরিবেশে রক্তপাত! ভাবা যায় না মশাই।'

'হুঁ—ব্লান্ট ইনস্‌ট্রুমেন্ট...' অন্যমনস্কভাবে বলল ফেলুদা। আমি জানি অস্ত্র দিয়ে খুনটা সাধারণত তিন রকমের হয়। এক হল আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে—যেমন রিভলভার পিস্তল; দুই: শার্প ইনস্‌ট্রুমেন্ট, যেমন ছোরা-ছুরি-চাকু ইত্যাদি; তিন হল ব্লান্ট ইনস্‌ট্রুমেন্ট বা ভোঁতা হাতিয়ার, যেমন ডাণ্ডা জাতীয় কিছু। বেশ বুঝতে পারলাম ফেলুদা কাল রাত্রে ওর মাথায় বাড়ি লাগার কথাটা ভাবছে। সত্যি, ভাবলে রক্ত জল হয়ে যায়। ভাগ্যে আঘাতটা মোক্ষম হয়নি।

'ফুটপ্রিন্টস...' ফেলুদা বলে উঠল।

একটু এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেলাম টাটকা পায়ের ছাপ। জুতো, আর সেই সঙ্গে বাঁ হাতে ধরা লাঠি।

'বিলাসবাবু খুব আর্লি রাইজার বলে মনে হচ্ছে', মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু।

'বিলাসবাবু? বিলাসবাবু বলে মনে হচ্ছে কি? দেখুন তো ভাল করে'—দূরে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল ফেলুদা।

এত দূর থেকেও বুঝতে পারলাম, যিনি বালিতে দাগ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলেছেন তিনি মোটেই বিলাসবাবু নন।

'তাই তো!' বললেন লালমোহনবাবু, 'ইনি তো দেখছি আমাদের সেনসেশন্যাল সেন সাহেব!'

'ঠিক ধরেছেন। দুর্গাগতি সেন।'

'কিন্তু তা হলে গেঁটে বাত?'

'সেইখানেই তো ভেল্‌কি। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের ওষুধের গুণ বোধহয়!'

মনে ধাঁধাটে ভাব নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। রহস্যের পর রহস্য যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ।

বাঁয়ে রেলওয়ে হোটেল দেখা যাচ্ছে। ডাইনে গোটা পাঁচেক নুলিয়া আর সুইমিং ট্রাঙ্কস পরা তিনজন সাহেব। তার মধ্যে একজন ফেলুদার দিকে হাত তুললেন।

'গুড মর্নিং!'

আন্দাজে বুঝলাম ইনিই কালকের সেই পুলিশকে ফোন করা আমেরিকান।

আমরা এগিয়ে গেলাম। ওই যে হিঙ্গোরানি আসছেন, কাঁধে তোয়ালে। ভারী অপ্রসন্ন মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে। আমাদের দিকে দেখলেনই না।

আমার মন কেন জানি বলছে ফেলুদা সাগরিকায় যাচ্ছে, কারণ ও সমুদ্রের ধারের বালি ছেড়ে বাঁয়ে চড়াইয়ে উঠতে শুরু করেছে। সূর্যের আধখানা কিন্তু এর মধ্যেই উঠে বসে আছে। ফেলুদার মাথা বিশালত্বের সামনে পড়ে পরিষ্কার হয়েছে কি?

'প্রাতঃপ্রণাম!'

গণৎকার মশাই এগিয়ে এসেছেন বালির উপর দিয়ে, লুঙ্গিটা খাটো করে পরা,

কাঁধে তোয়ালে, হাতে নিমের দাঁতন।

'কাল কোথায় ছিলেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কখন ?'

'সন্ধেবেলা ; আপনার খোঁজ করেছিলাম।'

'ওহো। কাল গেসলাম কেত্তন শুনতে। মংগলাঘাট রোডে একটা কেত্তনের দল আছে ; মাঝে-মধ্যে যাই।'

'কখন গিয়েছিলেন ?'

'আমার তো ছটার আগে ছুটি নেই। তারপরেই গেসলাম।'

'আপনি তো ও বাড়ির বাসিন্দা, তাই ভাবছিলাম চুরির ব্যাপারে যদি কোনও আলোকপাত করতে পারেন। আপনার ঘর থেকে পশ্চিমের গলিটা তো দেখা যায়।'

'তা তো যায়ই, তবে পশ্চিমের গলিতে যা দেখেছি তাতে খুব অবাক হইনি,' বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। 'নিশীথবাবুকে দেখলাম তল্পিতল্পা নিয়ে বেরুতে। তা উনি যে কলকাতায় যাবেন সেটা তো কদিন থেকেই ঠিক ছিল।'

'তাই বুঝি ?'

'ওঁর মা-র যে এখন-তখন অবস্থা। টেলিগ্রাম এসেছিল কদিন আগে।'

'বটে ? আপনি দেখেছিলেন সে টেলিগ্রাম ?'

'শুধু আমি কেন ? সেন মশাইও দেখেছিলেন।'

ফেলুদা অবাক।

'আশ্চর্য ! সেন মশাই তো সে কথা বললেন না।'

'সে আর কী বলব বলুন ! উনি মানুষটা কী রকম সেটা তো আপনারাও দেখলেন। দুর্ভোগ আছে আর কী। কপালের লিখন খণ্ডায় কার সাধ্যি বলুন !'

'আপনি মিঃ সেনেরও ভাগ্য গণনা করেছেন নাকি ?' ভারী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'এ তল্লাটে কার করিনি ? কিন্তু করলে কী হবে ? সবাইকে তো আর সব কথা বলা যায় না। অবিশ্যি ব্যারাম-ট্যারামের লক্ষণ দেখলে বলি ; তাই বলে, আপনি খুন করবেন, আপনার জেল হবে, ফাঁসি হবে, অপঘাতে মৃত্যু আছে আপনার—এ সব কি বলা যায় ? তা হলে আর কেউ আসবে না মশাই। আসলে লোকে ভালটাই শুনতে চায়। তাই অনেক হিসেব করে ঢেকে-ঢুকে বলতে হয়।'

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য বিদায় জানিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন। আমরা এগিয়ে চললাম সাগরিকার দিকে। সকালের রোদ পড়ে বাড়িটাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে।

'হত্যাপুরী', বললেন লালমোহনবাবু।

'সে কী মশাই,' প্রতিবাদের সুরে বলল ফেলুদা, 'হত্যা কোথায় হল যে হত্যাপুরী বলছেন ? বরং চুরিপুরী বলতে পারেন।'

'নট সাগরিকা,' বললেন লালমোহনবাবু।—'আমি এ দিকের বাড়িটার কথা বলছি।'

সাগরিকা থেকে আন্দাজ ত্রিশ গজ এই দিকে বালিতে বসে যাওয়া এই বাড়িটার কথা আগেই বলেছি। লালমোহনবাবু খুব ভুল বলেননি। এমনিতেই পোড়া নোনাধরা বাড়ি দেখলে কেমন গা ছমছম করে, এটার আবার তলার দিকের হাত-পাঁচেক বালিতে বসে যাওয়াতে, আর কাছাকাছি অন্য কোনও বাড়ি না থাকাতে সত্যিই বেশ ভুতুড়ে মনে হচ্ছিল। দিনের বেলাতেই এই, রাত্রে না জানি কী রকম হবে।

অন্যান্য দিন বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে যাই, আজ একটু কাছ থেকে দেখার লোভ সামলাতে পারল না বোধহয় ফেলুদা। ফটকের থামগুলো এখনও রয়েছে, তার একটার গায়ে কালসিটে মেরে যাওয়া শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা 'ভুজঙ্গ নিবাস'। বালি আর এক হাত উঠলেই ফলকটা ঢাকা পড়ে যাবে। ফটক পেরিয়ে বোধহয়

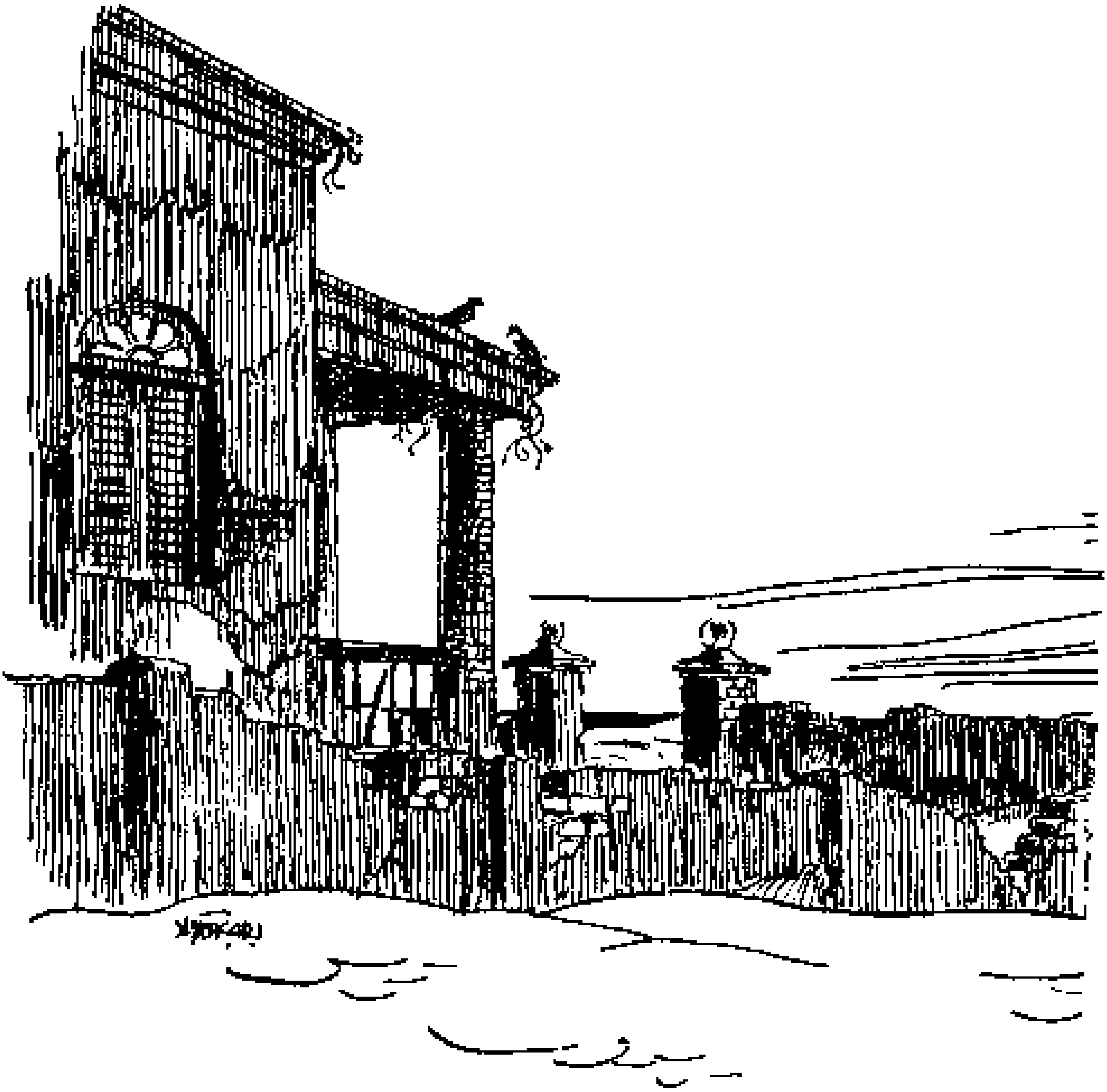

এককালে একটা ছোট্ট বাগান ছিল, তারপরেই সিঁড়ি উঠে গিয়ে বারান্দা। সিঁড়ির শুধু ওপরের দুটো ধাপ বেরিয়ে আছে, বাকিগুলো বালির নীচে। বারান্দার রেলিং ক্ষয়ে গেছে, ছাত যে কেন ধসে পড়েনি জানি না। বারান্দার পরে যে ঘর, সেটা নিশ্চয়ই বৈঠকখানা ছিল।

'একেবারে পরিত্যক্ত বলে তো মনে হচ্ছে না,' ফেলুদা মন্তব্য করল। করার কারণটা স্পষ্ট। লোকের যাতায়াত আছে, সেটা বারান্দার বালির উপর পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যায়।

'আর দেশলাইয়ের কাঠি, ফেলুদা।'

একটা নয়, তিন-চারটে। সিঁড়ি উঠেই বারান্দার বাঁদিকের থামটার পাশে।

'সমুদ্রের হাওয়ায় সিগারেট ধরাতে গেলে কাঠি খরচা একটু বেশি হবেই।'

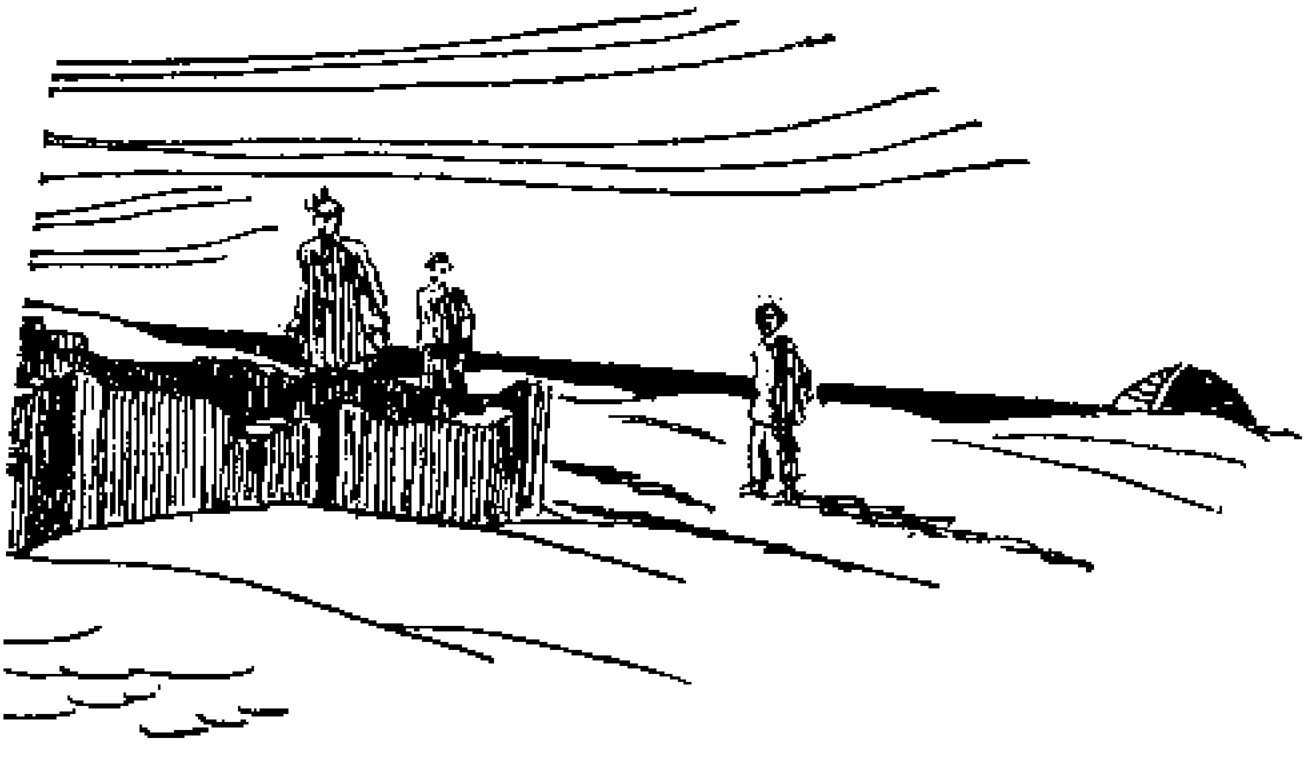

আমরা ফটকের মধ্যে ঢুকলাম। সাংঘাতিক কৌতূহল হচ্ছে বাড়িটার ভিতরে ঢোকার। দরজা নিশ্চয়ই খোলা যায়, কারণ দমকা বাতাসে সেটা খটখট করে নড়ছে; একেবারে যে খুলছে না, সেটা ঘরের মেঝেতে জমে থাকা বালিতে বাধা পাওয়ার জন্য।

পায়ের ছাপগুলো ফেলুদা খুব মন দিয়ে দেখল। প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে, কারণ ক্রমাগতই হাওয়ার সঙ্গে বালি এসে তার উপর জমা হচ্ছে।

কিন্তু জুতোর ছাপ তাতে সন্দেহ নেই।

এ ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে সেটা পা দিয়ে খানিকটা বালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল।

আমার মনে হল পানের পিক, যদিও লালমোহনবাবুর মতে নিঃসন্দেহে ব্লাড।

লালমোহনবাবু একবার মৃদুস্বরে 'ব্রেকফাস্ট' কথাটা বলাতে বুঝলাম ওঁর আর এগোতে সাহস হচ্ছে না। আমারও বুক টিপটিপ করছে, কিন্তু ফেলুদা নির্বিকার।

'তা হলে হত্যাপুরীতে একবার প্রবেশ করতে হয়।'

এটা জানাই ছিল। এতদূর এসে পায়ের ছাপটাপ দেখে ফেলুদা চট করে পিছিয়ে যাবে না।

ক্যাঁ—চ শব্দে দরজার দুটো পাল্লাই খুলে গেল ফেলুদার দু হাতের চাপে।

বাদুড়ে গন্ধ। বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না, কারণ ভিতরে জানালা থেকে থাকলেও তা নিশ্চয়ই বন্ধ। আর দরজা দিয়ে যে আলো ঢুকবে তার পথ আপাতত আমরাই বন্ধ করে রেখেছি।

ফেলুদা চৌকাঠ পেরোল। আমি জানি ঘুটঘুটে রাত্তির হলেও ও দ্বিধা করত না, তফাত হত এই যে ওর সঙ্গে তখন হয়তো ওর কোল্ট রিভলভারটা থাকত।

'আসুন ভিতরে।'

আমি ঢুকে গেছি, কিন্তু লালমোহনবাবু এখনও চৌকাঠের বাইরে।—'অল ক্লিয়ার কি?' অস্বাভাবিক রকম চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'ক্লিয়ার তো বটেই। আরও ক্লিয়ার হবে ক্রমে ক্রমে। এসে দেখুন না কী আছে ঘরের মধ্যে।'

আমি অবিশ্যি এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি।

প্রথমেই চোখে পড়েছে একটা টিনের ট্রাঙ্ক আর শতরঞ্চিতে মোড়া একটা বেডিং। ঘরের এক পাশে দেয়ালের সামনে যেমন-তেমন করে ফেলে রাখা হয়েছে সে দুটো।

'পুলিশের পণ্ডশ্রম,' বলল ফেলুদা, 'নিশীথবাবু যাননি'।

'তবে কোথায় গেলেন ভদ্রলোক?' লালমোহনবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ফেলুদা কথাটা গ্রাহ্য করল না।

'হুঁ—ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

ঘরের এক কোণে স্তূপ করে রাখা রয়েছে সরু আর লম্বা-করে কাটা কাঠ, আর পাশেই ফিতেয় মোড়া দিস্তা দিস্তা ফিকে হলদে রঙের সস্তা কাগজ।

'বলুন তো এ থেকে কী বোঝা যায়,' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ও তো পুঁথির কাঠ বলে মনে হচ্ছে। আর ওই, ইয়ে—'

লালমোহনবাবু এত সময় নিচ্ছেন কেন জানি না। আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে নিশীথবাবু একেবারে ব্যবসা খুলে বসেছিলেন—ডামি পুঁথি তৈরি করার। সাইজমাফিক কাগজ কেটে দুদিকে কাঠ চাপা দিয়ে শালুতে মুড়ে দিলে বাইরে থেকে ঠিক পুঁথি।'

'এগজ্যাক্টলি,' বলল ফেলুদা—'আমার বিশ্বাস, সেন মশাইয়ের সব পুঁথিগুলো বার করে খুললে দেখা যাবে তার অনেকগুলোই কেবল সাদা কাগজ। আসলগুলো পাচার হয়ে গেছে হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে।'

'ও হো হো!'—লালমোহনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—'সাপ, সাপ! সেদিন একটা কাগজের ফালি দেখেছিলাম সাগরিকার গলিতে—সে তা হলে এই কাগজ!'

'নিঃসন্দেহে,' বলল ফেলুদা।

এর পরে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা লিখতে আমার হাত না কাঁপলেও, বুক কাঁপছে।

বৈঠকখানায় ঢুকেই ডাইনে-বাঁয়ে মুখোমুখি দুটো দরজা রয়েছে পাশের দুটো ঘরে যাবার জন্য। লালমোহনবাবু ডানদিকের দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা সামনের দরজা খুলে ঢোকাতে সেটা দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে সমুদ্রের বাতাস ঢুকছিল। একটা দমকা হাওয়ার ফলে হঠাৎ ডাইনের দরজাটা প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল, লালমোহনবাবু চমকে উঠে খোলা দরজাটার দিকে চাইলেন, আর চাইতেই তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল। ভদ্রলোক পড়েই যেতেন যদি না ফেলুদা এক লাফে গিয়ে ওঁকে জাপটে ধরে ফেলত।

এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা লোক চোখ উলটে মরে পড়ে আছে পাশের ঘরের মেঝেতে। তার মাথা থেকে বেরোনো রক্ত চাপ বেঁধে আছে মেঝের উপর।

লোকটাকে চিনতে কোনওই অসুবিধা হল না।

ইনি দুর্গাগতি সেনের সেক্রেটারি নিশীথ বোস।

॥ ১১ ॥

ফেলুদার আর ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল না।

রেলওয়ে হোটেল থেকে টেলিফোনে পুলিশ খবর দিয়ে আমরা আমাদের হোটেলে চলে এলাম। ফেলুদা বলল যে ওর দু-একটা কাজ আছে, বিশেষ করে নুলিয়া বস্তিতে একবার যাওয়া দরকার, কাজেই ও একটু পরে ফিরবে। লাশ ছোঁয়াছুঁয়ি না করেই ও বলল যে, বোঝাই যাচ্ছে লোকটাকে মারা হয়েছে একটা ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে—যদিও সে ধরনের কোনও হাতিয়ার কাছাকাছির মধ্যে পেলাম না।

লালমোহনবাবু না জেনে মোক্ষম নাম দিয়েছিলেন বাড়িটার এটা স্বীকার করতেই হবে, যদিও পরে বলেছিলেন যে পুরী কথাটা বাড়ি অর্থে ব্যবহার করেননি। উনি মিন করেছিলেন পুরী শহর। 'তিন দিনের মধ্যে দু-দুটো খুন, হত্যাপুরী ছাড়া আর কী ?'

একটা সুখবর দিয়ে রাখি। দুর্গাগতিবাবুর সঙ্গে তাঁর ছেলের মিটমাট হয়ে গেছে। অন্তত দেখে তাই মনে হল। আমরা যখন ভুজঙ্গ নিবাস থেকে বেরোচ্ছি, তখন সাগরিকার দিকে চোখ পড়তে দেখি ছাতে দুজন লোক। বাপ আর ছেলে। শুধু তাই নয়, ছেলে আমাদের দিকে হাত নাড়লেন, কাজেই বুঝলাম খোশ মেজাজে আছেন। এটাও আমার কাছে কম রহস্য নয়।

ফেলুদা যখন ঘরে এসে ঢুকল তখন পৌনে এগারোটা। আমার মনে পড়ে গেল নেপালে টেলিফোনের কথাটা। বললাম, 'কলটা পেয়েছিলে ?'

'এই তো কথা বলে আসছি।'

'কলটা কি কাঠমাণ্ডুতে করেছিলে ?'

'উঁহু, পাটন। কাঠমাণ্ডুর কাছেই বাঘমতী নদী পেরিয়ে একটা পুরনো শহর।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'যাই বলুন, লাশের কাছে ভূত কিছুই না। এখনও ভাবলে শিভারিং হচ্ছে।'

'সব শিভারিং খরচা করে ফেলবেন না, রাত্তিরের জন্য কিছু হাতে রাখবেন।'

'রাত্তিরে ?'

আমরা দুজনেই ফেলুদার দিকে চাইলাম। ও একটা ওমলেটের আধখানা মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'এক পায়ে না হলেও, খাড়া থাকতে হবে আজ রাত্তিরে।'

'কোথায় ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'দেখতেই পাবেন।'

'কারণটা কী ?'

'জানতেই পাবেন।'

লালমোহনবাবু চুপ্‌সে গেলেন। অবিশ্যি এটা ওঁর কাছে নতুন কিছু না।

'সেনাপতি দিব্যি স্মার্ট ডাক্তার,' বলল ফেলুদা।

'তুমি এর মধ্যে ডিসপেনসারি ঘুরে এলে ?'

'ভদ্রলোক দুর্গা সেনের ট্রিটমেন্ট করেছেন সেটা জানলাম। এপ্রিলে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। ওষুধটা ওঁরই আনা।'

'ডায়াপিড ?'—নামটা মনে ছিল তাই জিজ্ঞেস করলাম।

'তোর প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারছি ওষুধটা তোর কোনও কাজে লাগবে না।'

থানা থেকে ফোন এল পৌনে বারোটায়। ডাক্তারের রিপোর্ট বলছে, নিশীথবাবু খুন হয়েছেন গতকাল সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত আটটার মধ্যে, আর তাঁকে মারা হয়েছে কোনও ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে। হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভুজঙ্গ নিবাসের বাইরে গেটের ধারেই মনে হয় খুনটা হয়েছে, তারপর মৃতদেহ টেনে নিয়ে ওই ঘরে ফেলে দেওয়া হয়, কারণ বারান্দার বালির নীচে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।

আমি একটা জিনিস আন্দাজ করছি, যদিও ফেলুদাকে এ বিষয়ে কিছু বলিনি এখনও। যে লোক নিশীথবাবুকে খুন করেছিল, সে লোকই ফেলুদার মাথায় বাড়ি মেরেছে, আর একই অস্ত্র দিয়ে। তাই ফেলুদার মাথায় রক্ত লেগে ছিল।

সাড়ে বারোটা নাগাত ভাবছি লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যায় কি না, কারণ লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই বলছেন রান্নাঘর থেকে টেরিফিক পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পাচ্ছেন, এমন সময় বিলাস মজুমদার এসে হাজির।

'কী মশাই, যাবেন নাকি ?' ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

'কোথায় ?'—ফেলুদা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ওর খাতায় কী যেন লিখছিল।

'টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের এয়ার-কন্ডিশন্ড লিমুজিন। ছ জনের জায়গা, মাত্র দুজন যাচ্ছি। আমি, আর একটি অ্যামেরিকান—নাম স্টেডম্যান। ভাবতে পারেন—এও ওয়াইল্ড লাইফ! কেওনঝরগড় যাচ্ছে। খুব মিশুকে। ভাল লাগত আপনার।'

'কখন বেরোচ্ছেন ?'

'লাঞ্চ খেয়েই।'

'না, থ্যাঙ্ক ইউ,' বলল ফেলুদা, 'আমার একটু কাজ আছে। বরং আপনি যদি থেকে যেতেন তো পুরীর ওয়াইল্ড লাইফের কিছুটা নমুনা দেখে যেতে পারতেন।'

'নো, থ্যাঙ্ক ইউ,' হেসে বললেন বিলাস মজুমদার।

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরোনোর মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা ভারী অ্যামেরিকান গাড়ির শব্দ পেলাম। বুঝলাম গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল।

* * *

শেষ করে যে চাপা উত্তেজনার মধ্যে এতটা সময় কাটাতে হয়েছে তা ভেবে মনে করতে পারলাম না।

রাত্তিরের খাওয়া সারার প্রায় ঘণ্টা খানেক পর দশটা নাগাত ফেলুদা বলল যে যাবার সময় হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দিল যে যদিও ওর মন বলছে যে একটা কিছু ঘটতে পারে, পণ্ডশ্রম যে হবে না এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। —'ফিটফাট স্মার্ট হয়ে নে। ওসব কুর্তা পাজামা চলবে না। সাদা জামা চলবে না। অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবার জন্য কী পরতে হয় সেটা আশা করি আর বলে দিতে হবে না।'

না : তার দরকার নেই। পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানেও আমাদের ঠিক এই কাজই করতে হয়েছিল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম তারা দেখা যাচ্ছে না। লালমোহনবাবু এমনিতেই ঘন ঘন আকাশের দিকে দেখেন, তবে সেটা তারা দেখার জন্য নয়, স্কাইল্যাবের চিহ্ন দেখার জন্য। আজ সমুদ্রের দিক থেকে প্রচণ্ড হাওয়া বইছে দেখে বললেন, 'হাওয়া উলটোমুখো হলে টুকরোগুলো তাও সমুদ্রে পড়ার চান্স ছিল। এখন কিস্যু বলা যায় না।'

ভুজঙ্গ নিবাসের চারিদিকে যদিও বালি, বিচটা কিন্তু বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে। যেখানে বিচ শুরু হয়েছে সেখানে রেলওয়ে হোটেল থেকে যারা স্নান করতে আসে তাদের জন্য বাঁশের খুঁটির ওপর হোগলা দেওয়া কয়েকটি ছাউনি রয়েছে। তারই একটার পাশে এসে ফেলুদা থামল।

পশ্চিম দিকের আকাশটা শহরের আলোর জন্য খানিকটা ফিকে, আমাদের পিছনে সমুদ্রের দিকে গাঢ় অন্ধকার। সামনের দিকে লোক হেঁটে গেলে তাকে ছায়ামূর্তির মতো দেখা যাবে, কিন্তু চেনা যাবে না। সে লোক কিন্তু আমাদের দেখতেই পাবে না।

মনে মনে বললাম, মোক্ষম জায়গা বেছেছে ফেলুদা, যদিও কেন বেছেছে জানি না, জিজ্ঞেস করলেও কোনও উত্তর পাব না। ওর এই অভ্যেসটার জন্য লালমোহনবাবু একবার বলেছিলেন, 'আপনি মশাই সাসপেন্স ফিলিম তৈরি করুন। লোকে দেখে দম ফেলতে পারবে না। কোথায় লাগে হিচকিক্‌।'

সাগরিকার তিনতলায় দুর্গাগতিবাবুর ঘরে এখনও আলো জ্বলছে; দোতলার আলো এইমাত্র নিভল। পাঁচিলের উপর দিয়ে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের একতলার ঘরের জানালার একটি ফালি দেখা যাচ্ছে; বুঝতে পারছি সে ঘরে এখনও আলো জ্বলছে।

আমরা তিনজনেই ছাউনির তলায় বালির উপর বসেছি। কথা বলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, আর বলতে হলেও গলা না তুললে হাওয়ায় আর সমুদ্রের গর্জনে কথা হারিয়ে যাবে। চোখ খানিকটা সয়ে এসেছে অন্ধকারে; ডাইনে চাইলে বেশ বুঝতে পারছি জটায়ুর কানের পাশের চুলগুলো বাতাসে মোরগের ঝুঁটির মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। বাঁয়ে ফেলুদা; ও এইমাত্র বাঁ কব্জিটা চোখের কাছে এনে ওর রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটাতে সময় দেখল। তারপর বুঝলাম ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে

একটা জিনিস বার করে ওর চোখের সামনে ধরল।
ওর জাপানি বাইনোকুলার।
ফেলুদা কী দেখছে জানি।
দুর্গাগতি সেনকে দেখা যাচ্ছে ওঁর শোবার ঘরের জানালায়, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দু পা বাঁয়ে সরে ডান হাত বাড়িয়ে কী জানি একটা তুললেন।
গেলাস।
কী খেলেন ভদ্রলোক গেলাস থেকে ?
একতলার ঘরে বাতি এইমাত্র নিভে গেছে, এবার তিনতলার বাতি নিভল, আর নিভতেই আমাদের আশেপাশের অন্ধকার যেন হঠাৎ আরও গাঢ় হয়ে গেল।
কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে কেউ নড়াচড়া করলে বেশ বুঝতে পারছি।
যেমন লালমোহনবাবু তাঁর পকেট থেকে টর্চটা বার করলেন।
কিন্তু কেন ? কী মতলব ভদ্রলোকের ?
আমি ঝুঁকে পড়ে ওঁর কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বললাম, 'জ্বালাবেন না, খবরদার !' ভদ্রলোক উত্তরে আমার কানে মুখ এনে বললেন, 'ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, হাতে থাক।'
উনি মুখ সরিয়ে নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস দেখে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লাফে গলার কাছে চলে এল।
ডাইনে হাত দশেক দূরে আরেকটা হোগলার ছাউনি।
তার পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।
কখন এসেছে জানি না।
লালমোহনবাবুও দেখেছেন, কারণ ওঁর কাঁপা হাত থেকে টর্চটা ঝুপ শব্দ করে বালির উপর পড়ে গেল।
আর ফেলুদা ?
ও দেখেনি।
ওর দৃষ্টি সোজা সাগরিকার দিকে।
আমিও জোর করে চোখ সেই দিকেই ঘোরালাম।
আর তাই বোধহয় ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে দেখতে পেলাম।
সাগরিকার দিক থেকে লোকটা আসছে আমাদের দিকে।
না, এই দিকে না। ভুজঙ্গ নিবাসের দিকে।
লোকটাকে চেনার কোনও উপায় নেই।
এগিয়ে এল। ওই তো ভুজঙ্গ নিবাসের গেটের থাম।
গেটের কাছাকাছি পৌঁছে লোকটা হাঁটার গতি কমাল, তারপর হাঁটা থামল।
এবারে আরেকটা লোক। এতক্ষণ দেখিনি। বোধহয় বাড়িটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল।
দ্বিতীয় লোকটা প্রথম লোকটার দিকে এগিয়ে গেল।
গেটের সামনে এখন দুজন লোক।
এবার দুজনে ভাগ হল। যে সাগরিকার দিক থেকে এসেছিল সে আবার

ফিরে—

সর্বনাশ! লালমোহনবাবুর অসাবধান আঙুলের চাপে ওঁর পাগলা টর্চ জ্বলে উঠেছে!

ফেলুদা এক থাবড়ে টর্চটা বালিতে ফেলে দিল, আর সেই মুহূর্তে লালমোহনবাবুর চার ইঞ্চি ডাইনের বাঁশের খুঁটিটাতে কান-ফাটানো শব্দের সঙ্গে একটা গুলি এসে লাগল।

'তুই ওটাকে ধর!'

ফেলুদা হাউইয়ের মতো লাফিয়ে উঠে ছুটে গেছে দ্বিতীয় লোকটাকে লক্ষ্য করে।

আশ্চর্য এই যে ওই একটা কথাতেই দেখলাম যে বিপদের তোয়াক্কা না করে আমিও নিঃশব্দে তীরবেগে ছুটতে শুরু করেছি বালির উপর দিয়ে প্রথম লোকটাকে লক্ষ্য করে।

ফেলুদার আর আমার পথ ভাগ হয়ে গেল।

রাগবি খেলায় যেমন ফ্লাইং ট্যাক্‌ল করে একজন খেলোয়াড় আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরে, আমিও ঠিক সেই ভাবে অব্যর্থ লক্ষ্যে লোকটার পা দুটোকে জাপটে ধরলাম।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল বালির ওপর। আমি লোকটার পিঠে, আমার দৃষ্টি ঘুরে গেছে ফেলুদার দিকে।

একটা হাড়ে-হাড়ে সংঘর্ষের শব্দের সঙ্গে ফিকে আকাশের সামনে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি আরেকটা ছায়ামূর্তিকে ঘুঁসি মেরে ধরাশায়ী করল।

ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু এসে পড়েছেন, এবং এসেই মহা বিক্রমে আমার হাতে বন্দি লোকটার মাথা লক্ষ্য করে তাঁর হাতের ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা নিক্ষেপ করেছেন। একটা ভোঁতা শব্দে বোঝা গেল হাতিয়ার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এখন বালিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

'ওকে নিয়ে আয় এদিকে!'

আমরা দুজনে লোকটার দুই পা ধরে বালির উপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলাম যেখানে রয়েছে ওরা দুজন। ফেলুদা দাঁড়ানো, অন্য লোকটি চিত, ফেলুদার একটা পা তার পেটের উপর, আর অন্যটা ডান হাতের তেলোর উপর—যে হাত থেকে রিভলভারটা আলগা হয়ে পড়ে আছে বালিতে।

'আপনার থুতনিতে ক্ষতচিহ্ন ছিল না, কিন্তু আজ থেকে থাকবে।'

আমার ওয়াইল্ড লাইফ কথাটা মনে পড়ল। অদ্ভুত হিংস্র চেহারা নিয়ে টর্চের তীব্র আলোতে কপাল কুঁচকে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছেন বিলাস মজুমদার, তাঁর বাঁ হাতে আঁকড়ানো রয়েছে লাল শালু দিয়ে মোড়া একটা পুঁথি।

ফেলুদা ঝুঁকে পড়ে এক ঝটকায় পুঁথিটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের ঝোলার মধ্যে রেখে দিল।

তারপর ওর টর্চ ঘুরে গেল আমাদের বন্দির দিকে।

'আপনার থার্ড আই কী বলছে লক্ষ্মণবাবু? শেষটায় এই ছিল আপনার কপালে?'

অন্ধকার থেকে আরও লোক বেরিয়ে এসেছে।

'আসুন মিঃ মহাপাত্র,' ফেলুদা হাঁক দিল।—'এঁদের দুজনকে তুলে দিচ্ছি আপনাদের হাতে, তবে কাজ ফুরোয়নি। আমরা হত্যাপুরীর বৈঠকখানায় একটু বসব। এঁরা দুজনও থাকবেন।'

চারজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে বিলাসবাবু আর লক্ষ্মণবাবুকে তুলে নিল।

'মহিমবাবু আছেন তো!' ফেলুদা পিছনের অন্ধকারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল।

'আছি বইকী।'

অন্ধকার থেকে সেই রহস্যজনক চতুর্থ ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন।—'বাবাও এসে পড়লেন বলে। ওই যে টর্চের আলো।'

'কোনও চিন্তা নেই,' বললেন, মিঃ মহাপাত্র, 'মোড়া এনে রাখা হয়েছে ঘরে—সবাই বসতে পারবেন।'

লালমোহনবাবুর 'বাইরেই তো বেশ—' কথাটা কারুর কানে গেল কি না জানি না, কারণ সবাই রওনা দিয়েছে ভুজঙ্গ নিবাসের দিকে।

॥ ১২ ॥

'আসুন, মিঃ সেন, আপনার জন্যই ওয়েট করছি।'

ফেলুদা এগিয়ে গেছে দরজার দিকে।

মহিমবাবু তাঁর বাবাকে নিয়ে ঢুকলেন। তিনটে লণ্ঠন জ্বলছে ঘরের ভিতর। পুলিশের লোকে ঝাড়পোঁছ করে ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে।

দুর্গাগতিবাবু আর মহিমবাবু দুটো পাশাপাশি মোড়ায় বসলেন।

'এই নিন আপনার কল্পসূত্র।'

ফেলুদা সদ্য-পাওয়া পুঁথিটা দুর্গাগতিবাবুর হাতে দিলেন। ভদ্রলোক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তক্ষুনি আবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, 'আর অন্যটা?'

'সেটার কথায় আসছি,' বলল ফেলুদা।—'আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি আজ আবার ঘুমের ওষুধ খাননি তো?'

'পাগল! ঘুমের ওষুধই তো আমার সর্বনাশ করল। কাল কী মিশিয়ে দিয়েছিল জলের সঙ্গে কে জানে?'

দুর্গাগতিবাবু গভীর বিরক্তির ভাব করে পুলিশের হাতে বন্দি লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে চাইলেন।

ফেলুদা বলল, 'এত ভাল একজন অ্যালোপ্যাথ থাকতে আপনি এই হাতুড়ে হামবাগটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন কেন বলুন তো?'

'কী করব বলুন! লোক যাচাই করার ক্ষমতা কি আর ছিল? সবাই এত সুখ্যাত করলে, যেচে এল আমার কাছে, বললে নিজের গরজে আমাকে সারিয়ে দেবে। আরও বললে, ওর সন্ধানে ভাল পুঁথি আছে—জ্যোতিষশাস্ত্রের পুঁথি...'

'ওই তো মুশকিল। পুঁথির কথা বললেই আপনার মন গলে যায়। যাই হোক অ্যামাপিডে কাজ দিয়েছে তো? লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনার পক্ষে ওটাই তো সবচেয়ে নতুন আর সবচেয়ে ভাল ওষুধ বলে।'

'আশ্চর্য ওষুধ,' বললেন মিঃ সেন, 'মুহূর্তে মুহূর্তে যেন স্মৃতির এক-একটা দরজা খুলে যাচ্ছে। সেনাপতি নিজে এসে ওষুধটা দিল বলেই তো হল। সেই যে আমার ডাক্তার সে কথাও তো ভুলে গিয়েছিলাম!'

'তা হলে বলুন তো, এই ভদ্রলোককে চেনেন কি না।'

ফেলুদা তার টর্চ ফেলল বিলাস মজুমদারের মুখে। দুর্গাগতিবাবু তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'কালকেই চিনেছিলাম গলার স্বর আর চাহনি

থেকে। কেন যে তবু খটকা লাগছিল জানি না।'

'এঁর নামটা মনে পড়ছে ?'

'পরিষ্কার—যদি না উনি নাম ভাঁড়িয়ে থাকেন।'

'সরকার কি ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'সরকার,' সায় দিয়ে বললেন দুর্গাগতিবাবু। 'পুরো নামটা কোনওদিন জানিনি।'

'লায়ার!' চোখমুখ লাল করে চিৎকার করে উঠলেন অভিযুক্ত ভদ্রলোক। 'পাসপোর্ট দেখতে চান আমার ?'

'না, চাই না'—বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল ফেলুদা।—'আপনার মতো ধূর্ত লোকের পাসপোর্টের কী মূল্য ? কী আছে পাসপোর্টে ? বিলাস মজুমদার নাম আছে তো ? আর চেহারার বিশেষত্বর মধ্যে কপালের আঁচিলের কথা বলেছে ?—'ডিসটিংগুইশিং মার্ক—মোল অন ফোরহেড'—এই তো ? তবে দেখুন—'

কথাটা বলেই ফেলুদা ভদ্রলোকের দিকে হনহনিয়ে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে এক ঝটকায় একটা রুমাল বার করে সেটা দিয়ে একটা চাপড় মারল ভদ্রলোকের কপালে, আর তার ফলে কৃত্রিম আঁচিল কপাল থেকে খুলে ছিটকে গিয়ে পড়ল অন্ধকারে মেঝেতে।

'আপনি বিলাস মজুমদার সম্বন্ধে অনেক খবর নিয়েছিলেন,' ফেলুদা বলল দৃপ্তকণ্ঠে, 'স্নো লেপার্ডের ছবি তুলতে গিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া, কোন হাসপাতালে গিয়েছিল, কী কী হাড় ভেঙেছিল, গত মাস অবধি সে হাসপাতালে ছিল—এ সবই আপনি জানতেন। কিন্তু একটি সংবাদ আপনার কানে পৌঁছয়নি। খবরের কাগজে সেই সংবাদটাই আমি পড়েছিলাম, কিন্তু তেমন মন দিয়ে পড়িনি। খবরটা কাল্কে আমি পেয়েছি কাঠমাণ্ডুর বীর হাসপাতালের ডাঃ ভার্গবের কাছ থেকে। সেটা হল এই—বিলাস মজুমদারের সবচেয়ে মারাত্মক ইনজুরি হয়েছিল ব্রেনে। তিন সপ্তাহ আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

লণ্ঠনের আলোতেও বুঝতে পারছি লোকটার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

'শুনুন মিঃ সরকার,' ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার পেশা পাসপোর্টে লেখা যায় না। আপনার পেশা স্মাগলিং। নিজে সব সময় চুরি না করলেও, চোরাই মাল পাচার করেন আপনি। ভাতগাঁওয়ের প্যালেস মিউজিয়াম থেকে চুরি করা পুঁথি আপনার হাতে আসে কাঠমাণ্ডুতে। তার পরের ঘটনা যে কী, সেটা শুনুন মিস্টার সেনের মুখে।'

দুর্গাগতি সেনের চাহনিতে এমন কঠিন গাম্ভীর্যের ভাব এর আগে দেখিনি। ভদ্রলোক বললেন :

'কাঠমাণ্ডুতে একই হোটেলে ছিলাম এই ভদ্রলোক আর আমি। পাশাপাশি ঘর—একদিন ভুল করে আমার চাবি ওঁর ঘরে লাগিয়ে দেখি দরজা খুলে গেছে। ভেতরে উনি ছাড়া দুজন লোক, তাদের একজন বাক্স থেকে একটা লাল মোড়ক

বার করে ওঁকে দিচ্ছে। দেখেই বুঝলাম পুঁথি। খটকা লাগল। মাপ চেয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সেই রাত্রে ঘুমের মধ্যে কী হল জানি না, জ্ঞান হল হাসপাতালে। মাথা ব্ল্যাঙ্ক। এই ঘটনার আগের সব স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে! হোটেলে খোঁজ করে আমার নাম-ঠিকানা পায়, এখানে খবর দেয়, নিশীথ গিয়ে আমাকে নিয়ে আসে। সাড়ে তিন মাস ছিলাম হাসপাতালে।'

'আপনার না-জানা অংশ আমি বলছি,' বলল ফেলুদা, 'ভুল হলে মিঃ সরকার যেন শুধরে দেন।—আপনাকে সেই রাত্রে অজ্ঞান করে গাড়িতে নিয়ে তুলে শহরের বাইরে গিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে পাঁচশো ফুট নীচে ফেলে দেওয়া হয়। মিঃ সরকারের ধারণা ছিল আপনার মৃত্যু হয়েছে। ন মাস পরে হয়তো চোরাই মাল পাচার করতেই পুরীতে এসে ডি. জি. সেন নাম দেখে খটকা লাগে। আমার ধারণা আপনার বাড়ির একতলার বাসিন্দা গণৎকার লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আপনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন পান মিঃ সরকার। তাই নয় কি?'

ঝিমিয়ে পড়া লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য হঠাৎ যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন—'এ সব কী বলছেন মশাই—উনি তো আপনাদের সঙ্গে প্রথম এলেন আমার বাড়িতে!'

'বটে?'—ফেলুদা এগিয়ে গেছে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে। 'তা হলে বলুন তো গণৎকার মশাই, পরিচয় হবার আগেই আপনি কেন ভদ্রলোককে তক্তপোশে বসতে বললেন আর আমাদের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন? উনিই যে বিলাস মজুমদার, আমি নই, সেটা আপনি কী করে জানলেন?'

এই এক প্রশ্নে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য আশ্চর্যভাবে কুঁকড়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে চলল, 'আমার বিশ্বাস দুর্গাগতিবাবুর স্মৃতি লোপ পাবার কথাটা জেনে, এবং লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের সাহচর্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে, সরকার মশাইয়ের মনে পুঁথি চুরির আইডিয়াটা আসে। ভাল খদ্দেরও রয়েছে একই হোটেলে—মিঃ হিঙ্গোরানি। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনটে মুশকিল দেখা দেয়। প্রথমটা হল—একজন অবাঞ্ছিত লোক মিঃ সরকারকে ধাওয়া করে এখানে এসে হাজির হয়। সে হল রূপচাঁদ সিং। ভারী মুশকিল, না, মিঃ সরকার? যে গাড়িতে করে আপনি বেহুঁশ মিস্টার সেনকে নিয়ে গেছিলেন পাহাড় থেকে ফেলে হত্যা করতে, তার ড্রাইভার—যাকে হয়তো আপনি ভালরকম ঘুষ দিয়েছিলেন—সে যদি হঠাৎ আরও লোভী হয়ে পড়ে, এবং আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে হুমকি দিয়ে আরও টাকা আদায় করতে চায়? ভারী মুশকিল। তখন তাকে খতম করা ছাড়া আর রাস্তা থাকে কি?'

'মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে!'—মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠলেন মিঃ সরকার।

'কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে তার মাথায় যে গুলিটা লেগেছিল সেটা আপনার এই রিভলভারটা থেকেই বেরিয়েছে, তা হলে?'

মিঃ সরকার আবার নেতিয়ে পড়লেন। বেশ দেখতে পাচ্ছি যে ভদ্রলোকের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। আমিও ঘামছি, তবে সেটা শ্বাসরোধ করা উত্তেজনায়। ফেলুদার খাতায় লেখা ছিল 'কালোডাক'। এখন বুঝতে পারছি সেটা হল ব্ল্যাকমেল। আমার পাশে লালমোহনবাবু যেন ফেনসিং ম্যাচ দেখছেন।

কথার তলোয়ার খেলায় ফেলুদার জুড়ি নেই সেটা স্বীকার করতেই হবে। আর সে খেলা এখনও শেষ হয়নি।

'অতএব রূপচাঁদ সিং হল মার্ডারার নাম্বার ওয়ান,' ফেলুদা বলে চলল।—'এখন দ্বিতীয় মুশকিলে আসা যাক। সেটা হল শ্রীক্ষেত্রে গোয়েন্দার আগমন। ফেলু মিত্তিরকে ধোঁকা না দিয়ে সরকার মশাইয়ের কার্যসিদ্ধি ছিল অসম্ভব। সেখানে বলব যে, বিলাস মজুমদারের ভূমিকায় নিজেকে এস্টাবলিশ করতে, এবং নিজের অপরাধ একজন স্মৃতিভ্রষ্ট অসহায় প্রৌঢ়ের স্কন্ধে চাপাতে, তিনি বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলেন। এই সাফল্যই তাঁর মনে একটা বেপরোয়া ভাব এনে দেয়। পরিকল্পনা খুবই সহজ। পুঁথি এনে দিতে পারলে হিঙ্গোরানি কিনবেন; সরাসরি মালিকের কাছ থেকে কেনার উপায় নেই, কারণ দুর্গাগতিবাবুর টাকার লোভ নেই এবং পুঁথিগুলি তাঁর প্রাণস্বরূপ। সুতরাং আলমারি থেকে পুঁথি বার করতে হবে। উপায় কী? অতি সহজ। কাজটা করবেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, কারণ এ কাজ তিনি বেশ কিছুদিন থেকেই করে আসছেন। আগে পুরো টাকাটাই তিনি নিজে পকেটস্থ করেছেন; এখানে টাকার অঙ্কটা অনেক বেশি, কাজেই সেটা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে একজনের কথা একটু ভাবতে হবে। সেক্রেটারি নিশীথ বোস।'

ফেলুদা থামল। তারপর লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মংগলা রোডে কীর্তনের কথা বলেছিলেন না আপনি?'

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য একটা বেপরোয়া ভাব আনবার চেষ্টা করে বললেন, 'মিথ্যে বলেছি?'

'না, মিথ্যে বলেননি,' বলল ফেলুদা, 'প্রতি সোমবার সেখানে কীর্তন হয় সেটা ঠিকই! কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন আপনি সেখানে যান, সেটা ঠিক না। আপনি কোনওদিন যাননি। আমি খোঁজ নিয়েছি। তবে এ বাড়ি থেকে একজন যেতেন। নিশীথ বোস। সোমবার বিকেলে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা নিশীথবাবু বাড়ি থাকতেন না। চাকর থাকত। এই সোমবার অর্থাৎ গত কালও নিশীথবাবু ছিলেন না। চাকরটা অপদার্থ। তাকে ঘুষ দিয়ে হাত করা কিছুই না। আপনি দুপুরে মিঃ সেনের ঘুমের ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে সাড়ে পাঁচটায় তাঁর ঘরে ঢুকে, বালিশের নীচ থেকে চাবি বার করে নিয়ে আলমারি থেকে পুঁথি বার করে নিয়ে যান। সেটা মিঃ সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। তার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় ভুজঙ্গ নিবাসের বারান্দায়। আপনি অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। আপনার জুতোর ছাপ, আপনার দেশলাইয়ের কাঠি ও আপনার পানের পিক তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এই সময় একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়।'

আমরা সবাই কাঠ। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য থর থর করে কাঁপছেন, কারণ মিঃ সরকার ছাড়া ঘরের সবাইয়ের দৃষ্টি এখন তাঁর দিকে।

ফেলুদা আবার শুরু করল— 'একজন আমেরিকান ভদ্রলোক সাড়ে ছটায় আসবেন মিঃ সেনের পুঁথি দেখতে। তাই ছটার মধ্যে নিশীথবাবু ফিরে আসেন। হয়তো কর্তাকে তখনও ঘুমোতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। আলমারি খুলে দেখেন

পুঁথির বদলে সাদা কাগজ। আপনি বাড়ি নেই। সন্দেহটা নিশ্চয়ই বাড়ে। বাইরে এসে দেখেন বালিতে পায়ের ছাপ। চলে আসেন ভুজঙ্গ নিবাসে। বলুন তো লক্ষ্মণবাবু, এই অবস্থায় তাকে কি বাঁচতে দেওয়া চলে? একটি ভোঁতা হাতিয়ার তো ছিল আপনার সঙ্গে, তাই না? তাই দিয়ে তাকে মেরে, লাশ সরিয়ে, সাগরিকায় ফিরে গিয়ে নিশীথবাবুর বাক্স বিছানা ভুজঙ্গ নিবাসে রেখে হঠাৎ খেয়াল হয় হাতিয়ারে রক্ত লেগে আছে। তখন সেটা সমুদ্রের জলে ফেলতে গিয়ে পথে আমায় দেখে সেটা দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মেরে, তারপর সেটাকে জলে ফেলে দেন—তাই তো?'

ফেলুদা জানে যে এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, কিন্তু তাও সে থামল, কারণ পরের প্রশ্নটায় জোর দেবার জন্য। আদ্যিকালের পোড়ো বৈঠকখানার চার দেয়াল কাঁপিয়ে প্রশ্নটা করল সে—

'কিন্তু তাতেও কি আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছিল?'

উত্তরটাও ফেলুদাই দিল, কারণ লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যকে দেখে মনে হয়, তিনি বাক্যবাণে আধমরা।

'না, তাতেও হয়নি। সে পুঁথি হিঙ্গোরানি পায়নি। মিঃ সরকারও পাননি। তাই অন্য পুঁথিটিকে সরাবার দরকার হয়েছিল আজকে। তার আগে, হয়তো কাল রাত্রেই, আপনি নিশীথবাবুর মায়ের অসুখের গল্পটি ফেঁদেছেন। কিন্তু প্রথম দিন এত করেও আপনার পরিশ্রম ব্যর্থ হল কেন সেটা এঁদের একটু বুঝিয়ে বলবেন? বলবেন না? তা হলে আমিই বলি—কারণ এত আশ্চর্য একটি ঘটনা বর্তমান অবস্থায় আপনার পক্ষে গুছিয়ে বলা সম্ভব না। আমি অনেক রহস্যের সমাধান করেছি কিন্তু বর্তমান রহস্যটি এতই অদ্ভুত ও অসামান্য যে, আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। ভোঁতা হাতিয়ারের কথা বলছিলাম, কিন্তু সেই ভোঁতা হাতিয়ার যে প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি, তা আমি কী করে বুঝব? আপনার হাতে যে আর কিছুই ছিল না, তা আমি কী করে বুঝব! নিজের মাথায় কাঠের পাটার বাড়ি সত্ত্বেও আমি বুঝিনি। সেই রক্ত লাগা পুঁথি কেমন করে আপনি সরকারের হাতে তুলে দেবেন, আর সরকারই বা হিঙ্গোরানিকে দেবেন কেমন করে?'

'হায়, হায়, হায়!'—দুর্গাগতি সেন দু হাত মাথায় দিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছেন।—'আমার এত সাধের পুঁথি শেষটায়—'

'আপনাকে একটা কথা বলি মিস্টার সেন'—ফেলুদা দুর্গাগতিবাবুর দিকে এগিয়ে এসেছে—'আপনি কি জানেন যে সমুদ্র মাঝে মাঝে দান গ্রহণ করে না, ফিরিয়ে দেয়? এমনকী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দেয়?'

এবার ফেলুদা তার ঝোলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করল আরেকটা শালুতে মোড়া পুঁথি।

'এই নিন আপনার অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। এটাকে "নাই মামা" বলতে পারেন। শালু যেমন ছিল তেমনই আছে। পাটার রং ফিকে হয়ে গেছে, তবে লেখা যে খুব বেশি নষ্ট হয়েছে তা বলব না। কাপড় আর কাঠ ভেদ করে জল বেশি ঢুকতে পারেনি।'